রচনাবলি

[নবম খণ্ড]

সৈয়দ মুজতবা আলী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রচনাবলি

সৈয়দ মুজতবা আলী

নবম খণ্ড

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৬৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

প্রথম সংস্করণ প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র ১৪২৩ এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ্ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওয়াসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0466-2

SYED MUJTABA ALI RACHONABOLI (Vol. 9)
Collected works of Syed Mujtaba Ali
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 375.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

দেশে বিদেশে ৯

সত্যপীরের কলমে

লাক্ষাদ্বীপ ২১৫
সিন্ধুপারে ২১৬
প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ ২১৮
পুনরপি প্রাচ্য ২১৯
সিলেটি সাগা ২২১
নটিংহাম ২২৯
হাওর ২৩২
মহাভারত ২৩৩
৫৭০-১৯৭০/১৪০০ বছর ২৩৬
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ২৩৭
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না ভাই ভাই এক ঠাঁই? ২৪৪
ভাই ভাই এক ঠাঁই ২৪৬
সাক্ষরকে নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিবার পন্থা ২৫৪
উচ্চারণ ২৬১
পরাজিত জর্মনি ২৬৬
প্যালেস্টাইন ২৭৪
নেটিভ স্টেট ২৭৯
ধবলদণ্ড ২৮২
চতুরঙ্গ ২৮৫
হ-য-ব-র-ল ২৮৭

www.pathagar.com

বিবিধ

সপ্তপর্ণী	৩০৭
তোমার আসন পাতব কোথায়?	৩০৯
গণভাষা	৩১১
জনমত	৩১৪
রাষ্ট্রভাষা	৩১৭
ত্রিবেণী	৩১৯
এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা	৩২১
ধর্মং শরণং?	৩২৩
কাঠ-বেরালি?	৩২৫
মিজো সমস্যা : সরকার	৩২৭

www.pathagar.com

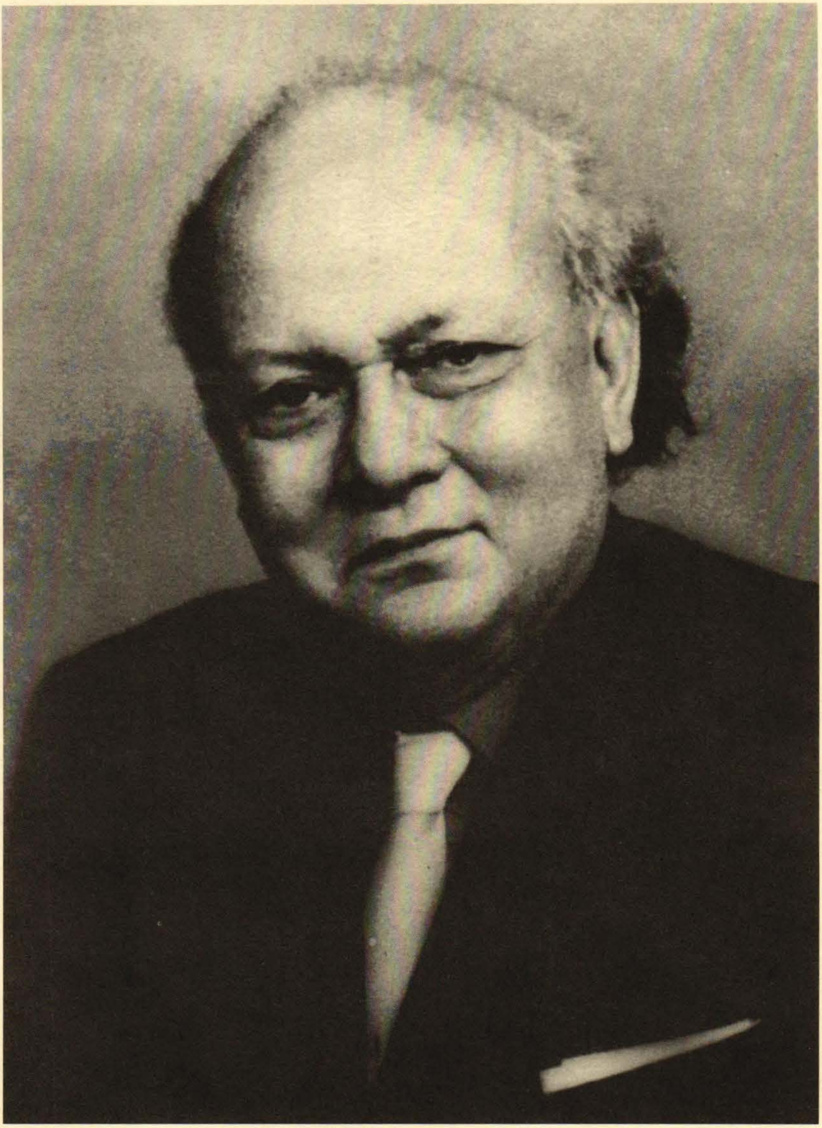

সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্ম : ১৯০৪ - মৃত্যু : ১৯৭৪)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দেশে বিদেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিন্নতবাসিনী জাহান আরার স্মরণে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চাঁদনি থেকে ন সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালির জন্য ইয়োরোপিয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গি হেঁকে বললে, 'এটা ইয়োরোপিয়নদের জন্য।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, 'ইয়োরোপিয়ন তো কেউ নেই। চল, তোমাতে-আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাংলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরেজি শব্দের প্রাগ্দেশে জোর দিয়ে কথা বললে সায়েবি ইংরেজি হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মতো— সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাংলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরেজি বলা। ফিরিঙ্গি তালতলার নেটিব, কাজেই আমার ইংরেজি শুনে ভারি খুশি হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁধে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো, মাসিপিসি রেলে কাজ করে— কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসত পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত— মনে হল, আমি একা।

ফিরিঙ্গিটি লোক ভালো। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ?' বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরি সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িঙ ফার?' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা-খুশি বলতে পার— দুটোর যে-কোনও একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ' যেন ইলিসিয়াম রো'র প্রশ্ন— ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে' নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরি

www.pathagar.com

করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরোদস্তুর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে, আমিও কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিব বস্তু, হয়তো বড্ড বেশি ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল সবকিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আ লা কার্ত ভোজন, যার যা খুশি খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগি মুসল্লম, আলু-গোশ্‌ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরোতে লাগল। এমনকি শিককাবাবের জায়গায় শামিকাবাব নয়, আলু-গোশ্‌তের বদলে কপি-গোশ্‌ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে কেনা।'

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গি মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গিকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াঁসের একটা বর্ণনা দিতে কিন্তু থেমে গেলুম। কী আর হবে বেচারির সন্দেহ বাড়িয়ে— তার উপর দেখি বোতল থেকে কড়া গন্ধের কী একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গির বাচ্চা— কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। ক্ষিধে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই ঘুম পাচ্ছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজ্যোৎস্না। তবুও পষ্ট চোখে পড়ে এ বাঙলা দেশ নয়। সুপারিগাছ নেই, আম-জামে ঘেরা ঠাসবুনুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে-সেখানে। উঁচু পাড়িওয়ালা ইঁদারা থেকে তখনও জল তোলা চলছে— পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হল বন্ধ— দমকা হাওয়ায় পোড়া ধুলো মাঝে মাঝে চড়াৎ করে যেন থাবড়া মেরে যায়। এই আধা আলো-অন্ধকারে যদি এ দেশ এত কর্কশ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কীরকম হবে। এই পশ্চিম, এই সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষ? না, তা তো নয়। বঙ্কিম যখন সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখ করেছেন তখন সুজলা-সুফলা শুধু বাঙলা দেশের জন্যই। ত্রিংশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হরেন ঘোষ দাঁড়িয়ে। অ্যাঁ? হ্যাঁ! হরেনই তো! কী করে? মানে? আবার গাইছে 'ত্রিংশ কোটি, ত্রিংশ কোটি, কোটি, কোটি—'

নাঃ, এ তো চেকার সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে। 'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট' বলে চেঁচাচ্ছে। থার্ড ক্লাস— ইয়োরোপিয়ন হলে কী হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে টিকিট চেক না করলে ও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ধড়মড় করে জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়োরোপিয়ন কম্পার্টমেন্ট' দিশি বেশ ধারণ করেছে— বাক্স তোরঙ্গ প্যাটরা চাঙারি চতুর্দিকে ছড়ানো। ফিরিঙ্গি কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে— একটুকরো চিরকুট লাগানো, তাতে লেখা 'গুড লাক ফর দি লঙ জার্নি।'

ফিরিঙ্গি হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক— তালতলার লোক— ওই তালতলাতেই ইরানি হোটেলে কতদিন খেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মোগলাই খানার কায়দাকানুন

www.pathagar.com

শিখিয়েছি, স্কোয়ারের পুকুরপাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই আর ফিরিঙ্গিতে মেমসায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে, এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজিতে যাকে বলে 'মডলিন'— তখন নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিস। কিন্তু উপস্থিত সে গবেষণা থাক— ভবিষ্যতে যে তার বিস্তর যোগাযোগ হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কীরকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের ওস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশিক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ। আরও শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিণী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে পশ্চিমের সকালবেলাকার রোদ্দুর বিলম্বিত আর বাদবাকি দিন দ্রুত।

গাড়ি যেন কালোয়াত। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনওগতিকে রোদ্দুরের তবলচিকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়। ইস্টিশানে ইস্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই রোদ্দুর প্ল্যাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে আড়নয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে— বাঘা তবলচি যেরকম দুই গানের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম-চাটিম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে ওস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন কোন ইস্টিশান গেল, কে গেল না তার হিসাব রাখিনি। সে-গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে
দৃষ্টি যায়— দগ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনওখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি।
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ-তীর ও-তীর ব্যাপী— শুষিয়াছে কোন ক্রূর যক্ষ
তার স্নিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনও আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধারে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ-পদ্য ছাপানো হয়নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।

দুই

গাঁয়ের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিতমশাই হাই তুললেই তুড়ি দিয়ে করুণ কণ্ঠে বলতেন, 'রাধে গো, ব্রজসুন্দরী, পার কর, পার কর।' বড় হয়ে মেলা হিন্দি, উর্দু পড়েছি, নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে কিন্তু 'পার কর, পার কর', বলে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করতে কাউকে শুনিনি।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা পার হয়ে এতদিন বাদে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম। নামগুলো ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি, ম্যাপে ভালো করে চিনে নিয়েছি আর কল্পনায় দেখেছি, তাদের বিরাট তরঙ্গ, খরতর স্রোত। ভেবেছি আমাদের গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, বুড়িগঙ্গা এনাদের কাছে ধূলিপরিমাণ। গাড়ি থেকে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হয় না, এরাই ইতিহাস-ভূগোলে নামকরা মহাপুরুষের দল। কোথায় তরঙ্গ আর কোথায় তীরের মতো স্রোত! এপার-ওপার জুড়ে শুকনো খাঁ-খাঁ বালুচর, জল যে কোথায় তার পাত্তাই নেই, দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ-টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন। তখন বুঝতে পারলুম, ভবযন্ত্রণা পশ্চিমাদের মনে নদী পার হবার ছবি কেন এঁকে দেয় না। এসব নদীর বেশিরভাগ পার হবার জন্য ঠাকুরদেবতার তো দরকার নেই, মাঝি না হলেও চলে। বর্ষাকালে কী অবস্থা হয় জানিনে, কিন্তু ঠাকুরদেবতাদের তো আর কিস্তিবন্দি করে মৌসুমমাফিক ডাকা যায় না; তিন দিনের বর্ষা, তার জন্য বারো মাস চেল্লাচিল্লি করাও ধর্মের খাতে বেজায় বাজে খরচা।

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনুদুস লালাজিদের মিষ্টি মিষ্টি 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ-ফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া', পাঞ্জাবিদের 'তুসি, অসি', আর শিখ সর্দারজিদের জালবন্ধ দাড়ির হরেকরকম বাহার। পুরুষ যেরকম মেয়েদের কেশ নিয়ে কবিতা লেখে, এদেশের মেয়েরা বোধ করি সর্দারজিদের দাড়ি সম্বন্ধে তেমনি গজল গায়; সে দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারি গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জত করে। তাতে আশ্চর্য হবারই-বা কী? তেয়োফিল গতিয়েরের এক উপন্যাসে পড়েছি, ফরাসি দেশে যখন প্রথম দাড়ি কামানো আরম্ভ হয় তখন এক বিদগ্ধা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'চুম্বনের আনন্দ ফরাসি দেশ থেকে লোপ পেল। শ্মশ্রুঘর্ষণের ভেতর দিয়ে প্রেমিকের দুর্বার পৌরুষের যে আনন্দঘন আস্বাদন পেতুম ফরাসি স্ত্রীজাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। এখন থেকে ক্লীবের রাজত্ব। কল্পনা করতেও ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে।'

ভাবলুম, কোনও সর্দারজিকে এ বিষয়ে রায় জাহির করতে বলি। ফরাসি দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজির দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি তখন এদেশের মহিলামহলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি-তারিফ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাবগতিক দেখে সাহস পেলুম না। এদেশের কোন কথায় কখন যে কার 'সখ্‌ৎ বেইজ্জতি' হয়ে যায়, আর 'খুনসে' তার 'বদলাঈ' নিতে হয়, তার হদিস তো জানিনে— তুলনাত্মক দাড়িতত্ত্বের

www.pathagar.com

আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দেব নাকি? এরা যখন বেণির সঙ্গে মাথা দিতে জানে তখন আলবত দাড়িবিহীন মুণ্ডও নিতে জানে।

সামনের বুড়ো সর্দারজিই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন। 'গোয়িঙ ফার?' নয়, সোজাসুজি 'কহাঁ জাইয়েগা?' আমি ডবল তসলিম করে সবিনয়ে উত্তর দিলুম— ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গি দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতিমিষ্ট মোলায়েম হাসি। বিচক্ষণ লোকও বটেন, বুঝে নিলেন নিরীহ বাঙালি কৃপাণ-বন্দুকের মাঝখানে খুব আরাম বোধ করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন পেশোয়ারে কাউকে চিনি, না, হোটেলে উঠব। বললুম, 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনও দেখিনি, তিনি যে আমাকে কী করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।'

সর্দারজি হেসে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে একগাড়ি বাঙালি নামে না, আপনি দু মিনিট সবুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।'

আমি সাহস পেয়ে বললুম, 'তা তো বটেই, তবে কি না শর্ট পরে এসেছি—'

সর্দারজি এবার অট্টহাস্য করে বললেন, 'শর্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা নয়, তবে কি না ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে হয়তো ভালো হত।'

সর্দারজিকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, 'এও তো তাজ্জবকি বাত্— 'পাঞ্জাবি' পরলে বাঙালিকে চেনা যায়?'

আমি আর এগুলুম না। বাঙালি 'পাঞ্জাবি' ও পাঞ্জাবি কুর্তায় কী তফাত সে সম্বন্ধে সর্দারজিকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়তো আমাকে আরও বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'সর্দারজি শিলওয়ার বানাতে ক গজ কাপড় লাগে?'

বললেন, 'দিল্লিতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালামুসায় সাড়ে ছয়, রাওয়ালপিণ্ডিতে সাড়ে সাত, তার পর পেশাওয়ারে এক লম্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুল্লুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।'

'বিশ গজ!'

'হ্যাঁ, তাও আবার খাকি শার্টিঙ দিয়ে বানানো।'

আমি বললুম, 'এরকম একবস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কী করে? মারপিট, খুনরাহাজানির কথা বাদ দিন।'

সর্দারজি বললেন, 'আপনি বুঝি কখনও বায়োস্কোপে যান না? আমি এই বুড়ো বয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি বোঝবার উপায় নেই— আমার আবার একপাল নাতি-নাতনি। এই সেদিন দেখলুম, দুশো বছরের পুরনো গল্পে এক মেম সায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন— মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশ গজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মদ্দা পাঠান বিশগজি শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?'

আমি খানিকটা ভেবে বললুম, 'হক কথা; তবে কি না বাজে খরচা।'

www.pathagar.com

সর্দারজি তাতেও খুশি নন। বললেন, 'সে হল উনিশ বিশের কথা। মাদ্রাজি ধুতি সাত হাত, জোর আট; অথচ আপনারা দশ হাত পরেন।'

আমি বললুম, 'দশ হাত টেকে বেশিদিন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরা যায়।'

সর্দারজি বললেন, 'শিলওয়ারের বেলাতেও তাই। আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাঠান প্রতি ঈদে নতুন শিলওয়ার তৈরি করায়? মোটেই না। ছোকরা পাঠান বিয়ের দিন শ্বশুরের কাছ থেকে বিশগজি একটা শিলওয়ার পায়। বিস্তর কাপড়ের ঝামেলা— এক জায়গায় চাপ পড়ে না বলে বহুদিন তাতে জোড়াতালি দিতে হয় না। ছিঁড়তে আরম্ভ করলেই পাঠান সে শিলওয়ার ফেলে দেয় না, গোড়ার দিকে সেলাই করে, পরে তালি লাগাতে আরম্ভ করে— সে যে-কোনও রঙের কাপড় দিয়েই হোক, পাঠানের তাতে বাছবিচার নেই। বাকি জীবন সে ওই শিলওয়ার পরেই কাটায়। মরার সময় ছেলেকে দিয়ে যায়— ছেলে বিয়ে হলে পর তার শ্বশুরের কাছ থেকে নতুন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপের শিলওয়ার দিয়ে চালায়।'

সর্দারজি আমাকে বোকা পেয়ে মশকরা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন বুঝতে না পেরে বললুম, 'আপনি সত্যি সত্যি জানেন, না আপনাকে কেউ বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে?'

সর্দারজি বললেন, 'গভীর বনে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বাঘের দেখা— বাঘ বললে, 'তোমাকে আমি খাব।' এ হল গল্প, তাই বলে বাঘ মানুষ খায় সে-ও কি মিথ্যে কথা?'

অকাট্য যুক্তি। পিছনে রয়েছে আবার সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা, কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম, 'আমরা বাঙালি, পাজামার মর্ম আমরা জানব কী করে? আমাদের হল বৃষ্টিবাদলার দেশ, খালবিল, পেরোতে হয়। ধুতিলুঙ্গি যেরকম টেনে টেনে তোলা যায়, পাজামাতে তো তা হয় না।'

মনে হয় এতক্ষণে যেন সর্দারজির মন পেলুম। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বর্মা-মালয়েও তাই। আমি ওইসব দেশে ত্রিশ বছর কাটিয়েছি।'

তার পর তিনি ঝাড় বেঁধে নানারকম গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য কতটা বানিয়ে বলা সেকথা পরখ করার মতো পরশপাথর আমার কাছে ছিল না, তবে মনে হল ওই বাঘের গল্পের মতোই। দু চারজন পাঠান ততক্ষণে সর্দারজির কাছে এসে তাঁর গল্প শুনতে আরম্ভ করেছে— পরে জানলুম, এদের সবাই দু দশ বছর বর্মা মালয়ে কাটিয়ে এসেছে— এদের সামনে সর্দারজি ঠিক তেমনি-ধারা গল্প করে যেতে লাগলেন। তাতেই বুঝলুম, ফাঁকির অংশটা কমই হবে।

আড্ডা জমে উঠল। দেখলুম, পাঠানের বাইরের দিকটা যতই রসকষহীন হোক না কেন, গল্প শোনাতে আর গল্প বলাতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তর্কাতর্কি করে না, গল্প জমাবার জন্য বর্ণনার রঙতুলিও বড়-একটা ব্যবহার করে না। সব যেন উড্‌কাটের ব্যাপার— সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে, কিন্তু ওই নীরব নিরলঙ্কার বলার ধরনে কেমন যেন একটা গোপন কায়দা রয়েছে, যার জন্য মনের ওপর বেশ জোর দাগ কেটে যায়। বেশিরভাগই মিলিটারি গল্প, মাঝে মাঝে ঘরোয়া অথবা গোষ্ঠী-সংঘর্ষণের ইতিহাস। অনেকগুলি গোষ্ঠীর নামই সেদিন শেখা হয়ে গেল— আফ্রিদি, শিনওয়ারি, খুগিয়ানি আরও কত কী! সর্দারজি দেখলুম এদের হাড়হদ্দ সবকিছুই জানেন। আমার সুবিধের জন্য মাঝে টীকাটিপ্পনী কেটে আমাকে

www.pathagar.com

যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিফহাল করে তুলেছিলেন। ফুরসতমাফিক আমাকে একবার বললেনও, 'ইংরেজ-ফরাসির কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাস করেছেন, অন্য কোনও কাজে সেগুলো লাগবে না। তার চেয়ে পাঠানদের নামবুনিয়াদ শিখে নিন, পেশাওয়ার খাইবারপাসে কাজে লাগবে।'

সর্দারজি হক কথা বলছিলেন।

পাঠানদের গল্প আবার শেষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে। ভাঙা ভাঙা পশতু উর্দু পাঞ্জাবি মিশিয়ে গল্প শেষ করে বলবে, 'তখন তো আমার কুছ মালুমই হল না, আমি যেন শরাবির বেহুশিতে মশগুল। পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা, তখন দেখি বাঁ হাতের দুটো আঙুল উড়ে গিয়েছে। এই দেখুন।' বলে বাইশগজি শিলওয়ারের ভাঁজ থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল।

আমি দরদ দেখাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাসপাতালে কতদিন ছিলেন?'

সুবে পাঠানিস্তান একসঙ্গে হেসে উঠল; বাবুজির অজ্ঞতা দেখে ভারি খুশি।

পাঠান বলল, 'হাসপাতাল আর বিলায়তি ডাগ্‌দর কঁহা বাবুজি? বিবি পট্টি বেঁধে দিলেন, দাদিমা কুচকুচ হলদভি লাগিয়ে দিলেন, মোল্লাজি ফুঁ-ফুঁকার করলেন। অব্‌ দেখিয়ে, মালুম হয় যেন আমি তিন আঙুল নিয়েই জন্মেছি।'

পাঠানের ভগিনীপতিও গাড়িতে ছিল; বলল, 'যে-তিনজনের কথা বললে তাদের ভয়ে অজরাইল (যমদূত) তোমাদের গাঁয়ে ঢোকে না— তোমাকে মারে কে?' সবাই হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর দাদিজানের কেচ্ছা ওকে বলতে বলুন না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের পর পাথর গড়িয়ে ফেলে কীরকম করে একটা পুরোদস্তুর গোরা পল্টনকে তিন ঘণ্টা কাবু করে রেখেছিলেন।'

সেদিন গল্পের প্লাবনে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ডুবে গিয়েছিল। আর কী খানাপিনা! প্রতি স্টেশনে আড্ডার কেউ না কেউ কিছু না কিছু কিনবেই। চা, শরবত, বরফজল, কাবাব, রুটি, কোনও জিনিসই বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে খায়, কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। আমি দু-একবার আমার হিস্যা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম। বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্যকব্যূহ ভেদ করে দরজায় পৌঁছবার বহু পূর্বেই কেউ না কেউ পয়সা দিয়ে ফেলেছে। আপত্তি জানালে শোনে না, বলে 'বাবুজি এই পয়লা দফা পাঠানমুল্লুকে যাচ্ছেন, না হয় আমরা একটু মেহমানদারি করলুমই। আপনি পেশাওয়ারে আড্ডা গড়ুন, আমরা সবাই এসে একদিন আচ্ছা করে খানাপিনা করে যাব।' আমি বললুম, 'আমি পেশাওয়ারে বেশিদিন থাকব না।' কিন্তু কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। সর্দারজি বললেন, 'কেন বৃথা চেষ্টা করেন? আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে পর্যন্ত একবার পয়সা দিতে দিল না। যদি পাঠানের আত্মীয়তা-মেহমানদারি বাদ দিয়ে এদেশে ভ্রমণ করতে চান, তবে তার একমাত্র উপায় কোনও পাঠানের সঙ্গে একদম একটি কথাও না বলা। তাতেও সবসময় ফল হয় না।'

পাঠানের দল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা গরিব, পেটের ধান্দায় তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়াই, আমরা মেহমানদারি করব কী দিয়ে?'

সর্দারজি আমার কানে কানে বললেন, 'দেখলেন বুদ্ধির বহর? মেহমানদারি করার ইচ্ছাটা যেন টাকা থাকা না-থাকার ওপর নির্ভর করে।'

www.pathagar.com

তিন

সর্দারজি যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে, পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োর, কাবাব-রুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে তখন আর একরত্তি শক্তি নেই যে, বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করি। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ এই যে, আমাদের কাছে যে কাজ কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তাল সামলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপরের বাঙ্কের বিছানা বাঁধা আর দেশলাইটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাঠান কোনও তফাত দেখতে পায় না। বাক্স-তোরঙ্গ নাড়াচাড়া করে যেন অ্যাটাচি কেস।

ইতোমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠান-মুল্লুকের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।' শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত ন-টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পৌঁছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি, এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা ঠা আলো, ন-টা বাজল কী করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছলুমই-বা কী করে? একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল হয়ে গিয়েছিল যে, শেষের দিকে ঘড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এখন চেয়ে দেখি সত্যি ন-টা বেজেছে। তখন অবশ্য এসব ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে হয়রান হবার ফুরসত ছিল না, পরে বুঝতে পারলুম পেশাওয়ার এলাহাবাদের ঘড়িমাফিক চলে বলে কাণ্ডটা খুবই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক— তখন আবার জুন মাস।

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম যে, ছ-ফুটি পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালিত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে একহাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দু হাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ— পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়! সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে। চিৎকার করে যে লাফ দিয়ে উঠিনি তার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে, তখনও গাড়ির পাঠানের দুটো আঙুল উড়ে যাওয়ার গল্প অবচেতন মনে বাসা বেঁধে অর্ধচেতন সহিষ্ণুতায় আমাকে উৎসাহিত করছিল। তাই সেদিন পাঠানমুল্লুকের পয়লা কেলেঙ্কারি থেকে বাঙালি নিজের ইজ্জত বাঁচাতে পারল। কিন্তু হাতখানা কোন শুভলগ্নে ফেরত পাব সেকথা যখন ভাবছি তখন হঠাৎ আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানি কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সমান উঁচু হলে সেদিন কী হত বলতে পারিনে কিন্তু আমার মাথা তাঁর বুক অবধি পৌঁছায়নি বলে তিনি তাঁর এক কড়া জোরও আমার গায়ে চাপাতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু-পশতুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অনুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায়— 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?' আমি 'জী হ্যাঁ, জী না', করেই যাচ্ছি আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতুম। পরে ওয়াকিবহাল হয়ে জানলুম, বন্ধু দর্শনে

www.pathagar.com

এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই, দেওয়া কায়দা নয়। উভয় পক্ষে একসঙ্গে প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে যাবেন অন্তত দু মিনিট ধরে। তার পর হাত-মিলানো, বুক-মিলানো শেষ হলে একজন একটি প্রশ্ন শুধাবেন, 'কীরকম আছেন?' আপনি তখন বলবেন, 'শুকুর, আল্‌হম্‌দুলিল্লা'। সর্দিকাশির কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে হলে তখন বলতে পারেন— কিন্তু মিলনের প্রথম ধাক্কায় প্রশ্নতরঙ্গের উত্তর নানা ভঙ্গিতে দিতে যাওয়া 'সখ্‌ৎ বেয়াদবি!'

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না, আমি বাঙালি তিনি পাঠান, তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনও জিনিসে পায় না— আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তা হলে তো আর কথাই নেই। তারও বাড়া, যদি সে অতিথি পাঠানের তুলনায় রোগাদুব্‌লা সাড়ে পাঁচফুটি হয়। ভদ্রলোক পাঠানের মারপিট করা মানা। তাই সে তার শরীরের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। রোগাদুব্‌লা লোক হাতে পেলে আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তখন উপভোগ করে— যদিও জানে যে কাজের বেলায় তার গায়ের জোরের কোনও প্রয়োজনই হবে না।

টাঙ্গা তো চলেছে পাঠানি কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয়— গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমুল্লুকে লোকজন যার যেরকম খুশি চলে, গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার করা বৃথা। খাস পাঠান কখনও কারও জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে 'স্বাধীন', রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার 'স্বাধীনতা' রইল কোথায়? কিন্তু ওই স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ঘোড়ার নালের চাট লেগে যদি তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে যায় তা হলে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশ ডাকাডাকি করে না। পরম অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না?' গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান— ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

দেখলুম পেশাওয়ারের বারো আনা লোক আহমদ আলীকে চেনে, আহমদ আলী বোধহয় দশ আনা চেনেন। দু মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি থামান আর পশতু জবানে কী একটা বলেন; তার পর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জানান, 'আপনার সঙ্গে খেতে বললুম। আপত্তি নেই তো?'

আহমদ আলীর স্ত্রীর সৌভাগ্য বলতে হবে— কারণ তিনিই রাঁধেন, পর্দা বলে বাড়েন না— যে তাঁদের বাড়ি স্টেশনের কাছে, না হলে সে রাত্রে আহমদ আলীর বাড়িতে পাঠানমুল্লুকের জিরগা বসে যেত।

সরল পাঠান ও সুচতুর ইংরেজে একটা জায়গায় মিল আছে। পাঠানমাত্রই ভাবে বাঙালি বোমা মারে, ইংরেজদেরও ধারণা অনেকটা তাই। আহমদ আলী সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর। আমি তাঁর বাড়িতে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের ভিতর এক পুলিশ এসে আহমদ আলীকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তিনি সে পড়েন আর হাসেন। তার পর তিনি রিপোর্টখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাতে রয়েছে আমার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এবং বিশেষ করে

www.pathagar.com

জোর দেওয়া হয়েছে যে লোকটা বাঙালি— আহমদ আলী যেন উক্ত লোকটার অনুসন্ধান করে সদাশয় সরকারকে তার হাল-হকিকত বাতলান।

আহমদ আলী কাগজের তলায় লিখলেন, 'ভদ্রলোক আমার অতিথি।'

আমি বললুম, 'নাম-ধাম মতলবটাও লিখে দিন— জানতে চেয়েছে যে।'

আহমদ আলী বললেন, 'কী আশ্চর্য, অতিথির পিছনেও গোয়েন্দাগিরি করব নাকি?'

আমি ভাবলুম পাঠানমুল্লুকে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ফলাই। বললুম, 'কর্ম করে যাবেন নিরাসক্তভাবে, তাতে অতিথির লাভলোকসানের কথা উঠবে না, এই হল গীতার আদেশ।'

আহমদ আলী বললেন, 'হিন্দুধর্মে শুনতে পাই অনেক কেতাব আছে। তবে আপনি বেছে বেছে একখানা গীতের বই থেকে উপদেশটা ছাড়লেন কেন? তা সেকথা থাক। আমি বিশ্বাস করি কোনও কর্ম না করাতে, সে আসক্তই হোক আর নিরাসক্তই হোক। আমার ধর্ম হচ্ছে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা।'

'উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা' কথায় আমার মনে একটু ধোঁকা লাগল। আমরা বলি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব এবং এইরকম চিৎ হয়ে শুয়ে থাকাটা ইংরেজ পছন্দ করে না বলে 'লাইঙ স্যুপাইন' কর্মটি প্রভুদের পক্ষে অপকর্ম বলে গণ্য হয়। পাঠানে-ইংরেজে মিল আছে পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম তাই বোধহয় পাপটা এড়াবারও আরামটি বজায় রাখার জন্য পাঠান উবুড় হয়ে শুয়ে থাকার কথাটা আবিষ্কার করেছে।

আমার মনে তখন কী দ্বিধা আহমদ আলী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি না জানিনে। নিজের থেকেই বললেন, 'তা না হলে এদেশে রক্ষা আছে! এই তো মাত্র সেদিনের কথা। রাত্রে বেরিয়েছি রোঁদে— মশহুর নাচনেওয়ালি জান্‌কীবাঈ কয়েকদিন ধরে গুম, যদি কোনও পাত্তা মেলে। আমি তো আপন মনে হেঁটে যাচ্ছি— আমার প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে জন আষ্টেক গোরা সেপাই কাঁধ মিলিয়ে রাত্তিরের টহলে কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসঙ্গে এক লহমায় অনেকগুলি রাইফেলের কড়াক্-পিঙ্। আমিও তড়াক করে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লুম, তার পর গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের নর্দমায়। সেখানে উবুড় হয়ে শুয়ে মাথা তুলে দেখি, গোরার বাচ্চারা সব মাটিতে লুটিয়ে, জন দশেক আফ্রিদি চট্‌পট্ গোরাদের রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে অন্তর্ধান। আফ্রিদির নিশান সাক্ষাৎ যমদূতের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরখেলাপের কথাই ওঠে না।

'তাই বলি, উবুড় হয়ে শুয়ে থাকতে না জানলে কখন যে কোন আফ্রিদির নজরে পড়ে যাবেন বলা যায় না। জান বাঁচাবার এই হল পয়লা নম্বরের তালিম।'

আমি বললুম, 'চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেই-বা দোষ কী?'

আহমদ আলী বললেন, 'উহুঁ, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবেন খুদাতালার আসমান— সে বড় খাবসুরত। কিন্তু মানুষের বদমায়েশির ওপর নজর রাখবেন কী করে? কী করে জানবেন যে ডেরা ভাঙবার সময় হল, আর এখানে শুয়ে থাকলে নয়া ফ্যাসাদে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা? মিলিটারি আসবে, তদারক-তদন্ত হবে, আপনাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে— তার চেয়ে আফ্রিদির গুলি ভালো।'

আমি বললুম, 'সে না হয় আমার বেলা হতে পারত। কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট দিতেই হত।'

www.pathagar.com

আহমদ আলী বললেন, 'তওবা, তওবা। আমি রিপোর্ট করতে যাব কেন? আমার কী দায়? গোরার রাইফেল, আফ্রিদির তার ওপর নজর। যে-জিনিসে মানুষের জান পোঁতা, তার জন্য মানুষ জান দিতে পারে, নিতেও পারে। আমি সে ফ্যাসাদে কেন ঢুকি? বাঙালি বোমা মারে— কেন মারে খোদায় মালুম, রাইফেলে তো তার শখ নেই— ইংরেজ বোমা খেতে পছন্দ করে না কিন্তু বাঙালির গোঁ সে খাওয়াবেই। তার জন্য সে জান দিতে কবুল, নিতেও কবুল। আমি কেন ইংরেজকে আপনার হাড়হদ্দের খবর দেব? জান লেনদেনের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের দূরে থাকা উচিত।'

আমি বললুম, 'হক কথা বলছেন। রাসেলেরও ওই মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না। ইংরেজ-পাঠানো বিস্তর মিল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাঙালি কেন বোমা মারে সে তো অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা পেয়ে গেলে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাইফেলের প্রয়োজন হয়। তাই বোধ করি স্বাধীন আফ্রিদির কাছে রাইফেল এত প্রিয়বস্তু।'

আহমদ আলী অনেকক্ষণ আপন মনে কী যেন ভাবলেন। বললেন, 'কী জানি স্বাধীনতা কিসের জোরে টিকে থাকে? রাইফেলের জোরে না বুকের জোরে। আমি এই পরশু দিনের একটা দাঙ্গার কথা ভাবছিলুম। জানেন বোধ হয়, পেশাওয়ারের প্রায় প্রতি পাড়ায় একজন করে গুণ্ডার সর্দার থাকে। দুই পাড়ার গুণ্ডার দলে সেদিন লাগল লড়াই। গোলাগুলির ব্যাপার নয়। হাতাহাতি, জোর ছোরাছুরি। একদল মিনিট দশেক পরে মার সইতে না পেরে দিল ছুট। কিন্তু তাদের সর্দার রইল দাঁড়িয়ে। সমস্ত দল তখন গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে— মেরে গুঁতিয়ে থেঁতলে যখন ভাবল সে মরে গিয়েছে, তখন তাকে ফেলে সবাই চলে গেল। কাল তাকে হাসপাতালে দেখে এলুম— অন্তত ছ মাস লাগবে সারতে— যদি ফাঁড়াটা কাটে। ক-খানা পাঁজর ভেঙেছে, আঁতে ক-টা ফুটো হয়েছে তার হিসেব-নিকেশ এখনও শেষ হয়নি।'

'কিন্তু আশ্চর্য হলুম দেখে যে, লোকটা অতি রোগা টিঙটিঙে, সাড়ে পাঁচ ফুট হয় কি না হয়। ছোরাও নাকি সে চালাতে জানে না, রাইফেলও সে রাখে না। ব্যস— ওই এক চিজ আছে, হিম্মত। বিস্তর মার খেয়েছে, অনেকবার। মেরেছে অল্প, মারিয়েছে অনেক, পালায়নি কক্‌খনও। আসামি হয়ে আদালতে এসেছে বহুবার, কখনও ফরিয়াদি হয়নি। বলে, 'পাঁচজনের বিপদ-আপদের ফৈসালা করে দিই আমি, আর আমি যাব আদালতে আমার বিপদ-আপদের কান্নাকাটি শোনাতে।'

'আরও আশ্চর্য হলুম দেখে, হাসপাতালে তার ওয়ার্ডে যেন পেশাওয়ারের ফলের বাজার বসে গিয়েছে। কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরি, মজার-ই-শরিফের আখরোট-খোবানি সব মজুত। ছ-জন পালোয়ান দিনরাত তার খাটের চতুর্দিকে মাটিতে বসে— কী জানি হুজুরের কখন কী দরকার হয়। হুজুর অবশ্য উপস্থিত জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সঙ্কটসঙ্কুল খাইবারপাসে।'

'কিন্তু আসল কথা, সে এখনও দলের সর্দার। তার ইজ্জত বেড়েছে; তার খুশনামে পেশাওয়ারের গুণ্ডামহল গমগম করছে।'

আমি চুপ করে ভাবছি, এমন সময় দেখি আহমদ আলী মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন, 'লোকটার হিম্মত ছাড়া নাকি আরও একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব। সবকথার চটপট উত্তর দিতে পারে। শুনলুম চারবার প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে পাঁচবারের বার যখন হাকিম ইজাজ হুসেন খানের আদালতে উপস্থিত হল, তখন তিনি

www.pathagar.com

নাকি চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই নিয়ে তুই পাঁচবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস; তোর লজ্জা-শরম নেই?'

'সর্দার নাকি মুচকি হেসে বলেছিল, 'হুজুর, প্রমোশন না পেলে আমি কী করব?'

সে রাতে শুতে যাবার আগে মটরুদাকে চিঠিতে লিখলুম, 'চিৎ হয়ে শোবে না, উবুড় হয়ে শোবে। পাঠানমুল্লুকের এই আইন। শিব ঠাকুরের আপন দেশেও এই খবরটি পাঠিয়ে দিও।'

চার

যতই বলি, 'ভাই আহমদ আলী, খুদা আপনার মঙ্গল করবেন, আখেরে আপনি বেহেশতে যাবেন, আমার যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে দিন', আহমদ আলী ততই বলেন, 'বরাদরে আজিজে মন্' (হে আমার প্রিয় ভ্রাতা), ফারসিতে প্রবাদ আছে, 'দের আয়দ্ দুরুস্ত আয়দ্' অর্থাৎ 'যা কিছু ধীরেসুস্থে আসে তাহাই মঙ্গলদায়ক'; আরবিতেও আছে, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ কি না 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা'; ইংরেজিতেও আছে—'

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি এই পাঠানের চালে আমার চলবে না। শুনেছি এখান থেকে লান্ডিকোটাল যেতে তাদের পনেরো দিন লাগে— বত্রিশ মাইল রাস্তা।'

আহমদ আলী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলেছে?'

আমি বললুম, 'কেন, কাল রাত্তিরের দাওয়াতে, রমজান খান, সেই যে বাবরি-চুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।

আহমদ আলী বললেন, 'রমজান খান পাঠানদের কী জানে? তার ঠাকুরমা পাঞ্জাবি, আর সে নিজে লাহোরে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে। খাস পাঠান কখনও আটক (সিন্ধু নদ) পেরোয় না। তার লান্ডিকোটাল থেকে পেশাওয়ার পৌঁছতে অন্তত দু মাস লাগার কথা। না হলে বুঝতে হবে লোকটা রাস্তার ইয়ার-দোস্তের বাড়ি কাট্ করে এসেছে। পাঠানমুল্লুকের রেওয়াজ প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে তেরাত্তির কাটানো, আর, সব পাঠান সব পাঠানের ভাই-বেরাদর। হিসাব করে নিন।'

কাগজ পেন্সিল ছিল না। বললুম, 'রক্ষে দিন, আমার যে কন্ট্রাক্ট সই করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।'

আহমদ আলী বললেন, 'বাস না পেলে আমি কী করব?'

'আপনি চেষ্টা করেছেন?'

আহমদ আলী আমাকে হুশিয়ার হতে বলে জানালেন, তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর, নানা রকমের উকিল-মোক্তার তাঁকে নিত্যি নিত্যি জেরা করে, আমি ও-লাইনে কাজ করে সুবিধা করতে পারব না।

তার পর বললেন, 'পেশাওয়ার ভালো করে দেখে নিন। অনেক দেখবার আছে, অনেক শেখবার আছে। বোখারা সমরকন্দ থেকে সদাগরেরা এসেছে পুস্তিন নিয়ে, তাশকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে—'

www.pathagar.com

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সামোভার কী?'

'রাশান গল্প পড়েননি? সামোভার হচ্ছে ধাতুর পাত্র— টেবিলে রেখে তাতে চায়ের জল গরম করা হয়। আপনারা যেরকম মিঙ বংশের ভাস্ নিয়ে মাতামাতি করেন, পেশাওয়ার কান্দাহার তাশকন্দ তুল্লা সামোভার নিয়ে সেইরকম লড়ালড়ি করে, কে কত দাম দিতে পারে। সেকথা আরেক দিন হবে। তার পর শুনুন, মজার-ই-শরিফ থেকে কার্পেট এসেছে, বদখশান থেকে 'লাল' রুবি, মেশেদ থেকে তসবি, আজরবাইজান থেকে—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

'আরও কত কী। তারা উঠেছে সব সরাইয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গরম ব্যবসা করে, রাত্তিরে জোর খানাপিনা, গানবাজনা। কত হৈ-হল্লা, খুনখারাবি, কতরকম-বেরকমের পাপ। শোনেননি বুঝি, পেশাওয়ার হাজার পাপের শহর। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করুন যে-কোনও সরাইয়ে— ডজনখানেক ভাষা বিনা কসরতে বিনা মেহনতে শেখা হয়ে যাবে। পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন; চট করে চলে যাবেন ফারসিতে, তার পর জগতাইতুর্কি, মঙ্গোল, উসমানলি, রাশান, কুর্দি— বাকিগুলো আপনার থেকে হয়ে যাবে। গান-বাজনায় আপনার বুঝি শখ নেই— সে কী কথা? আপনি বাঙালি টাগোর সাহেবের গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার আমি পড়েছি। আহা, কী উম্‌দা বয়েত, আমি ফারসি তর্জমায় পড়েছি। আপনার তো এসব জিনিসে শখ থাকার কথা। নাই-বা থাকল, কিন্তু ইদনজানের গান না শুনে আপনি পেশাওয়ার ছাড়বেন কী করে? পেশাওয়ারি হুরী, বারোটা ভাষায় গান গাইতে পারে। তার গাহক দিল্লি থেকে বাগদাদ অবধি। আপনি গেলে লড়কি বহুত খুশ হবে— তার রাজত্ব বাগদাদ থেকে বাঙ্গাল অবধি ছড়িয়ে পড়বে।'

আমি আর কী করি। বললুম, 'হবে, হবে। সব হবে। কিন্তু টাগোর সাহেবের কোন কবিতা আপনার বিশেষ পছন্দ হয়?'

আহমদ আলী একটু ভেবে বললেন, 'আয় মাদর, শাহজাদা ইমরোজ—'

বুঝলুম, এ হচ্ছে

'ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর—'

বললুম, 'সে কী কথা, খান সাহেব? এ কবিতা তো আপনার ভালো লাগার কথা নয়। আপনারা পাঠান, আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মতো রুখে দাঁড়াবেন। ঘোড়া চড়ে আসবেন বিদ্যুৎগতিতে, প্রিয়াকে একটানে তুলে নিয়ে কোলে বসিয়ে চলে যাবেন দূর-দূরান্তরে। সেখানে পর্বতগুহায় নির্জনে আরম্ভ হবে প্রথম মান-অভিমানের পালা, আপনি মাথা পেতে দেবেন তাঁর পায়ের মখমলের চটির নিচে—'

আমাকেই থামতে হল, কারণ আহমদ আলী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক, কারও কথা মাঝখানে কাটেন না। আমি আটকে গেলে পর বললেন, 'থামলেন কেন, বলুন।'

আমি বললুম, আপনারা কোন দুঃখে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা, মা মা করে।'

আহমদ আলী বললেন, 'হুঁ, এক জর্মন দার্শনিকও নাকি বলেছেন, স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না।'

আমি বললুম, 'তওবা তওবা, অত বাড়াবাড়ির কথা হচ্ছে না।'

www.pathagar.com

আহমদ আলী বললেন, 'না দাদা, প্রেমের ব্যাপারে হয় ইস্‌পার না হয় উস্‌পার। প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা, বিস্তর লোকজন। সেখানে 'গোল্ডেন মিন' বা 'সোনালি মাঝারি' বলে কোনও উপায় নেই। হয় 'কিপ টুক দি রাইট' অর্থাৎ ম্যা ম্যা করে হৃদয়বেদনা নিবেদন, না হয়, 'লেফট' অর্থাৎ বজ্রমুষ্টি দিয়ে— নিটশে যা বলেছেন। কিন্তু থাক্‌ না এসব কথা।'

বুঝলুম প্রেমের ব্যাপারে পাঠান নীরব কর্মী। আমরা বাঙালি, দুপুররাত্রে পাড়ার লোককে না জানিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পারিনে। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমাকে যেন খুশি করার জন্য আহমদ আলী বললেন, 'পেশাওয়ারের বাজারে কিন্তু কোনও গানেওয়ালি নাচনেওয়ালি ছ মাসের বেশি টিকতে পারে না। কোনও ছোকরা পাঠান প্রেমে পড়বেই। তার পর বিয়ে করে আপন গাঁয়ে নিয়ে সংসার পাতে।'

'সমাজ আপত্তি করে না? মেয়েটা দু দিন বাদে শহরের জন্য কান্নাকাটি করে না?'

'সমাজ আপত্তি করবে কেন? ইসলামে তো কোনও মানা নেই। তবে দু দিন বাদে কান্নাকাটি করে কি না বলা কঠিন। পাঠান গাঁয়ের কান্না শহরে এসে পৌঁছবে এত জোর গলা ইদনজানেরও নেই। জানকী বাঈয়ের থাকলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হত না। হলফ করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার নিজের বিশ্বাস, বেশিরভাগ মেয়েই বাজারের হট্টগোলের চেয়ে গ্রামের শান্তিই পছন্দ করে। তার ওপর যদি ভালোবাসা পায়, তা হলে তো আর কথাই নেই।'

আমি বললুম, 'আমাদের এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকও ওই ধরনের অভিমত দিয়েছেন, মেয়েদের বাজারে বহু খোঁজখবর নিয়ে।'

এমন সময় আহমদ আলীর এক বন্ধু মুহম্মদ জান বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির। আহমদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইসিকেল আবার খোঁড়া হল কী করে?'

মুহম্মদ জান পাঞ্জাবি। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি এদেশে এসেছেন বুঝতে পারিনে। এই পাঠানরা যে কীরকম পাব্লিক নুইসেন্স তার খবর জানতে পারতেন যদি একদিনও আধ ঘণ্টার তরে এ শহরে বাইসিকেল চড়তেন। এক মাইল যেতে না যেতে তিনটে পাংকচার। সব ছোট ছোট লোহার।'

ভদ্রলোক দম নিচ্ছিলেন। আমি দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত লোহা আসে কোথা থেকে?'

মুহম্মদ জান আরও চটে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কেন শুধচ্ছেন? জিগ্যেস করুন আপনার দিলজানের দোস্ত শেখ আহমদ আলী খান পাঠানকে।'

আহমদ আলী বললেন, 'জানেন তো পাঠানরা বড্ড আড্ডাবাজ। গল্পগুজব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে যাবে রাস্তার পাশে। মুচিকে বলবে, 'দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটা কয়েক পেরেক ঠুকে।' মুচি তখন ঢিলে লোহাগুলো পিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নতুনও লাগিয়ে দেয়। এইরকম শ-খানেক লোহা লাগালে জুতোর চামড়া আর মাটিতে লাগে না, লোহার উপর দিয়েই রাস্তার পাথরের চোট যায়। হাফসোল লাগানোর খরচাকে পাঠান বড্ড ভয় করে কি না। সেই পেরেক আবার হরেকরকম সাইজের হয়। পাঠানের জুতো তাই লোহার মোজায়িক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না-ঠোকানো অবান্তর— মুচির সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ওই তার অজুহাত।'

মুহম্মদ জান বললেন, 'আর সেই লোহা ঢিলে হয়ে গিয়ে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।'

আমি বললুম, 'এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল আড্ডা মানুষকে অপকর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছি।'

আহমদ আলী কাতরস্বরে বললেন, 'আড্ডার নিন্দা করবেন না। বাইসিকেল চড়ার নিন্দা করুন। আপনাকে বলিনি, "অল অজলু মিনা শয়তান" অর্থাৎ হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা? তাই তো বাইসিকেলের আরেক নাম শয়তানের গাড়ি।'

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাওয়ার দিনের ১১৪ ডিগ্রি ভুলে গিয়ে মোলায়েম বাতাস দিয়ে সর্বাঙ্গের গ্লানি খেদ ঘুচিয়ে দেয়। রাস্তাঘাট যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাই তুলে ঘোড়ার গাড়ির খটখটানি দিয়ে তুড়ি দিতে থাকে। পাঠান বাবুরা তখন সাজগোজ করে হাওয়া খেতে বেরোন। পায়ে জরির পয়জার, পরনে পপলিনের শিলওয়ার— তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মতো ক্রিজের দু দিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে; মুড়ির ভিতরে লাল সুতোর গোলাপি আভা। গায়ে রঙিন সিল্কের লম্বা শার্ট আর মাথায় যে পাগড়ি তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনও শিরাভরণের সঙ্গে হয় না। বাঙালির শিরাভরণ দেখে অভ্যাস নেই; টুপি বলুন, হ্যাট বলুন, সবই যেন তার কাছে অবান্তর ঠেকে, মনে হয় বাইরে থেকে জোর করে চাপানো, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠানের পাগড়ি দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাথাটা দিয়েছেন নিতান্ত ওই পাগড়ি জড়াবার উপলক্ষ হিসেবে।

কামিয়ে-জুমিয়ে গোঁফে আতর মেখে আর সেই ভুবনমোহন পাগড়ি বেঁধে খানসাহেব যখন সাঁঝের ঝোঁকে পেশাওয়ারের রাস্তায় বেরোন, তখন কে বলবে তিনি জাকারিয়া স্ট্রিটের পাঠানের জাতভাই; কোথায় লাগে তাঁর কাছে তখন হলিউডের ইভনিঙ ড্রেসপরা হি-মেনদের দল?

ফুরফুরে হাওয়া গাছের মাথায় চিরুনি চালিয়ে, খানসায়েবদের পাগড়ির চুড়ো দুলিয়ে, ফুলের দোকানে ঝোলানো মালাতে কাঁপন লাগিয়ে আর সর্বশেষে আহমদ আলীর দু কান ছোঁয়া গোঁফে হাত বুলিয়ে নামল আমার শ্রান্ত ভালে— তপ্ত গ্রীষ্মের দগ্ধ দিনান্তের সন্ধ্যাকালে। এ যেন বাঙলা দেশের জ্যৈষ্ঠশেষের নববর্ষণ— শীতল জলধারার পরিবর্তে এ যেন মাতৃহস্তের স্নিগ্ধমন্দ মলয়ব্যজন। কোন এক নৃশংস ফারাওয়ের অত্যাচারে দিবাভাগে দেশের জনমানব প্রাণীপতঙ্গ দলে দলে ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়ে প্রহর গুনছিল, পশ্চিম-পিরামিডে তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাতাস যেন মোজেসের অভয়বাণী দিয়ে গেল— দিকে দিকে নতুন প্রাণের সাড়া— ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দির।

কিন্তু জেগে উঠেই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন কি আহারের? রুটি আর কাবাবওয়ালার দোকানের সামনে কী অসম্ভব ভিড়। বোরকাপরা মেয়ে, সবে হাঁটতে শিখেছে ছেলে। বাঁ হাত মরণের দিকে ডান হাত রুটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে বুড়ো, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহারের সন্ধানে। রুটিওয়ালা সেই ক্ষুধার্তদের শান্ত করার জন্য কাউকে কাতরকণ্ঠে ডাকে 'ভাই', কাউকে 'বেরাদর', কাউকে 'জানে মন্' (আমার জান্), কাউকে 'আগা-জান্'— পশতু, পাঞ্জাবি, ফারসি, উর্দু চারটে ভাষায় সে একসঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। ওদিকে তন্দুরের ভিতর লম্বা লোহার আঁকশি চালিয়ে রুটি টেনে টেনে ওঠাচ্ছে রুটিওয়ালার ছোকরারা। গনগনে আগুনের টকটকে লাল আভা পড়েছে তাদের কপালে-গালে। বড় বড়

www.pathagar.com

বাবরিচুলের জুলফি থেকে থেকে চোখমুখ ঢেকে ফেলছে— দু হাত দিয়ে রুটি তুলছে, সরাবার ফুরসত নেই। বুড়ো রুটিওয়ালার দাড়ি হাওয়ায় দুলছে, কাজের হিড়িকে তার বজ্রবাঁধন পাগড়ি পর্যন্ত টেরচা হয়ে একদিকে নেমে এসেছে— ছোকরাদের কখনও তম্বি করে 'জুদ্ কুন্, জুদ্ কুন্', 'জলদি করো, জলদি করো', খদ্দেরদের কখনও কাকুতি-মিনতি 'হে ভ্রাতঃ, হে বন্ধু, হে আমার প্রাণ, হে আমার দিলজান, সবুর কর, সবুর কর, তাজা গরম রুটি দি বলেই তো এত হাঙ্গাম-হুজ্জত। বাসি দিলে কি এতক্ষণ তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখতুম?'

বোরকার আড়াল থেকে কে যেন বলল— বয়স বোঝার জো নেই— 'তোর তাজা রুটি খেয়ে খেয়েই তো পাড়ার তিনপুরুষ মরল। তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে বাসি খাস। তাই দে না।'

বোরকা পরে, ওই যা। তা না হলে পাঠান মেয়েও স্বাধীন।

রুটির পর ফুল কিংবা আতর। মনে পড়ল মহাপুরুষ মুহম্মদের একটি বচন— সত্যেন দত্তের তর্জমা—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি।
জুটে যায় যদি দুইটি পয়সা
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।

পাঁচ

পাঠান অত্যন্ত অলস এবং আড্ডাবাজ, কিন্তু আরামপ্রয়াসী নয় এবং যেটুকু সামান্য তার বিলাস, তার খরচাও ভয়ঙ্কর বেশি কিছু নয়। দেশভ্রমণকারী গুণীদের মুখে শোনা যে, যাদের গায়ের জোর যেমন বেশি, তাদের স্বভাবও হয় তেমনি শান্ত। পাঠানদের বেলায় দেখলুম কথাটা খাঁটি। কাগজে আমরা হামেশাই পাঠানদের লুটতরাজের কথা পড়ি— তার কারণও আছে। অনুর্বর দেশ, ব্যবসাবাণিজ্য করতে জানে না, পল্টনে তো আর তামাম দেশটা ঢুকতে পারে না, কাজেই লুটতরাজ ছাড়া অন্য উপায় কোথায়? কিন্তু পেটের দায়ে যে-অপকর্ম সে করে, মেজাজ দেখাবার জন্য তা করে না। আর আসল কারণ অবশ্য পাঠানের মেজাজ সহজে গরম হয় না— পাঞ্জাবিদের কথা স্বতন্ত্র। এবং হলেও সে চট করে বন্দুকের সন্ধান করে না। তবে সব জিনিসেরই দুটো-একটা ব্যত্যয় আছে— পাঠান তো আর খুদ খুদাতালার আপন হাতে বানানো ফিরিস্তা নয়। বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবারপাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর ভাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শান্তমনে যোগাসনে বসে আঙুল গোনে, নিদেনপক্ষে তাকে কটা খুন করতে হবে। কিন্তু হিসেব-নিকেশে সাক্ষাৎ বিদ্যেসাগর বলে প্রায়ই ভুল হয় আর দুটো-চারটে লোক বেঘোরে প্রাণ দেয়। তাই নিয়ে তম্বিতম্বা করলে পাঠান সকাতর নিবেদন করে, 'কিন্তু আমার যে চার-চারটে বুলেটের বাজে খরচা হল তার কী? তাদের গুষ্ঠি-কুটুম কান্নাকাটি করছে, কিন্তু একজনও একবারের তরে আমার বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না। ইনসান বড়ই খুদপরস্ত— সংসার বড়ই স্বার্থপর।'

পরশু রাতের দাওয়াতে এরকম নানা গল্প শুনলুম। এসব গল্প বলার অধিকার নিমন্ত্রিত ও রবাহূতদের ছিল। একটা জিনিসে বুঝতে পারলুম যে, এঁদের সক্কলেই খাঁটি পাঠান।

www.pathagar.com

সে হল তাদের খাবার কায়দা। কার্পেটের উপর চওড়ায় দু হাত, লম্বায় বিশ-ত্রিশ হাত — প্রয়োজন মতো— একখানা কাপড় বিছিয়ে দেয়। সেই দস্তরখানের দু দিকে সারি বেঁধে এক সারি অন্য সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তার পর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়; তিন থালা আলু-গোশ্‌ত, তিন থালা শিককাবাব, তিন থালা মুর্গি-রোস্ট, তিন থালা সিনা-কলিজা, তিন থালা পোলাও, এইরকমধারা সব জিনিস একখানা দস্তরখানের মাঝখানে, দু খানা দুই প্রান্তে। বাঙালি আপন আপন থালা নিয়ে বসে; রান্নাঘরের সব জিনিসই কিছু না কিছু পায়। পাঠানদের বেলা তা নয়। যার সামনে যা পড়ল, তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট। প্রাণ গেলেও কখনও বলবে না, আমাকে একটু মুর্গি এগিয়ে দাও, কিংবা আমার শিককাবাব খাবার বাসনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি হঠাৎ কেউ দরদ দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আরে হোথায়, দেখো গোলাম মুহম্মদ ট্যাড়শ চিবোচ্ছে, ওকে একটু পোলাও এগিয়ে দাও না'— সবাই তখন হাঁ-হাঁ করে সবকটা পোলাওয়ের থালা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। তার পর মজলিশ গালগল্পে ফের মশগুল। ওদিকে গোলাম মুহম্মদ শুকনো পোলাওয়ের মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মারা গেল, না মাংসের থৈ-থৈ ঝোলে ডুবে গিয়ে প্রাণ দিল, তার খবর ঘন্টাখানেক ধরে আর কেউ রাখে না। এবং লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে, পাঠান আড্ডা জমাবার খাতিরে অনেকরকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। গল্পের নেশায় বে-খেয়ালে অন্তত আধ ডজন অতিথি সুদ্ধ শুকনো রুটি চিবিয়েই যাচ্ছে, চিবিয়েই যাচ্ছে। অবচেতন ভাবটা এই, পোলাও-মাংস বাছতে হয়, দেখতে হয়, বহুৎ বায়নাক্কা, তা হলে লোকের মুখের দিকে তাকাব কী করে, আর না তাকালে গল্প জমবেই-বা কী করে।

অথচ এঁরা সবাই ভদ্রসন্তান, দু পয়সা কামায়ও বটে। বাড়িতে নিশ্চয়ই পছন্দ-মাফিক পোলাও-কালিয়া খায়। কিন্তু পাঠান জীবনের প্রধান আইন, একলা বসে নবাবি খানা খাওয়ার চেয়ে ইয়ারবক্সির সঙ্গে শুকনো রুটি চিবানো ভালো। ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

তব সাথি হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি
তোমারে ছাড়িয়ে মসজিদে গিয়ে
কী হবে মন্ত্র স্মরি?

কিন্তু ওমর বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠান ভাঙা ভাঙা উর্দুতে ওই একই আপ্তবাক্য প্রলেতারিয়া কায়দায় জানায়—

'দোস্ত্‌!
তুমহারী রোটি, হমারা গোশ্‌ত!'

অর্থাৎ 'নেমন্তন্ন করেছ সেই আমার পরম সৌভাগ্য। শুধু শুকনো রুটি? কুছ পরোয়া নাহি। আমি আমার মাংস কেটে দেব।'

কাব্যজগতে যে হাওয়া বইছে, তাতে মনে হয়, ওমরের শরাবের চেয়ে মজুরের ধেনোর কদর বেশি।

তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতরে বুর্জুয়া-প্রলেতারিয়ায় যে তফাত, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। অনুভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিন্তাধারায়

www.pathagar.com

যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশি, কেউ কম। কেউ শেক্সপিয়র পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালোমন্দ বিচার করার সময় দুই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে এখনও তারা গুষ্টির ঐতিহ্যগত সনাতন জান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে।

এসব তত্ত্ব আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরে নানা রঙ, নানা দাগ কেটে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করে বললেন—

'এই ধরুন আমার সহকর্মী অধ্যাপক খুদাবখ্‌শের কথা। ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত। ইহসংসারে সবকিছু তিনি অর্থনীতি দিয়ে জলের মতো তরল করে এই তৃষ্ণার দেশে অহরহ ছেলেদের গলায় ঢালছেন। ধর্ম পর্যন্ত বাদ দেন না। যিশুখ্রিস্ট তাঁর ধর্ম আরম্ভ করেছিলেন ধনের নবীন ভাগবণ্টন পদ্ধতি নির্মাণ করে; তাতে লাভ হওয়ার কথা গরিবেরই বেশি— তাই সবচেয়ে দুঃখী জেলেরা এসে জুটেছিল তাঁর চতুর্দিকে। মহাপুরুষ মুহম্মদও নাকি সুদ তুলে দিয়ে অর্থবণ্টনের জমিকে আরবের মরুভূমির মতো সমতল করে দিয়েছিলেন। এসব তো ইহলোকের কথা— পরলোক পর্যন্ত খুদাবখ্‌শ অর্থনৈতিক র‍্যাঁদা চালিয়ে চিক্কণ মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু থাক এসব কচকচানি— মোদ্দা কথা হচ্ছে ভদ্রলোক ইতিহাসের দূরবিনে আপন চোখটি এমনি চেপে ধরে আছেন যে, অন্য কিছু তাঁর নজরে পড়ে কি না সে বিষয়ে আমাদের সকলের মনে গভীর সন্দেহ ছিল।

'মাসখানেক পূর্বে তাঁর বড় ছেলে মারা গেল। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত, মেধাবী ছেলে, বাপেরই মতো পড়াশুনায় মশগুল থাকত। বড় ছেলে মারা গিয়েছে, চোট লাগার কথা, কিন্তু খুদাবখ্‌শ নির্বিকার। সময়মতো কলেজে হাজিরা দিলেন। চায়ের সময় আমরা সন্তর্পণে শোক নিবেদন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ লেকচর শুনলুম, জরথুস্ত্র কোন অর্থনৈতিক কারণে রাজা গুশ্‌ৎআস্‌প্‌কে তাঁর নতুন ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিন দিন বাদে দুসরা ছেলে টাইফয়েডে মারা গেল— খুদাবখ্‌শ বৌদ্ধ ধর্মের কী এক পিটক, না খোদায় মালুম কী, তাই নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। একমাস যেতে না যেতে স্ত্রী মারা গেলেন পিত্রালয়ে— খুদাবখ্‌শ তখন সিন্ধুর পারে পারে সিকন্দর শাহের বিজয়পন্থার অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে নাক-কান বন্ধ করে তুরীয়ভাব অবলম্বন করেছেন।

'আমরা ততদিনে খুদাবখ্‌শের আশা ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা ইতিহাস করে করে অমানুষ হয়ে গিয়েছে, এই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর পাঠান-সমাজ যখন মনুষ্যজাতির সর্বোচ্চ গৌরবস্থল তখন আর কি সন্দেহ যে খুদাবখ্‌শের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পূর হয়ে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক টেলিস্কোপের পাল্লারও বহু ঊর্ধ্বে দূরদূরান্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত কোন সূক্ষ্মলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'এমন সময় মারা গেল তাঁর ছোট ভাই— পল্টনে কাজ করত। খুদাবখ্‌শের আর কলেজে পাত্তা নেই। আমরা সবাই ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি এক প্রাগৈতিহাসিক ছেঁড়া গালচের উপর খুদাবখ্‌শ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। পুঁথিপত্র, ম্যাপ, কম্পাস চতুর্দিকে ছড়ানো। গড়াগড়িতে চশমার একটা পরকলা ভেঙে গিয়েছে। খুদাবখ্‌শের বুড়ো মামা বললেন, দু দিন ধরে জল স্পর্শ করেননি।

'হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, "আমার ভাই মরে গিয়েছে।" শোকে যে মানুষ এমন বিকল হতে পারে পূর্বে আর কখনও দেখিনি। আমরা সবাই নানারকমের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু খুদাবখ্‌শের মুখে ওই এককথা, "আমার ভাই মরে গিয়েছে।"

www.pathagar.com

'শেষটায় থাকতে না পেরে আমি বললুম, "আপনি পণ্ডিত মানুষ, শোকে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আর আপনার সহ্য করবার ক্ষমতা যে কত অগাধ সে তো আমরা সবাই দেখেছি— দুটি ছেলে, স্ত্রী মারা গেলেন, আপনাকে তো এতটুকু কাতর হতে দেখিনি।"

'খুদাবখ্‌শ আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে আমি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু মুখে কথা ফুটল। বললেন, "আপনি পর্যন্ত এই কথা বললেন? ছেলে মরেছিল তো কী? আবার ছেলে হবে। বিবি মরেছেন তো কী? নতুন শাদি করব। কিন্তু ভাই পাব কোথায়?" তার পর আবার হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, "আমার ভাই মরে গিয়েছে।" '

অধ্যাপক বলা শেষ করলে আমি বললুম, 'লক্ষ্মণের মৃত্যুশোকে রামচন্দ্রও ওই বিলাপ করেছিলেন।'

আহমদ আলী বললেন, 'লছ্‌ মন? রামচন্দরজি? হিন্দুদের কী-একটা গল্প আছে না? সেইটে আমাদের শুনিয়ে দিন। আপনি কখনও গল্প বলেন না, শুধু শোনেনেই।'

ইয়া আল্লা! আদি কবি বাল্মীকি যে গল্প বলেছেন আমাকে সে গল্প নতুন করে আমার টোটাফুটা উর্দু দিয়ে বলতে হবে! নিবেদন করলুম, 'অধ্যাপক খুদাবখ্‌শকে অনুরোধ করবেন। রামায়ণের নাকি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।'

অধ্যাপক শুধালেন, 'কিন্তু রামচন্দরজি জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন, নয় কি?'

আমি বললুম, 'আলবৎ।'

অধ্যাপক বললেন, 'ওই তো হল আসল তত্ত্বকথা। বীরপুরুষ আর বীরের জাতমাত্রই ভাইকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসে। পাঠানদের মতো বীরের জাত কোথায় পাবেন বলুন?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অধ্যাপক খুদাবখ্‌শ তো বীরপুরুষ ছিলেন না।'

অধ্যাপক পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললেন, 'সে তো গুহ্যতর তত্ত্ব। অধ্যাপকি কর আর যাই কর, পাঠানত্ব যাবে কোত্থেকে? অর্থনৈতিক কারণ-ফারণ সবকিছুই অত্যন্ত পাতলা ফিলিম— একটু খোঁচা লাগলেই আসল পেলেট্‌ বেরিয়ে পড়ে।'

মেজর মুহম্মদ খান বললেন, 'ভাইকে ভালোবাসার জন্য পাঠান হওয়ার কী প্রয়োজন? ইউসুফও (জোসেফ) তো বেনয়ামিনকে (বেনজামিন) ভয়ঙ্কর ভালোবাসতেন।'

অধ্যাপক বললেন, 'ইহুদিদের কথা বাদ দিন। আদমের এক ছেলে আরেক ছেলেকে খুন করেনি?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পাঠানরা ইহুদিদের হারিয়ে-যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয়? কোথায় যেন ওইরকম একটা থিয়োরি শুনেছি যে সেই উপজাতি যখন দেখল তাদের কপালে শুকনো, মরা আফগানিস্তান পড়েছে তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল— অর্থাৎ ফারসিতে যাকে বলে "ফগান" করেছিল— তাই তো তাদের নাম 'আফগান'। আর আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্তানি হয়েছেন।'

অধ্যাপক পণ্ডিতের হাসি হেসে বললেন, 'ত্রিশ বৎসর আগে একথা বললে আপনাকে আমরা শাবাসি দিতুম, এখন ওসব বদলে গিয়েছে। তখনও আমরা জানতুম না যে, দুনিয়ার বড় বড় জাতেরা নিজেদের 'আর্য' বলে গৌরব অনুভব করছে। তখনও রেওয়াজ ছিল খানদানি হতে হলে বাইবেলের ইহুদি চিড়িয়াখানায় কোনও না কোনও খাঁচায় সিংহ বাঁদর ছিল না কিছু একটা হতেই হবে। এখন সেসব দিন গিয়েছে— এখন আমরা কই "আর্য"।

www.pathagar.com

বেদফেদ কী সব আছে না?— সেগুলো সব আমরাই আউড়েছি। সিকন্দর শাহকে লড়াইয়ে আমরাই হারিয়েছি আর গান্ধার ভাস্কর্য আমাদেরই কাঁচা বয়সের হাত মকশোর নমুনা। "গান্ধার" আর "কান্দাহার"একই শব্দ। আরবি ভাষায় "গ" অক্ষর নেই বলে আরব ভৌগোলিকেরা "ক" ব্যবহার করেছেন।'

পাণ্ডিত্যের অগাধ সাগরে তখন আমার প্রাণ যায়-যায়। কিন্তু বিপদে-আপদে মুশকিল-আসান হামেশাই পুলিশ। আহমদ আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসরের ওসব কথা গায়ে মাখবেন না। ইসলামিয়া কলেজের চায়ের ঘরে যে আড্ডা জমে তারি খানিকটে পেতলে নিয়ে তিনি সুন্দর ভাষায় রঙিন গেলাসে আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আসল পাঠান এসব জিনিস নিয়ে কক্‌খনও মাথা ঘামিয়ে পাগড়ির প্যাঁচ ঢিলে করে না। আফ্রিদি ভাবে, আফ্রিদি হল দুনিয়ার সেরা জাত; মোমন্দ বলে বাজে কথা, খুদাতালার খাস পেয়ারা কোনও জাত যদি দুনিয়ায় থাকে তবে সে হচ্ছে মোমন্দ জাত। এমনকি, তারা নিজেদের আফগান বলেও স্বীকার করে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্তানের অংশ হতে চান না? ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে স্বাধীন পাঠান হয়ে থাকবেন বলে?'

সব পাঠান একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'আলবৎ না; আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব— সে মুল্লুকের নাম হবে পাঠানমুল্লুক।'

অধ্যাপক বললেন, 'পাঠানের সোপবক্স লেকচার শোনেননি বুঝি কখনও। সে বলে, "ভাই পাঠানসব, এস আমরা সব উড়িয়ে দি; ডিমোক্রেসি, অটোক্রেসি, বুরোক্রেসি, কমুনিজম, ডিক্‌টেটরশিপ— সব সব।" আরেক পাঠান তখন চেঁচিয়ে বলল, "তুই বুঝি অ্যানার্কিস্ট?" পাঠান বলল, "না, আমরা অ্যানার্কিও উড়িয়ে দেব।" '

অধ্যাপক বললেন, 'বুঝতে পেরেছেন?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পর 'না' হয়ে যাবে।" এই তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'ঠিক ধরেছেন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষের অংশ যখন হবেন না, তখন দয়া করে রাশানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন!'

সবাই সমস্বরে বললেন, 'আলবৎ!'

ছয়

পৃথিবীর আর সব দেশে যেতে হলে একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করে যে কোনও বন্দরে গিয়ে হাজির হলেই হল। আফগানিস্তান যেতে হলে সেটি হবার যো নেই। পেশাওয়ার পৌঁছে আবার নতুন স্ট্যাম্পের প্রয়োজন। সে-ও আবার তিন দিন পর নাকচ হয়ে যায়। খাইবার-পাসের আশেপাশে কখন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যায় তার স্থিরতা নেই বলেই এই বন্দোবস্ত। আবার এই তিন দিনের মেয়াদি স্ট্যাম্প সত্ত্বেও হয়তো খাইবারের মুখ থেকে মোটর ফিরিয়ে দিতে পারে— যদি ইতোমধ্যে কোনও বখেড়া লেগে গিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সেই স্ট্যাম্প নিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখি হরেকরকম বিদেশি লোকে ভর্তি কতকগুলি বাস পশ্চিমদিকে যাচ্ছে। আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'এগুলো কাবুল যায় না।' তার পর অন্য কথা পাড়বার জন্য বললেন, 'বাঙলা দেশের একটা গল্প বলুন না।'

আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা তবে শোন। বাইরে বললুম, 'গল্প বলা আমার আসে না, তবে একটা জিনিসে পাঠানে-বাঙালিতে মিল দেখতে পেয়েছি সেইটে আপনাকে বলছি, শুনুন—

'এখানে যেরকম কারবার পাঞ্জাবি আর শিখদের হাতে, কলকাতায়ও কারবার বেশিরভাগ অ-বাঙালির হাতে। আর বাঙালি যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আজব।

'আমি তখন ইলিয়ট রোডে থাকতুম, সেখানে দোকানপাট ফিরিঙ্গিদের। মুসলমানদের কিছু কিছু দর্জির দোকান আর লন্ড্রি, ব্যস। তার মাঝখানে এক বাঙালি মুসলমান ঝাঁ-চকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল। লোকটির বেশভূষা দেখে মনে হল, শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে। স্থির করলুম, সাহস করে দোকান যখন খুলেছে তখন তাকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'জোর গরম পড়েছে— বেলা দুটো। শহরে চর্কিবাজির মতো ঘুরতে হয়েছে— দেদার সাবান চোখে পড়েছে কিন্তু কিনিনি— ভদ্রলোকের ছেলেকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

ট্রাম থেকে নেমে দোকানের সামনে এসে দেখি ভদ্রলোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, পাখিটা খাঁচায় ঘুমোচ্ছে, ঘড়িটা পর্যন্ত সেই-যে বারোটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখনও জাগেনি।

'আমি মোলায়েম সুরে বললুম, "ও মশাই, মশাই"।

'ফের ডাকলুম, "ও সায়েব, সায়েব।"

'কোনও সাড়াশব্দ নেই। বেজায় গরম, আমারও মেজাজ একটু একটু উষ্ণ হতে আরম্ভ করেছে। এবার চেঁচিয়ে বললুম, "ও মশাই, ও সায়েব"।

'ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বোয়াল মাছের মতো দুই রাঙা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন, "আজ্ঞে?" তার পর ফের চোখ বন্ধ করলেন।

'আমি বললুম, "সাবান আছে? পামওলিভ সাবান"?

'চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন, "না।"

'আমি বললুম, "সে কী কথা, ওই তো রয়েছে শো-কেসে।"

"ও বিক্‌কিরির না।"— '

তার পর আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পাঠানরাও বুঝি ওইরকম ব্যবসা করে?' তিনি তো খুব খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলুন তো?'

আমি উত্তর দিলুম, 'ওই যে বললেন এসব বাস কাবুল যায় না।'

এবার আহমদ আলী থমকে দাঁড়ালেন। দেয়ালের দিকে ঘুরে, কোমরে দু হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। সে তো হাসি নয়— হাসির দমক। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন তাঁর হাসি থামবে। উত্তর দিলেন ভালো। বললেন, 'এসব বাস খাইবারপাস অবধি গিয়েই ব্যস্!'

আমি শুধালুম, 'এই সামান্য রসিকতায় আপনি এত প্রচুর হাসতে পারেন কী করে?'

www.pathagar.com

'কেন পারব না? হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ-দিলে। আপনাকে বলিনি স্বাধীনতা কোথায় বাসা বেঁধে থাকে? রাইফেলে নয়, বুকের খুনে। একটা গল্প শুনবেন? ওই দেখছেন, হোথায় চায়ের দোকানি বটতলায় বেঞ্চি পেতে দিয়েছে। চলুন না।'

পাঠানমাত্র ওই মারাত্মক ডিমোক্র্যাট। নির্জলা টাঙ্গাওয়ালা-বিড়িওয়ালার চায়ের দোকান।

আহমদ আলী তাঁর বিশাল বপুখানার ওজন সম্বন্ধে সচেতন বলে খুঁটির উপর ভর দিয়ে বসলেন, আমি আমার তনুখানা যেখানে খুশি রাখলুম। বললেন—

'ওমর খৈয়ামের এক রাত্রে বড্ড নেশা পেয়েছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচখানা রুবাইয়াত শেষ না করে উঠবেন না। জানেন তো কীরকম ঠাসবুনুনির কবিতা— শেষ করতে করতে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। মদের দোকানে যখন পৌঁছলেন তখন ভোর হব-হব। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "নিয়ে এস তো হে, এক পাত্তর উৎকৃষ্ট শিরাজি!" মদওয়ালা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "হুজুর এত দেরিতে এসেছেন, রাত কাবারের সঙ্গে সঙ্গে মদও কাবার হয়ে গিয়েছে।" ওমর নরম হয়ে বললেন, "শিরাজি নেই তো অন্য কোনও মাল দাও না।" মদওয়ালা বলল, "শরম কি বাত। কিচ্ছু নেই হুজুর।" ওমর বললেন, 'পরোয়া নদারদ, ওই যেসব এঁটো পেয়ালাগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে সেগুলো ধুয়ে তাই দাও দিকিনি— নেশার জিম্মাদারি আমার।" '

হিম্মতের জিম্মাদারি, হাসির জিম্মাদারি, নেশার জিম্মাদারি কিসে, কার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বেই দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সেই ভেজাল পাঠান— তাঁর ব্রাত্য-দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন— রমজান খান। আমি আহমদ আলীকে আঙুল দিয়ে দেখালুম। আর যায় কোথায়? 'ও রজমান খান, জানে মন্, বরাদরে মন্, এদিকে এস।' আমাকে তম্বি করে বললেন, 'আশ্চর্য লোক, আমি না ডাকলে আপনি ওঁকে যেতে দিতেন? এই গরমে? লোকটা সর্দি-গর্মি হয়ে মারা যেত না? আল্লা রসুলের ডর-ভয় নেই?'

রমজান খান এসে বললেন, 'ভগিনীপতির অসুখ, তার করতে যাচ্ছি।' বলেই ঝুপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। আহমদ আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হবে, হবে, সব হবে। টেলিগ্রাফের তার শক্ত মালে তৈরি— দু চার ঘণ্টায় ক্ষয়ে যাবে না। সুখবর শোনো। সৈয়দ সাহেব একখানা বহুৎ উম্‌দা গল্প পেশ করেছেন।' বলে তিনি আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টমাটো-রস আর উস্টার সস্ ঢেলে রমজান খানকে পরিবেশন করলেন। বারে বারে বলেন, ও সাবান বিক্‌কিরির না— এ বাস কাবুল যায় না। এ যেন বাঙলা দেশের পূর্ব আকাশে সূর্যোদয় আর পেশাওয়ারের পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেল। হুবহু একই রঙ।'

রমজান খান বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু বাঙালি আর পাঠানে একটা জায়গায় সখ্‌ৎ গরমিল আছে।'

আমি শুধালুম, 'কিসে?'

রমজান খান বললেন, 'আমি সিন্ধুনদ পেরিয়ে আহমদ আলীর পাক-নজরে যে মহাপাপ করেছি এটা সেই সিন্ধুপারের কাহিনী। তবে আটকের কাছে নয়, অনেক দক্ষিণে— সেখানে সিন্ধু বেশ চওড়া। তারি বালুচরে বসে দুপুর রোদে আটজন পাঠান ঘামছে। উট ভাড়া দিয়ে তারা ছিয়ানব্বুই টাকা পেয়েছে, কিন্তু কিছুতেই সমানেসমান ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে পারছে না। কখনও কারও হিস্যায় কম পড়ে যায়, কখনও কিছু টাকা উপরি থেকে যায়। ক্রমাগত

নতুন করে ভাগ হচ্ছে, হিসাব মিলছে না, ঘাম ঝরছে আর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গলাও চড়ছে। এমন সময় তারা দেখতে পেল, অন্য পার দিয়ে এক বেনে তার পুঁটুলি হাতে করে যাচ্ছে। সব পাঠান একসঙ্গে চেঁচিয়ে বেনেকে ডাকল, ওপারে এসে তাদের টাকার ফৈসালা করে দিয়ে যেতে। বেনে হাত-পা নেড়ে বোঝাল অত মেহন্নত তার সইবে না, আর কত টাকা ক জন লোক তাই জানতে চাইল। চার কুড়ি দশ ও তার উপরে ছয় টাকা আর হিস্যেদার আটজন। বেনে বলল, "বারো টাকা করে নাও।" পাঠানরা চেঁচিয়ে বলল, "তুই একটু সবুর কর, আমরা দেখে নিচ্ছি। বখরা ঠিক ঠিক মেলে কি না।" মিলে গেল— সবাই অবাক। তখন তাদের সর্দার চোখ পাকিয়ে বলল, "এতক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলুম, হিসাব মিলল না; এখন মিলল কী করে? ব্যাটা নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে হিসাব মিলিয়ে দিয়েছে। ওপার থেকে সে যখন হিসাব মেলাতে পারে তখন নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরাতেও পারে। পাকড়ো শালাকো!" '

রমজান খান বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, পরোপকার করতে গিয়ে বেনে পো'র অবস্থা। ভাগ্যিস সিন্ধু সেখানে চওড়া এবং বেনেরা আর কিছু পারুক না-পারুক ছুটতে পারে আরবি ঘোড়ার চেয়েও তেজে। সে-যাত্রা বেনে বেঁচে গেল।'

আমি বললুম, 'গল্পটি উপাদেয়, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে মিল-গরমিলের এতে আছে কোন চিজ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালি আপন দেশে বসে, এভারেস্টের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে, চুড়োয় চড়তে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাতলে দেয়নি, ওই দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।'

আহমদ আলী শুধালেন, 'তাই বুঝি বাঙালি চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকে বললুম, 'সেও একটা অতি সূক্ষ্ম কারণ বটে, তবে কি না শিকদার এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারেননি।'

রমজান খান উষ্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, 'হু', কিন্তু একটু সামান্য টেকনিকল মুশকিল ছিল। নামকরণ যখন হয় শিকদার তখন কলকাতায়, আর মহামান্য স্যার জর্জ লন্ডনে পেনশন টানছেন। পাল্লাটা— '

পুরো পাঠান এবং নিমপাঠান একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শুধালেন, 'তার মানে? তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্ট মাপা হয়নি?'

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? এই আপনাদের ভাইবেরাদরই কতবার কাবুল দখল করেছেন আমার ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু এই কথাটা মনে গাঁথা আছে যে, নাম হয়েছে প্রতিবারেই ইংরেজের। আর আপনারা যখনই হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তখনই হয় ইংরেজ কচুকাটা হয়ে মরেছে, নয় আপনাদের বদনাম দিয়ে নিজের অপমান জ্বালার মতো মোটা মোটা মেডেল পরে ঢেকেছে। এই গেলবারে যখন দু খানা আকবরশাহি কামান আর তিনখানা জাহাঙ্গিরি বন্দুক দিয়ে আমানউল্লা ইংরেজকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন, তখন ইংরেজ তামাম দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে শোনায়নি যে, পাঠানের ফেরেব্বাজিতেই তারা লড়াই হারল?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালি এত খবর রাখে কেন?'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে না করেন, আর গোস্তাকি বেয়াদবি মাফ করেন, তবে সবিনয় নিবেদন, আপনারা যদি একটু বেশি খবর রাখেন তা হলে আমরা নিষ্কৃতি পাই।'

দু জনেই চুপ করে শুনলেন। তার পর আহমদ আলী বললেন, 'সৈয়দ সাহেব, কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোমা মারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন চালান, ইংরেজ আপনাদের ভয়ও করে। এসব তো আরম্ভ হয়েছে মাত্র সেদিন। কিন্তু বলুন তো, যেদিন দুনিয়ার কেউ জানত না ফ্রন্টিয়ার বলে এক ফালি পাথরভর্তি শুকনো জমিতে একদল পাহাড়ি থাকে সেদিন ইংরেজ তাদের মেরে শেষ করে দিত না, যদি পারত? ফসল ফলে না, মাটি খুঁড়লে সোনা চাঁদি কয়লা তেল কিছুই বেরোয় না, একফোঁটা জলের জন্য ভোর হবার তিন ঘণ্টা আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্খ পাঠান, কত যুগ ধরে, কত শতাব্দী ধরে কে জানে? সিন্ধুর ওপারে যখন বর্ষার বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তখন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি? পূরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া অদ্ভুত মিঠে মিঠে গন্ধ নিয়ে আসে, আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুব দেশে চলে গিয়েছে— যায়নি শুধু মূর্খ আফ্রিদি মোমন্দ।

'লড়াই করে যখন ইংরেজ এদেশকে উচ্ছন্ন করতে পারল না তখন সে প্রলোভন দেখায়নি? লাখ লাখ লোক পল্টনে ঢুকল। ইংরেজের ঝাণ্ডা এদেশে উড়ল বটে, কিন্তু তার রাজত্ব ওই ঝাণ্ডা যতদূর থেকে দেখা যায় তার চেয়েও কম। আর পল্টনে না ঢুকে পাঠান করতই-বা কী? পাঠানমোগল আমলে তাদের ভাবনা ছিল না। পল্টনের দরওয়াজা খোলা, অথচ মোগলপাঠান এই গরিব দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকে বুড়ার রুটি কাড়তে চায়নি, বউঝিকে বিদেশি হারাম কাপড় পরাতে চায়নি। শাহানশাহ বাদশাহ দীনদুনিয়ার মালিক দিল্লির তখ্‌তনশিন সরকার-ই-আলা যখন হিন্দুস্তানের গরম বরদাস্ত না করতে পেরে এদেশ হয়ে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর যেতেন পাঠান তখন তাঁকে একবার তসলিম দিতে আসত। শাহানশাহ খুশ, পাঠান তর্। বাদশাহের মির-বখশি পিছনের তাঞ্জাম থেকে মুঠা মুঠা আশরফি রাস্তার দু দিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতেন। "জিন্দাবাদ শাহানশাহ জাহানপনা" চিৎকার খাইবারের দু দিকের পাহাড়ে টক্কর খেয়ে খেয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে খুদাতালার পা-দানে গিয়ে যখন পৌঁছত তখন সে প্রশংসাধ্বনি লক্ষ কণ্ঠের নয়, কোটি কোটি কণ্ঠের। সে আশরফি আজ নেই, পর্বত-গাত্রে প্রশংসারব প্রতিধ্বনিত হয় না, কিন্তু ওই পাথরের টুকরোগুলো পাষাণ পাঠান আপন ছাতির খুন দিয়ে এখনও স্বাধীন রেখেছে। তাই তার নাম এখনও "নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ড"। পাঠান আর কী করতে পারত, বলুন।'

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বার বার আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আমি সে অর্থে কথাটা বলিনি। আমি ভদ্রসন্তানদের কথা ভাবছিলুম এবং তাঁরাও কিছু কম করেননি। তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ না করলে পাঠান সেপাই হয়তো আমানউল্লার বিরুদ্ধে লড়ত।'

আহমদ আলী বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের কথা বাদ দিন। এই অপদার্থ শ্রেণি যত শীঘ্র মরে ভূত হয়ে অজরঈলের দফতরে গিয়ে হাজিরা দেয় ততই মঙ্গল।'

রমজান খান আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের লড়ার কায়দা আর পাঠান সিপাহির লড়ার কায়দা তো আর এক ধরনের হয় না। সময় যেদিন আসবে তখন দেখতে পাবেন আমাদের "অপদার্থ" আলী কোন দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

www.pathagar.com

আমি আহমদ আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম। আহমদ আলী বললেন, 'আমি সবকথা ভালো করে শুনতে পাইনে। একটু কালা— খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

সাত

আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফ্র্, নিস্ফ্ উস্ সফ্র্'— অর্থাৎ কি না 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাংলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরোলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরোতে গিয়ে আমার পাক্কা সাতদিন কেটে গেল। আটদিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হয় 'আমি ভয়ঙ্কর একা'। 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যান্স ল্যান্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্তানই বলুন, এসব জায়গায় মানুষ আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিশ আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যন্ত এখনও ঠিক 'কগনিজেবল অফেন্স্' নয়। রাহাজানির সময় যদি আপনি পাঠানি কায়দায় চটপট উবুড় হয়ে শুয়ে না পড়েন তা হলে সে ভুল অথবা গোঁয়ার্তুমির খেসারতি দেবেন আপনি। রাস্তাঘাটে কী করে চলতে হয় তার তালিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কিপ টু দি লেফ্ট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটা নিতান্তই দিয়ে দেন তবে আপনার আত্মীয়স্বজন তো রয়েছেন— তাঁরা খুনের বদলা নিলেই তো পারেন। একটা বুলেটের জন্য তো আর তালুক-মুলুক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না।

সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানিস্তান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুনখারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাদেরও তো কিছু-একটা করবার আছে এই ভেবে দু চারটে পুলিশ দু একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়স্বজন 'কা তব কান্তা' দর্শনে বুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনি কিংবা তার সুচতুর আত্মীয়স্বজন আপনার আত্মীয়স্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল ধাতুদ্বারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনার জীবনের এই তিন দিনের মুসাফিরিতে কে দু ঘণ্টা আগে গেল, কে দু ঘণ্টা পরে গেল, কে বিছানায় আল্লা-রসুলের নাম শুনে শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাবৎ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিশ কেন মিছে আপনাদের তথা খুনি এবং তস্য আত্মীয়স্বজনদের মামলায় আরও ঝামেলা বাড়িয়ে সবাইকে খামকা, বেফায়দা তঙ্গ করবে? নির্বিকল্প বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিশও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনে অংশীদার। তবে হ্যাঁ, আলবৎ, এই নশ্বর সংসারে মাঝে মাঝে রুটি-গোশ্তেরও প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন তাতে সবসময় কুলিয়ে ওঠে না, খুনির আত্মীয়স্বজনকে যখন মেহেরবান খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তখন—? তখন আফগান পুলিশকে আর দোষ দিয়ে কী হবে!

www.pathagar.com

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন— রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। বুখারা সমরকন্দ শিরাজ তেহরানে যদি খবর রটে যায় যে, আফগানিস্তানের রাজবর্ত্ম অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল তা হলে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফারসি ছাড়া অন্য কোনও ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরেজি না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরেজি জানেন না, তখন তিনি ফারসির যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনও যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে, অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারও পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবদে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দু দিন একাসনে কাটাবেন— আমি যদি কাবুলে গিয়ে রটাই যে, তিনি গণ্ডুষজলের সফরি তা হলে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল— তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন, ভাষার খাতে তাঁর জ্ঞানের জমা কতটুকু। তবু যে তিনি চাকরিতে বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্য সবাই ভাষা জানতেন তাঁর চেয়েও কম। এ তত্ত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে পড়ত না। গুণীরা বলেন, 'চোখের সামনে ধরা আপন বন্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলি ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজ-সরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এককথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু— বন্দুক, গোলাগুলি আর শীতের কাপড়। বাদবাকি প্রায় সবকিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্তান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য-প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে-সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রি গরম পড়েছিল— ছায়াতে। এখন বাস যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দুরবিন দিয়ে তাকালেও একটি পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে-ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

হোস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ি ছোকরা একবার জ্বলন্ত স্পিরিটে আরও স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে বোতলে-স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকরার ভুরু, চোখের লোম, মোলায়েম গোঁফ পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরণী কখন যেন হঠাৎ তাঁর মুখখানা সূর্যদেবের অত্যন্ত কাছে নিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন— সেখানে আগুনের এক থাবড়ায় তাঁর চুল ভুরু সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর ঘাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর কখনও দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়াবার মতো সেসব আমাদের জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে— সার হয়ে নতুন ঘাসপাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি। সূর্যদেব সেখানে একচ্ছত্রাধিপতি। এখানে নগ্ন বীভৎস দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলা ভুল— এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরণী এদেশকে শস্য-শ্যামল করার চেষ্টা এখনও সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি— প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেঠেল সবকিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তার পর খাইবার গিরিসঙ্কট।

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ওই সঙ্কট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বয়ং পিয়ের লোতি কী করতেন জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মতো অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মতো অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনও লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরু বাঙালির অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না। পাহাড় বাঙলা দেশে নেই— তাঁর আড়াই হাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালি সমুদ্র দেখে জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মতো করে— পুরীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাই 'পুরীর সমুদ্র দর্শনে' অথচ তিনি যে লোতির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তা-ও তো নয়। তবু এসব হল বাঙালির কিছু কিছু দেখা— সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস নয়। কিন্তু শীতের দেশের সবচেয়ে অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীন্দ্রনাথ নিদেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচশোবার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তবু যদি কেউ বার দশেক সেই গরম সহ্য করে খাইবারপাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তা হলে আলাদা কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারের সুখ-দুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মতো। ক্ষুধানিবৃত্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার খোঁচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অনুমান করা বিচিত্র নয়, খাইবারের গরম কাঁটা সয়ে গেলে তার থেকে কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মতো রসও কিঞ্চিৎ বেরোতে পারে।

আমি যে বাসে গিয়েছিলুম তাতে কোনওপ্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহি, বাবুরশাহি রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তার উপযুক্ত মিলিটারি বন্দোবস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আপাদমস্তক পুরু করোগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা এবং নশ্বর ভঙ্গুর কাচ সে তার উইন্ড-স্ক্রিন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেড-লাইট কানা, কাঁচের অবগুণ্ঠন নেই। তখনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের Song of songs-এ বর্ণিত এক চোখের মহিমা—

'Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with one of thine eyes.'

www.pathagar.com

যে সমস্যার সমাধান বহুদিন বহু কন্‌কর্ড বহু টিকাটিপ্পনী ঘেঁটেও করতে পারেনি, আজ এক মুহূর্তে সদ্‌গুরুর কৃপায় আর খাইবারি বাসের নিমিত্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

দু দিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। একজোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সঙ্কীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মতো টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যে কোনও জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে— তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসঙ্কটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে কোটি কণ্ঠে পরিবর্তিত হত— এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হন। তাঁদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতুষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজির চোখ সন্ধ্যাসব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মতো লাল হয়ে উঠেছে। কাবুলি রুমাল দিয়ে ফেটা মেরে চোখ বন্ধ করেছে। নগ্নচোখে ক জন লোক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধূ গান্ধারী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লি যেতে হলে তো খাইবারপাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, অন্ধ বধূর দুর্দৈব দহন প্রশমিত করার জন্য মহাভারতকার গান্ধারীর অন্ধত্ব বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজিকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই-বা কী? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে।' এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজির গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র-গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দমস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মতো 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেইরকম— গোলাপি সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা। কারও হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারও হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উটের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিশমিশ আলু-বুখারা চলেছে হিন্দুস্তানের বিরিয়ানি-পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরও চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ আর হশিশ, না ককেনই, না আরও কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে, অতি মন্থরে। মনে পড়ল মানস সরোবর-ফের্তা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উঁচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে

www.pathagar.com

প্রশস্ততম পন্থা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তড়িৎগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সজ্ঞানে যমদূতের হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমর্পণ করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উষ্ণ সমর্থন। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে দুর্দান্ত গরম। পাঠান দু বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।'

রবীন্দ্রনাথও ওইরকম কী একটা কথা বলেছেন না, দুঃখ না পেলে দুঃখ ঘুচবে কী করে? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে দুঃখ এড়াবার চেষ্টা করা বৃথা? মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

খ্রিস্টও তো বলেছেন—

'Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [prison] till thou hast paid the uttermost farthing.'

কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলি তড়িৎগতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজির দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা একপাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

হৃদয়ঙ্গম করলুম, সৃষ্টি যখন তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীষ্মে রুদ্র তাঁর প্রসন্ন-কল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হত বেশি।

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবারপাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দু দিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক-পিঙ্। তার পর কী কায়দায় সবকিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারি হরিণ নিয়ে কী করে না-করে সকলেরই জানা কথা— চামড়াটুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে হাসিটুকু গুলি খাওয়ার পূর্বে মুখে লেগেছিল সেটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে— বাদবাকি উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবারপাসের দু দিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদি-আফ্রিদিতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে-ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ এক্কেবারে চলে যায়। পরের দিন যখন সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে দু ঘণ্টা লাগল কী করে, তখন সর্দারজি বলেছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ঘণ্টা।

মোটর আবার চলল। কাবুলির গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলেছিলেন, তার নির্যাস—

'কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব— কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। নেয়ে উঠে বরফে ঘষে ঘষে আঙুর খাব তামাম জুলাই আগস্ট। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নয়ানজুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অক্টোবরে শীতের হাওয়ায় ঝরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নভেম্বরে পুস্তিনের জোব্বা বের করব। ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরোব। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!'

আমি বললুম, 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

হঠাৎ দেখি সামনে এ কী! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্তানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

> It is absolutely forbidden
> to cross this border into
> Afghan territory.

কাবুলি বললেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা। অল্‌হমদুলিল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ)।'

আমি বললুম, 'আমেন।'

আট

খাইবারপাস তো দুঃখে-সুখে পেরোলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল— তা সে সংকীর্ণই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনও বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে-আসতে কোনও অসুবিধা হয় না কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে— যদি সে গাড়ি কুড়িমাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকালে আমার মাথায় একটা দশগজি বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জখম থেকে বাঁচাল।

সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনও কাজে লাগে কি না। তিনি বললেন, 'আরও বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটা কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসিতেই চলে; দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

www.pathagar.com

বুঝলুম, রাস্তার অবস্থা গ্রীষ্মের আতিশয্য আর দ্বিপ্রহরের অনাহার এ-পথের ফুল-টাইম গাহক সর্দারজিকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে— তা না হলে এরকম বীভৎস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন?

দুঃখ হল। ষাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় না সর্দারজি দেশের গাঁয়ে তেঁতুলের ছায়ায় নাতি-নাতনির হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার-কাবুলে মাকু মারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল ও বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশি টানাহেঁচড়া করতে হল না।

কী দেশ! দু দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নেই সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করলুম লক্ষ বৎসরের রৌদ্রবর্ষণে তাতেও সজীব কোনওকিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তখন লক্ষ করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকামাকড়, কোনওপ্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই— খাবে কী, বাঁচবে কী দিয়ে? মা ধরণীর বুকের দুধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনও ফাটল দিয়ে কোনও বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকদিগন্তব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেতযোনি বর্মধারিণী ফোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চক্রবালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার অদৃশ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রস্তনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চলশকট শূন্যে তুলে নিয়ে বিরাট নৈস্তব্ধ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।

তার পর দেখি মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মসৃণ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন জাদুঘরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল-সামগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

লান্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দক্কা দুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারই ভিতর দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলি করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শূন্য কোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ-দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে একপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে— ডানদিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের সৃষ্টি হয়েছে তারই উপরে ভুখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে হল ভিজে সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল ওই সবুজটুকুর কল্যাণে সেযাত্রা

www.pathagar.com

আমার চোখ দুটি বেঁচে গেল। না হলে দক্কা দুর্গ প্রাকারের অন্ধ কোটর নিয়ে আমাকেও দিশেহারা হয়ে ওই দেয়ালেরই মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলি বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারি কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তা হলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পৌঁছতে পারব।'

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশি দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্কার মতো জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবত খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুঁজোতে কী করে তৈরি করা সম্ভব হল বুঝতে পারলুম না।

অফিসারটি সত্যি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমার কাতর অবস্থা দেখে বললেন, 'আজ রাতটা এখানেই জিরিয়ে যান। কাল অন্য মোটরে আপনাকে সোজা কাবুল পাঠিয়ে দেব।' আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম যে, আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে।

অফিসারটি শিক্ষিত লোক। একলা পড়েছেন, কথা কইবার লোক নেই। আমাকে পেয়ে নির্জনে জমানো তাঁর চিন্তাধারা যেন উপড়ে পড়ল। হাফিজ-সাদির অনেক বয়েত আওড়ালেন এবং মরুপ্রান্তরে একা একা আপন মনে সেগুলো থেকে নিংড়ে নিংড়ে যে রস বের করেছেন তার খানিকটা আমায় পরিবেশন করলেন। আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফারসিতে জিজ্ঞাসা করলুম, সঙ্গীহীন জীবন কি কঠিন বোধ হয় না? বললেন, 'আমার চাকরি পল্টনের, ইস্তফা দেবার উপায় নেই। কাজেই বাইরের কাবুল নদীটি নিয়ে পড়ে আছি। রোজ সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি আর ভাবি যেন একমাত্র নিতান্ত আমার জন্য সে এই দুর্গের দেয়ালে আঁচল বুলিয়ে চলে গিয়েছে। অন্যায় কথাও নয়। আর দু চারজন যারা নদীর পাড়ে যায়, তাদের মতলব ঠাণ্ডা হওয়ার। আমিও ঠাণ্ডা হই, কিন্তু শীতকালেও কামাই দিইনে। গোড়ার দিকে আমিও স্বার্থপর ছিলুম, কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, আর নাচ দেখতুম, তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রান্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্য সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অমাবস্যার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনও নদীর পারে কান পেতে শুয়েছেন?'

আমি বললুম, 'নৌকোতে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি।'

তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তা হলে আপনি বুঝতে পারবেন। মনে হয় না কুলকুল শুনে, যেন আর দু দিন কাটলেই আরেকটু, আর সামান্য একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই হঠাৎ কখন এই রহস্যময়ী ভাষার অর্থ সরল হয়ে যাবে? আপনি ভাবছেন আমি কবিত্ব করছি। আদপেই না। আমার মনে হয় মেঘের ডাক যেমন জনপ্রাণীকে বিদ্যুতের ভয় জানিয়ে দেয়, জলের ভাষাও তেমনি কোনও এক আশার বাণী জানাতে চায়। দূর সিন্ধুপার থেকে সে বাণী উজিয়ে উজিয়ে এসেছে, না কাবুল পাহাড়ের শিখর থেকে বরফের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখানে এসে গান গেয়ে জেগে উঠেছে, জানিনে।

'এখন বড্ড গরম। শীতকালে যখন আপনার ছুটি হবে তখন এখানে আসবেন। এই নদীর অনেক গোপন খবর আপনাকে বাতলে দেব। আহারাদি? কিচ্ছু ভাবনা নেই। মুরগি, দুম্বা যা চাই। শাকশবজি? সে গুড়ে পাথর।'

অফিসার যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, একা থেকে থেকে বোধহয় ভদ্রলোকের মাথা, কেমন জানি, একটুখানি—। কিন্তু কাবুল নদীর সবুজ

www.pathagar.com

আঁচল ছেড়ে তিনি যখন অক্লেশে দুম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন, তখনই বুঝলুম ভদ্রলোক সুস্থই আছেন। বললেন, 'আমার কাজ পাসপোর্ট সই করা আর কী মাল আসছে-যাচ্ছে তার ওপর নজর রাখা। কিছু কঠিন কর্ম নয়, বুঝতেই পারছেন। ওদিকে নতুন বাদশা উঠে-পড়ে লেগেছেন আফগানিস্তানকে সজীব সবল করে তোলবার জন্য। অনেক লোক তার চারদিকে জড়ো হয়েছেন। শুনতে পাই কাবুলে নাকি সর্বত্র নতুন প্রাণের সবুজ ঘাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এদিকে ইংরেজ দুম্বা ওদিকে রুশি বকরি। সুযোগ পেলেই কাঁচা ঘাস সাফ করে দিয়ে কাবুলের নেড়া পাহাড়কে ফের নেড়া করে দেবে। ভাগ্যিস, চতুর্দিকে খোদার দেওয়া পাথরের বেড়া রয়েছে, তাই রক্ষে। আর রক্ষে এই যে, দুম্বা আর বকরিতে কোনওদিন মনের মিল হয় না। দুম্বা যদি ঘাসের দিকে নজর দেয় তো বকরি শিং উঁচিয়ে লাফ দিয়ে আমুদরিয়া পার হতে চায়। বকরি যদি তেড়িমেড়ি করে, তবে দুম্বা ম্যা ম্যা করে আর সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, বকরির নজর শুধু কাবুলের চাট্টিখানি ঘাসের ওপর নয়— তার আসল নজর হিন্দুস্তান, চীন, ইরান সবকটা বড় বড় ধানক্ষেতের ওপর।'

আমি শুধালুম, 'দুম্বাটা শুধু শুধু ম্যা ম্যা করবে কেন? তারও তো একজোড়া খাসা শিং আছে।'

'ছিল। হিন্দুস্তান ভাবে, এখনও আছে, কিন্তু এদেশের পাথরে খামকা গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভোঁতা করে ফেলেছে। তাই বোধহয় সেটা ঢাকবার জন্য সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে— গোরা সেপাইয়ের খানাপিনার জমক-জৌলুস দেখেছেন তো? হিন্দুস্তান সেই সোনালি শিঙের ঝলমলানি দেখে আরও বেশি ভয় পায়। ওদিকে মিশরে সাদ জগলুল পাশা, তুর্কিতে মুস্তফা কামাল পাশা, হিজ্‌জাজে ইবনে সউদ, আফগানিস্তানে আমানউল্লা খান দুম্বার পিঠে কয়েকটা আচ্ছা ডাণ্ডা বুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনও জানোয়ারই সহজে ঘায়েল হয় না। জানোয়ার তো!'

আমি আঁতকে উঠলুম। কী ভয়ঙ্কর ডিসিশন! নাঃ, তা তো নয়। মনেই ছিল না যে স্বাধীন আফগানিস্তানে বসে কথা কইছি।

অফিসার বলে যেতে লাগলেন, 'তাই আজ হিন্দুস্তান-আফগানিস্তানে মিলেমিশে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে বড় খুশির কথা। কিন্তু আপনাকে বহুত তকলিফ বরদাস্ত করতে হবে। কাবুল শক্ত জায়গা। শহরের চারিদিকে পাথর, মানুষের দিলের ভিতর আরও শক্ত পাথর। শাহানশা বাদশা সেই পাথরের ফাটলে ঘাস গজাচ্ছেন, আপনাকে পানি ঢালতে ডেকেছেন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লজ্জা দেবেন না। আমার কাজ অতি নগণ্য।'

অফিসার বললেন, 'তার হিসেব-নিকেশ আর-একদিন হবে। আজ আমি খুশি যে এতদিন শুধু পেশাওয়ার পাঞ্জাবের লোক আফগানিস্তানে আসত, এখন দূর বাঙলা মুল্লুকেও আফগানিস্তানের ডাক পৌঁছেছে।

দেখি সর্দারজি দূর থেকে ইশারায় জানাচ্ছেন, সব তৈরি— আমি এলেই মোটর ছাড়ে।

অফিসার সর্দারজিকে দেখে বললেন, 'অমর সিং বুলানির গাড়িতে যাচ্ছেন বুঝি? ওর মতো হুঁশিয়ার আর কলকব্জায় ওস্তাদ ড্রাইভার, এ রাস্তায় আর কেউ নেই। এমন গাড়িও নেই যার গায়ে অমর সিংয়ের দুটো ঠোক্কর, দুটো-চারটে কদরের চাঁটি পড়েনি। কোনও বেয়াড়া গাড়ি যদি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে শেষ দাওয়াই তার ঘোমটা খুলে কানের কাছে বলা, 'ওঝা অমর সিংকে খবর দেওয়া হয়েছে।' আর দেখতে হবে না। সেলফ্-স্টার্টার না, হ্যান্ডিল

www.pathagar.com

না, হঠাৎ গাড়ি পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকে। ড্রাইভার কোনও গতিতে যদি পিছন দিকে ঝুলে পড়তে পারে তবেই রক্ষা।

'কিন্তু হামেশাই দেখবেন লাইনের সবচেয়ে লজঝড় গাড়ি চালাচ্ছে অমর সিং। একটা মজা দেখবেন?' বলে তিনি অমর সিংকে ডেকে বললেন, 'সর্দারজি, আমি একখানা নয়া গাড়ি কিনেছি। সিধা আমেরিকা থেকে আসছে। তুমি চালাবে? তন্‌খা এখন যা পাচ্ছ তাই পাবে।'

অফিসারের নজরে পড়াতে সর্দারজি তো হাসিমুখে এসে সালাম করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কথা শুনে মুখ গম্ভীর হল। পাগড়ির ন্যাজটা দু হাতে নিয়ে সর্দারজি ভাঁজ করেন আর ভাঁজ খোলেন— নজরও ওইদিকে ফেরানো। তার পর বললেন, 'হুজুরের গাড়ি চালানো বড়ি ইজ্জতকি বাত কিন্তু আমার পুরনো চুক্তির মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি।'

অফিসার বললেন, 'তাই নাকি? বড় আফসোসের কথা। তা সে চুক্তি শেষ হলে আমায় খবর দিও। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি ক্ষুদে আগাকে (অর্থাৎ আমাকে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো? নতুন গাড়ি সে চালাতে চায় না। চুক্তি-ফুক্তি সব বাজে কথা। আমার ড্রাইভারের দরকার শুনলে এ লাইনের কোনও মোটরের গোঁসাই চুক্তির ফপরদালালি করতে পারে বলুন তো! তা নয়। অমর সিং নতুন গাড়ি চালিয়ে সুখ পায় না। পদে পদে যদি টায়ার না ফাটল, এঞ্জিন না বিগড়ল, ছাতখানা উড়ে না গেল, তবে সে মোটর চালিয়ে কী কেরামতি? সে গাড়ি তো বোরকা-পরা মেয়েই চালাতে পারে।

'আমার কী মনে হয় জানেন? বুড়ি মরে গিয়েছে। মোটরের বনেট খুলতে পেলে সে এখন বউয়ের ঘোমটা খোলার আনন্দ পায়। নতুন গাড়িতে তার অজুহাত কোথায়?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউয়ের ঘোমটা খোলার জন্য আবার অজুহাতের প্রয়োজন হয় নাকি?'

অফিসার বললেন, 'হয়, হয়। রাজাধিরাজের বেলাও হয়। শুনুন, কাবুল-বদখশান আধা হিন্দুস্তানের মালিক হুমায়ুন বাদশা জুবেদীকে কী বলেছেন—

> তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারির মতো
> দেখা মোরে দিতে করুণায়;
> বল তুমি, 'রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে
> এ-রূপ দেখাতে নারি হায়।'
> তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান
> অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন?
> আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
> দূরে রাখে কোন আবরণ।
> একি গো সমরলীলা তোমায় আমায়?
> ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার;
> মরমের মর্ম যাহা তাই তুমি মোর
> জীবনের জীবন আমার!

—সত্যেন দত্তের অনুবাদ

www.pathagar.com

নয়

আফগানিস্তানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পীর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটল, আর এঞ্জিন সর্দারজির ওপর গোসা করে দু বার গুম হলেন, চাকা সারাল হ্যান্ডিম্যান— তদারক করলেন সর্দারজি। প্রচুর মেহদি-প্রলেপ সলুসন লাগিয়ে বিবিজানের কদম মবারক মেরামত করা হল, কিন্তু তাঁর মুখ ফোটাবার জন্য স্বয়ং সর্দারজিকে ওড়না তুলে অনেক কাকুতিমিনতি করতে হল। একবার চটে গিয়ে তিনি হ্যান্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন— শেষটায় কোন শর্তে রফারফি হল, তার খবর আমরা পাইনি বটে, কিন্তু হরেকরকম আওয়াজ থেকে আমেজ পেলুম বিবিজান অনিচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পৌঁছবার কয়েক মাইল আগে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীতিবন্ধ, কিংবা বেল্ট যাই বলুন, ছিঁড়ে দু টুকরো হল। তখন খবর পেলুম সর্দারজিও রাতকানা। রেডিয়োর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিসফিস করে প্রচার করে দিলেন, 'অদ্যকার মতো আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হল। কাল সকাল সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।'

আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সায়েব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। বুঝলুম, এদেশেও বাস চড়ার পূর্বে সাদা কালিতে কাবিন-নামায় লিখে দিতে হয়, 'বিবিজানের খুশিগমিতে তাঁহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে গররাজি হইব না।'

সর্দারজি তম্বি করে বললেন, 'একটু পা চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।'

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মতো দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। 'কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে' বলতে আমাদের চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোনও সংস্রব নেই। ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা— তার ভিতর দিয়ে উট, বাস, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরোতে হবে না।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কতশত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কী বুঝতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। এলাকাটা মৌসুমি হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনও বৃষ্টি হয় না— যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দরশাহি বাজীরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যেসব 'অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে তোলা যায়। চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা। বাইরের হাওয়া তারই সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বেরোবার পথ নেই দেখে ওই জালিয়ানওয়ালাবাগে আর ঢোকে না। সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচিভেদ্য দুর্গন্ধ শুঁকলুম।

www.pathagar.com

দুর্গপ্রাকারকে পিছনের দেয়ালস্বরূপ ব্যবহার করে চার সারি কুঠরি নয়— খোপ। শুধু দরজার জায়গাটা ফাঁকা। খোপগুলোর তিন দিক বন্ধ— সামনের চত্বরের দিকে খোলা। বেতারওয়ালা সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে দর-কষাকষি করে আমাদের জন্য একটা খোপ ভাড়া নিলেন— আমার জন্য একখানা দড়ির চারপাইও যোগাড় করা হল। খোপের সামনের দিকে একটু বারান্দা, চারপাই সেখানে পাতা হল। খোপের ভিতর একবার এক লহমার তরে ঢুকেছিলুম— মানুষের কত কুবুদ্ধিই না হয়। ধর্ম সাক্ষী, স্মেলিং সল্টে যার ভিরমি কাটে না, তাকে আধ মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখতে হবে না।

কেরোসিন কুপির ক্ষীণ আলোকে যাত্রীরা আপন জানোয়ারের তদারক করছে। উট যদি তাড়া খেয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে খচ্চরের পাল চিৎকার করে রুটিওয়ালার বারান্দায় ওঠে আর কী। মোটর যদি হেডলাইট জ্বালিয়ে রাত্রিবাসের স্থান অনুসন্ধান করে, তবে বাদবাকি জানোয়ার ভয় পেয়ে সবদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। মালিকেরা তখন আবার চিৎকার করে আপন আপন জানোয়ার খুঁজতে বেরোয়। বিচুলি নিয়ে টানাটানি, রুটির দোকানে দর-কষাকষি, মোটর মেরামতের হাতুড়ি পেটা, মোরগ-জবাইয়ের ঘড়ঘড়ানি, আর পাশের খোপের বারান্দায় খান সায়েবের নাক-ডাকানি। তার নাসিকা আর আমার নাকের মাঝখানে তফাত ছয় ইঞ্চি। শিথান বদল করার উপায় নেই— পা তা হলে পশ্চিমদিকে পড়ে ও মুখ উটের নেজের চামর ব্যজন পায়। আর উট যদি পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে কী হয় না-হয় বলা কিছু কঠিন নয়। গোমূত্রের মতো পবিত্র জিনিসেও প্রপাতস্নানের ব্যবস্থা নেই।

তবে একথা ঠিক, দুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞানঅন্বেষণ অথবা আড্ডার সন্ধানে একটা চক্কর লাগায়, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে না। আহমদ আলীর ফিরিস্তিমাফিক সব জাত সব ভাষা তো আছেই, তার ওপর গুটিকয়েক সাধু সজ্জন, দু একজন হজযাত্রী— পায়ে চলে মক্কা পৌঁছবার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এঁদের চোখেমুখে কোনও ক্লান্তির চিহ্ন নেই; কারণ এঁরা চলেন অতি মন্দগতিতে এবং নোংরামি থেকে গা বাঁচাবার কায়দাটা এঁরা ফ্রন্টিয়ারেই রপ্ত করে নিয়েছেন। সম্বল-সামর্থ্য এঁদের কিছুই নেই— উপরে আল্লার মরজি ও নিচে মানুষের দাক্ষিণ্য, এই দুই-ই তাঁদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আভাস-ইঙ্গিতও আছে— কিন্তু সেগুলো হির্শফেল্‌ট সায়েবের জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাত-সকালে পেশাওয়ারের আণ্ডা-রুটি খেয়ে বেরিয়েছিলুম, তার পর পেটে আর কিছু পড়েনি। দক্কার শরবত পেট পর্যন্ত পৌঁছায়নি, শুকনো তালু-গলাই তাকে শুষে নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকের নোংরামিতে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোনওকিছু গিলবার প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আদিখ্যেতায় নিজের ওপর বিরক্তিও ধরছিল— 'আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমুচ্ছে, তখন তুমিই-বা এমন কোন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি যে, তোমার স্নান না হলে চলে না, মাত্র দু হাজার বছরের জমানো গন্ধে তুমি ভিরমি যাও। তবু তো জানোয়ারগুলো চত্বরে, তুমি বারান্দায় শুয়ে। মা জননী মেরি সরাইয়েও জায়গা পাননি বলে শেষটায় গাধা-খচ্চরের মাঝখানে প্রভু যিশুর জন্ম দেননি? ছবিতে অবশ্য সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সবকিছু এঁকেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে ক-টা মাছ?

www.pathagar.com

'বেৎলেহেমের সরাইয়ে আর আফগানিস্তানের সরাইয়ে কি তফাত? বেৎলেহেমেও বৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইহুদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার? আফগানিস্তানের গন্ধে তোমার গা বিড়োচ্ছে, কিন্তু ইহুদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দরমা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।'

এসব হল তত্ত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মানুষের মনের ভিতর যেরকম গীতাপাঠ হয়, সেরকম বেয়াড়া দুর্যোধনও সেখানে বসে। তার শুধু এক উত্তর, 'জানামি ধর্মং, ন চ মে প্রবৃত্তি', অর্থাৎ 'তত্ত্বকথা আর নতুন শোনাচ্ছে কী, কিন্তু ওসবে আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার ওপর আমার বেয়াড়া মনের হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। 'সর্দারজি ও বনেটবাসিনীতে যদি সাঁঝের ঝোঁকে ঢলাঢলি আরম্ভ না হত তবে অনেক আগেই জলালাবাদের সরকারি ডাকবাংলোয় পৌঁছে সেখানে তোমাতে-আমাতে স্নানাহার করে এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়, চিনার গাছের দোদুল হাওয়ায় মনের হরিষে নিদ্রা যেতুম না?'

বেয়াড়া মন কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানেরও সন্ধান রাখে— না হলে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটায় কী করে? ফিসফিস করে তর্কও জুড়ে দিয়ে বলল, 'মা মেরি ও যিশুর যে গল্প বললে সে হল বাইবেলি কেচ্ছা। মুসলমান শাস্ত্রে আছে, বিবি মরিয়ম (মেরি) খেজুরগাছের তলায় ইসা-মসিহকে প্রসব করেছিলেন।'

বিবেকবুদ্ধি— 'সে কী কথা! ডিসেম্বরের শীতে মা মেরি গেলেন গাছতলায়?'

বেয়াড়া মন— 'কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভু জন্মগ্রহণ করলে পর দেবদূতেরা সেই সুসমাচার মাঠের মাঝখানে গিয়ে রাখাল-ছেলেদের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মাঠে কাটাতে পারে, তবে ছুতোরের বউই পারবে না কেন, শুনি? তার ওপর গর্ভযন্ত্রণা— সর্বাঙ্গে তখন গলগল করে ঘাম ছোটে!'

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আদপেই পছন্দ করিনে। দু জনকে দুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা প্রহরী শিখর। সেখান থেকে হঠাৎ এক হুঙ্কারধ্বনি নির্গত হয়ে আমার তন্দ্রাভঙ্গ করল। শিখরের চুড়ো থেকে সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলছিল, 'সরাই যদি রাত্রিকালে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে হে যাত্রীদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদারি তোমাদের নিজের।'

ওইটুকুই বাকি ছিল। সরাইয়ের সব কষ্ট চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিয়েছিলুম ওই জানটুকু বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়ালা সেই জিম্মাদারিটুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনও ভরসা কোনওদিকে রইল না, তখন আমার মনে এক অদ্ভুত শান্তি আর সাহস দেখা দিল। উর্দুতে বলে, 'নঙ্গেসে খুদাভি ডরতে হ্যাঁয়' অর্থাৎ উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সমঝে চলেন।' সোজা বাংলায় প্রবাদটা সামান্য অন্যরূপ নিয়ে অল্প একটু গীতিরসে ভেজা হয়ে বেরিয়েছে, 'সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কী ভয় তার?'

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরও একটা খটকা লাগল। রেডিয়োওয়ালার চোস্ত ফারসি জানার কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওই যে সরাইওয়ালা বলল, "মাল-জানের" তদারকি আপন আপন কাঁধে একথাটা আমার কানে কেমনতরো নতুন ঠেকল। সমাসটা কি "জান-মাল" নয়?'

www.pathagar.com

অন্ধকারে রেডিয়োওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁর কথা অনেকটা বেতারবার্তার মতো কানে এসে পৌঁছল। বললেন, 'ইরানদেশের ফারসিতে বলে, "জানমাল" কিন্তু আফগানিস্তানে জান সস্তা, মালের দাম ঢের বেশি। তাই বলে "মাল-জান"।

আমি বললুম, 'তাই বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজায় সস্তা— তাই আমরাও বলি "ধনে-প্রাণে" মেরো না। "প্রাণে-ধনে" মেরো না কথাটা কখনও শুনিনি।'

আমাতে-বেতারওয়ালাতে তখন এতটা ছোটখাটো 'ব্রেন্‌স্‌-ট্রাস্ট্‌' বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্রন্টিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপন্ন হয় না। তবে আপনার মুখে এরকম কথা কেন?'

আমি বললুম, 'বুলেট ছাড়া অন্য নানা কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে। জ্বর আছে, কলেরা আছে, সান্নিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারো মাসই খোলা রয়েছে। সে-পথ ধরলে দু-দণ্ড জিরোবার তরে সরাই-ই বলুন আর হাসপাতালই বলুন, কোনওকিছুরই বালাই নেই।'

বেতারবাণী হল, 'না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর করে রাখার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার নামান্তর "হোয়াইট মেনস বার্ডেন"। কিন্তু আফগানরা প্রাচ্যভূমির ছোটজাত বলে নিজের মোট নিজেই বইবার চেষ্টা করে। সাধারণত এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় 'ধর্মপ্রাণ' মিশনারিরা, তাই আফগানিস্তানে তাদের ঢোকা কড়া বারণ। কোনও অবস্থাতেই কোনও মিশনারিকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। মিশনারির পরে আসে ইংরেজ। তাদেরও আমরা পারতপক্ষে ঢুকতে দিই না— ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের জন্য যে কজন ইংরেজের নিতান্ত প্রয়োজন তাদেরি আমরা বড় অনিচ্ছায় বরদাস্ত করেছি।'

এই দুটি খবর আমার কর্ণকুহরে মথি ও মার্ক লিখিত দুই সুসমাচারের ন্যায় মধুসিঞ্চন করল। গুলিস্তান, বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল দুর্গন্ধ মেরে ফেলে আমার চোখে গোলাপি ঘুমের মোলায়েম তন্দ্রা এনে দিল।

'জিন্দাবাদ আফগানিস্তান!' না হয় থাকলই-বা লক্ষ লক্ষ ছারপোকা সে দেশের চারপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে।

দশ

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। নামাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবি উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে, তুর্কিস্তানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কী করে! বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই জিগ্যেস করুন না।' আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে করেন?' আমার এই সঙ্কোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্যদেশে অচেনা-অজানা লোককে যে-কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশিই হয়।

মোটরে বসে তারী খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।

গ্রেট ইস্টার্ন পান্থশালা, আফগান সরাইও পান্থশালা। সরাইয়ের আরাম-ব্যারাম তো দেখা হল— গ্রেট ইস্টার্ন, গ্রান্ডেরও খবর কিছু জানা আছে।

www.pathagar.com

মার্কস্ না পড়েও চোখে পড়ে যে সরাই গরিব, হোটেল ধনী। কিন্তু প্রশ্ন তাই দিয়ে কি সব পার্থক্যের অর্থ করা যায়? সরাইয়েও জন আষ্টেক এমন সদাগর ছিলেন যাঁরা অনায়াসে গ্রেট ইস্টার্নে সুইট নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারী হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্নের বড় সায়েবদের কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচারব্যবহারে কী ভয়ঙ্কর তফাত। এই আটজন ধনী সদাগর ইচ্ছে করলেই একত্র হয়ে উত্তম খানাপিনা করে জুয়োয় দু শো-চারশো টাকা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। চাকরবাকর সন্ত্রস্ত হয়ে হুজুরদের হুকুম তামিল করত— সরাইয়ের ভিখিরি ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই, সাধুসজ্জনদের সঙ্গেও এঁদের কোনও যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরদস্তম্ভে এঁরা তো বসে থাকলেনই না— আটজন মিলে 'খানদানি' গোঠও এঁরা পাকালেন না। নিজ নিজ পণ্যবাহিনীর ধনী-গরিব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার ওপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা আরও পাঁচজনের তত্ত্বতাবাশ করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে হরেক রকমের আড্ডা জমে উঠল; ধনী-গরিবের পার্থক্য জামা-কাপড়ে টিকে থাকল বটে কিন্তু কথাবার্তায় সেসব তফাত রইল না। দু চারটে মোসাহেব 'ইয়েসমেন' ছিল সন্দেহ নেই, তা সে গরিব আড্ডা-সর্দারেরও থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য, তত্ত্বকথা, দেশ-বিদেশের রাস্তাঘাট-গিরিসঙ্কট, ইংরেজ-রুশের মন-কষাকষি, পাগলা-উট কামড়ালে তার দাওয়াই, সর্দারজির মাথার ছিট, সব জিনিস নিয়েই আলোচনা হল। গরিব-ধনী সকলেরই সকলরকম সমস্যা আড্ডার দ'য়ে মজে কখনও ডুবল কখনও ভাসল; কিন্তু বাকচতুর গরিবও ধনীর পোলাও-কালিয়ার আশায় বেশরম বাঁদরনাচ নাচল না।

ঝগড়া-কাজিয়াও আড্ডার চোখের সামনের চাতালে হচ্ছে। কথাবার্তার খোঁচা-খুঁচিতে যতক্ষণ উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড্ডা সেসব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু মারামারির পূর্বাভাষ দেখা দিলেই কেউ-না-কেউ মধ্যস্থ হয়ে বখেড়া ফৈসালা করে দেয়। মনে পড়ল বায়স্কোপের ছবি : সেখানে দুই সায়েবে ঝগড়া লাগে, আর পাঁচজন হটে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ায়। দুই সায়েব তখন কোট খুলে ছুড়ে ফেলেন, আর সক্কলের দয়ার শরীর, কোটটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তার পর শুরু হয় ঘুষোঘুষি রক্তারক্তি। পাঁচজন বিনা টিকিটে তামাশা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটাকে 'অন্য লোকের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার' নাম দিয়ে ক্ষীণ বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারও কোনও নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই। তাই পার্সোনাল ইডিয়সিংক্রেসি বা খেয়ালখুশির ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন, সক্কলেই যে যার খুশিমতো কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনিও আপনার পছন্দমতো যা-খুশি করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না। হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো-মন্দ দুই-ই হয়। একদিকে যেমন গরম, ধুলো, তৃষ্ণা সত্ত্বেও মানুষ একে অন্যকে প্রচুর বরদাস্ত করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সকলেই সরাইয়ের কুঠরি-চত্বর নির্মমভাবে নোংরা করে।

একদিকে নিবিড় সামাজিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ। অর্থাৎ 'কমুনিটি সেন্স' আছে কিন্তু 'সিভিক সেন্স' নেই।

www.pathagar.com

ভাবতে ভাবতে দেখি সরাইয়ে একরাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। হুঁশিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখব আর কী? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশূন্য শিলাপর্বত।

সর্দারজিকে বললুম, 'রাত্তিরে যখন গা বিড়োচ্ছিল তখন একটু সুপুরি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

সর্দারজি বললেন, 'পান কোথায় পাবেন বাবুসায়েব? পেশাওয়ারেই শেষ পানের দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাকের কোথাও পান দেখিনি— পল্টনে ড্রাইভারি করার সময় এসব দেশে আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। পাঠানও তো পান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গ্রাহক সব পাঞ্জাবি।'

তাই তো। মনে পড়ল, কলুটোলা জাকারিয়া স্ট্রিটে হোটেলের গাড়ি-বারান্দার বেঞ্চে বসে কাবুলিরা শহর রাঙা করে না বটে। আরও মনে পড়ল, দক্ষিণ-ভারতে বর্মা মালয়ে এমনকি খাসিয়া পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয়— যদিও এদের কেউই কাশী-লক্ষ্ণৌয়ের মতো তরিবত করে জিনিসটার রস উপভোগ করতে জানে না। তবে কি পান অনার্য জিনিস? 'পান' কথাটা তো আর্য— 'কর্ণ' থেকে 'কান', 'পর্ণ' থেকে 'পান'। তবে 'সুপারি?' উহু, কথাটা তো সংস্কৃত নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া'— সেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'গুয়া' কথাটার 'গুবাক' না 'গূবাক' কী একটা সংস্কৃত রূপ আছে না? কিন্তু তা হলেও তো কোনওকিছুর সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নাসিক আর্যভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়ে গাছের ডগায় আশ্রয় নেবেন কেন? আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়, কিন্তু গৃহসূত্রের ফিরিস্তিতে গুবাক— গুবাক! নাহ্। মনে তো পড়ে না। তবে কি এ নিতান্তই অনার্যজনসুলভ সামগ্রী? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশাওয়ার অবধি পৌঁছেছে? সাধে বলি, ভারতবর্ষ তাবৎ প্রাচ্য সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসি জিগির তুলে বড্ড বেশি চেঁচামেচি করাতে দক্ষিণ ভারতের এক সাধক বলেছিলেন, 'তা হলে সবাই ঘুমিয়ে পড়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষে-মানুষে ভেদ থাকে না, সবাই সমান।' সেই গরমে বসে বসে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলুম। ঝাঁকুনি, ধুলো, কঠিন আসন, ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্ত্বেও বেতার-কর্তা ও আমার, দু জনেরই ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঢলে পড়ছিল, আমি তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁর ঘুমে তা দিচ্ছিলুম। তার পর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি আমার কাছে মাফ চেয়ে শক্ত হয়ে বসেছিলেন। তখন আমার পালা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভদ্রতার বেড়া ভেঙে আমার মাথা তাঁর কাঁধে জিরিয়ে নিচ্ছিল।

চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা— রাস্তার দু দিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'জলালাবাদ'।

দক্কার পাশেই সেই কাবুল নদীর কৃপায় এই জলালাবাদ শস্যশষ্পশ্যামল। এখানে জমি বোধহয় দক্কার মতো পাথরে ভর্তি নয় বলে উপত্যকা রীতিমতো চওড়া— একটু নিচু জমিতে বাস নামার পর আর তার প্রসারের আন্দাজ করা যায় না। তখন দু দিকেই সবুজ, আর

www.pathagar.com

লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কী মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জলালাবাদ তার অতি মধুর তসবির? এমনকি যে দুটো-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হল। লক্ষ করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের 'বেপর্দামির' নিন্দা করে, তারই বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মতো। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতারকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার যতদূর জানা, কোনও দেশের গরিব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্তত আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে কখনও পর্দা মেনে "ভদ্রলোক" হবার চেষ্টা করে, কখনও কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আরবের বেদুইন মেয়েরা?'

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'

থাক্ উপস্থিত এসব আলোচনা। গোটা দেশটা প্রথম দেখে নিই, তার পর রীতি-রেওয়াজ ভালো-মন্দের বিচার করা যাবে।

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জলালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলিরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভিতর অন্তর্ধান। কেউ একবার জিগ্যেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজিকে শুধালুম, 'বাস আবার ছাড়বে কখন?' সর্দারজি বললেন, 'আবার যখন সবাই জড়ো হবে।' জিগ্যেস করলুম, 'সে কবে?' সর্দারজি যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তার কী জানি? সবাই খেয়েদেয়ে আসবে যখন, তখন।'

বেতারকর্তা বললেন, 'ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কী? আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই-বা কখন?'

তিনি বললেন, 'ওদের জন্য আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আপনি তো ওদের মাল-জানের জিম্মাদার নন।'

আমি বললুম, 'তা তো নই-ই। কিন্তু যেরকমভাবে হুট করে সবাই নিরুদ্দেশ হল তাতে তো মনে হল না যে ওরা শিগগির ফিরবে? আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পৌঁছব কী করে?'

বেতারকর্তা বললেন, 'সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। ওদের তো কাবুল পৌঁছবার কোনও তাড়া নেই। বাস যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌঁছত পনেরো দিনে, এখন চারদিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। ওরা খুশি, ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে না, মালপত্র তদারক করে গাধা-খচ্চরের পিঠে চাপাতে-নামাতে হচ্ছে না, তাদের জন্য বিচুলির সন্ধান করতে হচ্ছে না। জলালাবাদে পৌঁচেছে, এখানে সক্কলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ না কেউ আছে, তাদের তত্ত্বতাবাশ করবে, খাবে-দাবে, তার পর ফিরে আসবে।'

আমি চুপ করে গেলুম। দক্কাতে অফিসারকে বলেছিলুম, 'আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে', এখন বুঝতে পারলুম সব মানুষই কিছু-না-কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তফাত শুধু এইটুকু— কেউ করে জেনে, কেউ না জেনে।

আফগানিস্তানের বড় শহর পাঁচটি। কাবুল, হিরাত, গজনী, জলালাবাদ, কান্দাহার। জলালাবাদ আফগানিস্তানের শীতকালের রাজধানী। তাই এখানে রাজপ্রাসাদ আছে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য খাস পান্থনিবাস আছে।

www.pathagar.com

বেতারবাণী যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপস্থিত জলালাবাদের বাজার দেখে আফগানিস্তানের অন্যতম প্রধান নগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পেলুম না। সেই নোংরা মাটির দেয়াল, অত্যন্ত গরিব দোকানপাট— সস্তা জাপানি মালে ভর্তি— বিস্তর চায়ের দোকান, আর অসংখ্য মাছি। হিমালয়ের চট্টিতে মানুষ যেরকম মাছি সম্বন্ধে নির্বিকার, এখানেও ঠিক তাই।

হঠাৎ আখ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চৌকো চৌকো করে কেটে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে এবং তার উপরে দুনিয়ার সব মাছি বসাতে চেহারাটা চালে-তিলের মতো হয়ে গিয়েছে। ঘিনপিত ঝেড়ে ফেলে কিনলুম এবং খেয়ে দেখলুম, দেশের আখের চেয়েও মিষ্টি। সাধে কি বাবুর বাদশা এই আখ খেয়ে খুশি হয়ে তার নমুনা বদখশান-বুখারায় পাঠিয়েছিলেন। তার পর দেখি, নোনা ফুটি শসা তরমুজ। ঘন সবুজ আর সোনালি হলদেতে ফলের দোকানে রঙের অপূর্ব খোলতাই হয়েছে— খুশবাই চতুর্দিক মাত করে রেখেছে। দরদস্তুর না করে কিনলেও ঠকবার ভয় নেই। রপ্তানি করার সুবিধে নেই বলে সব ফলই বেজায় সস্তা। বেতারবার্তা জ্ঞান বিতরণ করে বললেন, 'যারা সত্যিকার ফলের রসিক তারা এখানে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ফল খেয়েই কাটায় আর যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও কিশমিশ আখরোট পেস্তা বাদামের ওপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে রুটি-পনির আর কৃচিৎ কখনও এক টুকরো মাংস। এরাই সবচাইতে দীর্ঘজীবী হয়।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'এদের গায়ে বুলেট লাগে না বুঝি? জলালাবাদের ফল তা হলে মন্ত্রপূত বলতে হয়।'

বেতারবার্তা বললেন, 'জলালাবাদের লোক গুলি খেতে যাবে কেন? তারা শহরে থাকে, আইনকানুন মানে, হানাহানির কি-বা জানে?'

কিন্তু জলালাবাদের যথার্থ মাহাত্ম্য শহরের বাইরে। আপনি যদি ভূবিদ্যার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চান তবে কিঞ্চিৎ খোঁড়াখুঁড়ি করলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আপনি যদি নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে চান তবে চারিদিকের নানাপ্রকারের অনুন্নত উপজাতি আপনাকে দেদার যোগাড় করে দেবে। যদি মার্কসবাদের প্রাচ্যদেশীয় পটভূমি তৈরি করতে চান তবে মাত্র এঙেল্‌সের 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি'খানা সঙ্গে নিয়ে আসুন, বাদবাকি সব এখানে পাবেন— জলালাবাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবার-পত্তনের ভিত, আর একশো মাইল দূরে কাবুলে রাষ্ট্রনির্মাণের গম্বুজ-শিখর বিরাজমান। যদি ঐতিহাসিক হন তবে গান্ধারী, সিকন্দর, বাবুর, নাদিরের বিজয় অভিযান বর্ণনার কতটা খাঁটি কতটা ঝুটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূগোল-অর্থনীতির সমন্বয়ে প্রমাণ করতে চান যে, তিন ফোঁটা নদীর জল কী করে নব নব মন্বন্তরের কারণ হতে পারে, তা হলে জলালাবাদে আস্তানা গেড়ে কাবুল নদীর উজান-ভাঁটা করুন। আর যদি গ্রিক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রঙ্গভূমি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদ্দা গ্রামে। ধ্যানী বুদ্ধ, কঙ্কালসার বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ যতরকমের মূর্তি চান, গান্ধার শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপর কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। টিপিঢাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।

আর যদি আপনি পাণ্ডিত্যের বাজারে সত্যিকার দাঁও মারতে চান, তবে দেখুন সিন্ধুর পারে মোন্‌-জো-দড়ো বেরোল, ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা বেরোল,

www.pathagar.com

নীলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরোল— এর সবকটাই পৃথিবীর প্রাকআর্য প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই, নর্মদার পারে ওইরকম একটা দাঁও মারার জন্য একপাল পণ্ডিত মাথায় গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বাজার কোণঠাসা করতে পারবেন না, উল্টো দেউলে হবার সম্ভাবনাই বেশি। আর যদি নিতান্তই বরাতজোরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল বাঁড়ুজ্যে। একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচামাল বিলেত নিয়ে গিয়ে তিন ভলুম চামড়ায় বেঁধে আপনারি মাথায় ছুড়ে মারবে। শোনেননি, গুণী বলছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দু বার ঠকলে তোমার দোষ।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন-জো-দড়োর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্তানের চার আনা। বিশেষত যখন আফগানিস্তানে কাক-চিল নেই— আপনার মেহন্নতের মাল নিয়ে তারা চুরিচামারি করবে না।

জানি, পণ্ডিতমাত্রেই সন্দেহ-পিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরেই নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল ফলে আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে অ্যাদ্দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির পাল সেখানে ঝামেলা লাগায়নি কেন?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন। ইংরেজ এবং অন্য হরেকরকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাণ্ডিত্যাম্বরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড্ডীয়মান, তাদের সর্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আপনার রঙ দিব্য বাদামি, আপনি প্রতিবেশী, আফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে— আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনারি জাতভাই বহু ভারতীয় এখনও আফগানিস্তানে ছোটখাটো নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমনকি বসবাসও করে, আপনাকে আনাচে-কানাচে ঘুরতে দেখলে কাবুলিওয়ালা আর যা করে করুক, আঁতকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।

তবু শুনবেন না? সাধে বলি, সবকিছু পণ্ড না হলে পণ্ডিত হয় না।

এগারো

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছবার আর কোনও ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ একশ মাইল, জলালাবাদ থেকে কাবুল আরও একশো মাইল। শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পৌঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশেপাশের গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তায় খেলাধুলো করছে। তারই এক খেলা মোটরের জন্য রাস্তায় গোলকধাঁধা বানিয়ে দেওয়া। কায়দাটা নতুন। কাবুলিরা যে আণ্ডার মতো শক্ত টুপির চতুর্দিকে পাগড়ি জড়ায়, ছোঁড়ারা সেই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে, হুশিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে দুটো-চারটে থেঁতলে দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে পেলেই সর্দারজি দাড়িগোঁফের ভিতরে বিড়বিড় করে কী একটা গালাগাল

www.pathagar.com

দিয়ে মোটরের বেগ কমান। কয়েকবার এরকম লক্ষ করার পর বললুম, 'দিন না দুটো-চারটে থেঁতলে। ছোঁড়াদের তা হলে আক্কেল হয়।' সর্দারজি বললেন, 'খুদা পানাহ্। এমন কর্ম করতে নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বুঝতে না পেরে বললুম, 'সে কী কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ছ্যাঁদা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলাটার আসল মর্মই ধরতে পারেননি। টুপির ভিতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোঁতা লম্বা লোহা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ি বাঁচানো হল, যদি টুপি থেঁতলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।"

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটরওয়ালাদের শেখাতে চায়, "পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়"।'

সর্দারজি বললেন, 'ওহ্, আপনার কী পরিষ্কার মাথা!'

বেতারবাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিই বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভগ্নাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ডাইনে হাঁটলেই পৌঁছবেন হাদ্দায়। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধমূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন, সে আমলের লোক নানারকম মূর্তি জড়ো করে যাদুঘর বানাত?'

এ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কনিষ্কের আমলে গান্ধারবাসীরা যাদুঘর নির্মাণ করিত কি না?'

ফেল মারলুম। কিন্তু বাঙালি আর কিছু পারুক না পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত। বললুম 'কিন্তু কাল রাত্রে সরাইয়ে নিজের "জান-মাল";— থুড়ি, "মাল-জান" সম্বন্ধে যে সতর্কতার হুঙ্কার শুনতে পেলুম তা থেকে তো মনে হল না প্রভু তথাগতের সাম্যমৈত্রীর বাণী শুনছি।'

বেতারবার্তা বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশু-শাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম। পূর্ণবয়স্ক, প্রাণবন্ত দুর্ধর্ষ পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজি খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি কিন্তু একথা বার বার স্বীকার করব যে, এই আধা-ইনসান পাঠান জাতকে কেউ যদি ধর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে তবে সে ইসলাম।'

আমি তো ভয় পেয়ে গেলুম। এইবার লাগে বুঝি। 'আধা-ইনসান' অর্থাৎ 'অর্ধমনুষ্য' বললে কার রক্ত গরম না হয়। কিন্তু বেতারবাণী অত্যন্ত সৌম্য বৌদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আপনি বিদেশি এবং আমাদের সকলের চেয়ে বেশি লোকজনের সংস্রবে এসেছেন, তার ওপর আপনি বয়সে প্রবীণ। আপনার এই মত শুনে ভারি খুশি হলুম।'

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সর্দারজিকে আস্তে আস্তে উর্দুতে শুধালুম, 'এ কী কাণ্ড? আপনি এঁর জাত তুলে এঁকে আধা-ইনসান বললেন, আর ইনি খুশি হয়ে আপনাকে তসলিম করলেন!'

www.pathagar.com

সর্দারজি আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তিনি চটবেন কেন? ইনি তো কাবুলি।'

আমি আরও সাত হাত জলে। ফের শুধালুম, 'কাবুলি পাঠান নয়?'

সর্দারজি তখন আমার অজ্ঞতা ধরতে পেরে বুঝিয়ে বললেন, 'আফগানিস্তানের অধিবাসী পাঠান। কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইরান দেশ থেকে এসে সেখানে বাড়িঘরদোর বেঁধে শহর জমিয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ফারসি। পাঠানের মাতৃভাষা পশতু। বেতারের সায়েব পশতু ভাষার এক বর্ণও বোঝেন না।'

আমি বললুম, 'তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু কলকাতার কাবুলিওয়ালারা তো ফারসি বোঝে না।'

'তার কারণ কলকাতার কাবুলিরা কাবুলের লোক নয়। তারা সীমান্ত, খাইবার, বড়জোর চমন কান্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাবুলি পারতপক্ষে কাবুল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে দু দশ জন যায় তারা সদাগর। তাদেরও পাল্লা ওই পেশাওয়ার অবধি।'

এত জ্ঞান দান করেও সর্দারজির আশ মিটল না। আমাকে শুধালেন, 'আপনি "কাবুলিওয়ালা", 'কাবুলিওয়ালা' বলেন কেন? কাবুলের লোক হয় হবে "কাবুলি", নয় 'কাবুলওয়ালা'! "কাবুলিওয়ালা" হয় কী করে?'

হকচকিয়ে গেলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাবুলিওয়ালা'। গুরুকে বাঁচাই কী করে? আর বাঁচাতে তো হবেই, কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥

সামলে নিয়ে বললুম, 'এই আপনি যেরকম 'জওয়াহিরাত' বলেন। 'জওহর' হল এক বচন; 'জওয়াহির' বহুবচন। 'জওয়াহিরে' ফের 'আত' লাগিয়ে আরও বহুবচন হয় কী প্রকারে?'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিন্তু মাছ দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কি না সে প্রশ্ন অন্য যে-কোনও দেশে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু পাঠানমুল্লুকের আইন, এক খুনের বদলে আরেক খুন। তাই সে-যাত্রা সর্দারজির সামনে ইজ্জত বজায় রেখে ফাঁড়া কাটাতে পারলুম।

অবশ্য দরকার ছিল না। সর্দারজি তখন মোড় নিতে ব্যস্ত। আমি ভাবলুম, ম্যাপে দেখেছি জলালাবাদ থেকে কাবুল সোজা নাকবরাবর রাস্তা— গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন?

বেতারবাণী হল, 'সেই ভালো, আজ যখন কিছুতেই কাবুল পৌঁছন যাবে না, তখন নিমলার বাগানেই রাত কাটানো যাক।'

দূরে থেকেই সারি সারি চিনার গাছ চোখে পড়ল। সুপারির চেয়ে উঁচু— সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বুক অবধি ডালপাতা নেই, বাকিটুকু মসৃণ ঘন পল্লবে আন্দোলিত। আমাদের বাঁশপাতার সঙ্গে কচি অশত্থপাতার সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ বিনুনির মতো যদি কোনও পল্লবের কল্পনা করা যায় তবে তাই হয় চিনারের পাতা। কিন্তু তার দেহটির সঙ্গে অন্য কোনও গাছের তুলনা হয় না। ইরানি কবিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তন্বঙ্গী তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা করে এখনও তৃপ্ত হননি। মৃদুমন্দ বাতাসে চিনার যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে-মন্থরে আন্দোলিত করে, তখন রসকষহীন পাঠান পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বারে বারে তার দিকে তাকায়। সুপারির দোলের সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে কিন্তু সুপারির রঙ শ্যামলিমাহীন কর্কশ আর সমস্ত ক্ষণ ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল।

www.pathagar.com

মনে হয়, মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনও প্রাণী চিনারের দেহচ্ছন্দকে তরুণীর চেয়ে মধুর বলে স্বীকার করবে।

বেতারওয়ালা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনও খবরই রাখেন না। সর্দারজির কাছ থেকে বেশি আশা করাও অন্যায়, কিন্তু তিনিই বললেন নিমলার বাগান আর তাজমহলের বাগান নাকি একই সময়কার। নিমলার বাগানে যে প্রাসাদ ছিল, সেটি অভিযান আক্রমণ সহ্য না করতে পেরে অদৃশ্য হয়েছে কিন্তু সারিবাঁধানো রমণীয় চিনারগুলো নাকি শাহজাহানের হুকুমে পোঁতা। সর্দারজির ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে অবশ্য উদ্ভিদবিদ্যা দিয়ে পরখ করে নেবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এই অজানা-অচেনা দেশে শাহজাহানের তৈরি তাজের কনিষ্ঠ উদ্যানে ঢুকছি কল্পনা করাতে যে সুখ, উদ্ভিদতত্ত্বের মোহমুদ্গার দিয়ে সে মায়াজাল ছিন্ন করে কী এমন চরম মোক্ষ লাভ! বাগানে আর এমন কিছু চারুশিল্পও নেই যার কৃতিত্ব শাহজাহানকে দিয়ে দিলে অন্য কারও ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। আর একথাও তো সত্য যে, শাহজাহানের আসন উঁচু করার জন্য নিমলার বাগানের প্রয়োজন হয় না— এক তাজই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তবু স্বীকার করতে হবে, অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিরাম। চিনারের সারি, জল দিয়ে বাগান তাজা রাখবার জন্য মাঝখানে নালা আর অসংখ্য নরগিস ফুলের চারা। নরগিস ফুল দেখতে অনেকটা রজনীগন্ধার মতো, চারা হুবহু একইরকম অর্থাৎ ট্যুব্‌রোজ জাতীয়। গ্রিক দেবতা নারসিসাস্ নাকি আপন রূপে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত দিন নদীর জলে আপন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেবতারা বিরক্ত হয়ে শেষটায় তাঁকে নদীর পারের ফুলগাছে পরিবর্তিত করে দিলেন। এখনও নারসিসাস্ ফুল— ফারসিতে নরগিস্— ঠিক তেমনি নদীর জলে আপন ছায়ার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নরগিস বনের একপাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পর ডাকবাংলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেইখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলকুল শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে, নাকমুখ ছাপিয়ে কোন অজানা সৌরভসুন্দরীর মধুর নিঃশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলকুল শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানালার পাশে শিউলিগাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যেরকম তন্দ্রা টুটে যায়, এখানে তাই হল, কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে। এ সঙ্গীত বহুবার শুনেছি কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনও পাইনি।

সেই আধা-আলো অন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে নরগিসের পা ধুয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলুম নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল— ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে— তারই পরশে নরগিস নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সংগীতসৌরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে

www.pathagar.com

না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল— পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

'এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার,
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার?'

বারো

ভোরের নমাজ শেষ হতেই সর্দারজি ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হল তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধ্যায় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন।

বেতার-সায়েবের দিলও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সর্দারজির সঙ্গে নানারকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকেও আফগানিস্তান সম্বন্ধে নানা কাজের খবর, নানা রঙিন গুজব বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য, কতটা কল্পনা, কতটা ডাহা মিথ্যে বুঝবার মতো তথ্য আমার কাছে ছিল না, কাজেই একতরফা গল্প জমে উঠল ভালোই। তারই একটা বলতে গিয়ে ভূমিকা দিলেন, 'সামান্য জিনিস মানুষের সমস্ত জীবনের ধারা কীরকম অন্য পথে নিয়ে ফেলতে পারে শুনুন!

'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জন চল্লিশ কয়েদি আর তাদের পাহারাওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা দেখে একজন কী করে পালিয়েছে। পাহারাওয়ালাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদি নিয়ে বেরিয়েছিল জলালাবাদে যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কী শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল ফাঁসি দেবে, কেউ বলল গুলি করে মারবে, কেউ বলল, জ্যান্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবে সে বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না, আর আফগান জেলের অবস্থা আর কেউ জানুক না-জানুক তারা বিলক্ষণ জানত। একবার সে জেলে ঢুকলে সাধারণত কেউ আর বেরিয়ে আসে না— যদি আসে তবে সে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে অথবা অন্যের স্কন্ধের উপর সোয়ার হয়ে কফিনের ভিতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যেসব কথা শুনতে পাবেন তার বেশিরভাগই কল্পনা— মরা লোকে তো আর কথা কয় না।

'তা সেই যাই হোক, পাহারাওয়ালা তো ভয়ে আধমরা। শেষটায় একজন বুদ্ধি বাতলাল যে, রাস্তার যে-কোনও একটা লোককে ধরে নিয়ে হিসাবে গোঁজামিল দিতে।'

'পাছে অন্য লোকে জানতে পেরে যায় তাই তারা সাততাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরোল। চতুর্দিকে নজর, কাউকে যদি একাকী পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবে। ভোরের অন্ধকার তখনও কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে ধরে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সক্কলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।'

www.pathagar.com

'সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে ইহলোক-পরলোক সকল লোকের সকলরকম ভয় দেখিয়ে পাহারাওয়ালারা শাসিয়ে বলল, জলালাবাদের জেলর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, "মা খু চিহ্‌ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম্" অর্থাৎ "আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।" ব্যস, আর কিছু না।

'লোকটা হয় আকাট মূর্খ ছিল, না হয় ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল অথবা এও হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে, যদি কোনও কয়েদি পালিয়ে যায়, তবে সক্কলের পয়লা রাস্তায় যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারি নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়তো ভেবে নিয়েছিল রাস্তার যে-কোনও লোককে রাজার হাতি যখন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে তখন তাকে জেলখানায়ই-বা নিয়ে যেতে পারবে না কেন?'

বেতারবাণী বললেন, 'গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনাগুলোর বর্ণনার বিশেষ ফেরফার হয় না কিন্তু ওই হতভাগা কেন যে জলালাবাদের জেলরের সামনে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না সেই বিচিত্র।'

সর্দারজি শুধালেন, 'অন্য কয়েদিরাও চুপ করে রইল?'

বেতারওয়ালা বললেন, 'তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সবকটা কয়েদিই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে— অন্য সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অন্য সকলের যখন ষড় ছিল তখন তারা কিছু বললে তো তাকে ধরিয়ে দেবারই সুবিধে করে দেওয়া হত।

'তা সে যাই হোক, সেই হতভাগ্য তো জলালাবাদের জাহান্নামে গিয়ে ঢুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল কী বোকামিই সে করেছে। তখন একে-ওকে বলে কয়ে আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জলালাবাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হুজুরের কাছে পৌঁছয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে শনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়তো তার কপালে আছে। অথবা হয়তো ভেবেছে, সমস্তটাই গাঁজা, কিংবা ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মতো এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

'জলালাবাদের জেলের ভিতরে কাগজ-কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক ঝুলোঝুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তার পর সে দরখাস্তের কী গতি হয় তার খবর পর্যন্ত বেচারির কানে এসে পৌঁছয় না।

'বিশ্বাস করবেন না, এই করে করে একমাস নয়, দু মাস নয়, এক বৎসর নয় দু বৎসর নয়— ঝাড়া ষোলটি বৎসর কেটে গিয়েছে। তার তখন মনের অবস্থা কী হয়েছে বলা কঠিন, তবে আন্দাজ করা বোধ করি অন্যায় নয় যে, সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

'এমন সময় তামাম আফগানিস্তানজুড়ে খুব-একটা খুশির জশন (পরব) উপস্থিত হল— মুইন-উস-সুলতানের (যুবরাজের) শাদি অথবা তাঁর প্রথম ছেলে জন্মেছে। আমির হবিবউল্লা খুশির জোশে অনেক দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত রুখাসুখা জেলগুলোতেও পৌঁছল। শীতকাল; আমির তখন জলালাবাদে। ফরমান বেরোল, জলালাবাদের জেলর যেন তাবৎ কয়েদিকে হুজুরের সামনে হাজির করে। হুজুর তাঁর বেহদ মেহেরবানি ও মহব্বতের তোড়ে বে-এখতেয়ার হয়ে হুকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদির ফরিয়াদ-তকলিফের খানাতল্লাশি করবেন।

www.pathagar.com

'বিস্তর কয়েদি খালাস পেল, তারও বেশি কয়েদির মিয়াদ কমিয়ে দেওয়া হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা হুজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'হুজুর শুধালেন, "তু কিস্তি", "তুই কে"?

'সে বলল, "মা খু চিহ্‌ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম' অর্থাৎ "আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের"।

'হুজুর যতই তার নামধাম কসুরসাজার কথা জিজ্ঞাসা করেন সে ততই বলে সে শুধু পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। ওই এক বুলি, এক জিগির। হুজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বুঝি পাগল। ঠাহর করবার জন্য অন্য নানারকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন দিকে ওঠে, কোন দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, না ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু তার নিজের কথা জিগ্যেস করলেই বলে, "আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।"

'ষোল বছর ওই মন্ত্র জপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিন ঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণ্য নেই, জেলের ভিতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই— তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব, তার সর্বৈব সত্তা ওই এক মন্ত্রে, "আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।"

শত দোষ থাকলেও আমির হবিবউল্লার একটা গুণ ছিল; কোনও জিনিসের খেই ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। শেষটায় সেই ডাকাতদের যে দু-একজন তখনও বেঁচে ছিল তারাই রহস্যের সমাধান করে দিল।

'শুনতে পাই খালাস পাওয়ার পরও, বাকি জীবন সে ওই পঁয়তাল্লিশ নম্বরের ভানুমতী কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

গল্প শুনে আমার সর্ব শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিপক্ক বৃদ্ধ সর্দারজির মুখে শুধু 'আল্লা মালিক', 'খুদা বাঁচানেওয়ালা।'

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত-আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে হয় নিমলার-এর কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

সিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছিলেন, দেরাদুন থেকে মুসৌরি, কিংবা মহাবলেশ্বরের কাছে পশ্চিম ঘাট উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে এরকম রাস্তার চুলের কাঁটার বাঁক, হাঁসুলি চাকের মোড় কিছু নতুন নয়— নতুনত্বটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিঙ বানিয়ে দেয় না, হরেকরকম সাইনবোর্ড দু দিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না, বিশেষ সঙ্কীর্ণ সঙ্কট পেরোবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দু দিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি ধসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আষ্টেক ড্রাইভার আটকা পড়ে আপন আপন শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতমশায়ের 'রাধে গো ব্রজসুন্দরী, পার করো' বলা ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই। যাঁরা শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে, রাস্তার বরফও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরফ সাফ করাতে আভিজাত্য আছে— শুনেছি স্বয়ং হুমায়ুন বাদশাহ নাকি শেরশাহের তাড়া খেয়ে কাবুল না কান্দাহার যাবার পথে নিজ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ-নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ড্রাইভার অন্তত এই সান্ত্বনা দেয় যে, দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনও ড্রাইভার এরকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে-কোনও একপাশ, হাজার ফুট গভীর খাদে দুর্ঘটনায়

www.pathagar.com

অপমৃত্যু দুটো-একটা মোটরগাড়ির কঙ্কাল। মনে পড়ছে কোনও এক হিল-স্টেশনের চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলুম, ড্রাইভারদের বুকে যমদূতের ভয় জাগাবার জন্য রাস্তার কর্তা ব্যক্তিরা একখানা ভাঙা মোটর বুলিয়ে রেখেছেন— নিচে বড় বড় হরপে লেখা, 'সাবধানে না চললে এই অবস্থা তোমারও হতে পারে।' কাবুলের রাস্তার মুখে সেরকম ব্যাপক কোনও বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না— চোখ খোলা রাখলে দু দিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাহাড়ের গা, আর একদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে রাস্তার ক্লিয়ারিঙ এক হাত। তার ভেতর দিয়ে নড়বড়ে উট দূরের কথা, শান্ত গাধাও পেরোতে পারে না। চওড়া রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তখন গাড়িই ব্যাক করে চলে উল্টো দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়ুবিহীন 'দুঃখেস্বনুদ্বিগ্নমনা' স্থিতধী মুনিপ্রবর আমি কখনও দেখিনি। সবাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না-থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তার পর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে-চমকানিয়া। আস্তে আস্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে, তার পর বলা নেই কওয়া নেই, একটা উট হঠাৎ আধপাক নিয়ে ফাঁকটুকুও চওড়া-চওড়ি বন্ধ করে দেয়। পিছনের উটগুলো সঙ্গে সঙ্গে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঝামেলা লাগায়— স্রোতের জলে বাঁধ দিলে যেরকম জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাটানি করে, আর জন বিশেক পিছন থেকে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লাগায়। অবস্থাটা তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর আনাড়ি ড্রাইভার মোটর ঘোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যেরকম হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, সেখানে হাজার ফুট গভীর খাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়তো রকে বসে বিড়ি হাতে আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পিছন থেকে আর এক সারি উট এসে উপস্থিত হয় তবে দুটোর সম্পূর্ণ খোলতাই হয়। আধ মাইল ধরে, সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা-দক্ষিণের মেলার গোরুর হাট বসে যায়।

বুখারা-সমরকন্দ, শিরাজ বদখশান সেই দ-য়ে মজে গিয়ে চিৎকার করে, গালাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সম্বরণ করে, দু-দণ্ড জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে ঔড্র কায়দায় আরম্ভ করে—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি
'খ' রে খগ-আসনে মুরারি
'গ' রে গরুড়—

স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভিতর কনুইয়ের উপর ভর করে দু হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জট-পাকানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কী করে খুলল, মোটর আবার কী করে চলল, একদম মনে নেই।

www.pathagar.com

তের

ফ্রান্সের বেতারবাণী আরম্ভ হয় 'ইসি পারি' অর্থাৎ 'হেথায় প্যারিস' দিয়ে। কাবুল ইয়োরোপীয় কোনও জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে আদর্শরূপে মেনে নেয় বলে কাবুল রেডিও দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞতা-বাণী প্রচারিত করে 'ইন্ জা কাবুল' অর্থাৎ 'হেথায় কাবুল' বলে।

মোটরেও বেতারবাণী হল 'ইন্ জা কাবুল'। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অথবা কাবুলের যতটা দেখবার সুবিধা হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

হেডলাইটের জোরে কিছু যে দেখব তারও উপায় ছিল না। পূর্বেই বলেছি বাসখানার মাত্র একটি চোখ— সাঁঝের পিদিম দেখাতে গিয়ে সর্দারজি তার ওপর আবিষ্কার করলেন যে, সে চোখটিও খাইবারের রৌদ্রদাহনে গান্ধারীর চোখের মতো কানা হয়ে গিয়েছে। সর্দারজির নিজের জন্য অবশ্য বাসের কোনও চোখেরই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকানা। কিন্তু রাস্তার পঁয়তাল্লিশ নম্বরিদের উপকারের জন্য প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে একটা হারিকেন যোগাড় করা হল। হ্যান্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাড-গার্ডের উপর বসল।

আমি সভয়ে সর্দারজিকে জিগ্যেস করলুম, 'হারিকেনের সামান্য আলোতে আপনার মোটর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

সর্দারজি বললেন, 'হচ্ছে বইকি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোরে চালাতে পারতুম।' মনে পড়ল, দেশের মাঝিরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সম্মুখে আলো রাখতে দেয় না।

কিন্তু 'ভাগ্য-বিধাতা' অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তো কবি তাঁরই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেড়ে দিয়ে গেয়েছেন—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক ঢের বেশি হুঁশিয়ার হয়। তাই বোধহয় কবির হাতে রাষ্ট্রের কী দুরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালোমন্দ সব কবিকেই অবিচারে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

এসব তত্ত্বচিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনও উপায় ছিল না। যদিও কাবুল উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে, তবু দুটো-একটা মোড় সব সময়েই থাকার কথা। সেসব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিলুম এবং সেই খবরটি সর্দারজিকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ডরভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আম্মো চোখ বন্ধ করি।' শুনে আমি যা চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গান্ধারীর চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়।

সে যাত্রা যে কাবুলে পৌঁছতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে, রগরগে উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না— ভ্রমণকাহিনী-লেখকের জীবনেও সেই সূত্র প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

'গুমরুক' বা কাস্টম-হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে— বিছানাখানা পর্যন্ত ছাড়ল না। টাঙ্গা নিয়ে ফরাসি রাজদূতাবাসের দিকে রওনা হলুম— কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফারসির অধ্যাপক ছিলেন ও তখন ফরাসি রাজদূতাবাসে কর্ম করতেন।

টাঙ্গা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কো রেডিও কোন ভরসায় তাবৎ দুনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করে। দেখলুম, কাবুল শহরে আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙ্গাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালায় কোনও তফাত নেই। আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য শেয়ালদার কাপ্তেনদের মতো তখনি স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসি দূতাবাস কী করে যেতে হয়, সেও বার বার 'চশম', 'বস্‌র্ ও চশ্‌ম্' অর্থাৎ 'আমার মাথার দিব্যি, আপনার তামিল এবং হুকুম আমার চোখের জ্যোতির ন্যায় মূল্যবান' ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দু মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে আকাট মূর্খকে জিজ্ঞাসা করে ফরাসি দূতাবাস কী করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। এক গুণী শেষটায় বললেন— 'ফরাসি রাজদূতাবাস? সে তো প্যারিস। যেতে হলে— '

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বোম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙ্গাওয়ালা; পেশাওয়ার অথবা কান্দাহার— যেটা কাছে পড়ে। সেখান থেকে বোম্বাই।'

টাঙ্গাওয়ালা ঘড়েল। বুঝল,

'বাঙাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো'

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর-আরা হয়ে ফরাসি রাজদূতাবাস পৌঁছল। কাবুল শহর ছোট— কম করে তিনবার সে আমাকে ওই রাস্তা দিয়ে আগেই নিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে পাহাড়— এর চেয়ে প্যাঁচালো কেপ অব গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফারসি সে বুঝতে পারে না। এবার আমার পালা। ভাড়া দেবার সময় সে যতই নানারকম যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে আমি ততই বোকার মতো তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাই আর একঘেয়ে আলোচনায় নতুনত্ব আনবার জন্য তার খোলা হাত থেকে আমারই দেওয়া দু চার আনা কমিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঙা ফারসিকে একদম ক্ষুদ্র বানিয়ে দিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলি, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ইমানদার লোক, বিদেশি বলে না জেনে বেশি দিয়ে ফেলেছি, অত বেশি নিতে চাও না। মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগি দরাজ করুন, তোমার বেটাবেটির— '

পয়সা সরালেই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, আল্লা রসুলের দোহাই কাড়ে, আর ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদি-রুমির বয়েত আওড়ায়। এমন সময় অধ্যাপক বগদানফ এসে সবকিছু রফারফি করে দিলেন।

www.pathagar.com

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে, অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শুধাল, 'আপনার দেশ কোথায়?'

বুঝলুম, গয়ার পাণ্ডার মতো। ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য।

কে বলে বাঙালি হীন? আমরা হেলায় লঙ্কা করিনি জয়?

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা। সমস্ত রাত ধরে পড়াশোনা করেন, আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বোধহয় তিনি ভারতবর্ষের সব পাখির মধ্যে পেঁচাকে পছন্দ করতেন বেশি। শান্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটায় ক্লাস নিতেন, নন্দবাবু তারই দেয়ালে একটা পেঁচা এঁকে দিয়েছিলেন। বগদানফ সায়েব তাতে ভারি খুশি হয়ে নন্দবাবুর মেলা তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ও কট্টর জারপন্থী। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের সময় মস্কো থেকে পালিয়ে আজরবাইজান হয়ে তেহরান পৌঁছান। সেখান থেকে বসরা হয়ে বোম্বাই এসে বাসা বাঁধেন। ভালো পেহলেভি বা পহলবি জানতেন বলে বোম্বাইয়ের জরথুস্ত্রি কামা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিয়ে সেখানে অনেক পুঁথিপত্রের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে রুশ পণ্ডিতদের দুরবস্থায় সাহায্য করবার জন্য এক আন্তর্জাতিক আহ্বানে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাড়া দেন এবং বোম্বাইয়ে বগদানফের সঙ্গে দেখা হলে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ফারসির অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭ সালের পূর্বে বগদানফ রুশের পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষে তেহরানে আট বৎসর কাটিয়ে অতি উৎকৃষ্ট ফারসি শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তীকালে ইরান যান, তখন সেখানে ফারসির জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ফারসি পড়াবার জন্য বগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের অন্য জহুরিদের মুখেও আমি শুনেছি যে, আধুনিক ফারসি সাহিত্যে বগদানফের লিখনশৈলী আপন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

ইউরোপীয় বহু ভাষা তো জানতেনই— তাছাড়া জগতাই, উসমানলি প্রভৃতি কতকগুলো অজানা-অচেনা তুর্কি ভাষা উপভাষায় 'জবরদস্ত মৌলবি'ও ছিলেন। কাবুলের মতো জগাখিচুড়ি শহরের দেশি-বিদেশি সকলের সঙ্গেই তিনি তাঁদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে কুসংস্কারে ভর্তি। বাঁ-দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন না তো গোখরোর ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই 'দুর্ঘটনা'র তিন মাস পরেও যদি তাঁর পেয়ারা বেড়াল বমি করে, তবে ওই বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অপয়া চাঁদ দেখাই তার জন্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আরশি ভেঙে গিয়েছে, চাবির গোছা ভুলে মেঝের উপর রেখেছিলে— আর যাবে কোথায়, সে রাত্রে বগদানফ সাহেব তোমার জন্য এক ঘণ্টা ধরে আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন, গ্রিক অর্থডক্স চার্চের তাবৎ সেন্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন, পরদিন ভোরবেলা তোমার চোখে-মুখে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে তিন বৎসর ধরে অপেক্ষা করবেন তোমার কাছ থেকে কোনও দুঃসংবাদ পাবার জন্য। তিন বৎসর দীর্ঘ মেয়াদ, কিছু-না-কিছু একটা

www.pathagar.com

ঘটবেই। তখন বাড়ি বয়ে এসে বগদানফ সায়েব তোমার সামনে মাথা নিচু করে জানুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ওই এককথা 'বলিনি, তখনি বলিনি?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক-একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারই উপরে বিনা মেহন্নতে ভবনদী পার হয়ে যায়।'

বগদানফের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে দুনিয়ার কুল্লে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে, একমাসের ভিতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, দু মাসের ভিতর দেখতে পাবেন, বগদানফ-কাঠের গুঁড়িতে আপনি একা নন, আপনার এবং সায়েবের পরিচিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। ঘোর বেলেল্লা দু একটা নাস্তিকের কথা অবশ্যি আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসির কানা মারে।

দয়ালু বন্ধুবৎসল ও সদানন্দ পুরুষ। তাঁর মুক্ত হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসি অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'ইল আশেত লে মাশিন আ পের্সে লে মাকারনি।' অর্থাৎ "মাকারনি" ফুটো করার জন্য তিনি মেশিন কেনেন।' সোজা বাংলায় 'কাকের ছানা কেনেন।'

কাবুলের বিদেশি দুনিয়ার কেন্দ্রস্থলে ছিলেন বগদানফ সায়েব— একটি আস্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল।

চোদ্দ

এক বৃদ্ধা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পালা-পর্বে নেমন্তন্ন পেলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তার পর বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তা হলে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম; সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সক্কলের কাছ থেকে একই গালাগাল, এতদিন ধরে বিয়ে দাওনি কেন?'

দেশ ভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না। যদি না দাও তবে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম, না, মন্দ করলুম। যদি দাও তবে লোকের গালাগাল নিশ্চিত খেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্তানের বেলা, কারণ অরক্ষণীয়া কন্যার যেরকম বিয়ে হয়নি, আফগানিস্তানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস পোঁতা আছে সে-দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ মহাভারতে। আফগানিস্তান গরিব দেশ, ইতিহাস গড়ার জন্য মাটি ভাঙবার ফুরসত আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলি মোন-জো-দড়ো বের করার জন্য নয়— কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি করার মতো পাণ্ডিত্য কাবুলির এখনও হয়নি— আমাদেরই কতটা হয়েছে কে জানে? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস-পাগলাদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস্য তারই মীমাংসা করতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়।

আফগানিস্তানের অর্বাচীন ইতিহাস নানা ফারসি পাণ্ডুলিপিতে এদেশে-ওদেশে, অন্তত চারখানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করছেন— মাহমুদ বাবুরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের পাঠান-তুর্কি-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য।

www.pathagar.com

কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় পণ্ডিত— আফগানের কথাই ওঠে না— কাবুল হিন্দুকুশ, বদখশান্ বলখ, মৈমানা হিরাতে ঘোরাঘুরি করেননি, কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উদ্ব্যস্ত হননি। অথচ এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্তানের ইতিহাস না লিখে ভারত-ইতিহাস লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠাণ্ডা রাখবার কোনও মধ্যমনারায়ণ নেই।

গোদের উপর আরেক বিষফোঁড়া— আফগানিস্তানের উত্তরভাগে অর্থাৎ বল্খ্-বদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমুদরিয়ার (গ্রিক অক্ষুস, সংস্কৃত বক্ষু) ওপারের তুর্কিস্তানের সঙ্গে, পশ্চিমভাগ অর্থাৎ হিরাত অঞ্চল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মিরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা যুগে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্তানের তুলনায় সুইটজারল্যান্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা— যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ে কারবার।

আর শেষ বিপদ, যে দু চারখানা কেতাব-পত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রামদা উঁচিয়ে আছেন। 'গান্ধার' লিখেই সেই রামদা— '?'— উঁচিয়েছেন অর্থাৎ 'গান্ধার কোথায়?' 'কাম্বোজ' বলেই সেই খঙ্গ— '?'— অর্থাৎ 'কাম্বোজ বলতে কী বোঝ?' 'কম্বুকণ্ঠী' বা 'কম্বুগ্রীব' বলতে বোঝায় যার গলায় শাঁখের গায়ের তিনটে দাগ কাটা রয়েছে— যেমনতর বুদ্ধের গলায়। কম্বোজ দেশ কি তবে গিরি-উপত্যকার কণ্ঠী-ঝোলানো দেশ আফগানিস্তান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্র-পারের দেশ বেলুচিস্তান? এমনকি দেশগুলোর নামের পর্যন্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন বল্খ্— কখনও বল্হিকা, কখনও বাল্হিকা, কখনও বাল্হীকা। সে কি তবে ফেরদৌসি উল্লিখিত বল্খ্— যেখানে জরথুস্ত্র রাজা গুশ্ৎআস্প্‌কে আবেস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? সেখান থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলিরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে? কারণ ওই দুয়ের নামই তো সংস্কৃতে বাল্হিকম্।

রাসেল বলেছেন, 'পণ্ডিতজন যে স্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন মূর্খ যেন তথায় ভাষণ না করে।'

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস— আমার মনে হয় ঠিক ওই জায়গাতেই তার কিছু বলার সুযোগ— পণ্ডিতরা তখন একজোট হতে পারেন না বলে সে বারোয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পণ্ডিতে-মূর্খে মিলে আফগানিস্তান সম্বন্ধে যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মোটামুটি তত্ত্ব এই—

আর্যজাতি আফগানিস্তান, খাইবারপাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল— পামির, দার্দিস্তান বা পৈশাচভূমি কাশ্মির হয়ে নয়। বোগাজ কো-ই বর্ণিত মিতানি রাজ্য ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগানি কিংবদন্তি যে আফগানরা ইহুদিদের অন্যতম পথভ্রষ্ট উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তি দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্র নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দেখেই বোধ করি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবতীরূপে কল্পনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের ষোলটি রাজ্যের নির্ঘণ্টে গান্ধার ও কাম্বোজের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতেরা সেই রামদা দেখান।

এ যুগে এবং তার পর বহুযুগ ধরে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে যেরকম কোনও সীমান্তরেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্যের মধ্যে কোনও সীমান্তভূমি ছিল না। বক্ষু বা আমুদরিয়ার উভয় পারের দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরানি সাহিত্যে তাকে আবার ইরানের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তার পর ইরানি রাজা সায়েরাস (কুরশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্তান দখল করে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিকন্দর শাহের সিন্ধুদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্তান ও পশ্চিম-সিন্ধু ইরানের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর-আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তাঁর সৈন্যদল খাইবারপাস হয়ে পেশাওয়ারে পৌঁছয়। খাইবার পেরোবার সময় সীমান্তের পার্বত্য জাতি পাহাড়ের চূড়াতে বসে সিকন্দরি সৈন্যদলকে এতই উদ্ব্যস্ত করেছিল যে গ্রিক সেনাপতি তাদের শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দরের সিন্ধুজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেরকম জোর দাগ কেটে গিয়েছে, তেমনি গ্রিক অধিকারের ফলে আফগানিস্তানও ভৌগোলিক আরিয়া, আরাখোসিয়া, গেদ্রোসিয়া, পারোপানিসোদাই ও দ্রাঙ্গিয়ানা অর্থাৎ হিরাত, বল্‌খ্‌, কাবুল, গজনি ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ নিতে আরম্ভ করে।

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষ দখল করে গ্রিকদের মুখোমুখি হন— ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বালহিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্তান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বেদ ও ইরানি আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে একদিকে যেমন বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়, অন্যদিকে তেমনি ইরানি ও গ্রিক ভাস্কর শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়স্তম্ভের মসৃণতা ইরানি ও তার রসবস্তু গ্রিক। সে-যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় কলার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার আকার দৃঢ়, গতি পঙ্কিল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মাধ্যন্তিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্তানে পাঠান। সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কি না বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্তানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। দুই শতাব্দীর ভিতরেই আফগানিস্তানের বহু গ্রিক সিথিয়ান ও তুর্ক বুদ্ধের শরণ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বেদ-আবেস্তার ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে।

www.pathagar.com

উত্তর-আফগানিস্তানের বল্খ্ প্রদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগের গ্রিক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বল্খ্ অঞ্চলের গ্রিকদের ভিতর অন্তঃকলহ্ সৃষ্টি হয় ও বল্খের গ্রিকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তার পর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদের একজন রাজা মেনান্দের (পালিধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্চহোর' রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (আধুনিক) করাচি পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্তান তথা পশ্চিম-ভারতের গ্রিক রাজাদের কোনও ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকের তৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে জানেন। কাবুল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেগ্রাম উপত্যকায় এঁদের তৈরি হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বৎসর মাটির তলা থেকে বেরোয়। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১২০ রাজ্যকালের ভিতর অন্তত ঊনত্রিশজন রাজা ও তিনজন রানির নামচিহ্নিত মুদ্রা এ-যাবৎ পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রিক ও খরোষ্ঠী এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রিক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজরানির নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজায় রাজায় বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কিন্তু আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারতের যোগসূত্র অটুট ছিল।

আবার দুর্যোগ উপস্থিত হল। আমুদরিয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়েচিদের হাতে পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে ফেলল। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দু দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে শকদ্বীপ ইরানিতে সকস্থান হয়। বর্বর শকেরা ইরানি, গ্রিক ও ভারতীয়দের সংস্রবে এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্তানের ইতিহাসে তারা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইন্দো-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্ধফারনেস্ নাকি যিশুখ্রিস্টের শিষ্য সেন্ট টমাসের হাতে খ্রিস্টান হন। কিন্তু এই সেন্ট টমাসের হাতেই নাকি আবিসিনিয়াবাসী হাবশিরাও খ্রিস্টান হয় ও এঁরই কাছে মালাবার ও তামিলনাড়ের হিন্দুরাও নাকি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েকমাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর সেন্ট টমাসের কবর দেখানো হয়। কাজেই আফগানিস্তানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার বোধকরি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কুষণ সম্রাটদের ইতিহাস ভারতে অজানা নয়। কুষণ-বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরানি পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্তান দখল করেন। কনিষ্ক পশ্চিমে ইরান সীমান্ত ও উত্তরে কাশগড় খোটান, ইয়ারকন্দ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরের কনিষ্ক যে স্তূপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহাস্থি রক্ষা করেন তার জন্য তিনি গ্রিক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে শিল্পী ভারতীয় গ্রিক না আফগান গ্রিক বলা কঠিন— দরকারও নেই— কারণ পশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে তখনও সংস্কৃতিগত কোনও পার্থক্য ছিল না।

যে স্তূপে কনিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। জলালাবাদে যে অসংখ্য স্তূপ এখনও খোলা হয়নি তারই একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তা হলে আফগান ঐতিহাসিকেরা(?) আশ্চর্য হবেন না। কনিষ্ককে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয় তা হলে তাঁকে আফগান রাজা বলতেও

www.pathagar.com

কোনও আপত্তি নেই। ধর্মের কথা এখানে অবান্তর— কনিষ্ক বৌদ্ধ হওয়ার বহুপূর্বেই আফগানিস্তান তথাগতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুষণ-রাজ্য পতনের পরও আফগানিস্তানে কিদার কুষণগণ দু শো বছর রাজত্ব করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রিক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার যৌবনমধ্যাহ্ন আফগানিস্তান ও পূর্ব-তুর্কিস্তানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে স্বপ্রকাশ। গুপ্তযুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী তার ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কখনও কখনও গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে— যেদিন বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখব সেদিন জানব যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা আর কখনও সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্তানের ভূগর্ভ থেকে যেমন গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বেরোবে, সঙ্গে সঙ্গে সেদেশের চারুকলার ইতিহাস লেখা হয়ে ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করাতে বাধ্য করবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত-সম্রাটদের সুশাসনে সনাতনধর্ম বৈষ্ণব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, আফগানিস্তান তখনও বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মতো গুপ্তরা আফগানিস্তান জয় করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আফগানিস্তানে পরবর্তী যুগের শক শাসনপতিগণ হীনবল। পঞ্চম শতকের চীন পর্যটক ফা-হিয়েন কাবুল খাইবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার সাহস করেননি, খুব সম্ভব আফগান সীমান্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরের অনেক কঠিন রাস্তা পামির কাশ্মির হয়ে ভারতবর্ষ পৌছান।

তার পর বর্বর হূণ অভিযান ঠেকাতে গিয়ে ইরানের রাজা ফিরোজ প্রাণ দেন। হূণ অভিযান আফগানিস্তানের বহু মঠ ধ্বংস করে ভারতবর্ষে পৌছয়— গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাদের যেসব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হূণ এবং আফগানদের সংমিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের সূত্রপাত।

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তাশকন্দ সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া অতিক্রম করে কাবুল পৌছন। কাবুল তখন কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ। ততদিন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পৌছেছিল। শান্ত ভারতবাসীই যখন বেশিদিন বৌদ্ধধর্ম সইতে পারল না তখন দুর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীবে দয়ার বাণী মেনে চলতে কষ্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার গজনি কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাঁদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্তানে এসে পৌছয় তখন সেদেশ কনিষ্কের বংশধর তুর্কি রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রাহ্মণ্য রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিন-লয়েস কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন— শেষ রাজা ত্রিলোচন পাল গজনির সুলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্তানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকি ইতিহাস কাশ্মিরে। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁদের বর্ণনা আছে।

www.pathagar.com

এখানে এসে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এক প্রকাণ্ড ঢেরা কাটেন। আমি পণ্ডিত নই, আমার মনে হয় তার কোনওই কারণ নেই। প্রথম আর্য অভিযানের সময়— কিংবা তারও পূর্ব থেকে— আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ নানা যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করেছে। যদি বলা হয় আফগানরা মুসলমান হয়ে গেল বলে তাদের অন্য ইতিহাস, তা হলে বলি, তারা একদিন অগ্নি-উপাসনা করেছিল, গ্রিক দেবদেবীর পূজা করেছিল, দেববিরোধী বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন দুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বুদ্ধের শরণ নিয়ে কাবুলি যখন মগধবাসী হয়নি তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্তান— বিশেষ করে কান্দাহার, গজনি, কাবুল, জলালাবাদ— বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বান্নু কোহাট এমনকি পাঞ্জাবও বাদ দিতে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায়? যদি কোনও পার্থক্য থাকে, তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ গজনির পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতিযুগে নানা ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি চোরাবালির উপর তো আর ইতিহাসের তাজমহল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বিরুনির কথা বাদ দেয়ার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বিরুনির নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবি, অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনও নেই), অল-বিরুনি ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনও মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কী করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকিক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বিরুনি ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন— প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় আফগানিস্তান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারশিকূহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবি ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি। এই বিংশ শতকেই কটি লোক সংস্কৃত-আরবি দুই-ই জানেন আঙুলে গুনে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান তুর্কি সম্রাটেরা আফগানিস্তানের দিকে ফিরেও তাকাননি, কিন্তু আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আলাউদ্দিন খিলজির সভাকবি আমির খুসরু ফারসিতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ শোনেননি, কিন্তু কাবুল-কান্দাহারে আজকের দিনেও তাঁর প্রতিপত্তি হাফিজ-সাদির চেয়ে কম নয়। 'ইশকিয়া' কাব্যে দেবলা দেবী ও খিজর খানের প্রেমের কাহিনী পড়েননি এমন শিক্ষিত মৌলবি আফগানিস্তানে আজও বিরল।

আফগানিস্তান— বিশেষ করে গজনির— দৌত্যে উত্তর-ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা তার সাহিত্যসম্পদ, বাইজনটাইন সেরাসিন ইরানি স্থাপত্য, ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি, ইউনানি ভেষজবিজ্ঞান, আরবি-ফারসি শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে, নতুন নতুন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। একদিন আফগানিস্তান গ্রিক ও ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে

www.pathagar.com

গান্ধার-কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান-তুর্কি যুগে সেই আফগানিস্তান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

তার পর তৈমুরের অভিযান।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নতুন শিল্পপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্তানের হিরাত অতি সহজেই তুর্কিস্তানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ-রুখ চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানিদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চারুকলার পত্তন করেন। তৈমুরের পুত্রবধূ গৌহর শাদ শিক্ষাদীক্ষায় রানি এলিজাবেথ, ক্যাথরিনের চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁর আপন অর্থে তৈরি মসজিদ-মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেননি। এখনও আফগানিস্তানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ওই হিরাতে— যে কয়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সত্ত্বেও এখনও বেঁচে আছে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় মধ্য-এশিয়ার সর্বকলাশিল্প কী আশ্চর্য প্রাণবলে সম্মিলিত হয়ে এই অনুর্বর দেশে কী অপূর্ব মরূদ্যান সৃষ্টি করেছিল।

অল-বিরুনির পর গৌহর শাদ, তার পর বাবুর বাদশাহ।

শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের নির্লজ্জ জাত্যাভিমানের চূড়ান্ত প্রকাশ হয় যখন সে বাবুরের আত্মজীবনী অপেক্ষা জুলিয়াস সিজারের আত্মজীবনীর বেশি প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবি থাক।

আফগানিস্তান ভ্রমণে যাবার সময় একখানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট— সেই বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কান্দাহার গজনি কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্তানের বিশেষ তফাত নেই।

বাবুর ফরগনার রাজা নন, আফগানিস্তানের শাহানশাহ নন, দিল্লির সম্রাটও নন। আত্মজীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এসবের অতীত অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্তানের নববর্ষার প্রথম দিনে তিনি আনন্দে অধীর, জলালাবাদের আখ খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ— সেই আখ আপন দেশ ফরগনায় পোঁতবার জন্য টবে করে হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে চালান করেছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাত থেকে গৌহর শাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলা টবে করে নিয়ে এসে দিল্লিতে পুঁতে ভাবছেন এবং ভবিষ্যৎ কী, এ তরু মঞ্জরিত হবে তো?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাবুর ভারতবর্ষ ভালোবাসেননি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে বুঝতে পেরেছিলেন, ফরগনা কাবুলের লোভে যে বিজয়ী বীর দিল্লির তখ্‌ৎ ত্যাগ করে সে মূর্খ। দিল্লিতে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাবুলে পাঠাবার হুকুম দিলেন মরবার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মতো কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব। নব মৌর্য সাম্রাজ্য।

নাদির উত্তর-ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্তানে নিহত হন। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালির (সাদদোজাই দুররানি) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ সালের সমস্ত আফগানিস্তান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৬১ সালে পানিপথ।

www.pathagar.com

১৭৯৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতোমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানের ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতের মানুষ দেখা দিল যে এই দুই দেশের কোনও দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এ যেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্তান জয় করে রাজ্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছে, আফগান সিংহাসনে আপন পুতুল বসিয়ে রুশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্তান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত, 'কাফির' ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোল্লার অজ্ঞতা তার পাহাড়েরই মতো উঁচু, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমির দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজকে দোস্তি দেখিয়েছিল। তার চরম সৌভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমির হবিবউল্লাকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারেননি।

কিন্তু তিন বারের বার বেল টাকে পড়ল। আমানউল্লা ইংরেজকে সামান্য উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধহয় কাবুলিরা বলে 'খুদা-দাদ' আফগানিস্তান অর্থাৎ 'বিধিদত্ত' আফগানিস্তান।

জিন্দাবাদ খুদা-দাদ আফগানিস্তান!

পনের

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসি। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম আবদুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে— জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।' অর্থাৎ ইনি 'হরফন-মৌলা' বা 'সকল কাজের কাজি'।

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনও-না-কোনও মন্ত্রীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান— দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম— ছ ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দু খানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসে আঙুলগুলো দু কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দু খানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমির আবদুর রহমান হত তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্তানের ভার বইতে পারত। একান ওকান জোড়া মুখ— হাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-থেবড়ো নাক— কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার প্রকার ঠাহর হল না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।

www.pathagar.com

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে দিয়ে আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে— কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াসকিট্।

চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথমদিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ওই কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনদের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্তানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মতো রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মতো আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনওদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনও একটা হদিসের সন্ধানে মগজ আতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান— হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দণ্ডেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ্ দ্য কুইজিন, ফাই-ফরমাশ-বরদার তিনেক্কেতিন হয়ে একরারনামা পেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম্, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

'জিগ্যেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। একমাস হল খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার?'

একগাল হাসল।

'কী কী বাঁধতে জানো?'

'পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা—।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরি করার কল আছে?'

'কিসের কল?'

আমি বললুম, 'তা হলে বরফ আসে কোত্থেকে?'

বলল, 'কেন, ওই পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানালা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বরফ আনতে ওই উঁচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড় বড় গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম, খবর-টবরও রাখে। বললুম, 'তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সবকিছু কিনে নিয়ে এস। রাত্তিরের রান্না আজ আর বোধহয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরের রান্না কর। সকালবেলা চা দিও।'

www.pathagar.com

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা— মৃদুমধুর ঠাণ্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছব। পথে দেখি এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিগ্যেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কী দরকার ছিল— একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হত।'

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে-মোট কাবুলে বইতে যাবে কে?

আমি বললুম, 'দু জনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকাণ্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-নুন-লাকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাত্রে বাড়িতেই খাবেন।' যেভাবে বলল, তাতে অচিন দেশের নির্জন রাস্তায় গাঁইগুঁই করা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে' বলে কী হবে ভালো করে না বুঝিয়ে হনহন করে কাবুলের দিকে চললুম।

খুব বেশি দূর যেতে হল না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি মসিয়ে জিরার টাঙ্গা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস্ হিসেবে আমাকে তিনি বেশ দু-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।'

বসকে খুশি করবার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্ধ তাঁরই পাশে বসে 'উই, সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ, অর্থাৎ অতি অবশ্য, সার্টেনলি, এভিডেন্টলি', বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলন্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট আঁতাত হয়েছিল; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি নিত্যি, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তম্বিতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে হুট করে বেরিয়ে গেল।

তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। দেখি আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা-টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আগা আবদুর রহমান এককালে মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন ক্কাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস— তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামিকাবাব। বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটি আস্ত মুরগি-রোস্ট।

www.pathagar.com

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভয়বাণী দিল— রান্নাঘরে আরও আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ জনের রান্না পরিবেশন করে বলে রান্নাঘরে আরও আছে তখন আর কী করার থাকে? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার ওপর অদ্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও ডাক্তারি কলেজের ছাত্র যেরকম হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেইরকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'ব্যস! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবদুর রহমান—।'

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে একথালা ফালুদা নিয়ে। আমি সবিনয় জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ডাবর নিয়ে— পেঁজা বরফের গুঁড়োয় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কী?'

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নিচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগেবালার বরফি আঙুর— তামাম আফগানিস্তানে মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘষে— মেয়েরা যেরকম আচারের জন্য কাগজি নেবু পাথরের শিলে ঘষেন। বুঝলুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলায়েম কায়দা। ওদিকে তালু আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলি তাই খাইবারপাসের হিম্মত বুকে সঞ্চয় করে গোটা আস্টেক গিললুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলি সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তার পর ওইরকম তৃতীয়, চতুর্থ— কাবুলিরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মতো।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দিই, না হলে আবার হয়তো কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়তো দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার একহাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে-সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

www.pathagar.com

একমুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা মিলিয়ে দেখ দিকিনি— তার থেকে আন্দাজ করতে পার না, আমার পক্ষে কী পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর?'

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট-বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

তার পর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গলানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনওদিন বেরোবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়— আতসবাজির হল্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই-বা কী করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তার পর জিগ্যেস করল, 'হুজুর কখনও পানশির গিয়েছেন?'

'সে আবার কোথায়?'

'উত্তর-আফগানিস্তান। আমার দেশ— সে কী জায়গা! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার ক্ষিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজি ঘোড়ার সঙ্গে বাজি রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের ওপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত-খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনও কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরোনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কী আরাম! লোহার বারকোশে আঙার জ্বালিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানালার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে— দু-দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ— কীরকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানালার কাছে বসে থাকব?'

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করুণভাবে তাকাল যে, মনে হল এরকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনও এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, 'একবার আসুন, জানালার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

খেই তুলে নিয়ে বলল, 'সে কতরকমের বরফ পড়ে। কখনও সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো, তারই ফাঁকে ফাঁকে আসমান-জমিন কিছু কিছু দেখা যায়। কখনও ঘুরঘট্টি ঘন,— চাদরের মতো নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনও বয় জোর বাতাস— প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায়— হু হু করে কখনও একমুখো হয়ে তাজি ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনও সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ— ওঁ— ওঁ— তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের এঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে ছ হাত উঁচু বরফের কম্বল— গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কম্বলের মতো ওম দেয়। তার তলায় মানুষকে দু দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে— সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরত্তি ধুলো নেই, বালু নেই, ময়লা নেই। ছুরির মতো ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘত ফুলে উঠবে— দম ফেলবেন এক বিঘত নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক-এক বছর আয়ু বাড়বে— এক-একবার দম ফেলাতে একশোটা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

'তখন ফিরে এসে, হুজুর একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন, তবে আমি আমার গোঁফ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আবদুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড় খুশির বাত হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশির জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।'

আবদুর রহমান ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাল।

আমি বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানালার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে?'

ষোল

শোকেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিগ্যেস করেছিল, জিনিসটা কোন কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেইরকম বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা পরে হাত ধোয়ার ভারি সুবিধে। হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ধোয়া হল।'

কুঁড়ে লোকের যদি কখনও শখ হয় সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ হয় তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা কাবুলের সংকীর্ণ উপত্যকায়। কারণ কাবুলে দেখবার মতো কোনও বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরবার পর যদি কোনও সবজান্তা আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'দেহ্-আফগানান যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিশেছে তার পিছনের ভাঙা মসজিদের মেহরাবের বাঁ-দিকে চেনমতিফে ঝোলানো মেডালিয়োনেতে আপনি পদ্মফুলের প্রভাব দেখেছেন?' তা হলে আপনি অম্লান বদনে বলতে পারেন 'না', কারণ ওরকম পুরনো কোনও মসজিদ কাবুলে নেই।

www.pathagar.com

তবু যদি সেই সবজান্তা ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারার আমির পালিয়ে আসার সময় যে ইরানি তসবিরের বান্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরিন-কলম ওস্তাদ বিহ্জাদের আঁকা সমরখন্দের পোলো খেলার ছবি দেখেছেন?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না', কারণ কাবুল শহরে ওরকম কোনও তসবিরের বান্ডিল নেই।

পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আস্তাবলে সিকন্দর শাহের ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেখানে এখন হয়তো বেগুন ফলছে। পণ্ডিতরা কম্পাস নিয়ে তার নিশানা লাগাতে পারলে আনন্দে বিহ্বল। কোথায় এক টুকরো পাথরে বুদ্ধের কোঁকড়া চুলের আড়াই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায় হাতের তেলোর মতো পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পণ্ডিত পঞ্চমুখ— পাড়া অতিষ্ঠ করে তোলেন। এঁদের কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণ পাঁচজনের কথা বলছি, যারা দিল্লি আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুকে চমক লাগাবার মতো রসবস্তু কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পৌঁছে কাউকে তুর্কিনাচের চর্কিবাজি খেতে হয় না। পাথরফাটা রোদ্দুরে শুধু পায়ে শান বাঁধানো ছ ফার্লোঙি চত্বর ঘষ্টাতে হয় না, নাকে-মুখে চামচিকে বাদুড়ের থাবড়া খেয়ে পঁচা বোটকা গন্ধে আধা ভিরমি গিয়ে মিনার-শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মতো দিব্যি হাত ধোওয়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মনোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধবের কেউ না কেউ কোনও-একটা বাগানে সমস্ত দিন কাটাবার জন্য একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই— হেঁটে, টাঙ্গায়, মোটরে যে-কোনও কৌশলে যাওয়া যায়।

তিন দিকে উঁচু দেওয়াল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাঁধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা পুকুরের মতো শান্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতির গাছ, নরগিস ফুলের চারা, আর ঘন সবুজ ঘাস। কার্পেট বানাবার অনুপ্রেরণা মানুষ নিশ্চয় এই ঘাসের থেকেই পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাসের উপর ইয়ার-বক্সি ভালো ভালো কার্পেট পেতে গাব্দাগোব্দা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবেন। পাঁচ মিনিট যেতে না-যেতে সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন।

দীর্ঘ তন্বঙ্গি চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন আস্বচ্ছ ফিরোজা আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবুল পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের হুটোপুটি। কিংবা দেখবেন হুটোপুটি নয়, একপাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশঙ্কর জয় করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কোমর বেঁধে প্ল্যানমাফিক একজন আরেকজনের পিছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চুড়ো পেরিয়ে ওদিকে চলে যাবার তাদের মতলব। ধীরে-সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা চড়ার পর কোনও এক অদৃশ্য নন্দীর ত্রিশূলে ঘা খেয়ে নেমে আসছে, আবার এগোচ্ছে, আবার ধাক্কা খাচ্ছে। তার পর আলাদা ট্যাকটিক চালাবার জন্য দু তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকুল এক হয়ে গিয়ে নতুন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেক দল মেঘের চূড়োয় পৌঁছতে পেরে খানিকটা মাথা দেখিয়ে এদের যেন লজ্জা দিয়ে আড়ালে ডুব মারবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সবকিছু ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে অতি ঊর্ধ্বে আপনারই মতো নীল গালচেয় শুয়ে একখানা টুকরো মেঘ অতি শান্ত নয়নে নিচের মেঘের গৌরীশঙ্কর-অভিযান দেখছে— আপনারই মতো। ওকে 'মেঘদূত' করে হিন্দুস্তান পাঠাবার

www.pathagar.com

যো নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুরশাহের আমল থেকে সে ওইখানে শুয়ে আছে, আর কোথাও যাবার মতলব নেই। পানশিরের আবদুর রহমান এরই কাছ থেকে চুপ করে বসে থাকার কায়দাটা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে না অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীষ্মের অন্তিম নিঃশ্বাস হয়, তবে তাতে আরও মেশানো আছে পাকা আপেল, অ্যাপ্রিকটের বাসি বাসি গন্ধ। তিন পাঁচিলের বন্ধ হাওয়াতে সে গন্ধ পচে গিয়ে মিষ্টি নেশার আমেজ লাগায়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে— তখন শুনতে পাবেন উপরের হাওয়ার দোলে তরুপল্লবের মর্মর আর নাম-না-জানা পাখির জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ত কূজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে কোর্মা-পোলাও রান্নার ভারি খুশবাই। চোখে তন্দ্রা, জিভে জল। দ্বন্দ্বের সমাধান হবে গুড়ুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিটখানেক ধরে তার প্রতিধ্বনি শুনে।

কাবুলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে বেলা বারোটার কামান দাগার শব্দ। সবাই আপন আপন ট্যাকঘড়ি খুলে দেখবেন— হাতঘড়ির রেওয়াজ কম— ঘড়ি ঠিক চলছে কি না। কাবুলে এ রেওয়াজ অলঙ্ঘনীয়। ঘড়ি না-বের করা স্নবের লক্ষণ— 'আহা যেন একমাত্র ওঁয়ার ঘড়িরই চেক-আপের দরকার নেই—'

'যাঁদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দেখাল না, তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। কাবুলের কামান নাকি ইহজন্মে কখনও ঠিক বারোটার সময় বাজেনি। কারও ঘড়ি যদি ঠিক বারোটা দেখাল তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগি-খুনি— ওঁদের ঘড়ির মতো বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্তির চোখেমুখে যে অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই তখন সে ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

মীর আসলম আরবি ছন্দে ফারসি বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে ভটচাযরা যেরকম সংস্কৃতের তেলে ডোবানো সপসপে বাংলা বলে থাকেন। আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'ভ্রাতঃ "চহার-মগ্জ্ শিকন" কী বস্তু তস্য সন্ধান করিয়াছ কি?'

আমি বললুম, 'চহার মানে "চার" আর "মগ্জ্" মানে "মগজ" "শিকস্তন" মানে টুকরো টুকরো করা।' অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ ভাঙা যায়, এই আরবি ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হবে আর কী?'

মীর আসলম বললেন, 'চহার-মগজ' মানে 'চতুর্মস্তিষ্ক' অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু যোগরূঢ়ার্থে ওই বস্তু আক্ষোট অথবা আখরোট। অতএব 'চহার-মগ্জ্-শিকন্' বলতে শক্ত লোহার হাতুড়ি বোঝায়।' তার পর দাগী ঘড়িওয়ালা প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয় বরাদরে আজিজে মন্, হে আমার প্রিয় ভ্রাতঃ যোগরূঢ়ার্থে ঘটিকাযন্ত্র অথচ ধর্মত কার্যত যে দ্রব্য 'চহার-মগজ্-শিকন' সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক অঙ্গরক্ষার আস্তরণ মধ্যে পরম প্রিয়তমার ন্যায় বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন? অপিচ পশ্য, পশ্য, অদূরে উদ্যানপ্রান্তে পরিচারকবৃন্দ উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে উপলখণ্ড দ্বারা অক্ষরোট ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হইতেছে। তোমার হৃদয় কি ওই উপলখণ্ডের ন্যায় কঠিন অথবা বজ্রাদপি কঠোর?'

www.pathagar.com

দাগী ঘড়ি রাখা এমনি ভয়ঙ্কর পাপ যে, প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যন্ত একটা জুতসই উত্তর দিতে পারলেন না। সাদামাটা কী একটা বিড়বিড় করলেন যার অর্থ 'এক মাঘে শীত যায় না।'

মীর আসলম বললেন, 'ওই সহস্র হস্ত উচ্চ পর্বতশিখর হইতে তথাকথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধূম্র উদগিরণ করে— কখনও কখনও তজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা দ্বিপ্রহরে তোপচী লক্ষ করিল যে, বিস্ফোরকচূর্ণের অনটন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তের অস্ত্রশালা হইতে প্রয়োজনীয় চূর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া আইসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দূরার্থে বিপণি মধ্যে প্রবেশ করত অষ্টাধিক পাত্র চৈনিক জুষ পান করিল, প্রয়োজনীয় ধূম্রচূর্ণ আহরণ করত পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। স্বীকার করি, অপ্রশস্ত দিবালোকেই সেইদিন নাগরিকবৃন্দ কামানধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতঃ সইফুল আলম, সেইদিনও কি তোমার "চহার-মগ্‌জ্‌-শিকন" কন্টকে কণ্টকে দ্বাদশ ঘটিকার লাঞ্ছন অঙ্কন করিয়াছিল?'

আমি বললুম, 'এরকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে— তাকে বলা হয়, "আঁব পাড়ার ঘড়ি।"

সইফুল আলম আর মীর আসলম ছাড়া সবাই জিগ্যেস করলেন 'আঁব' কী? সইফুল আলম বোম্বাই হয়ে প্যারিস যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মীর আসলম?

তিনিই বললেন, 'আম্র অতীব সুরসাল ভারতীয় ফলবিশেষ। দ্রাক্ষা আম্রের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্যা এ যাবৎ সমাধান করিতে পারি নাই।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'কিন্তু আপনি আম খেলেন কোথায়?'

মীর আসলম বললেন, 'চতুর্দশ বৎসরের হিন্দুস্তানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অদ্য তোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে হইল? কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ করিয়াছি তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত-আফগানিস্তানের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিব। উপস্থিত পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অনুগত ভৃত্য আবদুর রহমান খান তোমার মুখারবিন্দ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান।'

কী আপদ, এ আবার জুটল কোত্থেকে?

দেখি হাতে লুঙ্গি তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, 'খানা তৈরি হতে দেরি নেই, যদি গোসল করে নেন।'

ইয়ারদোস্তের দু চারজন ততক্ষণে বাঁধে নেমেছে। সবাই কাবুল-বাসিন্দা, সাঁতার জানেন না, জলে নামলেই পাথরবাটি। মাত্র একজন চতুর্দিকে হাত-পা ছুড়ে, বারিমন্থনে গোয়ালন্দি জাহাজকে হার মানিয়ে বিপুল কলরবে ওপারে পৌঁছে হাঁপাচ্ছেন। এপারে অফুরন্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরাট আত্মপ্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলিরা কখনও ডুব-সাঁতার দেখেনি।

ওই একটিবারই এপার-ওপার সাঁতার কেটেছিলুম। ওরকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাতদুপুরে পানাঠাসা এঁদো পুকুরেও হয় না। সেই দু মিনিট সাঁতার কাটার

www.pathagar.com

খেসারতি দিয়েছিলুম ঝাড়া একঘণ্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজিয়ে, সৰ্ব্বাঙ্গে অশথপাতার কাঁপন জাগিয়ে।

মীর আসলম অভয় দিয়ে বললেন, 'বরফগলা জলে নাইলে নিওমোনিয়ার ভয় নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মানসসরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কিসের?' কিন্তু বুঝতে পারলুম বন্ধু বিনায়ক রাও মসোজি মানসসরোবরে ডুব দেবার পর কেন তিন ঘণ্টা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি, কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মীর আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সক্কলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনও প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আবার না হয় ডুব-সাঁতার দেখাচ্ছি।'

সবাই 'হা, হা কর কী, কর কী', বলে ঠেকালেন। অবশ্য মৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের জান বাঁচানো অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

তিন টুকরো পাথর, বাগান থেকেই কুড়ানো শুকনো ডাল-পাতা আর দু চারটে হাঁড়িবাসন দিয়ে উত্তম রান্না করার কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলি রাঁধুনিতে কোনও তফাত নেই। বিশেষত মীর আসলম ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা পণ্ডিত। অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকার সময় ইনি রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর তদারকিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাফিজের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি সমস্ত বাগান নাক ডাকাচ্ছে— একমাত্র হুঁকোটা ছাড়া। তা আমরা যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে এক লহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয়নি। কিন্তু কাবুলি তামাক ভয়ঙ্কর তামাক— সাক্ষাৎ পেল্লাদ মারা গুলি। প্রহ্লাদকে হাতির পায়ের তলায়, পাহাড় থেকে ফেলে, পাষাণ চাপা দিয়ে মারা যায়নি, কিন্তু এ তামাকে তিনি দুটি দম দিলে আর দেখতে হত না। এ তামাক লোকে যত না খায়, তার চেয়ে বেশি কাশে। ঠাণ্ডা দেশ বলে আফগানিস্তানের তামাক জাতে ভালো, কিন্তু সে তামাককে মোয়ালেম করার জন্য চিটে-গুড়ের ব্যবহার কাবুলিরা জানে না, আর মিষ্টি-গরম ধিকিধিকি আগুনের জন্য টিকে বানাবার কায়দা তারা এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি।

পড়ন্ত রোদে দীর্ঘ তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগানজুড়ে ফালি ফালি দাগ কেটেছে। সবুজ কালোর ডোরাকাটা নাদুসনুদুস জেব্রার মতো বাগানখানা নিশ্চিন্দি মনে ঘুমোচ্ছে। নরগিস্ ফুল ফোটার তখনও অনেক দেরি, কিন্তু চারা-ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কল্পনা না সত্যি বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গন্ধ সেদিক থেকে ভেসে আসছে। রাত্তিরে যে খুশবাইয়ের মজলিস বসবে, তারই মোহড়ার সেতারে যেন অল্প অল্প পিড়িং পিড়িং মিঠা বোল ফুটে উঠছে। জলে ছাওয়ায়, মিঠে হাওয়ায়, সমস্ত বাগান সুধাশ্যামলিম, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার ফুট উঁচু কালো নেড়া পাথরের খাড়া পাহাড়। তাতে একফোঁটা জল নেই, একমুঠো ঘাস নেই। বুকে একরত্তি দয়া-মায়ার চিহ্ন নেই— যেন উলঙ্গ সাধক মাথায় মেঘের জটা বেঁধে কোনও-এক মন্বন্তরব্যাপী কঠোর সাধনায় মগ্ন।

পদপ্রান্তে গুলবাগের সবুজপরী কেঁদে কেঁদে কাবুল নদী ভরে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ফকিরের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাড়ি ফিরে কোনও কাজে মন গেল না। বিছানায় শুয়ে আবদুর রহমানকে বললুম, জানালা খুলে দিতে। দেখি পাহাড়ের চূড়ায় সপ্তর্ষি। 'আঃ' বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্ত দিন দেখেছি অজানা ফুল, অজানা গাছ, আধাচেনা মানুষ, আর অচেনার চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়দর্শন শুষ্ক কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তর্ষি দেখে সমস্ত দেহমন জুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্য কী এক আকুল আগ্রহের আঁকুবাঁকু ছড়িয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলুম, মা এশার নামাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন।

সতের

কাবুলে দুই নম্বরের দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরনো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, দু দিকে বুক-উঁচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মতো এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে। কোনও কোনও দোকানে বাক্সের ডালার মতো কব্জা লাগানো, রাত্রে তুলে দিয়ে দোকানের নিচের আধখানা বন্ধ করা যায়— অনেকটা ইংরেজিতে যাকে বলে 'পুটিঙ আপ দি শাটার'।

বুকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারও কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে-কোনও বাজারে শতকরা ত্রিশটা দোকান মুচির। পেশাওয়ারের পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশিরভাগ লোকেরই কাজ-কর্ম নেই— কোনও-একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানির সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুচি পয়জারে গোটা কয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়তো ভাবছেন যে, দোকানে বসলে কিছু-একটা কিনতে হয়। আদপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্য কাবুলি দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোনও দোকানে নেই। এমনকি কলকাতা থেকেও এই গদাইলস্করি চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিৎপুরের শালওয়ালা, বড় বাজারের আতরওয়ালা এখনও এই আরামদায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে।

সুখদুঃখের নানা কথা হবে— কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তি ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ঙ্কর ধূর্ত— তিন দিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি ব্রিটিশ লিগেশনে ঘন ঘন গতায়াত করেন কি না— ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান দূতাবাস অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যখন দোকানি জানতে পারে যে, আপনি হাই-পলিটিক্স নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাধুলা করেন না, তখন আপনাকে 'বাজার গপ্' বলতে তার আর বাধবে না। আর সে অপূর্ব গপ্— বল্‌শেভিক তুর্কিস্তানের স্ত্রী-স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের

www.pathagar.com

জানকীবাঈকে ছাড়িয়ে দিল্লির বড়লাটের বিবিসায়েবের বিনে পয়সার হীরাপান্না কেনা পর্যন্ত। সেসব গল্পে কতটা গাঁজা কতটা নিট ঠাহর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই 'বাজার গপ্' অতীব অপরিহার্য। মোগল ইতিহাসে পড়েছি, দিল্লিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে এককালে সমস্ত ভারতবর্ষ এমনকি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কিস্তান ইরান পর্যন্ত ভারতীয় হুণ্ডির তাঁবেতে ছিল। গুণীদের মুখে শুনেছি বাংলার রাজা জগৎশেঠের হুণ্ডি দেখলে বুখারার খান পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা ঢেলে দিতেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়তো দিল্লির শাহানশাহ আহমদাবাদের সুবেদারের (গভর্নর) ওপর বীতরাগ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারি করলেন— সে ফরমান আহমদাবাদ পৌঁছতে অন্তত দিন সাতেক লাগার কথা। ওদিকে সুবেদার হয়তো দু হাজার ঘোড়া কেনার জন্য আহমদাবাদি বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন— ফরমান পৌঁছলে সুবেদার পত্রপাঠ দিল্লি রওনা দেবেন। সে টাকাটা বের করতে বেনেদের তখন ভয়ঙ্কর বেগ পেতে হত— সুবেদার বাদশাহকে খুশি করে নতুন সুবা, নিদেনপক্ষে নতুন জায়গীর না পেলে সে টাকাটা একেবারেই মারা যেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যায়ই বেনেদের দিল্লির হৌস থেকে আপন ডাকের ঘোড়সওয়ার ছুটত আহমদাবাদে। সেখানকার বিচক্ষণ বেনে বাদশাহি ফরমান পৌঁছবার পূর্বেই সুবেদারের হিসাবে ঢেরা কেটে দিত— পাওনা টাকা যতটা পারত উশুল করত— নতুন ওভারড্রাফট কিছুতেই দিত না ও দরকার হলে দেবার দায় এড়াবার জন্য হঠাৎ পালিতাণায় 'তীর্থ-ভ্রমণে' চলে যেত। তিন দিন পর ফরমান পৌঁছলে পর সুবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে হঠাৎ ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতাণার কোন তীর্থ করতে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্তানে এখনও সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে কখন হিরাত অথবা বদখশান সুবার কোন কর্ণধারের কর্ণ কর্তন করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই 'বাজার গপের' ধারা কখন কোনদিকে চলে, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয়, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফিল্টার যদি আপনার থাকে, তবে সেই ঘোলাটে 'গপ্' থেকে খাঁটি-তত্ত্ব বের করে আর দশজনের চেয়ে বেশি মুনাফা করতে পারবেন।

আফগানিস্তানের ব্যাঙ্কিং এখনও বেশিরভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়তো ভুল, কারণ এদের প্রায় সকলেই আফগানিস্তানের প্রজা। এদের জীবনযাত্রার প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালাপর্ব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোনও গবেষণা করেননি।

আশ্চর্য বোধ হয়। মরা বোরোবোদুর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটোগ্রাফের বিশখানা হাজা-ভোঁতা প্রিন্ট দেখে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জ্যান্ত ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে বৃহত্তর ভারতের পাণ্ডাদের কোনও অনুসন্ধিৎসা, কোনও আত্মীয়তাবোধ নেই।

মৃত বোরোবোদুর গোত্রভুক্ত, জীবন্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাঙ্‌ক্তেয়, ব্রাত্য! ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না খেয়ে শুঁটকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখেন।

www.pathagar.com

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরিব, কিন্তু অনেক বেশি রঙিন। কম করে অন্তত পঁচিশটা জাতের লোক, আপন আপন বেশভূষা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজারা, উজবেগ (বাংলা উজবুক), কাফিরিস্তানি, কিজিলবাস (ভারতচন্দ্রে কিজিলবাসের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পর্দা'!) মঙ্গোল, কুর্দ— এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোব্বা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহূর্তে এদের দেশ, ব্যবসা, মুনাফার হার, কঞ্জুশ না দরাজ-হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এইসব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মাড়োয়ারি কিংবা পাঞ্জাবির সঙ্গে লেনদেন করার সময় কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালি নয়— দু পয়সা লাভ করার পর কোনও পক্ষই অন্য পক্ষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেলে ডেকে নেওয়ার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত।

স্বপ্নময় লোকযাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার করে একে অন্যকে আল্লারসুলের ডরভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশিরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙা ভাঙা ফারসিতে দরকসর করছে, বুখারার বড় কারবারি ধীরে গম্ভীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকি দিনটা ওইখানেই বেচাকেনা, চা-তামাক-পান আর আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন— তাঁর পিছনে চাকর হুঁকো-কল্কি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচ্চর-বোঝাই বিদেশি কার্পেট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়তো মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর রসুলেরও আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যখন ভয়ঙ্কর তাড়া নেই, তখন দাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক অকেজো ছেলে-মেয়ে ঘোরাঘুরি করছে— তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, 'ও বাচ্চা, চাওয়ালাকে বলত আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তার পর সেইসব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্রবিচিত্র নকশা, কী মোলায়েম স্পর্শসুখ। কার্পেট-শাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র— তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নকশা, মিলিয়ে সরেস-নিরেস মালের বাছ-বিচার হয়। বিশেষ রঙের নকশা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরি হয়— সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসি শাড়িতে এই ঐতিহ্য ছিল— আড়িবেল শাড়ির বিশেষ নকশা উৎকৃষ্ট রেশমেই হত— সে নকশায় নিরেস মাল দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিকে কাবুলের বাজারে কিনবার মতো তিনটে ভালো জিনিস আছে— কার্পেট, পুস্তিন আর সিল্ক। ছোটখাটো জিনিসের ভিতর ধাতু সামোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদবাকি বিলাতি আর জাপানি কলের তৈরি সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্তানে ঢুকেছে।

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরিব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ, ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমুদরিয়ার ওপারের মালে বাঁধ দিয়ে রাশানরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানিরা তাদের মাল সোজাসুজি ইংরেজ অথবা রাশানকে বিক্রি করে। কাবুলের

www.pathagar.com

পয়সা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আর সে পরিমাণে কিনতে পারে না— আমাদের রেশম মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মর মর, বেশিরভাগ ইংরেজ সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু জাতের ভিড়ে কান পেতে যেসব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন—

আরবি, ফারসি, তুর্কি, মোগলি, হিন্দি, আফগানি, পশাঈ, প্রাচী, গেবেরি, বেরেকি ও লাগমানি।

'প্রাচী' হল পূর্ব-ভারতবর্ষের ভাষা, অযোধ্যা অঞ্চলের পূরবিয়া— বাংলা ভাষা তারই আওতায় পড়ে।

যেসব দিন গেছে; তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কি না সন্দেহ।

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষপ্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নমাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মের ইস্তফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্যবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট পরে, বাবরি চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চত্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের দমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনি করে তীব্র কণ্ঠে আমুদরিয়া-পারের মঙ্গোল সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের দু পাশের বাবরি চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দু হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরি চুল দিয়ে জামা ঢেকে দেয়। কখনও কোমর দুভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনও দু হাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণি হাওয়ার চর্কিবাজি। সমস্তক্ষণ চক্কর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনও ইরানি কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুল আর নিঠুরা নিদয়া প্রিয়ার ছবি মনে মনে এঁকে নিচ্ছে।

আরেক কোণে পীর-দরবেশ চায়ের মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকাহিনী, মেশেদ-কারবালা, মক্কা-মদিনার তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে সবাই শুনছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের ওপর আল্লার করুণা হবে, মৌলা কবে তাদের মদিনায় ডেকে নিয়ে যাবেন, প্রাণ তো ওষ্ঠাগত—

লবোঁ পর হৈ দম আয় মুহম্মদ সমহালো,
মেরে মৌলা মুঝে মদিনে বোলা লো!

ঠোঁটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও মুহম্মদ,
হে প্রভু আমার ডাকো মদিনায়, ধরেছি তোমার পদ।

www.pathagar.com

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠরিতে কবির মজলিস। অজাতশ্মশ্রু সুনীল গুম্ফ, কাজল-চোখ, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তুলোট কাগজে লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাম মজলিশ একগলায় পদের পুনরাবৃত্তি করছে— মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাবা, আফরিন, শাবাশ বলে উচ্চকণ্ঠে কবির তারিফ করছে।

চার সর্দারজিতে মিলে একটা পুরনো গ্রামোফোনে নখের মতো পালিশ তিনখানা রেকর্ড ঘুরিয়ে বাজাচ্ছে—

হরিদি বোতলাঁ
ভরদি বোতলাঁ
পাঞ্জাবি বোতলাঁ
লাল বোতলাঁ

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত, শ্রবণেও অর্ধপান!

আর আসল মজলিশ বসেছে কুহিস্তানের তাজিকদের আড্ডায়। হেঁড়ে গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটিয়ে কোরাস গান,

আয় ফতু, জানে মা—
ফতুজান,
ফতুজান,
বর তু শওম কুরবা— া— া— ন।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব, অবস্থাভেদে— সম মেলাবার জন্য। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি নয়, তবু দরদ আছে,

ওগো ফতুজান,
তুঁহারি লাগিয়া দিল-জান দিয়া
হব আমি কুরবান!

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন,

— চেরা রফতি
হিচ ন্ গুফতি
দূর হিন্দুস্তান?

অর্থাৎ—

কেন গেলে
আমায় ফেলে
দূর হিন্দুস্তান?

সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলিতে যখন এ-প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার লোক-সঙ্গীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন অভিনব মম্মট? মথুরার সিংহাসন জয়, হিন্দুস্তানে রাইফেল ক্রয়, দুটোই বদখদ বেতালা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মথুরাজয়ের যুক্তির হাল যমুনায় পানি

www.pathagar.com

পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেননি। বল্‌হিকের বল্লভও তাই নীরব।

আঠার

কাবুলের সামাজিক জীবন তিন হিস্যায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখাদেখি নেই।

পয়লা শরিক খাস কাবুলি; সে-ও আবার দু ভাগে বিভক্ত— জানানা, মর্দনা, কাবুলি মেয়েরা কট্টর পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে নিকট-আত্মীয় ছাড়া, দেশি-বিদেশি আলাপ হওয়ার জো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার দু ভাগ— একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের মোল্লা সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো ফেরতা এবং তাঁদের ইয়ার-বক্সিতে মেশানো ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা তরুণ সম্প্রদায়। একে অন্যকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ দেখাদেখি বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেই বাপ মশাই, বেটা মসিয়ো।

দুসরা শরিফ ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সালের খেলাফত আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরগণ। এঁদের কেউ কেউ কাবুলি মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে এঁরা কিছু কিছু যোগাযোগ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন, রুশ ইত্যাদি রাজদূতাবাস। আফগানিস্তান ক্ষুদে গরিব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদূতের ভিড় লাগাবার কোনও অর্থনৈতিক কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিস্তর। ফরাসি ইতালি তুর্ক সব সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস, ইংরেজ-রুশের মোষের লড়াই একদিন না একদিন হয় খাইবারপাসে, নয় হিন্দুকুশে লাগবেই লাগবে। তাই দু দলের পাঁয়তারা কষার খবর সরেজমিন রাখার জন্য একগাদা রাজদূতাবাস।

তবু পয়লা শরিক আর দুসরা শরিকে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। দুসরা শরিকের অধিকাংশই হয় কারবারি, নয় মাস্টার প্রোফেসর। দু দলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও দুসরা-তেসরাতে কখনও কোনও অবস্থাতেই যোগাযোগ হতে পারে না।

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাই।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অবাধে গদায়াত করতেন। বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম দোস্ত মুহম্মদ খান— জাতে খাস পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয়ে শেকহ্যান্ড করে ইংরেজি কায়দায় জিগ্যেস করলেন, 'হাও ডু ইয়ু ডু?'

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাস্তায়। দূরের থেকে কাবুলি কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন, 'খুব হাস্তি, জোর হাস্তি', ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখামাত্র চিৎকার করে বললেন, 'বফরমাইদ বফরমাইদ (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক), কদমে তান মবারক (আপনার পদদ্বয় পূতপবিত্র হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর হোক), শানায়ে তান দরাজ (আপনার বক্ষস্কন্ধ বিশালতর হোক)—,

www.pathagar.com

তার পর আমার জন্য যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপালে এদেশের পুলিশ আমাকে জেলে দেবে।

আমি একটু থতমত খেয়ে বললুম, 'কী যা তা সব বলছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ চোখ পাকিয়ে তম্বিৎ লাগালেন, 'কেন বলব না? আলবৎ বলব, একশো বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরানি যে ভদ্রতা করে সবকিছু বলব, সত্যি কথাটি ছাড়া? আমি পাঠান— আমার ঘোড়ার লাগাম নেই, আমার জিভেরও লাগাম নেই।'

ঘরে বসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'বাড়িঘরদোর গুছিয়ে নিয়েছেন তো? চাকরবাকর? রুটি-গোশ্‌ত? কিছু যদি দরকার হয় আমাকে বলবেন। সব যোগাড় করে দিতে পারি— কাবুলের তখ্‌তটি ছাড়া। তাও পারি— কিন্তু একটা কি না, খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে। কিন্তু ওটায় নজর দিয়ে কোনও লাভ নেই। বড্ড শক্ত; আমি বসে দেখেছি।'

আমি বললুম, 'কাবুলের সিংহাসনে বসা সে শক্ত, যে তো আর গোপন কথা নয়।'

দোস্ত মুহম্মদ আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয় পেয়ে ভাবলুম বোধহয় বেফাঁস রসিকতা করে ফেলেছি। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদের উত্তর শুনে অভয় পেলুম। বললেন, 'আহা-হা-হা বাঁচালে দাদা। তোমার তা হলে রসকষ আছে। তোমার দেশের লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, বড্ড বেহুল্লোড়, বে-আড্ডা, বেরসিক। কী গম্ভীর মুখ! দেখে মনে হয় হিন্দুস্তান স্বাধীন করার দুর্ভাবনা যেন ওদেরই ঘাড়ে।'

অদ্ভুত লোক! অশ্লীল কথা বললেন রাস্তায় চেঁচিয়ে, চাকরবাকর বন্দোবস্ত করে দেবেন বললেন ঘরের ভিতর বসিয়ে ফিসফিস করে, রসিকতা শুনে যখন খুশি তখন মুখ হল গম্ভীর। ভাবলুম এবার যদি দুটো-একটা কটুবাক্য বলি তবে বোধহয় অট্টহাস্য করে উঠবেন।

ততক্ষণে তিনি একটা কুশনে মাথা দিয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়েছেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'কী খাবে? চা-রুটি, পোলাও-গোশ্‌ত, আঙুর-নাসপাতি? যা খুশি। বাজারে সব পাওয়া যায়। বাড়িতে কিছু নেই।'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'না, না, আছে, আছে। সিগারেট আছে। দাঁড়াও।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে গম্ভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিকে-ওদিকে তাকালেন। তার পর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সোফার পিছনে হাঁটু গেড়ে সোফা আর দেয়ালের মাঝখানের কার্পেট তুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলেন।

আমি তো অবাক। সামান্য সিগারেট; মদের বোতল নয়, প্যারিসের ছবি নয়, যে এত লুকিয়ে রাখবেন। আর কার কাছ থেকেই-বা এত লুকোনো?

শুনি দোস্ত মুহম্মদ করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছেন, 'ওরে ও হারামজাদা আগা আহমদ, তোকে আমি আজ খুন করব। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আয় ব্যাটা। ওরে নেমকহারাম, তোকে খুন করে, আজ আমি গাজি হব, ফাঁসি গিয়ে শহিদ হব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহ্‌! কী পাষণ্ড! দরজা বন্ধ করে, হুড়কো মেরে সিগারেট বের করি, লুকিয়ে রাখি যেন আলাউদ্দিনের পিদিম। তবু ব্যাটা সন্ধান পেয়েছে। আর কী বেহায়া বেশরম। দশটা সিগারেটই মেরে দিয়েছে। ওহ্‌!'

www.pathagar.com

ততক্ষণে আগা আহমদ দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। কারও দিকে না তাকিয়ে, দোস্ত মুহম্মদের কোনও কথায় সাড়া না দিয়ে সোজা সোফার পিছনে গিয়ে কার্পেটের তলায় আরও বেশিদূর হাত চালিয়ে আরেক প্যাকেট পুরো সিগারেট বের করে আমার হাতে দিল।

বেরোবার সময় দোরের গোড়ায় একবার দাঁড়াল। এক ঝলকের তরে দোস্ত মুহম্মদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খালি প্যাকেটটা আমার। লুকিয়ে রেখেছিলুম।

দোস্ত মুহম্মদের চোখের পাতা পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েশ! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গর্ভস্রাবটার! শুধু তাই, নিত্য নিত্য আমাকে বেকুব বানায়।'

তার পর মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আপন মনেই বললেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক, কামারের এক ঘা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর পাঁচ বছরের মাইনে তিনশো টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁধে করে একদিন পাহাড়ে উধাও হয়ে যাব; তখন যাদু টেরটি পাবেন।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তালা লাগান?'

তিনি বললেন, 'একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তালা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তালা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙবার চেষ্টা করে হার মানলুম। ততক্ষণে পাড়ার বারান্দায় হেলে দুলে আগা আহমদ এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাষণ্ড কী বলল জানো? "ও তালাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলুম তখন শুধু বলল, "কারও উপকার করতে গেলেই মার খেতে হয়।"

আমি বললুম, 'তালা তা হলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন।'

'কী হবে? আগা আহমদ আফ্রিদি, ওরা সব তালা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদি বাজি ফেলে আমির হবিবউল্লার নিচের থেকে বিছানার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তালা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামি রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।'

দোস্ত মুহম্মদ খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছ শো টাকা দিয়েছিল ওর জন্য দাঁও মতো একটা ভালো রাইফেল কেনার জন্য। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায় তবে আমি তার ভাইকে তক্ষুনি চিঠি লিখে পাঠাব, "তোমার ভ্রাতৃহস্তে রাইফেল পাঠাইলাম, প্রাপ্তি-সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবা।" তার পর দুই ভায়েতে—'

আমি বললুম, 'সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই।'

দোস্ত মুহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জন্য তারা লড়েছিল?'

আমি বললুম, 'না, সুন্দরীর জন্য।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তওবা! তওবা! স্ত্রীলোকের জন্য কখনও জব্বর লড়াই হয়? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্য। রাইফেল থাকলে সুন্দরীর স্বামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বন্দোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে হুরী পেলে, তুমিও সুন্দরী পেলে।'

www.pathagar.com

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেব না, লক্ষ করিনি যে, তুমি আমাকে আপনি বলছ আর আমি "তুমি" বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশিদিন চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্তানে আমাকে কেউ "আপনি" বলে না, ইস্তেক আগা আহ্মদ পর্যন্ত না।'

টাঙ্গায় চড়বার সময় 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কর্সিকা আর আফগানিস্তানে একইরকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি 'কলঁবা'।*

উনিশ

দিন দশেক পরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দোস্ত মুহম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলি কায়দায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো' বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলুম, দোস্ত মুহম্মদ কোনও সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কী সব বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলুম তাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলছেন, 'কমরত ব শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পুন্দি, ব তরকি' ইত্যাদি।

সরল বাংলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোর কোমর ভেঙে দু টুকরো হোক, খুদা তোর দু চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মতো হয়ে যা, তার পর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'

আমি কোনও গতিতে সামলে নিয়ে বললুম 'দোস্ত মুহম্মদ, কী সব আবোল-তাবোল বকছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে দুগালে দুটো বম্‌শেল চুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কক্ষনো আবোল-তাবোল বকিনে।'

আমি বললুম, 'তবে এসব কী?'

বললেন, 'এসব তোর বালাই কাটাবার জন্য। লক্ষ করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটে ভুসো মাখিয়ে দেয়। তোর কপালে তো আর ভুসো মাখাতে পারিনে— তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগাল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন? পরমায়ু বেড়ে যাবে। বুঝলি?'

লক্ষ করলুম গেলবার দোস্ত মুহম্মদ আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবারে সেটা 'তুই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফারসি ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্য নেই— আছে শুধু 'শোমা' আর 'তো'। কিন্তু ওই 'তো' দিয়ে 'তুমি' 'তুই' দুই-ই বোঝানো যায়— যেরকম ইংরেজিতে যখন বলি, 'ড্যাম ইউ, তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান,' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা।' খাঁটি পাঠান আবার 'শোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মতো শুধু ওই এক 'ইউ'ই জানে। বেদুইনের আরবিতেও মাত্র এক 'আনতা'। বোধহয় পাঠান, ইংরেজ বেদুইনের ডিমোক্র্যাসি তার সম্বোধনের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

* 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

www.pathagar.com

দোস্ত মুহম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন প্যারিসফেরতা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরি।

সিগারেট দিয়ে বললুম, 'খান।'

বললেন, 'না। আবদুর রহমানকে বল তামাক দিতে।'

আমি বললুম, 'আবদুর রহমানকে চেনেন তা হলে।'

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপু, তুমি তো দু দিনের চিড়িয়া। আমাকে কে চেনে বাপু, আমিও তিন দিনের পাখি— যে পাহাড় থেকে নেমে এসেছি, সে পাহাড়ের গর্ভে আবার ঢুকে যাব, আগা আহমদের টাকাটা মেরে। আমি কে? মকতবে আমানিয়ার অধ্যাপক অবশ্যি বটি, কিন্তু কটা লোক জানে। অথচ বাজারে গিয়ে পুছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হচ্ছি সেই মূর্খ, যার কাঁধে বন্দুক রেখে আগা আহমদ শিকার করে; অর্থাৎ আগা আহমদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আবদুর রহমান বন্দুক রেখেছে— শিকার করে কি না-করে পরে দেখা যাবে। চাকর দিয়ে মনিব চিনতে হয়।'

আমি বললুম, 'বেশক্, বেশক্।' তার পর বাংলায় বললুম, 'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

বললেন, 'বুঝিয়ে বল।'

তর্জমা শুনে দোস্ত মুহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বললেন, 'আফরিন, আফরিন, শাবাশ, শাবাশ, উম্‌দা কবিতা, জরির কলম।' তার পর মুখে মুখে শেষ লাইনের একটা অনুবাদও করে ফেললেন—

'মনে বুরুত, তনে বুরুত, বুরুত শনাক্তদার।'

তার পর বললেন, 'আমি আরবি, ফারসি, আর তুর্কি নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু ভালো রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পদ্যে তো প্রায় নেই-ই। বাংলায় বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র দু খানা কি আড়াইখানা বই।'

দোস্ত মুহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, 'তা হলে আর বাংলা শিখে কী হবে।'

পেশওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের দোস্ত মুহম্মদে একটা মিল দেখতে পেলুম— দুজনই অল্প রসিকতায় মুগ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাঁচজনের মতো, আর দোস্ত মুহম্মদের জীবন যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে রসিকতার সূর্যকিরণ পড়লেই রামধনুর রঙ মেখে নিচ্ছে। দু একবার মামুলি দুঃখকষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম সেসব কথা তার কানে যেন পৌঁছচ্ছেই না। বিলাসব্যসনেও শখ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ বোম্বাগড়ের সন্ধানে যেখানে রাজার পিসি পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, যেখানে পণ্ডিতেরা টাকের উপর ডাকের টিকিট আঁটেন।

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিশে গিয়ে কাবুল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝখানে আসন পেলুম, তখন দোস্ত মুহম্মদের জন্য দুঃখ হল। খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন আপন মনে বলে যাচ্ছেন। তাঁর দিকে একটু ঝুঁকতেই তিনি

www.pathagar.com

বললেন, 'ফয়েজ মুহম্মদের গুণে শিক্ষামন্ত্রীর নাম, না শিক্ষামন্ত্রীর পদের জোরে ফয়েজ মুহম্মদের নাম— মুহম্মদ তর্জির গুণে বিদেশি সচিবের নাম, না বিদেশি সচিবের পদের জোরে মুহম্মদ তর্জির নাম? বাঙালি কবি লাখ কথার এককথা বলেছে,

'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

আমি বললুম, 'চুপ, মন্ত্রীরা সব আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনতে পেলে আপনাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

বললেন, 'হ্যাঁ, তা বটে, বিশেষ করে ওই ফয়েজটা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহম্মদ খান, মিনিস্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন?'

উত্তর দিলেন, 'না মিনিস্টার অব পাবলিক ডিস্ট্রাকশন। কত ছেলের মগজ ডেস্ট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নতুন কী?'

আমি ভয় পেয়ে 'চুপ চুপ' বলে উজির সায়েবদের 'জ্ঞানগর্ভ' কথাবার্তায় কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মুহম্মদকে দোষ দেওয়া অন্যায়। অনেক ভেবেও কুল-কিনারা পাওয়া যায় না যে, এঁরা সব কোন গুণে মন্ত্রী হয়েছেন। লেখাপড়ায় এক-একজন যেন বিদ্যাসাগর। দুনিয়ার কোনও খবর রাখার চাড়ও কারও নেই। বেশিরভাগই একবার-দু বার ইয়োরোপ হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে দু একটা শক্ত ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সঙ্গে এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। ছোকরাদের মধ্যে যারা গালগল্পে যোগ দিল তারা তবু দু একটা পাস দিয়ে এসেছে, বড়দের যাঁরা অবজ্ঞা অবহেলা সত্ত্বেও মুখ খুললেন, তাঁদের কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে যে, আর কিছু না হোক, তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এই উজিরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাঁটতে— চলন যেন ব্যাঙের মতো, এলোপাতাড়ি, থপথপ। কাবুলের বহু জিনিস, বহু প্রতিষ্ঠান দেখে মনে দুঃখ হয়, কিন্তু এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে দেখে কনফুৎসিয়সের মতো বলতে হয়,

'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সংসারে প্রণিপাত।'

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন, 'একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের মোড়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।' দোস্ত মুহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিশ থেকে বেরিয়ে যেন দম ফেলে বাঁচলুম। দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসিদ— গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, গরগরা শুদম— আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

সত্যিকারের বিয়ের মজলিশে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি, জনবিশেক ছোকরা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আড্ডা জমাচ্ছে। একজন গামছা দিয়ে গ্রামোফোনটার মুখ গুঁজে সাউন্ড-বক্সের পাশে কান পেতে গান শুনছে। জন-তিনেক তাস খেলছে। বিদগ্ধ মোল্লা মীর আসলম এক কোণে কী একখানা বই পড়ছেন। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, অথবা ঘুমোচ্ছেন— মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, বরফের মতো সাদা দাড়ি আর কালো মিশমিশে জোব্বা। শান্ত মুখচ্ছবি— একপাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার পাল, ওই মীর আসলম

www.pathagar.com

আর সেতারওয়ালা বৃদ্ধ ছাড়া। মজলিশে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামি গালচে আর রঙিন তাকিয়া।

কেউ কেউ 'বফরমাইদ, আসতে আজ্ঞা হোক' বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এইখানে সোজা এলেই তো হত।'

তিনি বললেন, 'সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে নাভিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্রমোশন নদারদ। তা তুমি তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে উসখুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজির হবার আসল গুণ তোমার আছে— To sit among bores without being bored. কিন্তু খবরদার, সাবধানে পা ফেলে চল দাদা, নইলে রক্ষে নেই— দেখবে একদিন বলা নেই কওয়া নেই, ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে উজির বানিয়ে দিয়েছে।'

সইফুল আলম আমাকে আদর করে বসালেন।

তরুণদের আড্ডা যে উজিরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশি মনোরঞ্জক তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তর্জনী নেই বলে যা-খুশি করার অনুমতি আছে। এরা নির্ভয়ে পলিটিক্স পর্যন্ত আলোচনা করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কারও মুখে আর কোনও লাগাম থাকে না। কথাবার্তায় ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে এদের আসল তফাত এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্যের কোনও চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় তো এরা খোঁজেই না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আশা-ভরসা, তাও স্বপ্নগড়া পরীস্তান নয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে অচেতন এরকম জোয়ান আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরই একজন আর বসন্তে কী করে ট্রান্সফার হয়ে বদখশান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে কাবুল এসেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছ বার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে, কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। দুটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার সবকিছু। দলের সাতজনের মধ্যে দু জন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনও রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্রান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা অনেকটা 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেরোতে পারি দরকার হলে— ছাতা যে সঙ্গে নেবই সেরকম কথাও দিচ্ছিনে।' অর্থাৎ আগামী বসন্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

অথচ যখন বার্লিনে পড়াশুনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চারশো মার্ক খরচা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলা দেশেই যখন বিয়ের রান্না ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাবুলে যে বেশিরভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আশ্চর্য কী?

মীর আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞ্চিত শূল্যপক্ব অজমাংস ভক্ষণ কর। অভ্যন্তরিক উষ্মার জন্য ইহাই প্রশস্ততম।'

www.pathagar.com

তার পর দোস্ত মুহম্মদকে জিগ্যেস করলেন, 'কোনও জিনিসের অপ্রাচুর্য হয় নাই তো?' দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসিদ— গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে— গরগরা শুদম— আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

কোনও জিনিসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফারসি সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সেকথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারও চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশি ফেলবে, বাংলা দেশের এই সুসভ্য বর্বরতার সন্ধান আফগানরা এখনও পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমল ভালো করে। শুধু দোস্ত মুহম্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিশের পাঁচজনের সঙ্গে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়ে বাড়িতে হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনও ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রণয় যজ্ঞভস্মের মতো পূতপবিত্র হবার উপক্রম করেছে, তখন তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতারখানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার অদৃষ্ট অদ্য রজনীর তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হইল।'

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারও সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। 'পিড়িং' করে প্রথম আওয়াজ বেরুতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মতো অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃদু টঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত মুহম্মদও সোজা হয়ে উঠে বসলেন— যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে প্রহর গুনছিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বুড়োর গলা থেকে গুঞ্জরন ধ্বনি বেরুল— কিন্তু ভুল বললুম— গলা থেকে নয়, বুক, কলিজা থেকে, তার প্রতি লোমকূপ ছিন্ন করে যেন শব্দ সে শব্দ বেরুল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোনও ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষযামে এই প্রথম পরিপূর্ণতায় পৌঁছালেন।

ওস্তাদি বাজনা নয়— বুড়োর গলা থেকে যেন পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরোল, সেতারের আওয়াজ যেন তার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফারসি গজল। বুড়োর চোখ বন্ধ; শান্ত-প্রশান্ত মুখচ্ছবি, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ-অধরের মৃদু স্ফুরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গম্ভীর নিষ্কম্প গুঞ্জরন। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মতো সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কী, সেতারের গলায় মিশে গিয়েছে, যেন সন্ধ্যাবেলাকার নীল আকাশ সূর্যাস্তের লাল আবির মেখে নিয়ে ঘন বেগুনি থেকে আস্তে আস্তে গোলাপির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে— এরকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই

www.pathagar.com

প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল সূর্যাস্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি— সমুদ্র, বেলাভূমি, তরুপল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—'

'যদি এক রাত্রের তরে, মাত্র এক রাত্রের তরে, একবারের তরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিগ্যেস করতে যাচ্ছি, 'কী? কী? কী? এক রাতের তরে, একবারের তরে কী?' কিন্তু বলার উপায় নেই— দরকার নেই, গুণী কি জানেন না?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্'
'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই।'

প্রথমবার বললেন অতি শান্তকণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা সুরে, তার পর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাষা, 'পাবই পাব, নিশ্চয় পাব'।

গুণী গাইছেন, 'লবে ইয়ার', 'প্রিয়ার অধর' আর আমার বন্ধু চোখের সামনে কালোর মাঝখানে ফুটে ওঠে টকটকে লাল দুটি ঠোঁট, যখন শুনি 'বোসয়ে তলবম্' 'যদি একটি চুম্বন পাই', তখন চোখের সামনে থেকে সবকিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-আতুর হিয়ার আকুলি-বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়।

হুঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম।'

'তা হলে আমি জোয়ান হব— একটি মাত্র চুম্বন পেলে যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তাণ্ডব-নৃত্যে ভরে উঠল— দেখি শঙ্কর যেন তপস্যাশেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার— 'জোয়ান শওম' 'জোয়ান শওম'। কোথায় বৃদ্ধ সেতারের ওস্তাদ— দেখি সেই জোয়ান মঙ্গোল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটছে, আর দু হাত মেলে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনে ছুড়ে কালো বাবরি চুলের আবর্তের ঘূর্ণি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। শুনি সঙ্গীততরঙ্গের কলকল্লোল জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সন্তান-নবীন প্রাণ নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাসধ্বনি করে উঠছে।

কিন্তু গুণী, যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে— অথচ কবিতার পদ যে এখনও অগ্রগামী—

'শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্
জোয়াম শওম—'
আজ এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই
জোয়ান হইব—

তার পর, তার পর কী?

www.pathagar.com

শুনি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে অদ্ভুত শপথ গ্রহণ—

'জসেরো জিন্দেগি দুবারা কুনম্'

'এই জীবন তা হলে আবার দোহারাতে, দু বার করতে রাজি আছি। একটি চুম্বন দাও, তা হলে আবার সেই অসীম বিরহের তপ্ত দীর্ঘ অন্তবিহীন পথ ক্ষত-বিক্ষত রক্তসিক্ত পদে অতিক্রম করবার শক্তি পাব। আসুক না আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহেলার কঠোর কঠিন দাহ!'

আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,

— 'জসেরো জিন্দেগি দুবারা কনম্!'

'গোড়া হতে তবে এ-জীবন দোহরাই।'

আমি মনে মনে মাথা নিচু করে বললুম, 'ক্ষমা কর গুণী, ক্ষমা কর কবি। শিখরে পৌঁছে উদ্ধত প্রশ্ন করেছিলাম, পদ এখনও অগ্রগামী, যাব কোথায়। তুমি যে আমাকে হঠাৎ সেখান থেকে শূন্যে তুলে নিতে পার, তোমার গানের পরী যে আমাকেও নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে, তার কল্পনাও যে করতে পারিনি।'

বারে বারে ঘুরে-ফিরে গুণীর আকুতি-কাকুতি 'শবি আগর', 'যদি এক রাতের তরে' আর সেই দৃঢ় শপথ 'জিন্দেগি দুবারা কুনম', 'এ জীবন দোহরাই'— গানের বাদবাকি এই দুই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে স্বপ্রকাশ হচ্ছে। কখনও শুনি 'শবি আগর' কখনও শুধু 'দুবারা কুনম্'— 'শবি আগর', 'দুবারা কুনম'।

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পুবের আকাশ অনেকক্ষণ ধরে লাল রঙ ছাড়ে না— কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনে। হঠাৎ ভোরের আজান কানে গেল, 'আল্লাহু আকবর,' 'খুদাতালা মহান' মাভৈ, মাভৈ, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

'ওয়া লাল আখিরাতু খাইরুল লাকা মিনাল্ উলা।'

'অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে তো ভবিষ্যৎ।'*

চোখ মেলে দেখি কবি নেই। মোল্লা মীর আসলম পাথরের মতো বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

কুড়ি

দরজা খাঁ খাঁ করছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর অ্যাটাচিকেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'বোরো, গুমশো'— 'বেরিয়ে যা, পালা এখান থেকে।'

দোস্ত মুহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, 'জিনিসপত্র সব কী হল? আগা আহমদ যে ভারী ভারী টেবিল চেয়ার, কোচ সোফা পর্যন্ত সরাবে ততটা আঁচ করতে পারিনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বিড়বিড় করে বললেন, 'সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কাবুল থেকে প্যারিস পর্যন্ত।'

---

* কুরান শরীফ ৯৩, ৪।

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'বড় অন্যায় কথা। চুরি করল আগা আহমদ, দোষ ছড়ালো প্যারিস পর্যন্ত।'

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পিছনে আমি রাইফেল কাঁধে করে বেরোতুম না? না বেরুলে আফ্রিদি সমাজে আমার জাত-ইজ্জত থাকত? নিয়েছে ব্যাটা লাফোঁ?

'সে আবার কে?'

'পরশু এসে পৌঁছেছে, ফরাসি অধ্যাপক। লব্-ই-দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে— বেশ বাড়িখানা। আফগান সরকারের যত আদিখ্যেতা-আত্তি সব বিদেশিদের জন্য।'

আমি বললুম, 'চোর কে, তার সাকিন-ঠিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার—'

বললেন, 'আইনে দেয় না— বেচারি দুঃখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না। আমি বললুম আমার বাড়িতে বিস্তর আছে— ফরাসি জান তো, বুক দ্য ম্যোবল, ফুল দ্য ম্যোবল, তা দ্য ম্যোবল, ব্যাটাকে দেখিয়ে দিলুম 'বিস্তর মাল' কত বিচিত্র কায়দায় ফরাসিতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা দুসরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মতো কচুকাটা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিব্যি সবকিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল।'

দোস্ত মুহম্মদ আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা তওবা, নিজে এলে কি আর সব নিয়ে যেত— দেখত না ভিটেতে কবুতর চরার মতো অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছ, এখন মরো হিমে শুয়ে—'

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরিয়ে বললেন, 'বলিনি বলিনি, তখন বলিনি, পারবিনি রে, পারবিনি— তোকে "আপনি" বলা ছাড়তেই হবে।' কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস— ঝাড়া পনেরো দিন "আপনি" চালিয়েছিস।'

আমি বললুম, 'বেশ বেশ। কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছ তখন দুনিয়াসুদ্ধ লোককে চোর-চামার বলে কটু-কাটব্য করছিলে কেন?'

'কাউকে বলবিনে, শুনেই ভুলে যাবি? তবে বলি শোন। তুই যখন ঘরে ঢুকলি তখন দেখলুম তোর মুখ বড্ড ভার। হয়তো দেশের কথা ভাবছিলি, নয় কাল রাত্তিরে গানের খোয়ারি কাটিয়ে উঠতে পারিসনি— কেন যে ক্ষ্যাপারা এরকম ভুতুড়ে গান গায়? তা সে যাক্‌গে। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড্ড বেজার। তাই যা-তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে সবকথা ভুলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা।'

আমি বললুম, 'খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। তোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আর তুমি বেকুব বানালে আমাকে। তা নতুন কিছু নয়— আমাদের দেশে একটা দোঁহা আছে—

> 'শমনদমন রাবণ আর রাবণদমন রাম,
> শ্বশুরদমন শাশুড়ি আর শাশুড়িদমন হাম্।'

ঢিলে গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ নবীনের মতো, 'যাহা পায় তাহাই খায়,' মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাট তো অন্তত কেনো, মাটিতে শোবে নাকি?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোনো; বিলিতি আসবাবপত্রে

www.pathagar.com

আমি কখনও আরাম বোধ করিনি— দশ বৎসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন সুযোগ মিলল তখন নতুন করে জঞ্জাল জুটোব কেন? এইবার আরাম করে পাঠানি কায়দায় ঘরময় মই চষে বেড়াব— খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কমরত ন শিকনদ', তোমার কোমর ভেঙে দু টুকরো না হোক।'

কথা ছিল দু জনে একসঙ্গে বগদানফ সায়েবের বাড়ি যাব।

পূর্বেই বলেছি ফরাসি দূতাবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশি মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি একপাল সায়েব মেম।

আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানফ সায়েব চোস্ত ফরাসি ভাষায় দুরুস্ত ফরাসি কায়দায় বললেন, 'পেরমেতে মওয়া ল্য প্লেজির দ্য ভূ প্রেজাঁতে— অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সামনে অমুককে নিবেদন করে বিমলানন্দ উপভোগ করি।'

তার পর এক-একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি বলি, 'হাডুডু', তাঁদের কেউ বলেন, 'আঁশাঁতে', কেউ বলেন 'শার্মে', কেউ বলেন 'রাভি'। অর্থাৎ আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ হয়েছেন enchanted কেউ charmed কেউ-বা ravished! একেই বলে ফরাসি ভদ্রতা। এঁরা যখন গ্রেতা গার্বো বা মার্লেনে দিতরিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন কী বলেন তার সন্ধান এখনও পাইনি।

মসিয়ে লাফোঁ গল্পের ছেঁড়া সুতোর খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'তার পর বাদশা আমায় জিগ্যেস করলেন, 'ফরাসি শিখতে ছ মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়।' আমি বললুম, 'না হুজুর, অন্তত দু বছর লাগার কথা।'

বগদানফ সায়েব বললেন, 'করেছেন কী? বাদশাহের কোনও কথায় না বলতে আছে? দিবা-দ্বিপ্রহরে, প্রখর রৌদ্রালোকে যদি হুজুর বলেন "পশ্য, পশ্য, নীলাম্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কী প্রকারে শ্বেতচন্দ্র প্রলেপ করেছেন।" আপনি তখন প্রথম বলবেন, "হুজুরের যে পূতপবিত্র পদদ্বয় অনাদি কাল থেকে অসীম কাল পর্যন্ত মণি-মাণিক্যবিজড়িত সিংহাসনে বিরাজমান এ গোলাম এই পদরজস্পর্শ লাভের আশায় কুরবানি হতে প্রস্তুত।" তার পর বলবেন— '

বাধা দিয়ে মাদাম লাফোঁ বললেন, 'সম্পূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণের যদি ভুলচুক হয়ে যায়? দৈর্ঘ্য তো কিছু কম নয়।'

বগদানফ সায়েব সদয় হাসি হেসে বললেন, 'অল্প-স্বল্প রদবদল হলে আপত্তি নেই। "মণি-মাণিক্যের" বদলে "হীরা-জওহর" বলতে পারেন, "পদরজে"র পরিবর্তে "পদধূলি" বললেও বাধবে না।'

'তার পর বলবেন, "হুজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি— চন্দ্রমা সত্যই কী অপূর্ব বেশ ধারণ করেছেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলী কতই-না নয়নাভিরাম।'

ইতালির সিন্নোরা দিগাদো জিগ্যেস করলেন, 'তবে কি ভদ্রতা বজায় রেখে হুজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনও উপায়ই নেই? এই মনে করুন মসিয়ো লাফোঁ যদি সত্যি সত্যি জানাতে চান যে, ফরাসি শিখতে দু বছর লাগে?'

www.pathagar.com

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, বাদশা যখন বলবেন ছ মাস, আপনি তখন বলবেন, "নিশ্চয়ই, হুজুর, ছ মাসেই হয়। দু বছরে আরো ভালো হয়।" হুজুরেরও তো কাণ্ডজ্ঞান আছে। আপনার ভদ্রতাসৌজন্যের আতর তিনি শুঁকবেন, গায়ে মাখবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।'

মসিয়ো লাফোঁ বললেন, 'এসব বাড়াবাড়ি।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই; বাড়াবাড়িরই আরেক নাম superfluity। আর পোয়েট টেগোর— আমাদের তিনি গুরুদেব— ' বলেই তিনি প্রোফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন— 'তিনি বলেন, 'আর্টের সৃষ্টি হয়েছে সুপারফ্লুয়িটি থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, কথাটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে কী একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না?'

আমি বললুম, 'কাঠের ডাণ্ডা লাগানো টিনের কেনেস্তারায় করে রাধু মালির নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্রবিচিত্রিত মৃৎপাত্র ভরে ষোড়শী তন্বঙ্গী সুন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপারফ্লুয়িটির তফাত, তাই আর্ট।'

বগদানফ সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আর্ট? দর্শন, বিজ্ঞান, সবকিছু— কলচর বলতে যা কিছু বুঝি। সবই সুপারফ্লুয়িটি থেকে, বাড়াবাড়ি থেকে।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসাঁ বললেন, 'কিন্তু এই কলচর যখন চরমে পৌঁছয় তখন গুরুচণ্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশের সব শ্রেণি এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হারায়। যেমন ইরান।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ।'

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'কিন্তু ইংরেজ? তারা তো সভ্য, তাদের গুরুচণ্ডালেরও তফাত অনেক, কিন্তু তারা তো সবসময় এক হয়ে লড়তে পারে।'

বগদানফ জিগ্যেস করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম?'

'ইংরেজের।'

'ওই যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে?'

মজলিশে ইংরেজ কেউ ছিল না। সবাই ভারি খুশি। আমি মনে মনে বললুম, আমাদের দেশেও বলে "চরুয়া"।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসাঁ বললেন, 'বগদানফ ঠিকই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভিতর অনেক খানদানি বংশ আছে সত্যি কিন্তু গুরুচণ্ডালে যে বৈদগ্ধ্যের পার্থক্য হবে, সে কোথায়? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সঙ্গীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থাপত্য নেই। শ্রেণিতে শ্রেণিতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায়? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রচুর; তাই দেখুন ফরাসিরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শান্তির সময় রাজ্য পর্যন্ত চালাতে পারে না। যে-দেশে আছি তার নিন্দে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, একফোঁটা দেশ অথচ স্বাধীন।'

মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'এ দেশেও তো মোল্লা আছে।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিছু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশিরভাগ যেটুকু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেটুকু আমি তিন দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মেয়েদের মোল্লা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

www.pathagar.com

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই?'

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাড়ি গজায় না বলে।'

ভ্যাঁসাঁ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মোল্লাই হন আর যাই হন, এদেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে সে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকতে হত। আমাদের ক্ষেতিটা বিবেচনা করুন।'

সবাই একবাক্যে

'Oui Madame

Si, si, Madame,

Certainement, Madame.'

কোরাস সমাপ্ত হলে দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পর্দা-প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলোয়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মুহম্মদের মুণ্ডুটা গড়িয়ে গড়িয়ে আফ্রিদি মুল্লুকের দিকে চলেছে।

নাঃ! কল্পনা। শুনি দোস্ত মুহম্মদ বলছেন, 'ধর্মত বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরভচিয়েভিচি, মাদাম লাফোঁ, সিন্নোরা দিগাদোর মতো সুন্দরী সংসারে কয়টি? বেশিরভাগই তো কুচ্ছিত। পাইকারি পর্দা চালালে তা হলে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি নয় কি?'

মহিলারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরভচিয়েভিচি পোলিশ— উষ্ণ রক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর পুরুষদের সবাই বুঝি খাপসুরত অ্যাডনিস? তারাই-বা বোরকা পরে না কেন, শুনি?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষদের দিকে মেয়েদের তাকানো বারণ।'

মজলিশে হট্টগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশি হলেন না ব্যাজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিন্নোরা দিগাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি?'

দোস্ত মুহম্মদ একটুখানি হাঁ করে বাঁ হাত দিয়ে ডানদিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, কোনও-একটি সুন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে, আমার মতে দুনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুচ্ছিত। একটি সুন্দরীর জন্য দুনিয়ার সব মেয়েকে এরকম বে-ইজ্জত করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

সবাই খুশি। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ি আফগান বিদগ্ধ ভ্যাঁসাঁকে শিভালরিতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরানি রাজদূতাবাসের আগা আদিব এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, বললেন, 'তবেই আফগানিস্তানের হয়েছে। ইরানি কায়দায় নকল করে আফগানিস্তানেরও কপাল ভাঙবে। ইরান কিন্তু ইতোমধ্যে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে। শাহ্-বাদশাহের সঙ্গে কথা বলবার যেসব কায়দা বগদানফ সায়েবে বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগেই ইরানে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সবরকম এটিকেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জোর আন্দোলন আর ঠাট্টামশকরা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্য ভদ্রতা একে অন্যকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কবিতা লেখা হয়। শুনে শুনে একটা তো আমারই মুখস্থ্ হয়ে গিয়েছে; আপনারা শোনেন তো বলি।'

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলেন।

আগা আদিব বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে গেলেন—

'খুদা তুমি দিলে বহুত জ্ঞান,
শেষ রহস্য এই বারেতে কর সমাধান।
ইরান দেশের লোক
কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক্।
বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, সাহস আছে ঢের
সিঙ্গি লড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।
তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে
সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে?
দোরের গোড়ায় চমকে দাঁড়ায় ভিতর পানে চায়,
'আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন' দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।
হাসি-খুশি বন্ধ হঠাৎ গল্প যে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে উঠছে সবাই ঘেমে।
অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিবা-দ্বিপ্রহরে
কী করে হয় ঘরের মাঝে ভূত?
তবে কি যমদূত?
সলমনের জিন্?
কিংবা গিলটিন?
ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা।
তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা?'

একুশ

কাবুলের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজিরনাজির, গুরুচণ্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যেসব অদৃশ্য শক্তি শান্তির সময় মন্দ গতিতে এবং বিদ্রোহবিপ্লবের সময় দুর্বার বেগে চলে সেগুলোর তাল ধরা বুঝলুম আরও শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্তানের মেরুদণ্ড তৈরি হয়েছে জনপদবাসী আফগান উপজাতিদের নিয়ে, অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা, অভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনও কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলে এমন কোনও গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে-সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করুন আর নাই করুন, অন্তত একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলিরা প্রায়ই বলেন, 'তার পর শিনওয়ারিরা বিদ্রোহ করল', কিন্তু যদি তখন প্রশ্ন করেন, বিদ্রোহ করল কেন, তবে উত্তর পাবেন, 'মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে', কিন্তু তার পরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতিদের ভিতরে এমন কোন

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল, তা হলে আর কোনও উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক— তিনিও ভারতীয়— আমাকে বলেছিলেন, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশের পণ্যবাহিনী লুটতরাজ না করলে গরিব আফগানের চলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড-সাইক্লের মতো তাদেরও বিপ্লব আর শান্তির চড়াই-উতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।'

গ্রামের অবস্থা যেটুকু শুনতে পেলুম তার থেকে মনে হল শান্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল, তরকারি, দুম্বা, ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামান্য যে দু একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আক্রা দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা বাদবাকির বদলে গ্রামের জন্য ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারি কোনও প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলি ছেলে সকালবেলা গাঁয়ের মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আমপারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে— এই হল বিদ্যাচর্চা। তাদের তদারক করনেওয়ালা মোল্লাই গাঁয়ের ডাক্তার। অসুখ-বিসুখে তাবিজ-কবচ তিনিই লিখে দেন। ব্যামো শক্ত হলে পানি-পড়ার বন্দোবস্ত, আর মরে গেলে তিনিই তাকে নাইয়ে ধুইয়ে গোর দেন। মোল্লাকে পোষে গাঁয়ের লোক।

খাজনা দিয়ে তার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরত পায় না তখন যে সে বড় অনিচ্ছায় সরকারকে টাকাটা দেয় একথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান-গাঁয়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয় না— বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জোয়ানরা তখন লুটে বেরোয়— 'বিধিদত্ত' আফগানিস্তানের অশান্তিও বিধিদত্ত, সেই হিড়িকে দু পয়সা কামাতে আপত্তি কী? ফ্রান্স-জর্মনিতে লড়াই লাগলে যেরকম জর্মনরা মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, 'নাখ্ পারিজ, নাখ্ পারিজ', 'প্যারিস চল, প্যারিস চল', আফগানরা তেমনি বলে, 'বি আ ব কাবুল, ব রত্তম্ ব কাবুল', 'কাবুল চল, কাবুল চল।'

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির লুণ্ঠন-লিপ্সাকে দমন করে রাখা। তার জন্য সৈন্য দরকার, সৈন্যকে মাইনে দিতে হয়, গোলাগুলির খরচা তো আছেই। শহরের লোক তার খানিকটা যোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গাঁ থেকে।

তাই এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলার জন্য সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্য খাজনার দরকার। এ চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্তানের বাদশা। তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নেই; যে আফগানের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্য তিনি শিলনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে পয়সা আদায় করে নেন।

ঘানি থেকে যে তেল বেরোয়, ঘানি সচল রাখার জন্য সেটুকু ওই ঘানিতেই ঢেলে দিতে হয়।

সামান্য যেটুকু বাঁচে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জৌলুশ।

কিন্তু সে এতই কম যে, তা দিয়ে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার জন্য ব্যাপক কোনও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বললেও চলে।

www.pathagar.com

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর একথা বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষ-আফগানিস্তানের যোগাযোগের ভগ্নাবশেষ।

কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারি ভাষা ফারসি, কাজেই সাধারণ বিদেশির মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শিয়া মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায় সুন্নি আফগানিস্তান শিক্ষাদীক্ষা পাওয়ার জন্য ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরিব, আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মতো সামর্থ্যও তার কোনও কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোগল যুগে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দিল্লি লাহোরে ইসলাম ধর্মের সুন্নি শাখার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ফারসি; কাজেই দলে দলে কাবুল কান্দাহারের ধর্মজ্ঞানপিপাসু ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; পূর্ববর্তী যুগে কাবুলিরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তক্ষশীলায় আসত— আফগানিস্তানে যেসব প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজন্তার ঐতিহ্যে আঁকা, চীন বা ইরানের প্রভাব তাতে নগণ্য।

এই ঐতিহ্য এখনও লোপ পায়নি। কাবুলের উচ্চশিক্ষিত মৌলবিমাত্রই ভারতে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রাবস্থায় ফারসির মাধ্যমে এদেশে জ্ঞানচর্চা করে গিয়েছে, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ উর্দু ভাষাও শিখে নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের ওপর এঁদের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁরা নাকি সর্বপ্রকার প্রগতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সবসময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের সুখদুঃখে মেশানো, পতন-অভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশ কুসুমজাত সত্যযুগের শাস্ত্রীয় অচলায়তনের অন্ধ-প্রাচীর নিরুদ্ধ।

তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্ব ধর্ম-যাজক সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাইলে অন্যায় করা হবে।

সে সাফাই তুলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবি-মোল্লা, শাস্ত্রী-ভটচায। কিন্তু এঁরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেননি অথচ আফগান মোল্লার কট্টর দুশমনও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইংরেজকে তিন-তিনবার আফগানিস্তান থেকে কান ধরে বের করবার জন্য প্রধানত দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এর পর আর কী বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। এর পর আর আফগান মোল্লার কোনও দোষ ক্ষমা না করে থাকা যায়? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারিফ গাইবার মতো ভাষা খুঁজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্তানে দু ডজন হবেন কি না সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি থাকে তখন এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরাই বুঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন,

www.pathagar.com

অশান্তি দেখা গেলেই এঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে আলাপচারী হল; দেখলুম প্যারিস তিন বৎসর কাটিয়ে এসে এঁরা মার্সেল প্রুস্ত্‌, আঁদ্রে জিদের বই পড়েননি, বার্লিন-ফেরতা ড্যুরারের নাম শোনেননি, রিলকের কবিতা পড়েননি। মিল্টন-বাল্মীক মিলিয়ে মধুসূদন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারই মতো গ্যেটে-ফিরদৌসি মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মতো লোক কাবুলে জন্মাতে এখনও ঢের বাকি।

তা হলে দাঁড়াল এই : বিদেশফেরতা জ্ঞান পল্লবগ্রাহী, এবং দেশের নাড়ির সঙ্গে এদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত— যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়— ইংরেজ-রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই কি আফগানিস্তানের চরম মোক্ষ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষাসভ্যতার জন্য যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের প্রয়োজন মৌলবি-সম্প্রদায় কি কোনওদিন তার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবেন? মনে তো হয় না। তবে কি বাধা দেবেন? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মতো ভুবনবরেণ্য জাত আর দুটো নেই; গরিব জাতের তার ওপর আরেকটা বিশ্বাস যে, তার দেশের মাটি খুঁড়লে সোনা রুপো তেল বেরুবে তার জোরে সে বাকি দুনিয়া, ইস্তেক চন্দ্রসূর্য কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বেরোয় তবে আফগানিস্তানের পক্ষে ধনী হয়ে শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার করার অন্য কোনও সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগে মহাপুরুষরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণৎকাররা করে। পাকাপাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়া মাত্র আবার আফগানিস্তান-ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল-কান্দাহারের বিদ্যার্থীরা আবার লাহোর-দিল্লিতে পড়াশুনা করতে আসবে।

প্রমাণ? প্রমাণ আর কী? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরেজি বলে না, ভিয়েনার লোক ফরাসি বলে না, কিন্তু বুডাপেস্টের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও জর্মন বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনও ভিয়েনা যান— ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলা যায় না। কাবুলের মৌলবি-সম্প্রদায় এখনও উর্দু বলেন, ভারতবর্ষ বর্জন করে এঁদের উপায় নেই। ঝগড়া যদি করেন তবে সে তিন দিনের তরে।

উর্দু যে এদেশে একদিন কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পেলুম হাতে-নাতে।

বাইশ

আগেই বলেছি, আমার বাসা ছিল কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে— সেখান থেকে আরও মাইল দুই দূরে নতুন শহরের পত্তন হচ্ছিল। সেখানে যাবার চওড়া রাস্তা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচ করে অতি যত্নে তৈরি রাস্তা। দু দিকে সারি-বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোড়সোয়ারদের জন্যও পৃথক বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবুলিদের বুলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, বাইসিকেল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নতুন শহরে হাওয়া খেতে যায়। হেঁটে বেড়ানো

www.pathagar.com

কাবুলিরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশি ডাক্তার যখন এক কাবুলি রোগীকে হজমের জন্য বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবুলি নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশিকে হয়রান করে পেটের অন্ন হজম হবে কী করে?

বিকেলবেলা কাবুল না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে পায়চারি করতুম। এসব জায়গা সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তায় লোক চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছি তখন একখানা দামি মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। স্টিয়ারিঙে এক বিরাট বপু কাবুলি ভদ্রলোক, তাঁর পাশে মেমসায়েবের পোশাকে এক ভদ্রমহিলা— হ্যাটের সামনে ঝুলানো পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্রমহিলা সাধারণ সুন্দরী নন।

নমস্কার অভিবাদন কিছু না, ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফারসি বলতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প-স্বল্প।'

'দেশ কোথায়?'

'হিন্দুস্তান।'

তখন ফারসি ছেড়ে ভদ্রলোক ভুল উর্দুতে, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রায়ই আপনাকে অবেলায় এখানে দেখতে পাই। আপনি বিদেশি বলে হয়তো জানেন না যে, এ জায়গায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করাতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী করে হয়?' এখানে তো অজ পাড়াগাঁ— চাষাভুষোরা থাকে।'

আমি বললুম, 'বাদশা এখানে কৃষিবিভাগ খুলেছেন— আমরা জনতিনেক বিদেশি একসঙ্গে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফারসিতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বলছিলেন না।

তার পর জিগ্যেস করলেন, 'কাবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই? একা একা বেড়ানোতে দিল হয়রান হয় না? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম্ মিখুরদ— ছেলেটার মনে সুখ নেই। তাইতে আপনার সঙ্গে আলাপ করলুম।' বুঝলুম, ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য মাতৃত্বের সৌন্দর্য। নিচু হয়ে আদাবতসলিমাত জানালুম।

ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কাবুলে এলেই আমার সঙ্গে টেনিস খেলে যাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধন্যবাদ— কিন্তু আপনার কোর্ট কোথায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভদ্রলোক প্রথম একটু অবাক হলেন। তার পর সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি? ওহ্, আমি? আমি মুইন-উস্-সুলতানে। আমার টেনিস-কোর্ট ফরেন অফিসের কাছে। কাল আসবেন।' বলে আমাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেবার ফুরসত না দিয়েই মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

এতক্ষণ লক্ষ করিনি, মোটরের প্রায় বিশ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আবদুর রহমান অ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের বেগে দু হাত নেড়ে আমাকে কী বোঝাবার চেষ্টা করছে। মোটর চলে যেতেই এঞ্জিনের মতো ছুটে এসে বলল, 'মুইন-উস-সুলতানে, মুইন-উস-সুলতানে!'

'আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন?'

আবদুর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কী। আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস-সুলতানে কে, সে ততই মন্ত্রোচ্চারণের মতো শুধু বলে, মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস্-সুলতানে। শেষটায় নৈরাশ্য, অনুযোগ, ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলল, 'চেনেন না বরাদরে-আল-হজরত, বাদশার ভাই— বড় ভাই। আপনি করেছেন কী? রাজবাড়ির সক্কলের হাতে চুমো খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'রাজবাড়িতে লোক সবসুদ্ধ কজন না জেনে তো আর চুমো খেতে আরম্ভ করতে পারিনে। সক্কলের পোষাবার আগে আমার ঠোঁট ক্ষয়ে যাবে না তো?'

আবদুর রহমান শুধু বলে, 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, করেছেন কী, করেছেন কী?'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন?'

আবদুর রহমান প্রথম মুখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল, তার পর ফিসফিস করে বলল, 'আমি গরিব তার কী জানি; কিন্তু, এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আবদুর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোসা ছাড়াতে বসল তখন তার মুখে ওই এক মুইন-উস-সুলতানের কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। দু তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুঝলুম, সরল আবদুর রহমান মনে করেছে, আফগানিস্তান যখন কাকামামাশালার দেশ, অর্থাৎ বড়লোকের নেকনজর পেলে সবকিছু হাসিল হয়ে যায় তখন আমি রাতারাতি উজিরনাজির কেউ-কেটা, কিছু-না-কিছু একটা হয়ে যাবই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস-সুলতানে সমাসের অর্থ 'যুবরাজ।'

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন, ছোট ভাই। সমস্যাটার সমাধান করতে হয়।

তেইশ

মুইন-উস্-সুলতানে বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হলেন সে-সমস্যার সমাধান করতে হলে খানিকটা পিছিয়ে এ-শতকের গোড়ায় পৌঁছতে হয়।

বাঙালি পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আমি জানি, বাঙালি— তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন— আরবি ফারসি মুসলমানি নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা জানি বলেই এতক্ষণ যতদূর সম্ভব কম নাম নিয়েই নাড়াচাড়া করেছি— বিশেষত আনাতোল ফ্রাঁসের মতো গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বড্ড বেশি মনোযোগ আশা করো না, আর যদি মনস্কামনা এই হয় যে, তোমার লেখা শত শত বৎসর পেরিয়ে গিয়ে পরবর্তী যুগে পৌঁছুক তা হলে হালকা হয়ে ভ্রমণ কর।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী বাবদে আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট

www.pathagar.com

সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট ঈষৎ মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারি। মৌসুমি ফুলই মনোযোগ চায় বেশি; দুদিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কঞ্জুসও রাজি হয়।

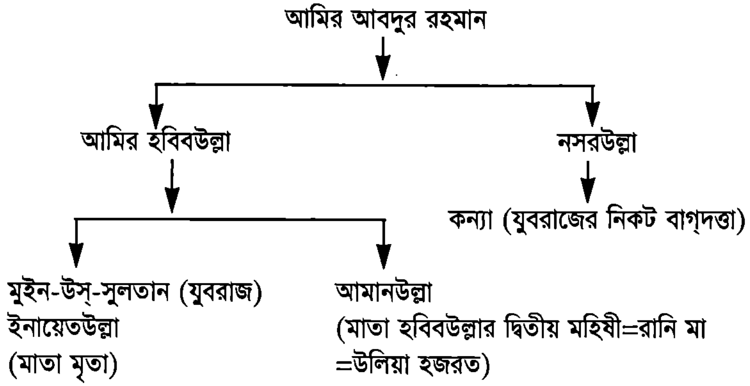

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্তানের কর্তা বা আমির ছিলেন হবিবউল্লা। তাঁর ভাই নসরউল্লা মোল্লাদের এমনি খাস-পেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস-সুলতানে তাঁর মরার পর আমির হবেন এ-ঘোষণা হবিবউল্লা বুকে হিম্মত বেঁধে করতে পারেননি। বরঞ্চ দুই ভায়ে এই নিষ্পত্তিই হয়েছিল যে, হবিবউল্লা মরার পর নসরউল্লা আমির হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমির হবেন মুইন-উস-সুলতানে। এই নিষ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার মতলবে হবিবউল্লা-নসরউল্লা দুই ভাইয়ে মীমাংসা করলেন যে, মুইন উস্‌-সুলতানে নসরউল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবিবউল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসরউল্লা, জামাইকে খুন করে 'দামাদ-কুশ' (জামাতৃহন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকতে পারে যোধপুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে জামাই দিল্লির বাদশাহ ফররুখসিয়ারকে নিহত করেন তখন দিল্লির ছেলে-বুড়োর 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় তিনি দিল্লি ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডেঁপো ছোঁড়ারা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিং-এর পালকির দু পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত আর সেপাই-বরকন্দাজের তম্বি-তম্বাকে বিলকুল পরোয়া না করে তারস্বরে একতানে 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' বলে অজিত সিংকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবিবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে তিনজনই এই চুক্তিতে অল্পবিস্তর সন্তুষ্ট হলেন। একদম নারাজ হলেন মাতৃহীন মুইন-উস্‌-সুলতানের বিমাতা। ইনি আমানউল্লার মা হবিবউল্লার দ্বিতীয়া মহিষী। আফগানিস্তানের লোক এঁকে রানি-মা বা উলিয়া হজরত নামে চিনত। এঁর দাপটে আমির হবিবউল্লার মতো খাণ্ডারও কুরবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঁঠার মতো কাঁপতেন। একবার গোসা করে রানি-মা যখন নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু খাটান তখন হবিবউল্লা কোনও কৌশলে তাঁর কিনারা না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের

মতো সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সঙ্গ-দিল্ বা পাষাণ হৃদয় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রানি-মা স্থির করলেন, এই সংসারকে যখন ওমর খৈয়াম দাবাখেলার ছকের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখন নসরউল্লা এবং মুইন-উস্-সুলতানের মতো দুই জব্বর ঘুঁটিকে ঘায়েল করা আমানউল্লার মতো নগণ্য বড়ের পক্ষে অসম্ভব না-ও হতে পারে। তাঁর পক্ষেই-বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

এমন সময় কাবুলের সেরা খানদানি বংশের মুহম্মদ তর্জি সিরিয়া নির্বাসন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরীর মতো তিন কন্যা, কাওয়াব, সুরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এঁরা দেশবিদেশ দেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রুজ-পাউডার ব্যবহারে ওকিবহাল; এঁদের উদয়ে কাবুল কুমারীদের চেহারা অত্যন্ত ম্লান, বেজৌলুস, 'অমার্জিত' বা 'অনকলচরড্' (আজ্ জঙ্গল বর আমদেহ— যেন জঙ্গলি) মনে হতে লাগল।

হবিবউল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমানউল্লার মা— যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী কিন্তু মুইন-উস্-সুলতানের মাতার মৃত্যুতে প্রধান মহিষী হয়েছেন— এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে পই পই করে বুঝিয়ে দিলেন, যে-করেই হোক মুইন-উস-সুলতানেকে তর্জির বড় মেয়ে কাওকাবের দিকে আকৃষ্ট করাতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে দু একটা কামরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রানি-মা নিজে মুইন-উস্-সুলতানকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওকাবকে ফিসফিস করে কানে কানে বললেন, 'ইনিই যুবরাজ, আফগানিস্তানের তখ্ত একদিন এঁরই হবে। কাওকাব বুদ্ধিমতী মেয়ে, ক-সের গমে ক-সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই-বা কী, শঙ্করাচার্য তরুণ-তরুণীর প্রধান বৃত্তি সম্বন্ধে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সেটা রাজপ্রাসাদেও খাটে।

প্ল্যানটা ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে মইন-উস্-সুলতানে কাওকাবের সঙ্গে পুরীর এক নিভৃত কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, খুশ-এখতেয়ারে নিভৃত কক্ষে ঢুকেছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ফ্রিডম অব্ উইল), রানি-মা জানতেন, শিকার জালে পড়েছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে প্ল্যান্‌ড্ ডেসটিনি)।

প্ল্যানমাফিকই রানি-মা হঠাৎ যেন বেখেয়ালে এই কামরায় ঢুকে পড়লেন। তরুণ-তরুণী একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। রানি-মা সোহাগ মেখে অমিয়া ছেনে সতীনপোকে বললেন, 'বাচ্চা তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা। তোমার সুখ দুঃখের কথা আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে? তোমার বিয়ের ভার তো আমার কাঁধেই। কাওকাবকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? তর্জির মেয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাবুলে আর নেই। তোমার দিল কী বলে?'

দিল আর কী বলবে? মুইন তখন ফাটা বাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বলে বলুক। মুখে কী বলেছিলেন সে সম্বন্ধে কাবুল-চারণরা পঞ্চমুখ। কেউ বলেন, নীরবতা দিয়ে সম্মতি দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন, মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ, জানতেন, নসরউল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে কাওকাবকে

www.pathagar.com

প্রেম-নিবেদন করে বসেছিলেন— হয়তো ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া— এখন এড়াবেন কী করে? কেউ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করেছিলেন, তার থেকে হস্ত-নীস্ত ('হঁ-না',— যে কথা থেকে বাংলা 'হেস্তনেস্ত' বেরিয়েছে) কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামগঙ্গা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রানি-মা কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ কাবুল-চারণদের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোদ্দা কথা এই, সে অবস্থায় আমির হোক, ফকির হোক, ঘুঘু হোক, কবুতর হোক, আর পাঁচজন গুরুজনদের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস্-সুলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কী করে বলেছিলেন সেকথা জানার যত-না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশি জানা দরকার রানি-মা মজলিশে ফিরে গিয়ে সে-বলা বা না-বলার কী অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সট্-বুক কী-বলে না-বলে সেটা অবান্তর, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইড-বুক।

রানি-মা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও যখন তামাম আফগানিস্তান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেত তখন মজলিশের হর্ষোল্লাস যে তাঁর গলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কী সন্দেহ? রানি-মা বললেন, 'আজ বড় আনন্দের দিন। আমার চোখের জ্যোতি (নূর-ই-চশ্‌ম্) ইনয়াতেউল্লা খান, মুইন-উস-সুলতানে তর্জিকন্যা কাওকাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খানা-মজলিশ দুটোর সময় ভাঙবার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নামাজ (সূর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।'

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস, হর্ষধ্বনি। দাসদাসী ছুটল বিয়ের তত্ত্বের তত্ত্বতাবাস করতে। সবকিছু সেই দুপুর রাতে রাজবাড়িতেই পাওয়া গেল। আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার?

তর্জি হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওকাব হৃদয়ে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানি-মা হবিবউল্লার কাছে 'সুসংবাদ' জানিয়ে দূত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস্-সুলতানের হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানতে পেরে তর্জিকন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন। 'প্রগতিশীল' আফগানিস্তানের ভাবী রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওকাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খুদাতালার মেহেরবানিতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতিসত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে 'আক্‌দ-রসুমাতের' (আইনত পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবিবউল্লা তো রেগে টং। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বুঝুক না-বুঝুক, তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন যে, মূর্খ মুইন-উস্-সুলতানে কাওকাবের প্রেমে পড়ে নসরউল্লার মেয়েকে হারায়নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবিবউল্লা যদিও সাধারণত পঞ্চ ম'কার নিয়ে মত্ত থাকতেন তবুও তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছে মহিষী। সৎমা'র এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না।

www.pathagar.com

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

পানি-ঢালা দেখেই হবিবউল্লা বুঝতে পারলেন, গুঁড়িটি নিশ্চয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবিবউল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন—

'খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, মহিষী শুভবুদ্ধি প্রণোদিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তর্জিকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুইন-উস্-সুলতানের উপযুক্ত তাতে আর কী সন্দেহ? কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তর্জির মেজো মেয়ে সুরাইয়াও তো সুশিক্ষিতা সুরূপা সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমানউল্লাই-বা খাস কাবুলি জংলি মেয়ে বিয়ে করবেন কেন? তাই তিনি মহিষীর মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুরাইয়ার সঙ্গে আমানউল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তর্জির নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। সত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে তিনি স্বয়ং' ইত্যাদি।

হবিবউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন, রানি-মা'র মতলব মুইন-উস্-সুলতানের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমানউল্লার সঙ্গে নসরউল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার। তা হলে নসরউল্লাহর মরার পর আমানউল্লার আমির হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবিবউল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্য আমানউল্লার স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। যে রানি-মা কাওকাবের বিদেশি শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি সুরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজ্জায়? বিশেষ করে যখন চিহ্‌ল্‌সতুন থেকে বাগ্-ই-বালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে, সুরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে শুনতে পড়াশোনায় অনেক ভালো।

রানি-মা'র মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাছাকাছি। হবিবউল্লাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসরউল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আমিও পেলুম না। তবু মন্দের ভালো; নসরউল্লার কাছে এখন মুইন-উস্-সুলতানে আর আমানউল্লা দু জনই বরাবর। মুইন-উস্-সুলতানের পাশা এখন আর নসর-কন্যার সিসায় ভারী হবে না তো।— সেই মন্দের ভালো।'

দাবা খেলায় ইংরিজিতে যাকে বলে 'ওয়েটিঙ মুভ' রানি-মা সেই পন্থা অবলম্বন করলেন।

চব্বিশ

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি জর্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদেশ মতো স্থির করলেন যে, কোনও গতিকে যদি আমির হবিবউল্লাকে দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো যায় তা হলে ইংরেজের এক ঠ্যাং খোঁড়া করার মতোই হবে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা পাবার লোভে বিদ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে অন্তত একটা পুরো বাহিনী পাঞ্জাবে রাখতে হবে— তা হলে তুর্করা মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ বন্ধ হয়ে যায় তা হলে ইংরেজের দু পা-ই খোঁড়া হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তা হলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, স্বর্ণ-ঈগল মেডেল পরিয়ে একদল জর্মন কূটনৈতিকের সঙ্গে আফগানিস্তান রওনা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুর্কির সুলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পেলেন।

কিন্তু পূর্ব-ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্তানের রাজা ও জর্মনদলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গর্দিশ কাটিয়ে এগোতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজা দৌত্যের খবর পেয়ে উত্তর-দক্ষিণ দু দিক থেকে হানা দেয়। অসম্ভব দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বেশিরভাগ জিনিসপত্র পথে ফেলে দিয়ে তাঁরা ১৯১৫ সালের শীতের শুরুতে কাবুল পৌঁছান।

আমির হবিবউল্লা বাদশাহী কায়দায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন— তামাম কাবুল শহর রাস্তার দু পাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাঁদের আনন্দ-অভিবাদন জানাল। বাবুর বাদশাহের কবরের কাছে রাজাকে হবিবউল্লার এক খাস-প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভিনন্দন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ, কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবিবউল্লার ইংরেজ-প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব্য-তুর্কি নব্য-মিশরের জাতীয়তাবাদের ক্বচিৎ-জাগরিত বিহঙ্গকাকলী কাবুলের গুলিস্তান-বোস্তানকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারতবর্ষের লোক, জর্মনির শেষ মতলব কী সে সম্বন্ধে কাবুলিদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। এ অনুমান কাইজার বার্লিনে বসে করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মন কূটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্দ্রের আসনে বসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবিবউল্লাকে তম্বি করে হুকুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু ধূর্ত হবিবউল্লা ইংরেজকে নানারকম টালবাহানা দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলেন। একথাও অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের দু হাত ভর্তি, আফগানিস্তান আক্রমণ করবার মতো সৈন্যবলও তার কোমরে নেই।

কিন্তু হবিবউল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজি হলেন না। কেননা এবং না হয়ে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সেসব কারণের কটা খাঁটি, কটা ঝুট বলা অসম্ভব; কিন্তু এ-বিষয়ে দেখলুম কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, হবিবউল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্থান তাতে সাড়া দিত। অর্থাৎ আমীর জনমত উপেক্ষা করলেন; জর্মনি, তুর্কি, ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মনরা এক বৎসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপ তখনকার মতো আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য জমি আবাদ করতে কসুর করলেন না। রাজা জানতেন হবিবউল্লার মৃত্যুর পর আমির হবেন নসরউল্লা নয় মুইন-উস্-সুলতানে। কিন্তু দুটো টাকাই যে মেকি রাজা দু চারবার বাজিয়ে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। আমানউল্লার কথা কেউ তখন হিসাবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাকে বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার পরখ করে নিয়েছিলেন

www.pathagar.com

সেকথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাঁকে কি কানমন্ত্র দিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না; রাজাও মুখ ফুটে কিছু বলেননি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। তার পর যুদ্ধ শেষ হল।

শেষ আশায় নিরাশ হয়ে কাবুলের প্রগতিপন্থিরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। পর্দার আড়াল থেকে তখন এক অদৃশ্য হাত আফগানিস্তানের ঘুঁটি চালাতে লাগল। সে হাত আমানউল্লার মাতা রানি-মা উলিয়া হজরতের।

বহু বৎসর ধরে রানি-মা প্রহর গুনছিলেন এই সুযোগের প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবিবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমানউল্লার কথা হিসাবেই আনবেন না। পর্দার আড়াল থেকেই রানি-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, হবিবউল্লা কাবুলের বুকের উপর জগদ্দল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যখন সে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তখন তাঁরা বসে আছেন কিসের আশায়? নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে দু জনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হক্কের মাল— সে মালের জন্য তাঁরা কোনও দাম দিতে নারাজ।

কিন্তু আমানউল্লা দাম দিতে তৈরি। সে দাম কী? বুকের খুন দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমানউল্লাকে আমির করা যায় কী প্রকারে? রানি-মা বোরকার ভিতর থেকে তারও নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবিবউল্লা যখন নসরউল্লা আর মুইন-উস্-সুলতানেকে সঙ্গে নিয়ে জলালাবাদ যাবেন, তখন আমানউল্লা কাবুলের গভর্নর হবেন। তখন যদি হবিবউল্লা জলালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অস্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গভর্নর আমানউল্লা তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই দুটো জিনিসই যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষ মরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবিবউল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কী স্থিরতা? অসহিষ্ণু রানি-মা বুঝিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়— বিশেষত যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

স্বামী হত্যা? অ্যাঁ? হ্যাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা হচ্ছে না— যেখানে সমস্ত দেশের আশাভরসা, ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সেখানে কে স্বামী, স্ত্রীই-বা কে?

শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'কা তব কান্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীব বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর আমার কাছে খোলসা হল।

অর্বাচীনরা তবু শুধাল, 'কিন্তু আমির হবিবউল্লার সৈন্যদল আর জলালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসরউল্লা বা মুইন-উস-সুলতানের পক্ষ নেবে না?'

রাগে দুঃখে রানি-মা'র নাকি কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। উষ্মা চেপে শেষটায় বলেছিলেন, 'ওরে মূর্খের দল, জলালাবাদে যে-ই রাজা হোক না কেন, আমরা রটাব না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই গৃধ্নুই নিরীহ হবিবউল্লাকে খুন করেছে? মূর্খেরা এতক্ষণে বুঝল, এ-স্থলে 'রানির কী মত?' নয়। এখানে 'রানির মত-ই সকল মতের রানি'।

এসব আমার শোনা কথা— কতটা ঠিক কতটা ভুল হলপ করে বলতে পারব না, তবে এরকমেরই কিছু-একটা যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল-চারণদের মনে কোনও সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু কথামালার গল্প ভুল। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য লোকও জুটল।

আপনা অলসতাই হবিবউল্লার মৃত্যুর আরেক কারণ। জলালাবাদে একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার থেকে ফিরে আসতেই তাঁর গুপ্তচর নিবেদন করল যে, গোপনে হুজুরের সঙ্গে সে অত্যন্ত জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। সে নাকি কী করে শেষ মুহূর্তে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবিবউল্লাহ্ প্রাসাদের ভিতর ঢুকে গেলেন। সকলের সামনে গুপ্তচর কিছু খুলে বলতে পারল না— আমিরও শুধু বললেন, 'কাল হবে, কাল হবে'।

সে কাল আর কখনও হয়নি। সে-রাতেই গুপ্তঘাতকের হাতে হবিবউল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমুল কাণ্ড হয়েছিল তার বর্ণনা আশা করা অন্যায়। কেউ শুধায়, 'আমিরকে মারল কে?' কেউ শুধায়, 'রাজা হবেন কে?' একদল বলল, 'শহীদ আমিরের ইচ্ছা ছিল নসরউল্লা রাজা হবেন', আরেকদল বলল, 'মৃত আমিরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েতউল্লা। তখ্তের হক তাঁরই।'

বেশিরভাগ গিয়েছিল ইনায়েতউল্লার কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিগ্যেস করে 'রাজা হবেন কে?' তিনি হয় উত্তর দেন না, না হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেন, 'ব কাকায়েম, বোরো' অর্থাৎ 'খুড়োর কাছে যাও, আমি কী জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেননি বলা শক্ত; হয়তো পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়তো পিতার ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন, হয়তো আন্দাজ করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তখ্ত দখল করবে। তিনি যদি সে পথে কাঁটা হয়ে মাথা খাড়া করেন তবে সে মাথা বেশিদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা, কাঁচা-লঙ্কাও পাঁঠার বলি দেখে খুশি হয় না। জানে এবার তাকে পেষার লগ্ন আসন্ন। নসরউল্লা আমির হলেন।

এদিকে রানি-মা কাবুলে বসে তড়িৎ গতিতে কাবুল কান্দাহার জলালাবাদ হিরাতে খবর রটালেন রাজ্যগৃধ্নু অসহিষ্ণু নসরউল্লা ভ্রাতা হবিবউল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমির হওয়াও এমনিতেই কোনও হক ছিল না— এখন তো আর কোনও কথাই উঠতে পারে না। হক ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানের। তিনি যখন স্বেচ্ছায়, খুশ-এখতেয়ারে নসরউল্লার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাৎ সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করেছেন, তখন হক বর্তালো আমানউল্লার ওপর।

অকাট্য যুক্তি। তবু কাবুল চিৎকার করল, 'জিন্দাবাদ আমানউল্লা খান'— ক্ষীণকণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রানি-মা আমানউল্লার তখ্ত লাভে খুশি হয়ে সেপাইদের বিস্তর বখশিশ দিলেন; নতুন বাদশা আমানউল্লা সেপাইদের তনখা অত্যন্ত কম বলে নিতান্ত 'কর্তব্য পালনার্থে' সে তনখা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকাই রাজকোষ থেকে বেরুল। কাবুল হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ আমানউল্লা খান'।

ভলতেয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কি না। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'যায়; কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেঁকো বিষ খাইয়ে দিলে আর কোনও সন্দেহই থাকবে না।'

www.pathagar.com

আফগান সেপাইয়ের কাছে যুক্তিতর্ক মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়— টাকাটাই সেঁকো।

আমানউল্লা কাবুল বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদৃপ্ত কণ্ঠে পিতৃঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যে পাষণ্ড আমার জান-দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার কাছে জল পর্যন্ত শরাবের মতো হারাম, তার মাংস টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত সব মাংস আমার কাছে শূকরের মাংসের মতো হারাম।'

আমানউল্লার শত্রুপক্ষ বলে আমানউল্লা থিয়েটারে ঢুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্রপক্ষ বলে, সমস্ত ষড়যন্ত্রটা রানি-মা সর্দারদের সঙ্গে তৈরি করেছিলেন— আমানউল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক 'পিদর-কুশ' বা পিতৃহন্তার হস্ত চুম্বন করতে অনেক লোকই ঘৃণা বোধ করতে পারে। বিশেষত রানি-মা যখন একাই এক লক্ষ তখন তরুণ আমানউল্লাকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নামিয়ে লাভ কী? আফগানিস্তানে স্ত্রীলোকের আমির হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়তো সারাজীবনই যবনিকা-অন্তরালে থাকতে হত।

আমানউল্লার সৈন্যদল জলালাবাদ পৌঁছল। নসরউল্লা, ইনায়েতউল্লা দু জনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসরউল্লা মোল্লাদের কুতুব-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে যাজক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাই-সান্ত্রি জড়ো করতে পারল না সে-ও এক সমস্যা। কাবুল ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেঁদে ফেলেছিলেন। জলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আমির তখ্‌তে বসাবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আমানউল্লার দলে যোগ দিয়ে কাবুল যাচ্ছে। কান্না দেখে তারা নাকি মুইন-উস্‌-সুলতানের কাছে এসে বার বার বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'বলো না এখন, "ব কাকায়েম বোরো— খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন।" যাও এখন খুড়োর কাছে? এখন দেখি, কাবুল পৌঁছলে খুড়ো তোমাকে বাঁচান কী করে।'

কাবুলের আর্ক দুর্গে দু জনকেই বন্দি করে রাখা হল। কিছুদিন পর নসরউল্লা 'কলেরায়' মারা যান। কফি খেয়ে নাকি তাঁর কলেরা হয়েছিল। কফিতে অন্যকিছু মেশানো ছিল কি না সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল-চারণের স্মৃতিশক্তি বড়ই ক্ষীণ।

এর পর মুইন্‌-উস্‌-সুলতানের মনের অবস্থা কী হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার মতো নিরীহ বাঙালির মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পৌঁছয় না, মৃত্যুভয়ের তুলনাও নাকি নেই।

এখানে পৌঁছে সমস্ত দুনিয়ার উচিত আমানউল্লাকে বার বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি আমানউল্লা তাই করলেন। মাতার হাত থেকে যেটুকু ক্ষমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরেছিলেন তারই জোরে বিচক্ষণ কূটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা মোগল-পাঠানের ইতিহাস পড়েছেন। এত বড় দরাজ-দিল আর হিম্মত-জিগরের নিশান আফগানিস্তানের ইতিহাসে আর নেই।

www.pathagar.com

পঁচিশ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কানমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে আমানউল্লা আরও ভালোরকমেই বুঝতে পারলেন যে, চোরের যদি তিন দিন হয় তবে সাধুর মাত্র এক দিন। সেই এক দিনের হক্কের জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন।— এখন আবার দুশমনের পালা। আমানউল্লা তার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

জমাখরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমানউল্লা খান। দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর আমির আমানউল্লা নন— তিনি 'গাজি' 'বাদশাহ' আমানউল্লা খান।

খরচে লেখা, নসরউল্লার মোল্লার দল যদিও আসর থেকে সরে গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমানউল্লা ফরাসি জানতেন— 'রেক্যুলের পুর মিয়ো সোতের', অর্থাৎ 'ভালো করে লাফ দেওয়ার জন্য পিছিয়ে যাওয়া' প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু আমানউল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোল্লারা সরকারি রাস্তার কোনখানে খানাখন্দ বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভিতর পুষে রাখলে দেশসংস্কারের মোটর টপ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ পুরা স্পিডে মোটর না চালিয়ে উপায় নেই— সাধুর মাত্র একদিন।

কাবুলে পৌঁছে যেদিকে তাকাই সেখানেই দেখি হরেকরকম সরকারি উর্দিপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে শুনি কোনওটা উর্দি ফরাসি স্কুলের, কোনওটা জর্মন, কোনওটা ইংরেজি আর কোনওটা মিলিটারি স্কুলের। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা পাস করে যারা শহরে এসেছে তাদের জন্য ফ্রি বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইন্‌স্ট্রুমেন্ট-বক্স, ডিকশনারি, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য খচ্চরের ভাড়া, এককথায় 'অল ফাউন্ড'।

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, 'নাথিং লস্ট'।

প্যারিসফের্তা সইফুল আলম বুঝিয়ে বললেন, 'আপনি ভেবেছেন "অল ফাউন্ড" হলে বিদ্যেও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়। মোটেই না। হস্টেল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।'

আমি বললুম, 'ধরে আনার বন্দোবস্ত নেই?'

সইফুল আলম বললেন, 'গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাড়ে তৈরি। পালিয়ে বাড়ি না গিয়ে যেখানে-সেখানে দিন কাটাতে পারে। তারও দাওয়াই আমানউল্লা বের করেছেন। হস্টেল থেকে পালানোমাত্রই আমরা সরকারকে খবর দিই। সরকারের তরফ থেকে তখন দু জন সেপাই ছোকরার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও হুকুম নেই তবু সকলের জানা কথা যে, কোরমা-কালিয়া না পেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তখন ছেলেকে খুঁজতে বেরোয়। সে এসে হস্টেলে হাজিরা দেবে, হেডমাস্টারের চিঠি গাঁয়ে পৌঁছবে যে আসামি ধরা দিয়েছে, তখন সেপাইরা বাপের ভালো দুম্বাটি কেটে বিদায়-ভোজ খেয়ে তাকে হুঁশিয়ার না করে শহরে ফিরবে। পরিস্থিতিটার পুনরাবৃত্তিতে তাদের কোনও আপত্তি নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ নিতান্তই গর্দভ হয় তবে?'

www.pathagar.com

'পরপর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেডমাস্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কি না? বুদ্ধিশুদ্ধি আছে অথচ পড়াশোনায় ঢিলেমি করছে জানলে তার তখনও ছুটি নেই।'

এর পর কোন দেশের রাজা আর কী করতে পারেন?

মিলিটারি স্কুলের ভার তুর্কদের হাতে। তুর্কি জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পৎস্‌দাম সমরবিদ্যায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম স্কুলটি জর্মন কায়দায় গড়া। সেখানে কীরকম উন্নতি হচ্ছে তার খবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওয়া বললেন, 'ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্তানের কিছু ক্ষতি হবে না।'

মেয়েদের শিক্ষার জন্য আমানউল্লা আর তাঁর বেগম বিবি সুরাইয়া উঠে-পড়ে লেগেছেন। বোরকা পরে এক কাবুল শহরেই প্রায় দু হাজার মেয়ে ইস্কুলে যায়, উঁচু পাঁচিলঘেরা আঙিনায় বাস্কেট-বল, ভলি-বল খেলে। সইফুল আলম বললেন, 'লিখতে পড়তে, আঁক কষতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্তত কোনও আপত্তি নেই। হারেমের বন্ধ হাওয়ার বাইরে এসে লাফালাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয়?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিলুম। সইফুল আলম কানে কানে বললেন, 'কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রানি-মা।'

শুনে একটু ঘাবড়ে গেলুম। দুই শত্রু নিপাত করে, তৃতীয় শত্রুকে ঠাণ্ডা রেখে যিনি আমানউল্লাকে বাদশা বানাতে পেরেছেন তাঁর রায়ের একটা মূল্য আছে বৈকি? তাঁর মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্তান হজম করতে পারবে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিন্যও হয়েছে— মাতা অভিমানভরে পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। বধূ সুরাইয়াও নাকি শাশুড়িকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমানউল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে— 'দেরেশি' পরে। 'দেরেশি' কথাটা ইংরেজি 'ড্রেস' থেকে এসেছে— অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই, পাতলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, সরকারি কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয় তা সে বিশ টাকার কেরানিই হোক, আর দশ টাকার সিপাই-ই হোক। শুধু তাই নয়, দেরেশি পরা না থাকলে কাবুল নাগরিক সরকারি বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারি চা, অন্যদিকে বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অনুন্নত জাতির মোহ, মাঝখানে সিনেমার উস্কানি, তিনে মিলে কাবুল দেরেশি-পাগল হয়ে উঠেছে।

ইস্তেক আবদুর রহমানের মনে ছোঁয়াচ লেগেছে। আমি বাড়িতে শিলওয়ার পরে বসে থাকলে সে খুঁতখুঁত করে; আটপৌরে সুট পরে বেরুতে গেলে নীলকৃষ্ণ দেরেশি পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছে। আমির হবিবউল্লা হারেমের মেয়েদের ফ্রক ব্লাউজ পরাতেন। আমানউল্লার আমলে দেখি ভদ্রমহিলামাত্রেই উঁচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আস্বচ্ছ সিল্কের মোজা, লম্বাহাতার আঁটসাঁট ব্লাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট ঝুলছে বলে চেহারাখানা পষ্টাপষ্টি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস তাঁর নেটের বুনুনি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসি উচ্চারণ ফিগুর, অর্থ— মুখের চেহারা। ফরাসি অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, 'কাবুলি মেয়েদের ফিগার বোঝা যায় বটে, কিন্তু ফিগুর দেখবার উপায় নেই।'

www.pathagar.com

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিত্য নতুন স্কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার ফলানো যায় না। ধনদৌলত বাড়াতে হলে আজকের দিনে কলকারখানা বানিয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার জন্য প্রচুর পুঁজির দরকার। আফগানিস্তানের গাঁটে সে কড়ি নেই— বিদেশিদের হাতে দেশের শিল্পবাণিজ্য ছেড়ে দিতেও বাদশা নারাজ। আমানউল্লার পিতামহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ আবদুর রহমান বলতেন, 'আফগানিস্তান সেইদিনই রেলগাড়ি চালাবে যেদিন সে নিজের হাতে রেলগাড়ি তৈরি করতে পারবে।' পিতা হবিবউল্লা সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেননি— তবে কাবুলের বিজলিবাতির জন্য যে কলকজা কিনেছিলেন সেটা কাবুলি টাকায়। আমানউল্লা কী করবেন ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না— ন্যাশনাল লোন তোলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা হলে সবাইকে সুদ দিতে হয় এবং সুদ দেওয়া-নেওয়া ইসলামে বারণ।

হয়তো আমানউল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনের কাঁধে যদি ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়া যায় তা হলে প্রগতির পথে চলার সুবিধে হবে। আমানউল্লা বললেন, 'পার্লিমেন্ট তৈরি কর।'

সে পার্লিমেন্টের স্বরূপ দেখতে পেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুড়ি মাইল রাস্তা। বাস চলাচল আছে। সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়ের থাকে থাকে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা শাঁখ কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ভাঁজে ভাঁজে ছোট ছোট বাংলো; অনেকটা ইতালিয়ান ভিলার মতো। সমস্ত পাগমান শহর জুড়ে আপেল-নাসপাতির গাছ বাংলোগুলোকে ঘিরে রেখেছে আর চূড়ার বরফগলা ঝরনা রাস্তার একপাশের নালা দিয়ে থাকে থাকে নেমে এসেছে। পিচঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি দু দিকে ঘন সবুজের নিবিড় স্তব্ধ সুষুপ্তি। কোনওদিকে কোনওপ্রকার জীবনযাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিনঘিনে হলদে রঙের বাড়িঘরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নীরস কর্কশ আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর ঝুড়ি-কাঁধে খাসিয়া মেয়েগুলোকে দেখব বলে।

বাদশা আমির-ওমরাহ নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটান। এক সপ্তাহের জন্য তামাম আফগানিস্তান এখানে জড়ো হয় 'জশন' বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য। দল বেঁধে আপন আপন তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসে তারা রাস্তার দু দিকে যেখানে-সেখানে সেগুলো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায় চাঁদমারি, মঙ্গোল নাচ, পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখে, না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়ে; রাত্রে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিশ। 'আজি এ নিশীথে প্রিয় অধরেতে চুম্বন যদি পাই; জোয়ান হইব গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই'— ধরনের ওস্তাদি গানের রেওয়াজ প্রায় নেই, হরেকরকম 'ফতুজানকে' অনেকরকম সাধ্য-সাধনা করে ডাকাডাকি করাই হচ্ছে এসব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে দু চার চক্কর নাচ ভি দেখিয়ে দেয়। আর সবাই গানের ফাঁকে ফাঁকে 'শাবাশ শাবাশ' বলে নাচনেওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এরকম মজলিশে বেশিক্ষণ বসা কঠিন। চোখ বন্ধ করে যদি সবাই সিগারেট ফোঁকে তবে নিজেকেও সিগারেট ধরাতে হয়— না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুসখুস করতে থাকে।

www.pathagar.com

এসব মজলিশে আপনিও যদি মনের ভেতর কোনও 'ফতুজান' বা কদম্ববন বিহারিণীর ছবি এঁকে গলা মিলিয়ে— না মিললেও আপত্তি নেই— চিৎকার করে গান না জোড়েন তবে দেখবেন ক্রমেই কানে তালা লেগে আসছে, শেষটায় ফাটার উপক্রম। রাগবি খেলার সঙ্গে এসব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে— তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একটু তফাতে আলগোছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্ঝরের ঝরঝর, পত্র-পল্লবের মৃদু মর্মর, অচেনা পাখির একটানা কূজন, পচা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবসুদ্ধ মিলে গিয়ে এখানে বেলা দ্বিপ্রহরেও মানুষের চোখে তন্দ্রা আসে। ভর গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবুও শীত শীত করে— কোটের কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়ালা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুরই প্রয়োজন নেই, একখানা র‍্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি এক অপরূপ মূর্তি। কাঁচাপাকা লম্বা দাড়িওয়ালা ঘামে-ভেজা, আজন্ম অস্নাত অধৌত, পীত দন্তকৌমুদী বিকশিত এক আফগান সামনে দাঁড়িয়ে। এরূপ আফগান অনেক দেখেছি, কিন্তু এর পরনে ধারাল ক্রিজওয়ালা সদ্য নতুন কালো পাতলুন, কালো ওয়েস্টকোট, স্টার্চ করা শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা স্টিফ কলার, কালো টাই, দু বোতামওয়ালা নব্যতম কাটের মর্নিং-কোট আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেড়ফুট উঁচু চকচকে সিল্কের অপেরা-হ্যাট! সবকিছু আনকোরা ঝাঁ-চকচকে নতুন; দেখে মনে হল যেন এইমাত্র দর্জির কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। যা তা 'দেরেশি' নয়, ষোল আনা মর্নিং-সুট। প্যারেডের দিনে লাট-বেলাট এইরকম সুট পরে সেলুট নেন।

বেল্টের অভাবে পাজামার নোংরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা, কালো ওয়েস্টকোট আর পাতলুনের সঙ্গমস্থল থেকে একমুঠো ধবধবে সাদা শার্ট বেরিয়ে এসেছে, টাইটাও ওয়েস্টকোটের উপরে ঝুলছে।

বাঁ হাতে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানানো বোঁচকা, ডান হাতে ফিতেয় বাঁধা একজোড়া নতুন কালো বুট। তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো-মোজা নেই!

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুটজোড়া দোলাতে দোলাতে ওরাঙওটাঙের মতো বড় রাস্তার দিকে রওনা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনও কুলকিনারা পেলুম না যে, এরকমের আফগান এ ধরনের সুট পেলেই-বা কোথায়, আর এর প্রয়োজনই-বা তার কী! কিন্তু ওই এক মূর্তি নয়। বন থেকে বেরোবার আগে হুবহু, এক দ্বিতীয় মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে দেখি এক মুচির সামনে উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে আর মুচি তার বুটের তলায় লোহা ঠুকে আল্পনা এঁকে দিচ্ছে।

পরের দিন আমানউল্লার বক্তৃতাসভায় যাবার পথে এরকম আরও ডজনখানেক মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্ল্যাটফর্মের মুখোমুখি প্রায় শ-দেড়েক লোক এরকম মর্নিং-সুটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে। এরাই প্রথম আফগান পার্লিমেন্টের সদস্য।

যে তাজিক হাজারা, মঙ্গোল, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোশাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাইরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশির মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা বিকট

www.pathagar.com

বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মতো বসে আছে। শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাঙ্গে যেন কৃষ্ণচন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে!

আমানউল্লা দেশের ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা বললেন। কাবুলের লোক হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কি না জানিনে, তারা এলোপাতাড়ি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিকে-ওদিকে তাকায়; ফরেন অফিসের কর্তারা আরও বেশি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন। বিদেশি রাজদূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমানউল্লার দিকে তাকিয়ে— সেদিন বুঝতে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদূর আত্মসংযম, কত জোর চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জানি, সুট ভালো করে পরতে পারা না-পারার ওপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কী প্রয়োজন ছিল লেফাফাদুরস্ত হওয়ার লোভে দেড়শো জন গাঁওবুড়াকে লাঞ্ছিত করে নিজে বিড়ম্বিত হওয়ার?

আমানউল্লার বক্তৃতা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে— ভাষা এক হলেই তো আর ভাবের বাজারের বেচাকেনা সহজ সরল হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরনো বোতলও নাকি নয়া মদ সইতে পারে না।

ছাব্বিশ

গ্রীষ্মকালটা কাটল ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে। আমাদের দেশে সে সুবিধে নেই; ঠাঠা রোদ্দুর, ঝমাঝ্‌ঝম বৃষ্টি, ভলভলে কাদা আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রফারফি না করে আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষবাসের বেশিরভাগ শুকনো-শুকনিতে। শীতের গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে একদফা মাল চালিয়ে দেয়; তার পর সমস্ত শীতকাল ধরে চাষির আশা যেন বেশ ভালোরকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ক্ষেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুইয়ে চুইয়ে অনেক নিচে ঢোকে আর সমস্ত ক্ষেতটাকে বেশ নরম করে দেয়। বসন্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠঘাট ডুবে যায় না। আধা-ভেজা আধা-শুকনোতে তখন ক্ষেতের কাজ চলে— নালার ধারে গাছতলায় একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম করে বসে ক্ষেতের কাজ দেখতে অসুবিধা হয় না। তার পর গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে পাহাড়ের উপরকার জমা-বরফ গলে কাবুল উপত্যকায় নেমে এসে খাল-নালা ভরে দেয়। চাষিরা তখন নালায় বাঁধ দিয়ে দু পাশের ক্ষেতকে নাইয়ে দেয়। ধানক্ষেতের মতো আল বেঁধে বেবাক জমি টৈটম্বুর করে দিতে হয় না।

কোন চাষির কখন নালায় বাঁধ দেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়াকড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালার উজান-ভাটির গাঁয়ে গাঁয়ে জলের ভাগ-বাঁটোয়ারার কী বন্দোবস্ত তারও পাকাপাকি শর্ত সরকারের দফতরে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি মাথা ফাটাফাটি হয়, কিন্তু কাবুল উপত্যকার চাষারা দেখলুম বাঙালি চাষার মতোই নিরীহ— মারামারির চেয়ে গালাগালিই বেশি পছন্দ করে। তার কারণ বোধহয় এই যে, কাবুল উপত্যকা বাঙলা দেশের

www.pathagar.com

জমির চেয়েও উর্বরা। তার ওপর তাদের আরেকটা মস্ত সুবিধা এই যে, তারা শুধু বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ক্ষেত ভরে যায়, অথবা যদি পাহাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেমে আসে, তা হলে তারা আর বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। কাবুলের লোক তাই বলে, 'কাবুল বেজ্‌র শওদ লাকিন বে-বর্ফন্‌ বাশদ'— কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দশ হাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার দু দিকে দু সারি উঁচু চিনারগাছ, তারই নিচে দিয়ে পায়ে চলার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটির মতো পাঁচচিনারের মাঝখানে বরসাতি পেতে আরাম করে বসতুম। একটু উজানে নালায় বাঁধ দিয়ে আরেক চাষা তার ক্ষেত নাওয়াচ্ছে। আমি যে ক্ষেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম সুখ-দুঃখের কথা কইছে। এ দু জনের কান মসজিদের দিকে— কখন আসরের (অপরাহ্ণ) নমাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়ামাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর-কাদা সরিয়ে দেয়— সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল করে নিচের বাঁধের জল ভর্তি হতে শুরু করে; চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরি করে রেখেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে বেড়ায়, কাঠের শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা তুলে সেটাকে আরও শক্ত করে দেয়, ক্ষেতের ঢেলা মাটি এদিকে-ওদিকে সরিয়ে দিয়ে বানের জলের পথ করে দেয়। শিলওয়ারটা হাঁটুর উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে, আর পাগড়ির লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছে। আমি ততক্ষণে তার হুঁকোটার তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে দু একটি দম দেয় আর পাগড়ির লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলি চাষার পাগড়ি দুই-ই একবস্তু। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ি দিয়ে করা যায় না— ইস্তেক মাছ ধরা পর্যন্ত। যদিও আমাদের নালায় সবসময়ই দেখেছি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়েরা কলসি মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর উড়না টেনে দিত, আমাদের দেশের চাষির বউ যেরকম 'ভদ্‌দর নোককে' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডান-হাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁ হাত দিয়ে হাঁটুর উপরে পাজামা তুলে এরা প্রথম দর্শনে আরবি ঘোড়ার মতো ছুট দেয়নি আর অল্প কয়েকদিনের ভিতরই তারা আমার সামনে স্বচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশিদিন টিকল না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুইন-উস্‌-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমটায় তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারই আগা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস্‌-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে, তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, সেও সায় দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সাজতে দেয় না, আগের মতো প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, 'তো'র বদলে হঠাৎ 'শুমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বহুবচন যদি-বা সর্বনামে ঠিক রাখে তবু ক্রিয়াতে একবচন ব্যবহার করে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, আর কিছুতেই

www.pathagar.com

ভুলতে পারে না যে, আমি মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব কেমন যেন করকরে হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি, যতদিন গাঁয়ে ছিলুম প্রায়ই মুরগিটা আণ্ডাটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আবদুর রহমানের থাবার ভয়ে যা নিতান্ত না নিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফসলকাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল— একদিন দেখি পাঁচ গাধা-বোঝাই শীতের জ্বালানি কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আবদুর রহমানের মতো খুঁতখুঁতে লোকও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করলে যে, এরকম পয়লা নম্বরের নিম্-তর নিম খুশ্‌ক্ (আধা-ভেজা) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড্ড বেশি গরম করে তোলে, তাতে আবার খর্চাও হয় বেশি। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তা হলে গরমের চেয়ে ধুঁয়োই বেরোয় বেশি, যদিও খর্চা তাতে কম।

এবার দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজারদর দিতে গেলে সে শুধু বলে যে, কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক তর্কাতর্কির পর বুঝলুম যে, বাজারের দরের বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ার-বক্সিকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলমাল শুনে মাদাম জিরার এসে মিটমাট করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের দিলখোলা বন্ধুত্ব প্রায় লোপ পাবার মতো অবস্থা হল যেদিন সে শুনতে পেল আমি 'সৈয়দ'। তার পর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুমো খেতে চায়। আমি যতই বাধা দিই, সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ি বাঁধে আর খোলে।

তামাক-সাজার সত্যযুগের কথা ভেবে নিশ্বাস ফেললুম।

ডিমোক্রেসি বড় ঠুনকো জিনিস; কখন যে কার অভিসম্পাতে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। তার পর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না।

সাতাশ

হেমন্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দিন এসে কাবুলে পৌঁছলেন। বগদানফ, বেনওয়া, মৌলানা আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারি' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দিন অমৃতসরের লোক। ১৯২১ সালের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন, ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হন এবং পরে ভালো বাংলা শিখেছিলেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবিতে অনুবাদ করে মূল সুরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্য-সভায় আসর জমাতেন। এখানে এসে সেসব গান খুব কাজে লেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবি সমাজ তাঁকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফারসি জানতেন বলে কাবুলিরাও তাঁকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু 'চারইয়ারি' সভাতে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনওয়া সায়েব তখন বড্ড মনমরা হয়ে

www.pathagar.com

গেলেন। কাবুলে তিনি কখনও খুব আরাম বোধ করেননি। এন্ড্রুজ, পিয়ার্সনকে বাদ দিলে বেনওয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমঝদার। শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক প্রায়ই উদাস হয়ে যেতেন আর খামকা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনওয়া সায়েবই আমাকে রাশান এম্বেসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই তাভারিশ দেমিদফকে আমার বড় ভালো লাগল। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালির মতোন উঁচু, সোনালি চুল, চোখের লোম পর্যন্ত সোনালি, শীর্ণ মুখ আর দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নীল চোখ। বেনওয়া যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই যেন চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কন্টিনেন্টালের চেয়ে একটু বেশি ঝুঁকে তিনি হ্যান্ডশেক করলেন, আর হাতে চাপ দেওয়ার মাঝ দিয়ে অতি সহজ অভ্যর্থনার সহৃদয়তা প্রকাশ করলেন।

তাঁর স্ত্রীরও রেশমি চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুশি মুখ। কোথাও কোনও অলঙ্কার পরেননি, লিপস্টিক রুজ তো নয়ই। হাত দু খানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে অনেক চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালি মেয়েদের মতো অযত্নে বাঁধা এলোখোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরেজিতে, গিন্নি ফরাসিতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশা দেমিদভা বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কী খাবেন বলুন।'

ইতোমধ্যে দেমিদফ পাপিরসি (রাশান সিগারেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরি।

আমি বাঙালি, বেনওয়া সায়েব শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আধা-বাঙালি হয়ে গিয়েছেন আর রাশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালিকেও হার মানায় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়দাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার; তাতে জল টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। এদিকে টি-পটে সকালবেলা মুঠো পাঁচেক চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশকালো লিকার তৈরি করা হয়েছে— সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পট হাতে করে প্রত্যেকের পেয়ালা নিয়ে মাদাম শুধান, 'কতটা দেব বলুন।' পোয়াটাক নিলেই যথেষ্ট; সামোভারের চাবি খুলে টগ্‌বগে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে দুয়ে মিলে তখন বাঙালি চায়ের রঙ ধরে। কায়দাটা মন্দ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনও কড়া, কখনও ফিকে যা-খুশি খাওয়া যায়। দুধের রেওয়াজ নেই, দুধ গরম করার হাঙ্গামাও নেই। সকালবেলাকার তৈরি লিকারে সমস্ত দিন চলে।

সামোভারটি দেখে মুগ্ধ হলুম। রুপোর তৈরি। দু দিকের হ্যান্ডেল, উপরের মুকুট, জল খোলার চাবি, দাঁড়াবার পা সবকিছুতেই পাকা হাতের সুন্দর, সুদক্ষ, সূক্ষ্ম কাজ করা।

তারিফ করে বললুম, 'আপনাদের রুপোর তাজমহলটি ভারি চমৎকার।'

দেমিদফের মুখের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল— ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যেরকম হয়। মাদাম উচ্ছ্বসিত হয়ে বেনওয়া সায়েবকে বললেন, 'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কমপ্লিমেন্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোনও ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো; আমি ওই একটির নাম জানি, ছবি দেখেছি।'

www.pathagar.com

তখন দেমিদফ বললেন, 'সামোভারটি তুলা শহরে তৈরি।'

আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললুম, কোথায় যেন চেখফ না গর্কির লেখাতে একটা রাশান প্রবাদ পড়েছি, 'তুলাতে সামোভার নিয়ে যাওয়ার মতো।' 'আমরা বাংলাতে বলি, "তেলা মাথায় তেল ঢালা"।'

'কেরিইং কোল টু নিউ কাসুল', 'বরেলি মে বাঁশ লে জানা' ইত্যাদি সবকটাই আলোচিত হল। আমার ফরাসি প্রবাদটিও মনে পড়েছিল, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া।' কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেপে রাখলুম। হাফিজও যখন বলেছেন, 'আমি কাজি নই মোল্লাও নই, আমি কোন দুঃখে "তওবা" (অনুতাপ) করতে যাব', আমি ভাবলুম, 'আমি ফরাসি নই, আমার কী দায় রসাল প্রবাদটা দাখিল করবার।'

দেমিদফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষের লোক রাশান কথাসাহিত্য পড়ে কি-না।'

আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও মত দেওয়া কঠিন কিন্তু বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসি সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বৎসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের অনেক গুণী বলেন, "চেখফ মপাসাঁর চেয়ে অনেক উঁচুদরের স্রষ্টা"।'

বাঙলা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে রুশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়া সায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। 'ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন জায়গায় মনের মিল, অনুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকক্ষণ ধরে আপন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় মজলিসি কায়দায় পরিবেশন করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যে প্রচুর রাশান নভেল, ছোটগল্পের বই মজুত আছে সেকথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিদফ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাশ্চাত্যের লোক তার স্থিরবিচার এখনও হয়নি। সামান্য একটা উদাহরণ নিন না। খাঁটি পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটি প্রাচ্যের লোক, তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক, কুর্তাটা ঝুলিয়ে দেয় পাজামার উপরে। রাশানরা এ দু দলের মাঝখানে— শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান কুর্তা পরলে সেটা পাতলুনের উপর ঝুলিয়ে দেয়— সে কুর্তাও আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরি, তাতে অনেক রঙ অনেক নকশা।'

দেমিদফের মতো অত শান্ত ও ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইংরেজি যে খুব বেশি জানতেন তা নয়, তবু যেটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবেচিন্তে, সযত্নে শব্দ বাছাই করে করে।

রাশান সাহিত্যে আমার শখ দেখে তিনি টলস্টয়, গর্কি ও চেখফ ইয়াসনা পলিয়ানাতে যেসব আলাপ-আলোচনা করেছিলেন তার অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সবকিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি— কারণ টলস্টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতেন। জারের পতনের পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল— এখন আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্যের সমাধান হচ্ছে।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'সে কী কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনাদের প্রাক-বলশেভিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন।'

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগান্ডা।'

আমি আমার ভুল খবরের জন্য হন্তদন্ত হয়ে মাপ চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা চেখফ পড়ি ইংরেজিতে, লাল রুশের নিন্দাও পড়ি ইংরেজিতে।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভাব দেখে বুঝলুম তিনি ইংরেজ কী করে না-করে, কী বলে না-বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন মন্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনার থেকে বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা এসেছিলুম চারটের সময়; তখন বাজে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত পাপিরসি পুড়ল, কত চা চলল গল্পের তোড়ে আমি কিছুমাত্র লক্ষ করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এঁটো চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অজানতেই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, দু একবার দেখেই আমার পরিমাণটা শিখে নিয়েছেন। আমি কখনও ধন্যবাদ দিয়েছি, কখনও টলস্টয় গর্কির তর্কের ভিতরে ডুবে যাওয়ায় লক্ষ করিনি বলে পরে অনুতাপ প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখানেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'আরেক দিন হবে।' বেনওয়া সায়েব তো ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বড্ড বেশিক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একটু বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমন্তন্নটা অন্য অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ো, আমি সে অর্থে বলিনি; আমি সত্যিই আপনাদের গালগল্পে ভারি খুশি হয়ে ভাবলুম দু মুঠো খাবার জন্য কেন আপনাদের আড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশাটা কাটাবার জন্য বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটে এরকম খেতে বলার অর্থ হয়তো 'তোমরা এবার ওঠো, আমরা খেতে বসব।' আমার স্ত্রী সে ইঙ্গিত করেননি। জানেন তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনও আমাদের কুর্তা পাতলুনের উপরে পরে থাকি— অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।'

সক্কলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে-যাত্রা ডিনার হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেমিদফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রাশান শেখেন না কেন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি শেখাবেন?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়। With pleasure!'

বেনওয়া বললেন, 'No, not with pleasure' বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

বেনওয়া বললেন, 'এক ফরাসি লন্ডনের হোটেলে ঢুকে বলল, 'Waiter, bring me a cotlette, please!' ওয়েটার বলল, 'With pleasure Sir!' ফরাসি ভয় পেয়ে বলল, 'No, no, not with pleasure, with potatoes, please!'

www.pathagar.com

বেনওয়া বিদগ্ধ ফরাসি। একটুখানি হালকা রসিকতা দিয়ে শেষ পাতলা মেঘটুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম 'But I shall give you cotlettes with both pleasure and potatoes.'

রাস্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'এ দুটি যথার্থ খাঁটি লোক।'

আটাশ

হেমন্তের কাবুল 'মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে ফুলে ওঠে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মিড্‌ল্ এজ্ স্প্রেড।' অর্থাৎ ভুঁড়িটা মোটা হয়, চাল-চলন ভারিক্কি ভরা।

যবগমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীষ্ম-ভর রোদ বাতাস বৃষ্টি খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইলে ডাইনে-বাঁয়ে নাচন তোলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ডাল ভেঙে গাছতলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবান্ন হয়ে গিয়েছে, চাষিরাও খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছে। শীতকাতুরেরা দুটো একটা ফালতো জামা পরে ফেঁপেছে, গাধাগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড়-চাপানো গাড়ির পেট ফেটে গিয়ে এদিক-ওদিক কুটোর নাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে।

আর সফল হয়ে ফেঁপে উঠার আসল গরমি দেখা যায় সকালবেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মতো কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আংটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখায়— ঝলমলানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু এসব জেল্লাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মতো সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে বুক চিরে বালু ওড়ে। মার্কস্ তো আর ভুল বলেননি, 'শোষণ করেই সবাই ফাঁপে।'

যে পাগমান পাহাড়ের বরফের প্রাসাদে কাবুল নদীর জৌলুশ সে তার নীল চুড়োগুলো থেকে এক-একটা করে সবকটা বরফের সাদা টুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বড্ড বেশি বুড়িয়ে গেল— নীল চোখে ঘোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলের গন্ধে মাথা ধরে; আফগানিস্তানের সরাইয়ের চতুর্দিক বন্ধ বলে দুর্গন্ধ যেরকম বেরুতে পারে না, কাবুল উপত্যকার চারিদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বাড়ির সামনে যে ঘূর্ণিবায়ু খড়কুটো পাতা নিয়ে বাইরে যাবে বলে রওনা দেয় সেও দেখি খানিকক্ষণ পরে ঘুরেফিরে কোনওদিকে রাস্তা না পেয়ে সেই মাঠে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

তার পর একদিন সন্ধের সময় এল ঝড়! প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেলে দেখি শেলির 'ওয়েস্ট্ উইন্ড' কিটসের 'অটামকে' ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে— সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'। খড়কুটো, জমে-ওঠা পাতা, ফেলে-দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজরিন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সঙের মতো ডিগবাজি খেয়ে, কেউ হনুমানের মতো লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মতো ডানা মেলে দিয়ে আর বাদবাকি যেন ধনপতির দল— প্রলেতারিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে-ওকে জড়িয়ে ধরে।

www.pathagar.com

আধঘণ্টার ভিতর সব গাছ বিলকুল সাফ।

সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের দেশে বন্যার জল কেটে যাওয়ার পর কখনও কখনও দেখেছি কোনও গাছের শিকড় পচে যাওয়ায় তার পাতা ঝরে পড়েছে— সমস্ত গাছ ধবল-কুষ্ঠ রোগীর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

এখানে সব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে, নেঙ্গা সঙ্গীত আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

দু একদিন অন্তর অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। আবদুর রহমানকে জিগ্যেস করলুম কোথাও মড়ক লেগেছে কি না।

আবদুর রহমান বলল, 'না হুজুর, পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরাও ঝরে পড়ে। এই সময়েই তারা মরে বেশি।'

খবর নিয়ে দেখলুম, শুধু আবদুর রহমান নয়, সব কাবুলিরই এই বিশ্বাস।

ইতোমধ্যে আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমতো হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য দায়ী অবশ্য আবদুর রহমানই।

আমাকে খাইয়ে দাইয়ে রোজ রাত্রেই কোনও-একটা কাজ নিয়ে আমার পড়ার ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসে— কখনও বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়ায়, কখনও চাল ডাল বাছে, কখনও কাঁকুড়ের আচার বানায় আর নিতান্ত কিছু না থাকলে সব ক জোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আবদুর রহমানের জুতো বুরুশ করার কায়দা মামুলি সায়ান্স নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট। আমার দৃঢ়বিশ্বাস তার অর্ধেক মেহন্নতে মোনালিসার ছবি আঁকা যায়।

প্রথম খবরের কাগজ মেলে তার মাঝখানে জুতো জোড়াটি রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। তার পর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়াবে। তার পর লাগাবে এঞ্জিনের পিস্টনের গতিতে বুরুশ। তার পর মেথিলেটেড স্পিরিটে নেকড়া ভিজিয়ে বেছে বেছে যেসব জায়গায় পুরনো রঙ জমে গিয়েছে সেগুলো অতি সন্তর্পণে ওঠাবে। তার পর কাপড় ধোয়ার সাবানের উপর ভেজা নেকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপর থেকে আগের দিনের রঙ সরাবে। তার পর নির্বিকার চিত্তে আধঘণ্টাটাক বসে থাকবে জুতো শুকোবার প্রতীক্ষায়— 'ওয়াশে'র আর্টিস্টরা যেরকম ছবি শুকোবার জন্য সবুর করে থাকেন। তার পর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস-সুন্দরীও বুঝি এত যত্নে লিপস্টিক লাগান না— তখন আবদুর রহমানের ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধোলে সাড়া পাবেন না। তার পর বাঁ হাত জুতোর ভিতরে ঢুকিয়ে ডান হাতে বুরুশ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের বুরুশ চালাবে তখন মনে হবে বেহালার ডাকসাইটে কলাবৎ সমে পৌঁছবার পূর্বে যেন দ'য়ে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছেন। তখন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'শাবাশ' বললেও ওস্তাদ তেড়ে আসবেন।

সর্বশেষে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অদর্শনের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে-মুখে, কপালে-চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথমদিন আমি আপন অজানাতে বলে ফেলেছিলুম 'সাবাশ'।

www.pathagar.com

একটি আট-ন বছরের মেয়েকে তারই সামনে আমরা একদিন কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলুম— সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সকলের বলা-কওয়া শেষ তখন সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তবু তো আজ তেল মাখিনি'।

আবদুর রহমানের ঠিক সেই ভাব।

গোড়ার দিকে প্রায়ই ভেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ সরল ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেষটায় স্থির করলুম, ফারসিতে যখন বলেছে এই দুনিয়া মাত্র কয়েক দিনের মুসাফিরি ছাড়া আর কিছুই নয় তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাত কোথায়? এবং আফগান সরাই যখন সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কমরেড আবদুর রহমানকে এ ঘর থেকে ঠেকিয়ে রাখি কোন হকের জোরে? বিশেষত সে যখন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে, তবে আমিই-বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাশান ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না কেন?

আবদুর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা কমিয়ে দিয়ে রাশান রাজদূতাবাসে খেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মুইন-উস-সুলতানের কোর্টে টেনিসের বল যেরকম শক্ত, এক মুইন-উস্-সুলতানেকে বাদ দিয়ে আর সকলের হৃদয়ও সেরকম শক্ত— রাশান, রাজদূতাবাসের বল যেরকম নরম, হৃদয়ও সেরকম নরম।

আবদুর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হুজুর, ওরা সব বেদীন, বেমজহব।' অর্থাৎ ওদের সবকিছু 'ন দেবায়, ন ধর্মায়'।

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তোমাকে ওসব বাজে কথা কে বলেছে?'

সে বলল, 'সবাই জানে, হুজুর; ওদেশে মেয়েদের পর্যন্ত হায়া-শরম নেই, বিয়ে-শাদি পর্যন্ত উঠে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমানউল্লা তাদের এদেশে ডেকে এনেছেন কেন?' ভাবলুম এই যুক্তিটাই তার মনে দাগ কাটবে সবচেয়ে বেশি।

আবদুর রহমান বলল, 'বাদশা আমানউল্লা তো— ।' বলে থেমে গিয়ে চুপ করে রইল।

পরদিন টেনিস খেলার দু সেটের ফাঁকে দেমিদফকে জানালুম, প্রলেতারিয়া আবদুর রহমান ইউ.এস.আর. সম্বন্ধে কী মতামত পোষণ করে। দেমিদফ বললেন, 'আফগানিস্তান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। তবে তুর্কিস্তান অঞ্চলে আমাদের একটু আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কর্মধারা একটু অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছচ্ছে। আমরা উপর থেকে তুর্কিস্তানের কাঁধে জোর করে নানারকম সংস্কার চাপাতে চাইনে; আমরা চাই তুর্কিস্তান যেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নিয়ে বাকি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিদফের স্ত্রী বললেন, 'বুখারার আমির আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ শোষক-সম্প্রদায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানারকম প্রোপাগান্ডা চালাতে কসুর করছে না, তা তো জানেনই।'

www.pathagar.com

আমি কম্যুনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এঁদের কথা বলার ধরন, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করল রাজদূতাবাসের ভিতর এঁদের সামাজিক জীবন। অন্যান্য রাজদূতাবাসে বড়কর্তা, মেজকর্তা ও ভদ্রেতরজনে তফাত যেন গৌরীশঙ্কর, দুমকা পাহাড় আর উইয়ের ঢিপিতে। এখানে যে কোনও তফাত নেই, সেকথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু পার্থক্য কখনও রূঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাহ্ণ, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি দেমিদফের বসবার ঘরে। তখন এম্বেসির কত লোক সেখানে এসেছেন, পাপিরসি টেনেছেন, গল্প-গুজব করেছেন। তাঁদের কেউ সেক্রেটারি, কেউ ডাক্তার, কেউ কেরানি, কেউ আফগান এয়ারফোর্সের পাইলট— দেমিদফ স্বয়ং রাজদূতাবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান খাতির-যত্ন পেয়েছেন; জিগ্যেস না করে জানবার কোনও উপায় ছিল না যে, কে সেক্রেটারি আর কে কেরানি।

খোদ অ্যামবেসডর অর্থাৎ রুশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিভূ তাভারিশ স্ট্রেঙ পর্যন্ত সেখানে আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানফ সায়েবের তালিম মতো খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে শেকহ্যান্ড করে বললুম, 'I am honoured to meet your Excellency!' কিন্তু আমার চোস্ত ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোর হাত-ঝাঁকুনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মতো এমনিধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত 'ভদ্রস্থতা' যেন দু টুকরো হয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল।

মাদাম দেমিদফ বললেন, 'ইনি রুশ সাহিত্যের দরদী।'

কোনও ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন, 'রিয়েলি? হাউ ইন্টারেস্টিঙ!' তার পর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্ট্রেঙ বললেন, 'তাই নাকি, তা হলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তখন আপন আপন গল্পে ফিরে গিয়েছেন। স্ট্রেঙ প্রথমেই গোটাকয়েক চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিদ্যের চৌহদ্দি জরিপ করে নিলেন, তার পর পুশকিনের গীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন। যে অংশ বেছে নিলেন সে-ও ভারি মরমিয়া। ওনিয়েগিন সংসারে নানা দুঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তাঁর প্রথমা প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে প্রেম নিবেদন করছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথম যৌবনের নষ্ট দিবসের কথা ভেবে বলেছেন, 'ওনিয়েগিন, হে আমার বন্ধু, আমি তখন তরুণী ছিলুম, হয়তো সুন্দরীও ছিলুম'—

আমাদের দেশের রাধা যেরকম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে।'

আমি তন্ময় হয়ে শুনলুম। আবৃত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনতে পাব স্বয়ং চার্চিল হেদোর পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনেবাদাম খেয়ে সশব্দে ডাইনে-বাঁয়ে নাক ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্য ব্রিটিশ রাজদূত প্রথমদর্শনে অভ্যাগতকে কিটসের 'ইসাবেলা' শোনাচ্ছেন, এ যেন 'শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না কর প্রত্যয়।'

ব্রিটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখেছি স্ট্রাইপ্‌ড্ স্ট্রাউজার আর স্প্যাটপরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতান্ত দৈবদুর্বিপাকে এক

www.pathagar.com

দুশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটাচ্ছেন। 'কিটস কে, অথবা কারা?— পিছনে যখন বহুবচনের "এস্" রয়েছে? পাসপোর্ট চায় নাকি? বলে দাও, ওসব হবে-টবে না।'

এমনকি, ফরাসি রাজদূতকেও কখনও বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি। বেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বললেন? মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন কাবুল? ম দিয়ো! উনি হচ্ছেন মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন মাবুল—'

'মাবুল' অর্থ অভিধানে লেখে, Loony, off his nut!

স্ট্রেঙ বললেন, 'তিনি রাজদূতাবাসের সাহিত্যসভাতে চেখফ সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোখের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। আরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চড়ুইপাখি শিকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ চললেও চলতে পারে, কিন্তু চেখফ, বাই গ্যাড্, স্যার!'

আমি বললুম, 'রাশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করার বাসনা রাখি।'

স্ট্রেঙ বললেন, 'বিলক্ষণ! আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোনও স্বত্ব সংরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলুম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্য চতুর্দিকে ঝুলে থাকেননি। ছোট্ট ছোট্ট দল পাকিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মশগুল ছিলেন। আর সকলে কী নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, তবে একটা কথা নিশ্চয় জানি যে, তাঁরা ড্রয়িংরুমে বসে চাকরের মাইনে, ধোপার গাফিলি আর মাখনের অভাব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালাতে পারেন না!

নিতান্ত ছোট জাত! আর শুধু কি তাই; এমনি বজ্জাত যে, সেকথাটা ঢাকবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না!

সাধে কি আর ইংরেজের সঙ্গে এদের মুখ-দেখা পর্যন্ত বন্ধ।

ইংরেজ তখন মস্কো-বাগে দুরবিন লাগিয়ে স্তালিন আর ত্রৎস্কি দলের মোষের লড়াই দেখছে, আর দিন গুনছে ইউ.এস.এস.আর-এর তেরটা বাজবে কখন।

এসব হচ্ছে ১৯২৭ সালের কথা।

ঊনত্রিশ

কবি বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' আমানউল্লা ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরুলেন, আমিও শীতের দু মাসের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যযুগ নয় বলে প্রবাদের মাত্র আধখানা ফলল— আমি ইয়োরোপ গেলুম না, গেলুম দেশে।

উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না কিন্তু ভারতবর্ষে দেখি আমানউল্লার ইয়োরোপে ভ্রমণ নিয়ে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আমানউল্লার সম্মানে প্রাচ্য ভারতবাসী যেন নিজের সম্মান অনুভব করছে।

আমাকে ধরল হাওড়া স্টেশনে কাবুলি পাজামা আর পেশাওয়ারের টিকিট দেখে— হয়তো লান্ডিকোটাল থেকে খবরও পেয়েছিল। তন্ন তন্ন করে সার্চ করল অনেকক্ষণ ধরে,

www.pathagar.com

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল তারও বেশিক্ষণ ধরে— যেন আমি মেকি সিকিটা। কিন্তু আমি যখন কাবুলের কাস্টম হৌসে তালিম পেয়েছি, তখন ধৈর্যে আমাকে হারাতে পারে কোন বাঙালি অফিসার। খালাস পেয়ে অজানাতে তবু বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা গেরো রে বাবা।'

বাঙালি অফিসার চমকে উঠলেন, বললেন, 'দাঁড়ান, আপনি বাঙালি, তা হলে আরও ভালো করে সার্চ করি।'

বললুম, 'করুন, আমার নাম কমলাকান্ত।'

দেশে পৌঁছে মাকে দিলুম এক সুটকেসভর্তি বাদাম, পেস্তা— অষ্ট গণ্ডা পয়সা খরচ করে কাবুল শহরে কেনা। মা পরমানন্দে পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াগাঁওয়ে যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল, সে-ও বাদ পড়ল না।

কিন্তু থাক। সাত মাস কাবুলে কাটিয়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি যে, বাঙালি কাবুলির চেয়ে ঢের বেশি হুঁশিয়ার। তারা যে আমার এ-বই পয়সা খরচ করে কিনবে, সে আশা কম। তাই ভাবছি, এ দু মাসের গর্ভাঙ্কটা 'সফর-ই হিন্দ' নাম দিয়ে ফারসিতে ছাপাব। তাই দিয়ে যদি দু পয়সা হয়। কাবুলি কিনুক আর না-ই কিনুক, উদ্যমটার প্রশংসা নিশ্চয়ই করবে। কারণ ফারসিতেই প্রবাদ আছে—

'খর বাশ ও খুস বাশ ও ইয়া সগে মুরদার বাশ।
খরচে বাশী বাশ আম্মা আন্দকি জরদার বাশ ॥'

'হও না গাধা, হও না শুয়োর, হও না মরা কুকুর।
যা ইচ্ছে হও কিন্তু রেখো রত্তি সোনা টুকুর ॥'

ত্রিশ

ফিরে দেখি সর্বত্র বরফ, দোরের গোড়ায় আবদুর রহমান আর ঘরের ভেতর গনগনে আগুন। আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।

আবদুর রহমান হাসিমুখে আমার হাতে চুমো খেল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। 'দাঁড়ান হুজুর' বলে আমাকে কোলে করে এক লাফে উঠানে নেবে গেল। এক মুঠো পেঁজা বরফ হাতে নিয়ে আমার নাক আর কানের ডগা সেই বরফ দিয়ে ঘন ঘন ঘষে আর ভীতকণ্ঠে জিগ্যেস করে 'চিন্ চিন্' করছে কি না। আমি ভাবলুম, এও বুঝি পানশিরের কোনও জংলি অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'চল, চল, ঘরের ভিতর চল, শীতে আমার হাড়মাস জমে গিয়েছে।' আবদুর রহমান কিন্তু তখন তার শালপ্রাংশু মহাবাহু দিয়ে আমাকে এমনি জড়িয়ে ধরে দু কানে বরফ ঘষছে যে, আমি কেন, কিঙ্কড় সিংয়েরও সাধ্যি নেই যে, সে-ব্যূহ ছিন্ন করে বেরুতে পারে। আবদুর রহমান শুধু বরফ ঘষে

www.pathagar.com

অনুভব করলুম সত্যিই নাক আর কানের ডগায় ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার সময় যেরকম চিন্ চিন্ করে সেরকম হতে আরম্ভ করেছে। আবদুর রহমানকে সে খবরটা দেওয়ামাত্রই সে আমাকে কোলে করে আরেক লাফে ঘরে ঢুকল, কিন্তু বসাল আগুন থেকে দূরে ঘরের আরেক কোণে। রোদে-পোড়া মোষ যেরকম কাদার দিকে ধায়, আমিও সেইরকম আগুনের দিকে যতই ধাওয়া করি, আবদুর রহমান ততই আমাকে ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'সর্বাঙ্গে রক্ত চলাচল শুরু হোক, হুজুর, তার পর যত খুশি আগুন পোয়াবেন!'

ততক্ষণে সে আমার জুতো খুলে পায়ের আঙুলগুলো পরখ করে দেখছে সেগুলোর রঙ কতটা নীল। আবদুর রহমানের চেহারা থেকে আন্দাজ করলুম নীল রঙের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। ঘষে ঘষে আঙুলগুলোকে যখন বেশ বেগুনি করে ফেলল তখন সে চেয়ারসুদ্ধ আমাকে আগুনের পাশে এনে বসাল। আমি ততক্ষণে দস্তানা খুলতে গিয়ে দেখি কমলি ছোড়তে চায় না— আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু ছেলে যেরকম খাওয়ার সময় মাকে পেট কামড়ানোর খবর দেয় না আমিও ঠিক সেইরকম আঙুল ফোলার খবরটা চেপে গেলুম। সরল আবদুর রহমান ওদিকে আমার পায়ের তদারক করছে, আমি ওদিকে আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে আরাম করে দেখি, কলাগাছ বটগাছ হতে চলেছে। ততক্ষণে আবদুর রহমান লক্ষ করে ফেলেছে যে, আমার হাত তখনও দস্তানাপরা। টমাটোর মতো লাল মুখ করে আমাকে শুধাল, 'হাতের আঙুলও যে জমে গিয়েছে সেকথাটা আমায় বললেন না কেন?' এই তার প্রথম রাগ দেখলুম। ভৃত্য আবদুর রহমানের গলায় আমির আবদুর রহমানের গলা শুনতে পেলুম। আমি চিঁ চিঁ করে কী একটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'চা খাওয়ার পরও যদিও দস্তানা না খোলে তবে আমি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলব।'

আমি শুধালুম, 'কী কাটবে? হাত না দস্তানা?'

আবদুর রহমান অত্যন্ত বেরসিক। আমি আরও ঘাবড়ে গেলুম।

কিন্তু শুধু আমিই ঘাবড়াইনি। দস্তানা পর্যন্ত আবদুর রহমানের গলা শুনে বুঝতে পেরেছে যে, সে চটে গেলে দস্তানা, দস্ত কাউকে আস্ত রাখবে না। চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাসের পঞ্চপাশ খসে গেল।

সে রাত্রে আবদুর রহমান আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আপন হাতে বিছানায় শুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বোতল ফ্ল্যানেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটাতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-ঋষিদের সিংহাসনে পদাঘাত করার সুখ অনুভব করলুম। পেটের ভিতর চর্বির ঘন শুরুয়া, লেপে-চাপা গরম বোতলের ওম, আর আবদুর রহমানের বাঘের থাবার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটি যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এ বই কোনওদিন কারও কোনও কাজে লাগবে না। আর আজকের দিনের ভারতদণ্ডিন্ কম্যুনিস্টরা বলেন, 'যে-আর্ট কাজে লাগে না সে-আর্ট আর্টই নয়। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি দেয়ালে মশারির পেরেক পোঁতা না যায় তবে সে শিবলিঙ্গের 'কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

www.pathagar.com

তবু যদি কোনওদিন পাকচক্রে ফ্রস্টবিটন্ হন তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওঝা আবদুর রহমানকে স্মরণ করে তার দাওয়াই চালাবেন। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেন আপনার কৃতজ্ঞতা আবদুর রহমানের দিকে ধায়। আবদুর রহমানের প্রাপ্য প্রশংসা আমি কেতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক', 'বুর্জুয়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরদিন সকালবেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেঙে বৃদ্ধ মীর আসলম এসে উপস্থিত; বললেন, 'আত্মজনের বাচনিক অবগত হইলাম তুমি কল্য রজনীর প্রথম যামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। কুশল-সন্দেশ কহ। শৈত্যাধিক্যে পথিমধ্যে অত্যধিক ক্লেশ হয় নাই তো?'

আমি আবদুর রহমানের কবিরাজির সালঙ্কার বর্ণনা দিলে মীর আসলম বললেন, 'নাতিদীর্ঘদিবস তথা শর্বরীর প্রথম যামই স্বতশ্চলশকটারোহীকে শিশিরবিদ্ধ করিতে সক্ষম। কৃশানুসংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচারক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ লক্ষ করো নাই, স্বদেশে আতপতাপে দগ্ধ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই সুশীলা জননী তদ্দণ্ডেই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, অবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না? সঙ্কটদ্বয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গ্রথিত।'

হক কথা।

বললুম, 'ইয়োরোপে আমানউল্লার সংবর্ধনা নিয়ে হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অনুভব করছে।'

মীর আসলম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিদেশে সম্মান-প্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।'

এ যেন চাণক্য-শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম, জিগ্যেস করি, মহাশয় ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, মুসলমানি না হিন্দুয়ানি, কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম, 'আমানউল্লা বিদেশে সম্মান পাওয়াতে স্বদেশে সংস্কার কর্ম করবার সুবিধা পাবেন না?'

মীর আসলম বললেন, 'সংস্কার-পঙ্কে যে নৃপতি কণ্ঠমগ্ন, বৈদেশিক সম্মান-মুকুটের গুরুভার তাঁহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করিবে।'

আমি বললুম, 'রানি সুরাইয়াকে দেখবার জন্য প্যারিসের ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, অদ্য যদি তুমি তোমার পদদ্বয়ের ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হও, তবে তোমার মতো স্বল্পপরিচিত মনুষ্যেরও এবম্বিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।'

আমি বললুম, 'কী মুশকিল, তুলনাটা আদপেই ঠিক হল না; রানি তো আর কোনওরকম পাগলামি করছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অন্য কোন বাতুলতা প্রত্যাশা কর? অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবর্ত্মে কোন মুসলমান রমণী এবম্বিধ আশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে?'

আমি বললুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কুরান-হদিস পড়েছেন; মুখ দেখানো তো আর কুরান-হদিসে বারণ নেই।'

www.pathagar.com

মীর আসলম বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে অবান্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি আলোচনাটা হালকা করবার জন্য বললুম, 'জানেন, ফরাসি ভাষায় 'সুরীর' শব্দের অর্থ "মৃদু হাসি"। রানি সুরাইয়ার নাম তাই প্যারিসের সক্কলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'আমির হবিবউল্লার নামের অর্থ "প্রিয়তম বান্ধব"; ইংরেজ শতবার এই শব্দার্থের প্রতি আমিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শত্রুহস্তের লৌহকীলক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবিবউল্লার কোন হবিব তাঁহাকে স্মরণ করিল? অপিচ, হবিবউল্লার হবিববর্গই তাঁহাকে পুলসিরাতের (বৈতরণীর) প্রান্তদেশে অকারণে, অসময়ে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল।'

আমি বললুম, 'ও তো পুরনো কাসুন্দি। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমানউল্লার সংস্কার পছন্দ করেন না?'

বললেন, 'বৎস, গুরুর পদসেবা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষাসংস্কারের বিরুদ্ধে কেন দণ্ডায়মান হইব? কিন্তু আমানউল্লা যে ফিরিঙ্গি-শিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া ঘৃণাবোধ করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার সুমিষ্ট চৈনিক যুষ পরিত্যাগ করিয়া এই তিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কী লভ্য। যুষপত্র কি তুমি স্বদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ? গুরুগৃহের সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বললুম, 'আপনার জন্যও এক প্যাকেট এনেছি।'

মীর আসলম সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভদ্র, শুল্কোদ্ধরণিকের ন্যায্য প্রাপ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য?'

আমি বললুম, 'আপনার কোনও ভয় নেই। কাবুল কাস্টম হৌসকে ফাঁকি দেবার মতো এলেম আমার পেটে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্যায্য দাবিদাওয়া কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম খাইয়ে আমি কি আখেরে জাহান্নমে যাব?'

মীর আসলম আমাকে শীতকালে কোন কোন বিষয়ে সাবধান হতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, আবদুর রহমানকে ডেকে ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুল-বস্ত্রইন্ধন সম্বন্ধে নানা সুযুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তার পর এলেন মৌলানা। আমি আমানউল্লার বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মীর আসলমের মন্তব্য তাঁকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমানউল্লা যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, 'মুস্তফা কামাল যদি তুর্কিকে, রেজা শাহ যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন, তবে আমানউল্লাই-বা পারবেন না কেন?' এই হল তাদের মনের ভাব; কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেন না। কারণ কোনওরকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলি সংস্কারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধর না শুক্রবারের বদলে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন করা।'

www.pathagar.com

মৌলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুম্মার নামাজের হিড়িকে সমস্ত দিনটা কেটে যায়, ফালতো কাজ-কর্ম করার ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই আমানউল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি, আর শুক্রবারে জুমার নামাজের জন্য আধ ঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টার ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কারণ বের করেছি। এই দেখ না অ্যারোপ্লেনে করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বুধবার বেরোও, এখানে পৌঁছবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে, তার পর ইরাক পৌঁছবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তার পরের দিন প্যালেস্টাইনে— সেখানে ইহুদিদের জন্য শনিবার ছুটি, তার পরের দিন রবিবারে ইয়োরোপে, তার পরের দিন সাউথ-সি আয়লেন্ডে, সেখানে তো তামাম হপ্তা ছুটি।'

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছ, কিন্তু বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছ তো? না হলে বরফ ভেঙে কাবুলে ফিরবে কী করে?

মৌলানা বললেন, 'দু একদিনের মধ্যেই বরফের উপর পায়ে চলার পথ পড়ে যাবে, আসতে-যেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে, বউকে নিয়ে আসতে। বেনওয়া সায়েব মত দিয়েছেন, তুমি কী বল?'

আমি শুধালুম, 'বউ রাজি আছেন?'

মৌলানা বললেন, 'হ্যাঁ'।

আমি বললুম, 'তবে আর কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? তোমাদেরই ভাষায় তো রয়েছে বাপু—

'মিয়া বিবি রাজি
কিয়া করে কাজি?'

মনে মনে বললুম, 'বগদানফ গেছেন, তোমার দাড়িটির দর্শনও এখন আর কিছুদিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের 'কা তব কান্তা' হতে অন্তত ছটি মাস লাগার কথা।'

মৌলানা চলে যাওয়ার পর আবদুর রহমানকে ডেকে বললুম, 'দাও তো হে কুর্সিখানা জানালার কাছে বসিয়ে; বাকি শীতটা তোমার ওই বরফ দেখেই কাটাব।'

আবদুর রহমানের বর্ণনামাফিক সবরকমেরই বরফ পড়ল। কখনও পেঁজা পেঁজা, কখনও গাদা গাদা, কখনও ঘূর্ণিবায়ুর চক্কর খেয়ে দশদিক অন্ধকার করে, কখনও আস্বচ্ছ যবনিকার মতো গিরিপ্রান্তর ঝাপসা করে দিয়ে; কখনও অতি কাছে আমারই বাতায়ন পাশে, কখনও বহুদূরে সানুশ্লিষ্ট হয়ে, শিখর চুম্বন করে। আস্তে আস্তে সবকিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁতভাঙা পুরনো চিরুনিখানা ঠাকুরমা যেন দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রেখে বরফের পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আবদুর রহমান মর্মাহত। আমাকে প্রতিবার চা দেবার সময় একবার করে বাইরের দিকে তাকায় আর আর্তস্বরে বলে, 'না হুজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানি বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানশিরে। চেয়ে দেখুন বরফের চাপে এখনও গেট বন্ধ হয়নি। মানুষ এখনও দিব্যি চলাফেরা করছে, ফেঁসে যাচ্ছে না।'

www.pathagar.com

আবদুর রহমানের ভয়, পাছে আমাকে বোকা পেয়ে কাবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ গছিয়ে দেয়। নিতান্তই যদি কিনতে হয় তবে যেন আমি কিনি আসল, খাঁটি মাল 'মেড্ ইন পানসির'।

একত্রিশ

শীত আর বসন্ত ঘরে বসে, ডুবসাঁতার দিয়ে কাটাতে হল।

এদেশে বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্য যে কোনও দিবসেই হোক ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ বারতা পেয়ে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দন-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তার পর নববসন্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল ফ্যাকাশে সাদা গাছগুলোতে বুঝি কোনওরকম সবুজ পোকা লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি গাছে অগুনতি ছোট্ট ছোট্ট পাতার কুঁড়ি; জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মতো। তার পর কয়েকদিন লক্ষ করিনি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি সেগুলো ফুটেছে আর দুটি দুটি করে পাতা ফুটে বেরিয়েছে— গাছগুলো যেন সমস্ত শীতকাল বকপাখির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ডানা মেলে উড়বার উপক্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবুজ বলাকা যেন মেলে ধরছে লক্ষ লক্ষ অঙ্কুরের পাখা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দির।

গাছে গাছে দেখন-হাসি, পাতায় পাতায় আড়াআড়ি— কে কাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। কোনও গাছ গোড়ার দিকে সাড়া দেয়নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলি চোখ মেলে দেখে আর সবাই ঢের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুট লাগাল যে, দেখতে না দেখতে আর সবাইকে পিছনে ফেলে বাজি জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে দুলতে লাগল। কেউ সারা গায়ে কিছু না পরে শুধু মাথায় সবুজ মুকুট পরল, কেউ ধীরে-সুস্থে সর্বাঙ্গে যেন সবুজ চন্দনের ফোঁটা পরতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো ডালের ভিতর দিয়ে হুহু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কী আদরে পাতাগুলোর গায়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কাবুল নদীর বুকের উপর জমে-যাওয়া বরফের জগদ্দল-পাথর ফেটে চৌচির হল। পাহাড় থেকে নেমে গম্ভীর গর্জনে শত শত নব জলধারা— সঙ্গে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ পাথরের নুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে— সিকন্দর শাহের আমল থেকে তারা হাঁটু ভেঙে কতবার নুয়ে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসাব কেউ কখনও রাখতে পারেনি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলাম্বুজের মতো নবীন নীলাকাশ হংসশুভ্র মেঘের ঝালর ঝুলিয়ে চন্দ্রাতপ সাজিয়েছে।

www.pathagar.com

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বন্যায় জনপদ অরণ্য ডুবে গিয়েছে। এরকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়ার শ্যামল রঙের স্মরণে বলেছিলেন।

ও বন্ধুয়া, কোন্ বন-ধোওয়া ছাঁওলা নীলা পানি,
গোসল করি হইলা তুমি সকল রঙের রানি।

কিন্তু এ-উপত্যকা এ-বনরাজি এরকম সবুজ পেল কোথা থেকে?

নীলাকাশের নীল আর সোনালি রোদের হলদে মিশিয়ে।

কিন্তু আমাদের বর্ষা আর এদেশের বসন্তে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়, এদেশের জনপ্রাণীর মন বাহিরমুখো হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে সুপ্তোত্থিত নব যৌবনের স্পন্দন অনুভব করে তারই স্মরণে কবি বলেছেন—

শপথ করিনু রাত্রে পাপ পথে আর যেন মন নাহি ধায়,
প্রভাতে দ্বারেতে দেখি শপথঘ্ন মধুঋতু কি করি উপায়।

শুধু ওমর খৈয়াম দোটানার ভিতর থাকা পছন্দ করেন না। তিনি গর্জন করে বললেন—

বিধিবিধানের শীতপরিধান
ফাগুন আগুনে দহন করো।
আয়ুবিহঙ্গ উড়ে চলে যায়
হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো।*

কাবুলিরা তাই বেরিয়ে পড়েছে, না বেরিয়ে উপায়ও নেই— শীতের জ্বালানি কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, দুম্বা ভেড়ার জাবনা তলায় এসে ঠেকেছে, শুঁটকি মাংসের পোকা কিলবিল করছে। এখন আতপ্ত বসন্তের রোদে শরীরকে কিঞ্চিৎ তাতানো যায়, দুম্বা ভেড়া কচি ঘাসে চরানো যায় আর আধখেঁচড়া শিকারের জন্য দু চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আবদুর রহমান বলল, পানশির অঞ্চলের ভাঙা বরফের তলায় কী এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোনওরকমের স্প্রিং ট্রাউটই হবে।

রথ দেখার সময় যাঁরা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে নজর দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যক্ষকে ঠিক একটি বৎসরের জন্যই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। ছয় ঋতুতে ছয় রকম করে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষ নাকি পরিপূর্ণ বিচ্ছেদবেদনার স্বরূপ চিনতে পারে না; আর বিদগ্ধ জনকে এক বছরের বেশি শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনও সূক্ষ্ম চতুরতা নেই— সোজা বাংলায় তখন তাকে বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান-সরকার অযথা বিঘ্ন-সন্তোষী নন বলে ছয়টি ঋতু পূর্ণ হওয়ামাত্রই আমাকে পাণ্ডববর্জিত গণ্ডগ্রামের নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে চাকরি দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই-দরিয়ায় অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে, রাশান দূতাবাসের গা ঘেঁষে, বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে একই বাড়িতে।

---

* অনুবাদকের নাম মনে নেই বলে দুঃখিত।

www.pathagar.com

প্রকাণ্ড সে বাড়ি। ছোটখাটো দুর্গ বললেও ভুল হয় না। চারদিকে উঁচু দেয়াল, ভেতরে চকমেলানো একতলা-দোতলা নিয়ে ছাব্বিশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চত্বরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। বড়লোকের বাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে— বেনওয়া সায়েব ফন্দি-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোণে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোণে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকি বাড়িটা খাঁ খাঁ করে, আর সে এতই প্রকাণ্ড যে আবদুর রহমানের সঙ্গীত রবও কায়ক্লেশে আঙিনা পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছায়।

শহরে এসে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই— দু দিন না গেলে দেমিদফ এসে দেখা দেন।— সইফুল আলম মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে যান, সোমত্থ বউ সম্বন্ধে অহরহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘূর্ণিবায়ুর মতো বেলা-অবেলায় চক্কর মেরে বেরোবার সময় 'কলাডা মুলাডা' ফেলে যান, বিদগ্ধ মীর আসলম সুসিদ্ধ চৈনিক যুষ পান করে যান, তাছাড়া ইনি উনি তিনি তো আছেনই আর নিতান্ত বান্ধব বাড়ন্ত হলে বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদূতাবাসে আরও অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল; দেমিদফকে বাদ দিয়ে সকলের পয়লা নাম করতে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ— ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুবাহু বললে আবদুর রহমান বরঞ্চ অপাঙ্‌ক্তেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণনা গলাধঃকরণ করে অনায়াসে সেকেন্ড হেলপিঙ চাইতে পারেন।

আবদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যে দ্বিতীয় নরদানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সে-বিভীষিকা।

বহুবার এঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি— কাবুল বাজারের মতো পপুলার লিগ অব নেশনসে আজ পর্যন্ত এমন দেশি-বিদেশি চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যায়নি।

হুঁশিয়ার সোয়ার হলে তক্ষুনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে— বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনের পা-দুটো আকাশে তুলতে দেখেছি।

টেনিস-কোর্টে রেকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ বেজ-লাইনের দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ বেজে দাঁড়ালে তাঁর কোনও পার্টনার নেটে দাঁড়াতে রাজি হত না, শত্রুপক্ষের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের রেকেট ঘন ঘন ছিঁড়ে যেত বলে অ্যালুমিনিয়ম জাতীয় ধাতুর রেকেট নিয়ে তিনি তাড়ু হাঁকড়াতেন, স্বচ্ছন্দে নেট ডিঙোতে পারতেন— লাফ দেবার প্রয়োজন হত না— আর, ঝোলা নেট টাইট করার জন্যে এক হাতে হ্যান্ডেল ঘোরাতেন মেয়েরা যেরকম সেলাইকলের হাতল ঘোরায়।

শুনেছি বিলেতে কোনও কোনও ফিলম্ নাকি ষোল বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না— চরিত্রদোষ হবে বলে; যাদের ওজন একশো ষাট পৌন্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি বলশফের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া কাঁধ থেকে খসে যায়। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

বীরপুরুষ হিসেবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের খাতির ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশেভিক বিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে-বিদেশে বিস্তর লড়াই লড়েছেন। ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে যখন রুশবাহিনী পোল্যান্ডে লড়াই হেরে পালায় তখন বলশফ রাশান ক্যাভালরিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তার পিঠের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল— বিস্তর ঝুলোঝুলির পর একদিন শার্ট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনও-কোনওটা তখনও আধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'পৃষ্ঠে তব অস্ত্র-লেখা।'

বলশফকে কেউ কখনও চটাতে পারেনি বলেই রসিকতাটা করেছিলুম। তিনি ভারতবর্ষের ক্ষাত্র বীরত্বের, 'কোড' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতুম তবে ব্রথস্কির আমলে পোলদের বেধড়ক পাল্টা মার দেবার সুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তার কী?'

মাদাম দেমিদফ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আর জানেন তো, মসিয়ো, ওই লড়াইতেই সোভিয়েট রাশার অনেক পথ সুরাহা হয়ে যায়।'

বলশফের একটা মস্ত দোষ দু-দণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত দু খানা নিয়ে যে কী করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা-সেটা নিয়ে সবসময় নাড়াচাড়া করেন, বেখেয়ালে একটু বেশি চাপ দিতেই কর্কস্ক্রুটা পর্যন্ত ভেঙে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমরা টুকিটাকি সব জিনিস তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলতুম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তাকে একথালা আস্ত আখরোট খেতে দিতুম।

দুটো-একটা খেতেন মাঝে মাঝে— যাওয়ার পর দেখা যেত সব কটি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, চহারমগজশিকন (হাতুড়ি) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এরকম অজাতশত্রু লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি দুটি দেখিনি। একদিন তাই যখন দেমিদফের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল তখন বলশফের সবচেয়ে দিল্লি-দোস্ত রোগাপটকা স্নিয়েশকফ বললেন, 'বলশফের সঙ্গে সক্কলের বন্ধুত্ব তার গায়ের জোরের ভয়ে।'

বলশফ বললেন, 'তা হলে তো তোমার সবচেয়ে বেশি শত্রু থাকার কথা।'

স্নিয়েশকফ যা বললেন, পদাবলির ভাষায় প্রকাশ করলে তার রূপ হয়—

'বঁধূ তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তুঁহারি রূপে—'

বাকিটা তিনি আর প্রাণের ভয়ে বলেননি।

বলশফ বললেন, 'রোগা লোকের ওই এক মস্ত দোষ। খামকা বাজে তর্ক করে। বলে কি না 'ভয়ে বন্ধুত্ব!' যত সব পরস্পরদ্রোহী, আত্মঘাতী বাক্যাড়ম্বর!'

বলশফ সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ তিনি তখন আমানউল্লাহর অ্যারফোর্সের ডাঙর পাইলট। বলশেভিক-বিদ্রোহ জুড়িয়ে গিয়ে থিতিয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী মন কাবুলে এসে নতুন বিপদের সন্ধানে আমানউল্লার চাকরি নিয়েছিল।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমানউল্লার সেবা করেছিলেন।

www.pathagar.com

বত্রিশ

আমানউল্লা ইয়োরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামি আসবাবপত্র, অগুনতি মোটরগাড়ি আর বক্তৃতা দেবার বদঅভ্যাস। প্রাচ্যদেশের লোক খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে আরামে গা এলিয়ে দেয়, পশ্চিমে ডিনারের পর স্পিচ, লাঞ্চের পর অরেটরি— তাও আবার যত সব শিরঃপীড়াদায়ক পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে।

সায়েবরা বিলেতে লাঞ্চে ডিনারে আমানউল্লাকে যে নেশার পয়লা পাত্র খাইয়ে দিয়েছিল তার খোয়ারি তিনি চালালেন কাবুলে ফিরে এসে, মাত্রা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে। পরপর তিন দিনে নাকি তিনি একুনে ত্রিশ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু কারও কথায় তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, কাবুলে চিঁড়ের প্রচলন নেই— কাজেই শ্রোতারা কেউ ঘুমাল, কেউ শুনল, দু একজন মনে মনে ইয়োরোপে তাঁর বাজে খরচার আঁক কষল।

তার পর আরম্ভ হল সংস্কারের পালা। একদিন সকালবেলা মৌলানার বাড়ি যেতে গিয়ে দেখি পনেরো আনা দোকানপাট বন্ধ। বড় দোকানের ভিতর গ্রামোফোন-ফোটোগ্রাফের দোকানটা খোলা ছিল। দোকানদার পাঞ্জাবি, অমৃতসরের লোক; আমাদের সঙ্গে ভাব ছিল।

খবর শুনে বিশ্বাস হল না। আমানউল্লার হুকুম, 'কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসে দোকান চালাবার কায়দা বেআইনি করা হল; সব দোকানে বিলিতি কায়দায় চেয়ার-টেবিল চাই।'

আমি বললুম, 'সে কী কথা? ছুতোর কামার, কালাইগর, মুচি?'

'সব, সব।'

'ছোট ছোট খোপের ভিতর চেয়ার-টেবিল ঢোকাবে কী করে, পাবেই-বা কোথায়?'

নিরুত্তর।

'যারা পয়সাওয়ালা, যাদের দোকানে জায়গা আছে?'

'রাতারাতি মেজ-কুর্সি পাবে কোথায়? ছুতোরও ভয়ে দোকান বন্ধ করেছে। বলে, চেয়ারে বসে টেবিলে তক্তা রেখে নাকি র‍্যাঁদা চালাতে শেখেনি।'

'আগের থেকে নোটিশ দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়নি?'

'না। জানেন তো, আমানউল্লা বাদশার সব-কুছ ঝটপট্।'

পাক্কা তিন সপ্তাহ চোদ্দ আনা দোকানপাট বন্ধ রইল। গম ডাল অবিশ্যি পিছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে বিক্রি হল, তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু পয়সা কামিয়ে নিল।

আমানউল্লা হার মানলেন কি না জানিনে তবে তিন সপ্তাহ পরে একে একে সব দোকানই খুলল— পূর্ববৎ, অর্থাৎ বিনা চেয়ার-টেবিল। কাবুলের সবাই এই ব্যাপারে চটে গিয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু রাজার খামখেয়ালিতে তারা অভ্যস্ত বলে অত্যধিক উষ্মাবোধ করেনি। কাবুলিদের এ মনোভাবটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি, কারণ আমরা ভারতবর্ষে অত্যাচার-অবিচারে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু খামখেয়ালি বড়-একটা দেখতে পাইনে।

www.pathagar.com

আমার মনে খটকা লাগল। পাগমানের পাগলামির কথা মনে পড়ল— গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংসুট পরাবার বিড়ম্বনা। এ যে তারই পুনরাবৃত্তি; এ যে আরও পীড়াদায়ক, মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধানুকরণ।

মীর আসলমের সঙ্গে দেখা হলে পর তিনি আমাকে সবিস্তর আলোচনা না করতে দিয়ে যেটুকু বললেন বাংলা ছন্দে তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

কয়লাওয়ালার দোস্তি? তওবা!
ময়লা হতে রেহাই নাই।
আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

আমি বললুম, 'এ তো হল সূত্র, ব্যাখ্যা করুন।'

মীর আসলম বললেন, 'পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ-ফরাসি প্রভৃতি ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাত্র ঘর্ষণ করত আমানউল্লা যে কৃষ্ণপ্রস্তর চূর্ণ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আসিয়াছিলেন তদ্বারা তিনি কাবুলহট্ট মসিলিপ্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।'

'তথাপি অস্মদ্দেশীয় বিদগ্ধজনের শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত যদি নৃপতি প্রস্তরচূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রস্তরখণ্ডও আনয়ন করিতেন। তদ্বারা ইন্ধন প্রজ্বলিত করিলে দীন দেশের শৈত্য নিবারিত হইত।'

আমি বললুম, 'চেয়ারটেবিল চালানো যদি মসিলেপন মাত্রই হয় তবে তা নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর দুঃখ করবার কী আছে বলুন।'

মীর আসলম বললেন, 'অযথা শক্তিক্ষয়। নৃপতির অবমাননা। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলুম যে, তাঁরা মীর আসলমের মতো কালো চশমা পরে ভবিষ্যৎ এত কালো করে দেখলেন না। ছোকরাদের চোখে তো গোলাপি চশমা; গোলাপি বললেও ভুল বলা হয়— সে চশমা লাল টকটকে রক্ত-মাখানো। তারা বলে, 'যেসব বদমায়েশরা এখনও কার্পেটে বসে দোকান চালাচ্ছে তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে বেঁধে হাজারো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমানউল্লা নিতান্ত ঠাণ্ডা বাদশা বলেই তাদের রেহাই দিয়েছেন।'

ভেবে-চিন্তে আমি গোলাপি চশমাই পরলুম।

তার কিছুদিন পরে আরেক নয়া সংস্কারের খবর আনলেন মৌলানা। আফগান সেপাইদের মানা করা হয়েছে, তারা যেন কোনও মোল্লাকে মুরশিদ না বানায় অর্থাৎ গুরু স্বীকার করে যেন মন্ত্র না নেয়।

খাঁটি ইসলামে গুরু ধরার রেওয়াজ নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, 'কুরান শরিফ কিতাবুম্মুবিন' অর্থাৎ 'খোলা কিতাব'; তাতেই জীবনযাত্রার প্রণালী আর পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের পন্থা সোজা ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে; গুরু মেনে নিয়ে তার অন্ধানুসরণ করার কোনও প্রয়োজন নেই।

অন্য দল বলেন, 'একথা আরবদের জন্য খাটতে পারে, কারণ তারা আরবিতে কুরান পড়তে পারে। কিন্তু ইরানি, কাবুলিরা আরবি জানে না; গুরু না নিলে কী উপায়?'

www.pathagar.com

এ-তর্কের শেষ কখনও হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গণ্ডির ভিতরেই বন্ধ থাকত, তবে আমানউল্লা গুরু-ধরা বারণ করতেন না। কারণ, যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্য, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু দুনিয়াদারির সব ব্যাপারেও উপদেশ আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাক্ষাৎ আদেশ।

তা হলে দাঁড়াল এই যে, আমানউল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তাঁর শিষ্য কোনও সেপাইকে পাল্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপি চশমাটা কপালে তুলে অনুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোনও লেখা ফুটে উঠেছে কি না, আমানউল্লা কেন হঠাৎ এ আদেশ জারি করলেন। তবে কি কোনও অবাধ্যতা, কোনও বিদ্রোহ, কোনও— ? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফুটে বলা তো দূরের কথা, ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মীর আসলম। তিনি দেখি কালো চশমায় আরেক পোঁচ ভুসো মাখিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক-পরলোক সর্বলোকের জন্যই গুরু নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ অনুসন্ধান করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করাও ততোধিক নিষ্প্রয়োজন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখন আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই তো দেখছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মীর আসলম বললেন, 'গুরু দ্বিবিধ; যে গুরুগৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পার না এবং ত্যাগ করার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু— গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিষ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণির গুরু শিষ্যকে প্রতিদিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে গুরু বিনা সে শিষ্যও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারে না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণির। আফগান সৈন্যের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণির।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন; আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিষ্প্রয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরুগ্রহণ সেখানে অপকর্ম।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারে কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে। যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য অন্য কী উপায়?'

আমি বললুম, 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না?'

মীর আসলম বললেন, 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনও বিদ্রোহ করে না, যতক্ষণ-না সিংহাসনের জন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হন।'

www.pathagar.com

আমি ভারি খুশি হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েকদিন হল লক্ষ করছি, আপনার ভাষা থেকে আপনি কঠিন আরবি শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সজ্ঞানে?'

মীর আসলম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলি ফারসিতে বললেন, 'অ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলে চাঁদ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যখন হেথায় এলে তখন ফারসি জানতে ঢু-ঢু। তাইতে তোমায় তালিম দেবার জন্য আরবি শব্দে বেড়া বানাতুম, তুমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে; গোড়ার দিকে ঠ্যাঙগুলো জখম-টখমও হয়েছে। এখন দিব্যি আরবি ঘোড়ার মতো আরবি বেড়া ডিঙোচ্ছ বলে খামকা বখেড়া বাঁধার কম্ম বন্ধ করে দিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধোল?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম লোকটি সত্যিকারের পণ্ডিত। গুরু কী করে নিজেকে নিষ্প্রয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।

তার পর বেশি দিন যায়নি, এমন সময় একদিন নোটিশ পেলাম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চশিক্ষার জন্য তুর্কিতে পাঠানো হবে; স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায়-আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনও মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধূমকেতুর মতো দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জনকুড়ি কাবুলি মেয়ে গার্ল গাইডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আমানউল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারি কর্মচারী, বিদেশি রাজদূতাবাসের গণ্যমান্য সভ্যগণ, আর একপাশে মহিলারা। রানি সুরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনে পাতলা নেটের পরদা।

আমানউল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক খাঁটি এবং পুরনো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন, 'আমি পর্দা-প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোরকায় তুর্কি পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমি স্বাধীনতাপ্রয়াসী; তাই কাবুলের কোনও মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমনকি, মহিষী সুরাইয়াও যদি বোরকা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

কর্মচারীটি বললেন, 'এতটা ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমানউল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রানি সুরাইয়া এগিয়ে এসে নাটকীয় ঢঙে হ্যাটের সামনে পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানিস্তানের রাজমহিষীর মুখ দেখতে পেল।'

কর্মচারীটির রসবোধ অত্যন্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন নিতান্ত নীরস-নির্জলা। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে জিগ্যেস করব, তারও উপায় নেই। হয়তো ঘুঘু এসেছেন রিপোর্ট তৈরি করবার মতলব নিয়ে— ঘটনাটা ভারতবাসীর মনে কীরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও 'পোকার' খেলার জুয়াড়ির মতো করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বললেন, 'এরকমধারা ড্রামাটিক কায়দায় পর্দা ছেঁড়ার কী প্রয়োজন ছিল? রয়েসয়ে করলেই ভালো হত না?'

www.pathagar.com

আমি মনে মনে বললুম, 'ইংরেজের সনাতন পন্থা। সবকিছু রয়েসয়ে। সবকিছু টাপেটোপে। তা সে ইংরেজি লেখাপড়া চালানোই হোক, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করাই হোক। ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, মুষল হয়ে বেরোবে।'

কিছু-একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম, 'এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসীমাত্রই কোনও না কোনও মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্তান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনও কাজ করত না, কিন্তু এখন আমানউল্লা নিজের চোখে সমস্ত পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, ব্যস।'

কর্মচারী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলুম।

কিন্তু একটা কথা এখানে আমি আমার পাঠকদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং কাবুলের আর পাঁচজন তখন আমানউল্লার এসব সংস্কার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাইনি। মানুষের স্বভাব আপন ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বড় করে দেখা— হাতের সামনে আপন মুঠি হিমালয় পাহাড় ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত যেসব সংস্কার করা হচ্ছিল তার একটাও আমার মতো পাঁচজনের স্বার্থকে স্পর্শ করেনি। সুট সঙ্গে নিয়েই আমরা কাবুল গিয়েছি, কাজেই সুট পরার আইন আমাদের বিচলিত করবে কেন; আর আমরা পাতলা নেটের ব্যবসাও করিনে যে, মহারানি তাঁর হ্যাটের নেট ছিঁড়ে ফেললে আমাদের দেউলে হতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ইরান-আফগানিস্তানের বাদশা দেশের লোকের মাল-জানের মালিক। আর সকলেই জানে এই দুই বস্তুই অত্যন্ত 'ফানি'— নশ্বর। নশ্বর জিনিস এমনি যাবে অমনিও যাবে— বাদশাহের খামখেয়ালি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। রাজা-বাদশা তো আর গাধাখচ্চর নন যে, শুধু দেশের মোট পিঠে করে বইবেন আর জাবর কাটবেন— তাঁরা হলেন গিয়ে তাজি ঘোড়ার জাত। দেশটাকে পিঠে নিয়ে যেমন হঠাৎ প্রগতির দিকে খামকা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন, তেমনি কারণে-অকারণে সোয়ারকে দুটো-চারটে লাথি-চাঁটও মারবেন। তাই বলে তো আর ঘোড়ার দানাপানি বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

কাজেই কাবুল শহরের লোকজন খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমানউল্লার প্রতিজ্ঞা যে, তিনি সব মেয়েদের বেপর্দায় বেরোবার সাহায্য করবেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল— শোনা গেল বাদশার হুকুম, কোনও স্ত্রীলোক যদি বেপর্দা বেরুতে চায় তার স্বামী যেন কোনও ওজর-আপত্তি না করে। যাদের আপত্তি আছে, তারা যেন বউদের তালাক দিয়ে দেয়। আর তারা যদি সরকারি চাকরি করে, তবে আমানউল্লা দেখে নেবেন। কী দেখে নেবেন? সেটা পষ্টাপষ্টি বলা হয়নি, তবে চাকরিটাও হয়তো বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সাধে কি আর বাংলায় বলি 'বিবিজান চলে যান লবে-জান করে।' শুধু বিবিজান চলে গেলে সুস্থ মানুষ-প্রেমিকদের কথা আলাদা— 'লবে জান' হবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটা গেলে পর মানুষ অনাহারে 'লবে-জান' হয়।

মীর আসলম বললেন, 'গিন্নিকে গিয়ে বন্নু, "ওগো চোখে সুরমা লাগিয়ে বে-বোরকায় কাবুল শহরে এট্টা রোঁদ মেরে এস।" বিশ্বাস করবে না ভায়া, বদনা ছুড়ে মারলে। তাও জানো তো, মোল্লার পাগড়ি, বদনাটাই খেল টোল। আম্মো অবশ্যি টাল খেয়ে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, পাগড়ি অনেক কাজে লাগে।'

মির আসলম বললেন, 'ছাই জানো, বে করলে জানতে। বেয়াড়া বউকে তোমার তো আর বেঁধে রাখতে হয় না।'

আমি বললুম, 'বাজে কথা। আমানউল্লা ক্যাঁচ করে কেটে দিয়েছেন। আর ভালোই করেছেন, বউকে বেঁধে রাখতে হয় মনের শিকল দিয়ে, হৃদয়ের জিঞ্জির দিয়ে।'

মীর আসলম বললেন, 'হৃদয়মনের কথা ওঠে যেখানে তরুণ-তরুণীর ব্যাপার। ষাট বছরের বুড়ো ষোল বছরের বউকে কোন মনের শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে বল? সেখানে কাবিন-নামা সর্বাঙ্গ-ঢাকা বোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমানউল্লা যে পর্দা ছেঁড়ার জন্য তম্বি লাগিয়েছেন, তাতে জোয়ানদের কী— বেদনাটা সেখানে নয়। বুড়া সর্দারদের ভিতর চিংড়ি বউদের ঠেকাবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'তরুণীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নাকি?'

তিনি বললেন, 'ভ্যালা রে বিপদ, আমাকে তুমি নওরোজের আকবর বাদশা ঠাওরালে নাকি? চিংড়িদের আমি চিনব কোত্থেকে? ইস্তক মেয়ে নেই, ছেলের বউও নেই। গিন্নির বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে হাফ-টিকিট কেটেছেন, দেখলে বোঝা যায় শ-খানেক হবে।'

আমি বললুম, 'তবে কি বুড়োরা খামকা ভয় পেয়েছেন?'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো। খুলে বলি। আমানউল্লার হুকুম শোনামাত্র চিংড়িরা যদি লাফ দিয়ে উঠত, তবে বুড়োরাও না হয় তার একটা দাওয়াই বের করত; এই মনে কর তুমি যদি হঠাৎ তলোয়ার নিয়ে কাউকে হামলা কর, সেও কিছু-একটা করবে। বীর হলে লড়বে, বকরির কলিজা হলে ন্যাজ দেখাবে। কিন্তু এ তো বাপু, তা নয়, এ হল মাথার ওপর ঝোলানো নাঙা তলোয়ার। চিংড়িরা হয়তো সব চুপ করে বসে আছে— রাস্তায় তো এখনও চাঁদের হাট বসেনি— কিন্তু এক-একজন এক-এক শো-খানা তলোয়ার হয়ে চাঁদির ওপর ঝুলে আছেন। চোখ দুটি বন্ধ করে একটিবার দেখে নাও, বাপু।'

শিউরে উঠলুম।

তেত্রিশ

একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ মূর্তি। চেনা চেনা মনে হল অথচ যেন অচেনা। তার হাতের ট্রের দিকে নজর যেতে দেখি সেটা সম্পূর্ণ চেনা। তার উপরকার রুটি, মাখন, মামলেট, বাসি কাবাবও নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত। ধূম দেখলে বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়; সকালবেলা আমার ঘরে এরকমের ট্রে হাওয়ায় দুলতে পারে না, বাহক আবদুর রহমানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু কী বেশভূষা! পাজামা পরেনি, পরেছে পাতলুন। কয়েদিদের পাতলুনের মতো সেটা নেমে এসেছে হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে; ঊরুতে আবার সে পাতলুন এমনি টাইট যে,

www.pathagar.com

মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি নাইট সাটিনের ব্রিচেস্ পরেছেন। শার্ট, কিন্তু কলার নেই। খোলা গলার উপর একটা টাই বাঁধা। গলাবন্ধ কোট, কিন্তু এত ছোট সাইজের যে, বোতাম লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না— তাই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শার্ট আর টাই। দু কান ছোঁয়া হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। দোকানে যেরকম হ্যাট-স্ট্যান্ডের উপর খাড়া করানো থাকে!

পায়ে নাগরাই, চোখে হাসি, মুখে খুশি।

আবদুর রহমানের সঙ্গে এক বছর ঘর করেছি। চটে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে হস্তীর সঙ্গে নানাদিক দিয়ে তুলনা করেছি, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ সুস্থ, তার মাথায় যে ছিট নেই সে বিষয়ে আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। তাই চোখ বন্ধ করে বললুম, 'বুঝিয়ে বল।'

আমার যে খটকা লাগবে সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল বলে বলল, 'দেরেশি পুশিদম'— অর্থাৎ 'সুট পরেছি।'

আমি শুধালুম, 'সরকারি চাকরি পেলে লোকে দেরেশি পরে; আমার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

আবদুর রহমান বলল, 'তওবা, তওবা, আপনি সায়েব আমার সরকার, আমার রুটি দেনেওয়ালা।'

'তবে?'

সকালবেলা রুটি কিনতে গেলে পর পুলিশ ধরল। বলল, 'বাদশার হুকুম আজ থেকে কাবুলের রাস্তায় পাজামা কুর্তা, জোব্বা পরে বেরোনো বারণ— সবাইকে দেরেশি পরতে হবে।' আমার কাছ থেকে এক পাই জরিমানাও আদায় করল। রুটি কিনে ফেরবার পথে আর দু তিনটে পুলিশ ধরল। আপনার দোহাই পেড়ে কোনও গতিকে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সামনে আমাদের পড়শি কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা, তিনি ডেকে নিয়ে এই দেরেশি দিলেন, আমাকে তিনি বড্ড স্নেহ করেন কি না, আমিও তাঁর ফাইফরমাশ খেটে দিই।'

গুম্ হয়ে শুনলুম। শেষটায় বললুম, 'দর্জির দোকানে তো এখন ভিড় হওয়ার কথা। দু দিন বাদে গিয়ে তোমার পছন্দমতো একটা দেরেশি করিয়ে নিও।'

আবদুর রহমান হিসেবি লোক; বলল, 'এই তো বেশ।'

আমি বললুম, 'চুপ। আর দুপুরবেলা একজোড়া বুট কিনে নিও।'

আবদুর রহমান কলরব করে বলল, 'না হুজুর তার দরকার নেই। পুলিশের ফিরিস্তিতে বুটের নাম নেই।'

প্রথমটায় অবাক হলুম। পরে বুঝলুম ঠিকই তো; লক্ষ্মণ না হয় সীতাদেবির পায়ের দিকে তাকাতে পারেন— রাজাপ্রজায় তো সে সম্পর্ক নয়!

বললুম, 'চুপ। দুপুরবেলা কিনবে। আর দেখ, এবার হ্যাটটা খুলে ফেল।'

আবদুর রহমান চুপ।

বললুম, 'খুলে ফেল।'

আবদুর রহমান আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হুজুরের সামনে?' তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

হঠাৎ মনে পড়ল উত্তর আফগানিস্তানে তুর্কিস্তানের মানুষ শয়তানের ভয় পেলে পাগড়ি খুলে ফেলে। শুধু-মাথা দেখলে নাকি শয়তান পালায়। তাই আবদুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে। তখন মনে পড়ল যে, হৌস অব কমন্সে হ্যাট না পরা থাকলে কথা কইতে দেয় না। বললুম, 'থাক, তা হলে তোমার মাথায় হ্যাট।'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহর অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা। দেরেশির অভাবে লোকজন বাড়ি থেকে বেরুতে পারেনি। পর্দা তুলে দেওয়াতে রাস্তাঘাটে মেয়েদের ভিড় বাড়ার কথা ছিল তেমনি দেরেশির রেওয়াজ এক নতুন ধরনের পর্দা হয়ে পুরুষদের হারেম-বন্ধ করল।

যারা বেরিয়েছে তাদের দেরেশির বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যতরকম ছেঁড়া, নোংরা, শরীরের তুলনায় হয় ছোট নয় বড়, কোট-পাতলুন, প্লাসফোর, ব্রিচেস্ দিয়ে যতরকমের অসম্ভব খিচুড়ি পাকানো যেতে পারে তাই পরে কাবুল শহর রাস্তায় বেরিয়েছে— গোটা দশেক পাগলা-গারদকে হলিউডের গ্রিনরুমে ছেড়ে দিলেও এর চেয়ে বিপর্যয় কাণ্ড সম্ভবপর হত না।

ইয়োরোপীয়রা বেরিয়েছে তামাশা দেখতে। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আফগানিস্তানকে আমি কখনও পর ভাবিনি।

শহরতলী দিয়ে আমাকে কাজে যেতে হয়। সেখানে দেখি আরও কঠোর দৃশ্য। গ্রামের লাকড়িওয়ালা, সবজিওয়ালা, আণ্ডাওয়ালা যেই শহরের চৌহদ্দির ভিতরে পা দেয় অমনি পুলিশ তাদের ধরে ধরে এক এক পাই করে জরিমানা করে। বেচারিদের কোনও রসিদ দেওয়া হয় না; কাজেই দশ পা যেতে না যেতে তাদের কাছ থেকে অন্য পুলিশ এসে আবার নতুন করে জরিমানা আদায় করে। দুনিয়ার যত পুলিশ সেদিন কাবুলের শহরতলিতে জড়ো হয়েছে। খবর নিয়ে শুনলুম যারা এ সময়ে অফডিউটি তারাও উর্দি পরে পয়সা রোজগার করতে লেগে গিয়েছে— জরিমানার পয়সা নাকি সরকারি তহবিলে জমা দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত করা হয়নি।

দিবাদ্বিপ্রহরে যে কাবুলি পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানোতে রেকর্ড ব্রেক করতে পারে, তার ব্যস্ততা দেখে মনে হল, যেন তার বাস্তুবাড়িতে আগুন লেগেছে।

এ অত্যাচার কদিন ধরে চলেছিল বলতে পারিনি।

দুই সপ্তাহ ধরে দেশের খবরের কাগজ চিঠিপত্র পাইনি। খবর নিয়ে শুনলুম জলালাবাদ-কাবুলের রাস্তা বরফে ঢাকা পড়ায় মেল-বাস আসতে পারেনি; দু একজন ফিসফিস করে বলল, রাস্তায় নাকি লুটতরাজও হচ্ছে। মীর আসলম সাবধান করে গেলেন যেন যেখানে-সেখানে যা-তা প্রশ্ন জিগ্যেস না করি।

অন্য কাজ শেষ হলে মেয়েদের ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস ও সেকেন্ড মিস্ট্রেসকে আমি ইংরেজি পড়াতুম। আফগান মেয়েরা চালাক; জানে যে ধনীর কাছ থেকে টাকা বের করা শক্ত কিন্তু গরিবের দরাজ-হাত। জ্ঞানের বেলাতেও এই নীতি খাটবে ভেবে এই দুই মহিলা আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

হেডমিস্ট্রেসের বয়স পঞ্চাশের উপর; মাতৃভাষা বাদ দিলে জীবনে তিনি এই প্রথম ভাষা শিখছেন। কাজেই কাবুলের পাথর-ফাটা শীতেও তাকে আমি ইংরেজি বানান শেখাতে গিয়ে ঘেমে উঠতুম। ইংরেজি ভাষা শিখতে বসেছেন, কিন্তু ওই এক বিষয় ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসের প্রতি তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মাস্টারমশায়ের বয়স কত, দেশ কোথায়, দেশের জন্য মন খারাপ হয় কি না— কোনও প্রশ্ন জিগ্যেস করতেই তাঁর বাধত না। তবে খুব সম্ভব আমার এপেনডিক্সের সাইজ ও এ-জগতে আমার জন্মাবার কী প্রয়োজন ছিল, এ দুটো প্রশ্ন তিনি আমাকে জিগ্যেস করেননি। আমার উত্তর দেবার কায়দাও ছিল বিচিত্র। আমার দেশ? আমার দেশ হল Bengal, বানানটা শিখে নিন, বি ই এন জি এ এল। উচ্চারণটাও শিখে নিন; কেউ বলে বেনগোল, আবার কেউ বলে বেঙোল। ঠিক তেমনি France-এফ আর—।' তিনি বলতেন, বুঝেছি, বুঝেছি, তা বলুন তো বাঙালি মেয়েরা দেখতে কীরকম? শুনেছি তাদের খুব বড় চুল হয়, 'জুলফেবাঙাল' বলে একরকম তেল এদেশে পাওয়া যায়। আপনি কি তেল মাখেন?' আমাদের দু জনার এই চাপান-উতোরের মাঝখানে পড়ে ইংরেজি ভাষা বেশি এগোতে পারত না, বিশেষ করে তিনি যখন আমাকে আমার মায়ের কথা জিগ্যেস করতেন। মায়ের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখাবার এরকম আমার পেটে নেই।

সেকেন্ড মিস্ট্রেসের বয়স কম— ত্রিশ হয় না-হয়। দুটি বাচ্চার মা, থলথলে দেহ, খাঁদা নাক, মুখে একগাদা হাসি, পরনে বারো মাস স্লিপওভার, লম্বা-হাতা ব্লাউজ আর নেভি ব্লু ফ্রক। কর্নেলের বউ, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে আর আমি যখন কর্ত্রীর প্রশ্নের চাপে নাজেহাল হতুম, তখন তিনি মিটমিটিয়ে হাসতেন আর নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলে মাঝে মাঝে উদ্ধার করে দিতেন।

জোর শীত কিন্তু তখনও বরফ পড়েনি এমন সময় একদিন পড়াতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি কর্নেলের বউ বইয়ের উপর মুখ গুঁজে টেবিলে ঝুঁকে পড়েছেন আর কর্ত্রী তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে কর্নেলের বউ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দেখি আর দিনের মতো মুখের হাসির স্বাগতসম্ভাষণ নেই। চোখদুটো লাল, নাকের ডগার চামড়া যেন ছড়ে গিয়েছে।

এসব জিনিস লক্ষ করতে নেই। আমি বই খুলে পড়াতে আরম্ভ করলুম। দু মিনিটও যায়নি, হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানে কর্নেলের বউ দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলুম। কর্ত্রী শান্তভাবে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকলেন, 'অধীর হয়ো না, অধীর হয়ো না। খুদাতালা মেহেরবান। বিশ্বাস হারিয়ো না, শান্ত হও।'

আমি চোখের ঠারে কর্ত্রীকে শুধালুম, 'আমি তা হলে উঠি?'

তিনি ঘাড় নেড়ে যেতে বারণ করলেন, দু মিনিট যেতে না যেতে আবার কান্না, আবার সান্ত্বনা! আমি যে সে অবস্থায় কী করব ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে যা বলছিলেন তার থেকে গোড়ার দিকে মাত্র এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি তাঁর স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভালো করে কিছু বলতে গেলেই কর্ত্রী বাধা দিয়ে তাঁকে ওসব কথা তুলতে বারণ করছিলেন। বুঝলুম যে, অমঙ্গল চিন্তা সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

অমূলক নয় এবং এমন সব কারণও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, সেগুলো প্রকাশ্যে বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু তিনি তখন এমনি আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে বসেছেন যে, তাঁকে ঠেকানো মুশকিল। কখনও বলেন, 'শিনওয়ারিরা বর্বর জানোয়ার' কখনও বলেন, 'সাত দিন ধরে সরকারি কোনও খবর পাওয়া যায়নি।' কখনও বলেন, 'শিনওয়ারিরা শহরে পৌঁছলে কোনও অফিসার পরিবারের রক্ষা নেই।'

জলালাবাদ অঞ্চলে লুঠতরাজ হচ্ছে আগেই গুজব হিসেবে শুনেছিলুম; তার সঙ্গে এসব ছেঁড়া ছেঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বুঝতে পারলুম যে, সে অঞ্চলে শিনওয়ারিরা বিদ্রোহ করে কাবুলের দিকে রওনা হয়েছে, আমানউল্লা তাদের ঠেকাবার জন্য যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সাত দিন ধরে তাদের সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাস্য খবর পাওয়া যায়নি, আর কাবুলের অফিসার-মহলে গুজব, সে বাহিনীর অফিসাররা শিনওয়ারিদের হাতে ধরা পড়েছেন।

এত বড় দুঃসংবাদ ইংরেজি পড়ার চেষ্টা দিয়ে দমন করা অসম্ভব। আর আমি ওসব সংবাদ জেনে ফেলেছি সেটাও কর্ত্রী আদপেই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের বউকে তিনি কিছুতেই ঠেকাতেও পারছিলেন না। শেষটায় আমি একরকম জোর করে উঠবার চেষ্টা করলে কর্নেলের বউ হঠাৎ চোখ মুছে বললেন, 'না, মুআল্লিম সাহেব, আপনি যাবেন না, আমি পড়াতে মন দিচ্ছি।'

এরকম পড়া আমাকে যেন জীবনে আর না পড়াতে হয়। এবার যখন ভেঙে পড়লেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বাদশা আমানউল্লার মতো যারা গোঁফ রেখেছে তাদের ধরে ধরে উপরের ঠোঁট কেটে ফেলছে। আমানউল্লা ঠিক নাকের তলায় একটুখানি গোঁফ রাখেন—সেই টুথ-ব্রাশ মুস্টাশ ফ্যাশান ফৌজি অফিসারদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবার আমি একটু সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'লড়াইয়ের সময় কতরকম গুজব রটে সেসব কি বিশ্বাস করতে আছে? আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন তাই অমঙ্গল সংবাদ মাত্রই বিশ্বাস করছেন।'

আবার চোখ মুছে উঠে বসলেন। আমি যে পর-পুরুষ সেকথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমার দু হাত চেপে ধরে বললেন, 'মুআল্লিম সায়েব, সত্যি বলুন, ইমান দিয়ে বলুন, আপনি কয় সপ্তাহ ধরে হিন্দুস্তানের চিঠি পাননি?'

হিন্দুস্তানের ডাক শিনওয়ারি অঞ্চল হয়ে কাবুল আসে। তিন সপ্তাহ ধরে সে ডাক বন্ধ ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম, 'আমি এ সপ্তাহেই দেশের চিঠি পেয়েছি।'

তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন দেখে আমি বললুম, 'আপনি তো আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেশেন না যে, হক খবর পাবেন। মেয়েরা স্বভাবতই একটুখানি বেশি ভয় পায়, আর নানারকম গুজব রটায়, তাই তো বাদশাহ আমানউল্লা পরদা পছন্দ করেন না।'

কর্ত্রী আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'যেসব খবর শুনলেন সেগুলো আর কাউকে বলবেন না।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'এসব খবর নয়, গুজব। গুজব রটালে শুধু কি আপনাদের বিপদ? আমি বিদেশি, আমাকে আরও বেশি সাবধানে থাকতে হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে একা হতেই বুঝলুম, মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার বিড়ম্বনাটা কী। সেটা কাটাবার জন্য পাঞ্জাবি গ্রামোফোনওয়ালার দোকানে ঢুকলুম। আমার গ্রামোফোন নেই, আমি রেকর্ড কিনিনে তবু 'দেশের ভাই শুকুর মুহম্মদ' বলে দোকানদার আমাকে সব আদর-আপ্যায়ন করত। জিগ্যেস করলুম, মৌলানার বাংলা রেকর্ডগুলো কলকাতা থেকে এসেছে?'

দোকানদার বলল, 'না', এবং ভাবগতিক দেখে বুঝলুম খোঁচাখুঁচি করলে কারণটা বলতেও বাধবে না। আমি কিন্তু তাকে না ঘাঁটিয়েই খানকয়েক রেকর্ড শুনে বাড়ি চলে এলুম।

কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি খোঁচাখুঁচি কিছুই করতে হল না। স্তরে স্তরে বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম গুজব এসে কাবুলের বাজারে স্তূপীকৃত হতে লাগল। সে বাজার অন্ন বিক্রয় করে অর্থের পরিবর্তে, কিন্তু সন্দেশ দেয় বিনামূল্যে এবং বিনামূল্যের জিনিস যে ভেজাল হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? খবরের চেয়ে গুজব রটল বেশি।

কিন্তু এ-বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ রইল না যে, আমানউল্লা অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হননি, এখন যদি অর্থবলে কিছু করতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি আফগানিস্তানের উপজাতি-উপজাতিতে খুনোখুনি-লড়াই প্রায় বারোমাস লেগে থাকে। সন্ধির ফলে কখনও কখনও অস্ত্রসংবরণ হলেও মিত্রতা-হৃদ্যতার অবকাশ সেখানে নেই। কাজেই আফগান কূটনীতির প্রথম সূত্র : কোনও উপজাতি যদি কখনও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপজাতির শত্রুপক্ষকে অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যদি অর্থে বশ না হয়, তবে রাইফেল দেবে। রাইফেল পেলে আফগান পরমোৎসাহে শত্রুকে আক্রমণ করবে— কাষ্ঠ-রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।

কিন্তু এ স্থলে দেখা গেল, বিদ্রোহের নীল-ছাপটা তৈরি করেছেন মোল্লারা এবং তাঁরা এ কথাটা সব উপজাতিকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনও উপজাতি 'কাফির' আমানউল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তারা তখন দীন ইসলামের রক্ষাকর্তা। রাইফেল কিংবা টাকার লোভে অথবা ঐতিহ্যগত সনাতন শত্রুতার স্মরণে তখন যারা আমানউল্লার পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়বে তারাও তখন আমানউল্লার মতোই কাফির। শুধু যে তারাই তখন দোজখে যাবে তা নয়, তাদের পূর্বতন অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ যেন স্বর্গদ্বার দর্শন করবার আশা মনে পোষণ না করে।

এ বড় ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত। ইহলোকে বক্ষলগ্ন থাকবে রাইফেল, পরলোকে হুরী, এই পুরুষ-প্রকৃতির ওপর আফগান-দর্শন সংস্থাপিত। কোনওটাতেই চোট লাগলে চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন, আমানউল্লা কি সত্যই কাফির?

এবারে মোল্লারা যে মোক্ষম যুক্তি দেখাল তার বিরুদ্ধে কোনও শিনওয়ারি কোনও খুগিয়ানি একটি কথাও বলতে পারল না। মোল্লারা বলল, 'নিজের চোখে দেখিসনি আমানউল্লা গণ্ডা পাঁচেক কাবুলি মেয়ে মুস্তফা কামালকে ভেট পাঠিয়েছে; তারা যে একরাত জলালাবাদে কাটিয়ে গেল, তখন দেখিসনি, তারা বেপর্দা বেহায়ার মতোন বাজারের মাঝখানে গট্‌গট্ করে মোটর থেকে উঠল নামল?'

www.pathagar.com

কথা সত্যি যে, বিস্তর শিনওয়ারি খুগিয়ানি সেদিনকার হাটবারে জলালাবাদ এসেছিল ও সেখানে বেপর্দা কাবুলি মেয়েদের দেখেছিল। আরও সত্যি যে, গাজি মুস্তফা কামাল পাশা আফগানি মোল্লাদের কাছ থেকে কখনও গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ পাননি।

তবু নাকি এক 'মূর্খ' বলেছিল যে, মেয়েরা তুর্কি যাচ্ছে ডাক্তারি শিখতে। শুনে নাকি শিনওয়ারিরা অট্টহাস্য করেছিল— 'মেয়ে ডাক্তার! কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে ডাক্তার হয়! তার চেয়ে বললেই হয়, মেয়েগুলো তুর্কিতে যাচ্ছে গোঁফ গজাবার জন্য!'

কে তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে যে, শিনওয়ারি মেয়েরাই বিনা পর্দায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, কে বোঝাবে যে, বুড়িদাদিমা যখন হলুদ-পট্টি বাঁধতে কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত তখন কাবুলি মেয়েরাই-বা ডাক্তার হতে পারবে না কেন? কিন্তু এসব বাজে তর্ক, নিষ্ফল আলোচনা। আসল একটা কারণের উল্লেখ কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু সেটা সত্য কি না, অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। আমানউল্লা নাকি রাজকোষের অর্থ বাড়াবার জন্য প্রতি আফগানের ওপর পাঁচ মুদ্রা ট্যাক্স বসিয়েছিলেন।

আমানউল্লা এসব কথাই আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন; কিন্তু আর পাঁচজনের মতো তিনিও সেই ফারসি বয়েতটি জানতেন, সোনার রত্তিটুকু থাকলে মানুষ মরা কুকুরকেও আদর করে। আমানউল্লা সব উজিরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, উপজাতিকে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে কে কী জানেন?

আমার বন্ধু আধা-পাগলা দোস্ত মুহম্মদ ভুল বলেননি; দেখা গেল অনেকেই অনেক কিছু জানেন, শুধু জানেন না, কোন উপজাতির সঙ্গে কোন উপজাতির শত্রুতা, কোন উপজাতির বড় বড় সর্দার উপস্থিত কারা, কাদের মধ্যস্থতায় তাদের কাছে গোপনে ঘুষ পাঠানো যায়, কোন মোল্লার কোন খুড়ো উপস্থিত কাবুলে যে, তার ওপর চোটপাট করলে দেশের ভাইপো শায়েস্তা হবেন— অর্থাৎ জানবার মতো কিছুই জানেন না।

তখন অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী বৃদ্ধদের ডাকা হল— তাঁরা বললেন যে, গত দশ বৎসর ধরে তাঁরা কোনওপ্রকার কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না বলে আফগান উপজাতিদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজানুকম্পা বিগলিত হয়ে যে অর্থবারি তাঁদের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে উপজাতিদের কাছে পৌঁছত, সেসব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালাবদ্ধ। এখন বন্যা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে আমানউল্লা তাঁর ভগিনীপতি আলী আহমদ খানকে জলালাবাদ পাঠালেন। শিনওয়ারিদের টাকার বানে ভাসিয়ে নেবার জন্য সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কেউ বলে দশ লাখ, কেউ বলে বিশ লাখ।

শাস্ত্রের তর্কে, দর্শনের লড়াইয়ে দিশেহারা হলে ওমর খৈয়াম মৃৎপাত্র ভরে সুরা পান করতেন। সেই মাটির ভাঁড়ই নাকি তখন তাকে গভীরতম সত্যের সন্ধান দিত।

আমার মৃৎপাত্র আবদুর রহমান। তাকে সব খুলে বলে তার মতামত জানতে চাইলুম। গোড়ার দিকে সে আমাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে বারণ করত, কিন্তু শিনওয়ারি বিদ্রোহের পাকাপাকি খবর শহরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজার গল্প গল্পের রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবদুর রহমান বরফের জহুরি, আর সেই বরফই তার মাপকাঠি। সে বলল,

www.pathagar.com

'নানা লোকে নানা কথা কয়, তার হিসেব-নিকেশ আমি করব কী করে? কিন্তু একটা কথা ভুলবেন না, হুজুর, এই বরফ ভেঙে শিনওয়ারিরা কিছুতেই কাবুল পৌঁছতে পারবে না। ওদের শীতের জামা নেই। বরফ গলুক, তার পর দেখা যাবে।' আমি জিগ্যেস করলুম, 'তাই বুঝি প্রবাদ, কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়!'

ভেবে দেখলুম আবদুর রহমান কিছু অন্যায় বলেনি। ইতিহাসে দেখেছি, বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের বিদ্রোহবিপ্লবও ছেঁড়া কাঁথা গায়ে টেনে নিয়ে 'নিদ্রা যায় মনের হরিষে'।

চৌত্রিশ

এমন সময় যা ঘটল তার জন্য কেউ তৈরি ছিল না; প্রবীণ অর্বাচীন কারও কোনও আলোচনায় আমি এ ব্যাপারে কোনও আভাস-ইঙ্গিত পাইনি।

বেলা তখন চারটে হবে, দোস্ত মুহম্মদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় তুমুল কাণ্ড। দোকানিরা দুদ্দাড় করে দরজা-জানালা বন্ধ করছে, লোকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে, চতুর্দিকে চিৎকার, 'ও ভাই কোথায় গেলি', 'ও মামা শিগগির এস।' লোকজনের ভিড়ের উপর দিয়ে টাঙ্গাওয়ালারা খালি গাড়ি, বোঝাই গাড়ি এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চালিয়েছে যে, আমার চোখের সামনে একখানা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে কাবুল নদীর বরফের উপর গিয়ে পড়ল, কেউ ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

সবকিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে চিৎকার পৌঁছয়, 'বাচ্চায়ে সকাও আসছে, বাচ্চায়ে সকাও এসে পড়ল।' এমন সময় গুড়ুম করে রাইফেলের শব্দ হল। লক্ষ করলুম শব্দটা শহরের উত্তর দিক থেকে এল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য জনতা যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। যাদের হাতে-কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি ছিল তারা সেগুলো ফেলে দিয়ে ছুটল, একদল রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে নেমে গেছে, অন্য দল কাবুল নদীতে জমে-যাওয়া জলের উপর ছুটতে গিয়ে বারেবারে পিছলে পড়ছে। রাস্তার পাশে যে অন্ধ ভিখারি বসত সে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিড়ের ঠেলায় এদিক-ওদিক টাল খাচ্ছে আর দু হাত শূন্যে তুলে সেখানে যেন পথ খুঁজছে।

আমি কোনও গতিকে রাস্তা থেকে নেমে, নয়ানজুলি পেরিয়ে এক দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির করলুম, বিদ্রোহ বিপ্লবের সময় পাগলা-ঘোড়ার চোট খেয়ে অথবা ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে মরব না; মরতে হয় মরব আমার হিস্যার গুলি খেয়ে।

এক মিনিট যেতে না যেতে আরেক ব্যক্তি এসে জুটলেন। ইনি ইটালিয়ান 'কলোনেল্লো' অর্থাৎ কর্নেল। বয়স ষাটের কাছাকাছি, লম্বা করোগেটেড দাড়ি।

এই প্রথম লোক পেলুম যাকে ধীরে-সুস্থে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। বললুম, 'আমি তো শুনেছিলুম ডাকাত-সর্দার বাচ্চায়ে সকাও আসবে আমানউল্লার হয়ে শিনওয়ারিদের সঙ্গে লড়বার জন্য। কিন্তু এ কী কাণ্ড?'

কলোনেল্লো বললেন, 'মনে হচ্ছে ভুল খবর। এ তো আসছে শহর দখল করবার জন্য।'

www.pathagar.com

তাই যদি হয় তবে আমানউল্লার সৈন্যেরা এখনও শহরের উত্তর দিকে যাচ্ছে না কেন, এরকম অতর্কিতে বাচ্চায়ে সকাও এসে পৌঁছলই-বা কী করে, তার দলে কী পরিমাণ লোকজন, শুধু বন্দুক না কামান-টামান তাদের সঙ্গে আছে— এসব অন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর কলোনেল্লো দিতে পারলেন না। মাঝে মাঝে শুধু বললেন, 'কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

আমি বললুম, 'সাধারণ কাবুলি যে ভয় পেয়েছে সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়নরা এদের সঙ্গে জুটল কেন? এরা যাচ্ছে কোথায়?'

কলোনেল্লো বললেন, 'আপন আপন দূতাবাসে আশ্রয়ের সন্ধানে।'

ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে— ভিড়ও দেখলুম ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাচ্ছে, একটানা স্রোতের মতো নয়। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে আমি কলোনেল্লোকে বললুম, 'চলুন বাড়ি যাই।' তিনি বললেন যে, শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। মিলিটারি খেয়াল, তর্ক করা বৃথা।

বাড়ির দোরের গোড়ায় দেখি আবদুর রহমান। আমাকে দেখে তার দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বাড়ি ঢুকতেই সে সদর দরজা বন্ধ করে তার গায়ে একগাদা ভারী ভারী পাথর চাপাল। বিচক্ষণ লোক, ইতোমধ্যে দুর্গ রক্ষা করার যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন সেইটুকু সে করে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেনওয়া সাহেব কোথায়?' বলল, তিনি মাত্র একটি সুটকেশ নিয়ে টাঙ্গায় করে ফ্রেঞ্চ লিগেশনে চলে গিয়েছেন।

ততক্ষণে বন্দুকের শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের একটানা ক্যাটক্যাট যোগ দিয়েছে। আবদুর রহমান চা নিয়ে এসেছিল। কান পেতে শুনে বলল, 'বাদশার সৈন্যেরা গুলি আরম্ভ করেছে। বাচ্চা মেশিনগান পাবে কোথায়?'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'বাদশার সৈন্যরা কি এতক্ষণে বাচ্চার মুখোমুখি হল? তবে কি সে বিনা বাধায় কাবুলে পৌঁছল?'

আবদুর রহমান বলল, 'দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেককেই তো জিগ্যেস করলুম, কেউ কিছু বলতে পারল না। বোধ হচ্ছে বাচ্চা বিনা বাধায়ই এসেছে। ওর দেশ হল কাবুলের উত্তর দিকে, আমার দেশ পানশির— তারও উত্তরে। ওদিকে কোনও বাদশাহি সৈন্যের আনাগোনা হলে আমি দেশের লোকের কাছ থেকে বাজারে খবর পেতুম। বাদশাহি সৈন্যরা সবাই তো এখন পূর্ব দিকে শিনওয়ারির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে— আলী আহমদ খানের তাঁবেতে।'

গোলাগুলি চলল। সন্ধ্যা হল। আবদুর রহমান আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে আগুনের তদারকিতে বসল। তার চোখমুখ থেকে আন্দাজ করলুম, সে কাবুলিদের মতো ভয় পায়নি। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, বাচ্চা যদি জেতে তবে লুটতরাজ নিশ্চয় হবে এবং তাই নিয়ে আমাদের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সে ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু এসব ছাপিয়ে উঠছে তার কৌতূহল আর উত্তেজনা— শহরে সার্কাস ঢুকলে ছেলেপিলেদের যেরকম হয়।

কিন্তু এই বাচ্চায়ে সকাওটি কে? আবদুর রহমানকে জিগ্যেস করতে হল না, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলল এবং তার থেকে বুঝলুম যে, আবদুর রহমান বরফের জহুরি, ফ্রস্ট-বাইটের ওঝা, রন্ধনে ভীমসেন, ইন্ধনে নলরাজ, সবকিছুই হতে পারেন, কিন্তু বসওয়েল

www.pathagar.com

হতে এখনও তার ঢের দেরি। বাচ্চায়ে সকাও সম্বন্ধে সে যা বলল তার উপরে উত্তম রবিনহুড খাড়া করা যায়, কিন্তু সে বস্তু জলজ্যান্ত মানুষের জীবনী বলে চালানো অসম্ভব।

চোদ্দ আনা বাদ দেওয়ার পরও যেটুকু রইল তার থেকে বাচ্চার জীবনের এইটুকু পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে প্রায় শ-তিনেক ডাকাতের সর্দার, বাসস্থান কাবুলের উত্তরদিকে কহিস্তানে, ধনীকে লুটে গরিবকে পয়সা বিলোয়, আমানউল্লা যখন ইয়োরোপে ছিলেন তার পরাক্রম তখন এমনি বেড়ে গিয়েছিল যে, কাবুল-কহিস্তানের পণ্য-বাহিনীর কাছ থেকে সে রীতিমতো ট্যাক্স আদায় করত। আমানউল্লা ফিরে এসে কহিস্তানের হাটে-বাজারে নোটিশ লাগান, 'ডাকাত বাচ্চায়ে সকাওয়ের মাথা চাই পুরস্কার পাঁচশো টাকা'; বাচ্চা সেগুলো সরিয়ে পাল্টা নোটিশ লাগায়, 'কাফির আমানউল্লার মাথা চাই, পুরস্কার এক হাজার টাকা।'

আবদুর রহমান জিগ্যেস করল, 'কর্নেলের ছেলে আমাকে শুধাল যে, আমি যদি আমানউল্লার মুণ্ডটা কাটি, আর আমার ভাই যদি বাচ্চায়ে সকাওয়ের মুণ্ডটা কাটে তবে আমরা দু জনে মিলে কত টাকা পাব। আমি বললুম, 'দেড় হাজার টাকা।' সে হেসে লুটোপুটি; বলল, 'এক পয়সাও নাকি পাব না। বুঝিয়ে বলুন তো, হুজুর, কেন পাব না?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'কেউ জ্যান্ত নেই বলে তোমার টাকাটা মারা যাবে বটে, কিন্তু কর্নেলের ছেলেকে বলো যে, তখন আফগানিস্তানের তখত তোমাদের পরিবারে যাবে।'

আরও শুনলুম, বাচ্চায়ে সকাও নাকি দিন দশেক আগে হঠাৎ জবলুস-সিরাজের সরকারি বড় কর্তার কাছে উপস্থিত হয়ে কোরান ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল যে, সে আমানউল্লার হয়ে শিনওয়ারিদের সঙ্গে লড়বে এবং সেই কসমের জোরে শ-খানেক রাইফেল তাঁর কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে ফের উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তবে কি সেই বন্দুকগুলো নিয়েই বাচ্চার দল আমানউল্লাকে আক্রমণ করেছে? আশ্চর্য হবার কী আছে? আমানউল্লা যখন উপজাতিদের কাছ থেকে তোলা ট্যাক্সের পয়সায় ফৌজ পুষে তাদের তাঁবুতে রাখেন, তখন বাচ্চাই-বা আমানুল্লার কাছ থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে না কেন?

রাত তখন বারোটা। আবদুর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব।'

আমি বললুম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমোতে পার না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এত দুর্ভাবনা করতে হবে না।'

আবদুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্য ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কী করে? আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

কথাটা সত্যি। আবদুর রহমান আমার চাকরিতে ঢুকেছে খবর পেয়ে তার বুড়ো বাপ গাঁ থেকে এসে আমাকে তার জানের মালিক, স্বভাবচরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়োকে খুশি করবার জন্য 'সিংহ ও মুষিকের' গল্প বলেছিলুম।

কিন্তু আবদুর রহমানের ফন্দিটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ নিউটন। এদিকে বাক্সে দুটো ফুটো করে দুটো বেড়ালের জন্য, অন্যদিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে— একদিকে কর্নেলের ছেলের ধাঁধায় বোকা বনে যায়, অন্যদিকে তর্কে বাঙালিকেও কাবু করে আনে।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম' অর্থাৎ পাইকারি খুন-খারাবি লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনওটাই বাদ যাবে না। চেঙ্গিস, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এসব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এসব করবে না সে আশা দিদিমার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান, আফগানিস্তান, চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানারকম বিদগ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুড়ে ছুড়ে ক্ষতবিক্ষত করে মারা, পেট কেটে চোখের সামনে নাড়িভুঁড়ি বের করে মারা, জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কায়দায় অনেক চাক্ষুষ বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক দিয়ে দু কান দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। আবদুর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের ঘুম পায় আর মাথা বার বার ঝুলে পড়ে। তার তুলনায় রাইফেল-মেশিনগানের শব্দ, আর চেঙ্গিস-নাদিরের কাহিনীস্মরণ ধূলি পরিমাণ। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়াটা বীর অথবা কাপুরুষ কোনওকিছুরই লক্ষণ নয়।

সকালবেলা দেউড়ি খুলে দেখি শহরে মেলার ভিড়। কাবুল শহরের আশপাশের গাঁ থেকে নানারকম লোক এসে জড়ো হয়েছে, সুযোগসুবিধা পেলে লুটে যোগ দেবে বলে। অনেকের কাঁধেই বন্দুক, শীতের ভারী ভারী জামার ভেতর যে ছোরা-পিস্তলও আছে সেটাও অনায়াসে বোঝা গেল। আবদুর রহমানের বাধা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারকতদন্ত করবার জন্য।

আর্ক কাবুল শহরের ভেতরকার বড় দুর্গ— হুমায়ুনের জন্ম এই আর্কের ভেতরেই হয়েছিল। আর্ক থেকে বড় রাস্তা বেরিয়ে এসে কাবুল নদীর পারে ঠেকেছে, তাকেই কাবুলের চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে। সেখানে দেখি একটা বড় রকমের ভিড় জমেছে। কাছে গিয়ে বুঝলুম কোনও এক বড় রাজকর্মচারী— অফিসারও হতে পারেন— কাবুল শহরের লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছে।

'ওজার্ম সিতোআইয়াঁ'— 'ধরো হাতিয়ার, ফ্রান্সের লোক বাঁধো দল, বাঁধো দল' ধরনের ওজস্বিনী ফরাসিনী বক্তৃতা নয়— ভদ্রলোকের শুকনো, ফ্যাকাশে ঠোঁট কাঁপছে আর বিড়বিড় করে যা বলছেন দশ হাত দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছে না।

টিমের কাপ্তান যেরকম প্র্যাকটিসের পূর্বে আঁটা আঁটা হকিস্টিক বিলোয় তেমনি গাদা গাদা দামি ঝকঝকে রাইফেল বিলোনো হচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই, যার যা ইচ্ছে এক একখানা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। শুধু লক্ষ করলুম উত্তর দিকে কেউই গেল না— অথচ লড়াই সেই দিকেই।

রাইফেল বিলোনো শেষ হতেই ভদ্রলোক তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। বিপজ্জনক অবশ্য-কর্তব্য-কর্ম অর্ধসমাধান করে মানুষ যেরকম তড়িঘড়ি একস্থান থেকে সরে পড়ে। তখন চোখে পড়ল তার পরনে পাজামা-কুর্তা-জুব্বা-পাগড়ি— দেরেশি নয়। তার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখি কারও পরনেই দেরেশি নয়, আর সকলের মাথায়ই পাগড়ি। আমার পরনে সুট, মাথায় হ্যাট— অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

www.pathagar.com

এমন সময় দেখি ভিড় ঠেলে হন হন করে এগিয়ে আসছেন মীর আসলম। কোনও কথা না কয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললেন— আমার কোনও প্রশ্নের উত্তরে মুখ না খুলে, কোনও কথায় কান না দিয়ে। বাড়ি পৌঁছতেই আমাদের দু জনকে দেখে আবদুর রহমান কী একটা বলে তিন লম্ফে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোল।

মীর আসলম আমাকে বকতে আরম্ভ করলেন। এ কি তামাশা দেখার সময়, না, ইয়ার্কি করে ঘুরে বেড়াবার মোকা। তাও আবার দেরেশি পরে।

আমি শুধু বললুম, 'কী করে জানব বলুন যে, দেরেশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে।

মীর আসলম বললেন, 'মকুব-বাতিলের প্রশ্ন এখন কে শুধায় বাপ! যে-কোনও মুহূর্তে বাচ্চায়ে সকাও শহরে ঢুকতে পারে। কাবুলিরা তাই দেরেশি ফেলে ফের 'মুসলমান' হয়েছে। দেখলে না ইস্তক সর্দার— খান জোব্বা পরে রাইফেল বিলোলেন?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কী কথা, রাজপরিবার পর্যন্ত ভয় পেয়ে দেরেশি ছেড়েছেন?'

মীর আসলম বললেন, 'উপায় কী বল? বাদশাহি ফৌজ থেকে সৈন্যেরা সব পালিয়েছে। এখন আমানউল্লার একমাত্র ভরসা যদি কাবুল শহরের লোক রাইফেল বন্দুক নিয়ে বাচ্চাকে ঠেকাতে পারে। তাদের খুশি করার জন্য দেরেশি বর্জন করা হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম। 'কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন রাজধানীর সৈন্যেরা কখনও বিদ্রোহ করে না।'

'বিদ্রোহ তারা করেনি। তারা সব পালিয়েছে। যাদের বাড়ি বহু দূরে, বরফ ভেঙে এখন যেসব জায়গায় পৌঁছনো যায় না, তারা এখনও শহরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যারা নিতান্ত গা-ঢাকাও দিতে পারেনি, তারাই লড়তে গেছে, অন্তত আমানউল্লার বিশ্বাস তাই। আসলে তারা দেহ-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে বসে চন্দ্রসূর্য তাগ করে গুলি ছুড়ছে। বাচ্চাকে এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে আমানউল্লার দেহরক্ষী খাস সৈন্যদল।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কিন্তু মৌলানার বাসা তো দেহ-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে। চলুন, তাঁর খবর নিয়ে আসি।'

মীর আসলম বললেন, 'শান্ত হও। আমি সকালে সেদিকেই গিয়েছিলুম, কিন্তু মৌলানার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। সেখানে লড়াই হচ্ছে। আমি মোল্লা মানুষ— কাবুল শহর আমাকে চেনে। আমি যখন সেখানে পৌঁছতে পারিনি, তুমি যাবে কী করে?'

এ সংবাদ শুনে আমার মন থেকে অন্য সব প্রশ্ন মুছে গেল। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কিছু করার উপায় আছে কি না। মীর আসলম আমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে পই পই করে বারণ করে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে আবদুর রহমান একখানা নতুন রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। বলল, 'হুজুর, চট করে একখানা কাগজে লিখে দিন আপনার রাইফেল নেই। আমি আরেকটা নিয়ে আসি।' আমি তখন মৌলানার কথা ভাবছি— আমার কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে আবদুর রহমান চলে গেল।

লুটপাট আরম্ভ হয়নি সত্য, কিন্তু হতে কতক্ষণ? সকালবেলা যখন বেরিয়েছিলুম তখন কোথাও কোনও পুলিশ দেখতে পাইনি। রাজার দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বাচ্চাকে ঠেকাতে গিয়েছে, তখন শহর রক্ষা করবে কে? আর এ পরিস্থিতি আফগান ইতিহাসে কিছু অভিনব বস্তু নয়।

www.pathagar.com

বাবুর বাদশাহ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কাবুল শহরে কোনওপ্রকার অশান্তির উদ্ভব হলেই আশপাশের চোর-ডাকাত শহরের আনাচে-কানাচে শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করত। মীর আসলম আবার আরেকটা সুখবর দিলেন যে, বাবুরের আমলে কাবুল আজকের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য ছিল। অসম্ভব নয়, কারণ বাবুর লিখেছেন অশান্তির পূর্বাভাস দেখতে পেলেই তিনি রাস্তায় রাস্তায় সেপাই মোতায়েন করতেন; আমানউল্লা যে পারেননি সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য একটা সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, কাবুলের বসতবাড়ি লুট করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক বাড়ি দুর্গের মতো করে বানানো— চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সেও আবার খানিকটা উঠে ভেতরের দিকে বেঁকে গিয়েছে— তবে সুবিধে এই যে, মই লাগিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে আবার এক সারি ছেঁদা; বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে সে ছেঁদা দিয়ে রাইফেল গলিয়ে নির্বিঘ্নে বাইরে গুলি চালানো যায়। বাড়িতে ঢোকার জন্য মাত্র একখানা বড় দরজা— সে দরজা আবার শক্ত ঝুনো কাঠে তৈরি, তার গায়ে আবার ফালি ফালি লোহার পাত পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

মোক্ষম বন্দোবস্ত। দু খানা রাইফেল দিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কারণ যারা রাস্তা থেকে হামলা করবে তাদের কোনও আচ্ছাদন আবরণ নেই যার তলা থেকে রাইফেলের গুলি বাঁচিয়ে দেয়াল ভাঙবার বা দরজা পোড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ডিসেম্বরের শীতে সমস্ত রাত ছাদের উপর টহল দিয়ে নজর রাখবে কে? বড় পরিবার হলে কথা নেই; পালা দিয়ে পাহারা দেওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে সেই প্রাচীন সমস্যা 'কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি দু জন।' বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। চোর না হয়ে এরা হবে ডাকাত, হাতে লাঠি নয় বন্দুক— আর সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই।

এ অবস্থায় মৌলানা আর তাঁর তরুণী ভার্যাকে ডেকে আনি কোন বুদ্ধিতে? কিন্তু ওদিকে তাঁরা হয়তো রয়েছেন 'আন্ডার দি ফায়ার' দুই ফৌজের মাঝখানে। স্থির করলুম, বেশি ভেবে কোনও লাভ নেই। মৌলানার পাড়ায় ঢুকবার সুযোগ পেলেই তাঁকে সবকথা বুঝিয়ে বলে নির্বাচনের ভারটা তাঁরই হাতে ছেড়ে দেব।

আবদুর রহমান খবর দিল, বাচ্চার ডাকুরা অ্যারোড্রাম দখল করে ফেলেছে বলে আমানউল্লার হাওয়াই জাহাজ উড়তে পারছে না।

আমি শুধালুম, 'কিন্তু আমানউল্লা বিদেশ থেকে যেসব ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি এনেছিলেন সেসব কী হল?'

নিরুত্তর।

'কাবুল বাসিন্দাদের যে রাইফেল দেওয়া হল তারা লড়তে যায়নি?'

আবদুর রহমান যা বলল তার হুবহু তর্জমা বাংলা প্রবাদে আছে। শুধু এ স্থলে উলুখড়ের দু খানা পা আছে বলে দু রাজার মাঝখানে সে যেতে রাজি হচ্ছে না। আমি বললুম, 'তাজ্জবের কথা বলছ আবদুর রহমান। বাচ্চায়ে সকাও ডাকাত, সে আবার রাজা হল কী করে?' আবদুর রহমান যা বলল তার অর্থ, বাচ্চা শুক্কুরবার দিন মোল্লাদের হাত থেকে তাজ পেয়েছে, খুতবায়

www.pathagar.com

(আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে) তার নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে, আমানউল্লা কাফির সে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে ও বাচ্চায়ে সকাও বাদশাহ্ হবিবউল্লা খান নাম ধারণ করে কাবুল শহর থেকে 'কাফির' আমানউল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস। আমানউল্লার পিতার নাম হবিবউল্লা। আততায়ীর হস্তে নিহত হবিবউল্লার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা কি স্বীয় নামেই প্রতিহিংসার রক্ত অনুসন্ধান করছে!

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান তার শেষ বুলেটিন দিয়ে গেল; আমানউল্লার হাওয়াই জাহাজ কোনও গতিকে উঠতে পারায় বোমা ফেলেছে। বাচ্চার দল পালিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দূরে থানা গেড়েছে।

পঁয়ত্রিশ

জনমানবহীন রাস্তা। অথচ শান্তির সময় এ রাস্তা গমগম করে। আমার গা ছমছম করতে লাগল।

দু দিকের দোকান-পাট বন্ধ। বসতবাড়ির দেউড়ি বন্ধ। বাসিন্দারা সব পালিয়েছে, না ঘুপটি মেরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, বুঝবার উপায় নেই। যে কুকুর-বেড়াল বাদ দিয়ে কাবুলের রাস্তায় কল্পনা করা যায় না, তারা সব গেল কোথায়? যেখানে গলি এসে বড় রাস্তায় মিশেছে, সেখানে ডাইনে-বাঁয়ে উঁকি মেরে দেখি একই নির্জনতা। এসব গলি শীতের দিনেও কাচ্চাবাচ্চার চিৎকারে গরম থাকে, মানুষের কানের তো কথাই নেই, বরফের গাদা পর্যন্ত ফুটো হয়ে যায়। এখন সব নিঝঝুম, নীরব। গলিগুলোর চেহারা এমনিতেই নোংরা থাকে। এখন জনমানবের আবরণ উঠে যাওয়াতে যেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সর্বাঙ্গে ঘা-পাঁচড়া দেখাতে আরম্ভ করেছে।

শহরের উত্তরপ্রান্ত। পর্বতের সানুদেশ। মৌলানার বাড়ি এখনও বেশ দূরে। বাচ্চার একদল ডাকাত এদিকে আক্রমণ করেছিল। তারা সব পালিয়েছে, না আড়ালে বসে শিকারের অপেক্ষা করছে, কে জানে?

হঠাৎ দেখি দূরে এক রাইফেলধারী। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাইনে-বাঁয়ে গলি নেই যে ঢুকে পড়ব। দাঁড়িয়ে অথবা পিছনে ফিরে লাভ নেই— আমি তখন মামুলি পাখি-মারা বন্দুকের পাল্লার ভিতরে। এগিয়ে চললুম। মনে হল রাইফেলধারীও আমাকে দেখতে পেলেছে, কিন্তু আমাকে, হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। দু জন মুখোমুখি হলুম, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকালও না। চেহারা দেখে বুঝলুম, সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তবে কি আমারই মতো কারও সন্ধানে গিয়েছিল, নিরাশ হয়ে ফিরছে? কে জানে, কী?

মৌলানার বাড়ি গলির ভিতরে। সেখানে পৌঁছনো পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। কিন্তু এবারে নতুন বিপদ; দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল— কোনও সাড়াশব্দ নেই। তবে কি মৌলানারা কেউ নেই? অথবা সে শীতে দরজা-জানালা সবকিছু বন্ধ বলে কড়া নাড়া, আমার চিৎকার, কিছুই তাঁদের কানে পৌঁছচ্ছে না। কতক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করেছিলুম বলতে পারব না, হঠাৎ আমার মনে আরেক চিন্তা উদয় হল। মৌলানা যদি গুম

www.pathagar.com

হয়ে গিয়ে থাকেন, আর তার বউ বাড়িতে খিল দিয়ে বসে আছেন, স্বামীর গলা না শুনলে দরজা খুলবে না; অথবা একা থেকে থেকে ভয়ে মূর্ছা গেছেন? আমার গলা থেকে বিকৃত চিৎকার বেরুতে লাগল। নিজের নাম ধরে পরিচয় দিয়ে চেঁচাচ্ছি, মনে হচ্ছে, এ আমার গলা নয়, আমার নাম নয়।

হঠাৎ শুনি মেঁয়াও; জিয়াউদ্দিনের বেড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মৌলানা। চোখ ফোলা, গাল এমনিতেই ভাঙা— আরও বসে গিয়েছে। দু দিনে দশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছেন।

বললেন, পরশুদিন প্রথম গোলমাল শুরু হতেই চাকরকে টাঙ্গা আনতে পাঠিয়েছিলেন, সে এখনও ফেরেনি। পাড়ার আর সবাই পালিয়েছে। ইতোমধ্যে বাচ্চার সেপাই দু বার এ রাস্তা দিয়ে নেমে এসে দু বার হটে গিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আল্লার হাতে জান সঁপে দিয়ে ডাকাতের হানার অপেক্ষা করছিলেন।

সে তো হল। কিন্তু এখন চল। এই নির্জন ভুতুড়ে পাড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। তখন মৌলানা যা বললেন, তা শুনে বুঝলুম, এ সহজ বিপদ নয়। তার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। আমার বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাবার মতো অবস্থা হলে তিনি বহু পূর্বেই চলে আসতেন।

বললুম, 'তা হলে আর বসব না। টাঙার সন্ধানে চললুম।'

শহরে ফিরে এসে পাক্কা দু ঘণ্টা এ আস্তাবল, সে বাগগিখানা অনুসন্ধান করলুম। একটা ঘোড়া দেখতে পেলুম না; শুনলুম, ডাকাত এবং রেকুইজিশনের ভয়ে সবাই গাড়ি ফেলে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।

এখন উপায়? একমাত্র উপায় আবদুর রহমানের গায়ের জোর। সে মৌলানার বউকে কোলে-কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চয়ই, কিন্তু— । নাহ্, এতে কোনও কিন্তু নেই। রাজি করাতেই হবে।

কিন্তু বাড়ি ফিরে যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলুম তেমনটা জীবনে আর কখনও দেখিনি। আমার আঙিনা যেন শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির সামনের গৌর-প্রাঙ্গণ; বেনওয়া সায়েব আর মৌলানা নিত্যিকার মতো দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। আবদুর রহমানও সসম্ভ্রম গলা-খাঁকারি দিয়ে বোঝাল, 'পুরা বাঁধকে— জনানা হ্যায়।'

জিয়াউদ্দিন বললেন যে, আমি চলে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই নাকি তাঁর চাকর টাঙা নিয়ে উপস্থিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে প্রশ্ন পর্যন্ত জিগ্যেস করলুম না, এ দুর্দিনে সে টাঙ্গা পেল কোথায়।

তার পর তাকিয়ে দেখি, বেনওয়া সায়েবের গালে দু দিনের দাড়ি, কোট-পাতলুন দুমড়ানো, চেহারা অধৌত। ভদ্রলোক ফরাসি, হামেশাই ফিটফাট থাকেন— শান্তিনিকেতনের সবাই জানে যে, বিদেশিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাঙালি ফিট বাবুর মতো ধুতি কুঁচিয়ে পরতে জানতেন। শুধু তাই নয়, বাঁ-হাত দিয়ে কোঁচাটি টেনে নিয়ে খানিকটা উঁচুতে তুলে দরকার হলে হনহন করে হাঁটতেও পারতেন।

বললেন, পরশু দিন টাঙা ফরাসি লিগেশনে পৌঁছতে পারেনি— লিগেশন শহরের উত্তর দিকে বলে পাগলা-জনতা উজিয়ে গাড়ি খানিকটে চলার পর গাড়ি-গাড়োয়ান দু জনেই দিশেহারা হয়ে যায়; শেষটায় গাড়োয়ান সায়েবের কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামের রাস্তা

www.pathagar.com

ধরে পুবদিকে তিন মাইল দূরে নিজের গাঁয়ে উপস্থিত হয়। সায়েব দুরাত্তির একদিন গরিব চাষার গোয়াল-ঘরে না আর কোথাও লুকিয়ে কাটিয়েছেন। দু চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর নাকি গাড়োয়ান আর তার ভাই-বেরাদর গলার উপর হাত চালিয়ে সায়েবকে বুঝিয়েছে যে, কাবুল শহরের সব ফিরিঙ্গিকে জবাই করা হচ্ছে। বেনওয়া সায়েব ভালো সাহিত্যিক, কাজেই বর্ণনাটা দিলেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে, আপন দুশ্চিন্তা-উদ্বেগটা ঢেকে চেপে, কিন্তু চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম যে, ১৯১৪-১৮ সালে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার তুলনায় এ-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি কিছু কম দেননি।

মৌলানা বললেন, 'সায়েব, বড় বেঁচে গেছেন; গাঁয়ের লোক যে আপনার গলা কেটে 'গাজি' হবার লোভ সম্বরণ করতে পেরেছে, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

বেনওয়া বললেন, 'চেষ্টা হয়নি কি না বলতে পারব না। যখনই দেখেছি দু তিনজন মিলে ফিসফাস করছে, তখনই সন্দেহ করেছি, আমাকে নিয়েই বুঝি কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বাড়িওয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানো নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে আর পাঁচজনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

আমি বললুম, 'আমি কাবুলের গাঁয়ে এক বছর কাটিয়েছি, আমার বিশ্বাস কাবুল উপত্যকার সাধারণ চাষা অত্যন্ত নিরীহ। পারতপক্ষে খুন-খারাবি করতে চায় না।'

বেনওয়া সাহেব বেশভূষা পরিবর্তন করে আপন লিগেশনে চলে গেলেন।

আমি মৌলানাকে বললুম, 'দেখলে? ফরাসি, জর্মন, রুশ, তুর্ক, ইরানি, ইতালি সবাই আপন লিগেশনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু তোমার-আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

মৌলানা বললেন, 'ব্রিটিশ লিগেশন ব্রিটিশের জন্য— বাংলা কথা। যদিও তৈরি ভারতীয় অর্থে, চলে ভারতের পয়সায়, ইস্তক হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিক মিনিস্টার লেফটেনান্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিস নুন খান ভারত সরকারের।'

আমি বললুম, 'বিস্তর নুন; মাসে তিন-চার হাজার টাকার।'

দু জনেই একবাক্যে স্বীকার করলুম যে, পরাধীন দেশের অবমাননা লাঞ্ছনা বিদেশ না গেলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জর্মন কবি গ্যোটে বলেছেন, যে বিদেশে যায়নি, সে স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পারেনি।

ছত্রিশ

চারদিন অরাজকতার ভিতর দিয়ে কাটল। কনফুৎসিয় বলেছেন, 'বাঘ হতে ভয়ঙ্কর কু-রাজার দেশ', আমি মনে মনে বললুম, 'তারও বাড়া হবে ডাকু পরে রাজবেশ।'

আমানউল্লা বসে আছেন আর্কের ভিতরে। তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা শহরের লোককে সাধ্যসাধনা করছে বাচ্চার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। কেউ কান দিচ্ছে না। শহর চোরডাকাতে ভর্তি। যেসব বাড়ি পাকাপোক্ত মাল দিয়ে তৈরি নয়, সেগুলো লুট হচ্ছে। একটুখানি নির্জন রাস্তায় যাবার যো নেই— ওভারকোটের লোভে শীত-কাতুরে ফিচকে ডাকাত সবকিছু করতে

www.pathagar.com

প্রস্তুত। টাকার চেয়েও ডাকাতের লোভ ওই জিনিসের ওপর— কারণ টাকা দিয়েও কোনওকিছু কেনার উপায় নেই। হাট বসছে না বলে দুধ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ কিছুই কেনা যাচ্ছে না। গম-ডালের মুদিও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, দাম চড়বার আশায়— কাবুল শহর বাকি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় বেরুচ্ছে না; একমাত্র রুশ পাইলটরা নির্ভয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে ভিড় ঠেলে বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে। হাতে রাইফেল পর্যন্ত নেই, কোমরে মাত্র একটি পিস্তল।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম খাস কাবুলি বাসিন্দাদের ব্যবহার দেখে। রাইফেল ঝুলিয়েছে কাঁধে, বুলেটের বেল্ট বেঁধেছে কোমরে, কেউ পরেছে আড়াআড়ি করে পৈতের মতো বুকের উপরে, কেউ-বা বাজুবন্ধ বানিয়ে বাহুতে, কেউ কাঁকন করে কবজিতে, দু একজন মল করে পায়ে!

যে অস্ত্র বিদ্রোহী নরঘাতক, দস্যুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য দীন আফগানিস্তান নিরন্ন থেকে ক্রয় করেছিল, সে আজ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হল!

কিন্তু আশ্চর্য, নগরী রক্ষা করতে এদের কোনও উৎসাহ নেই! দস্যু জয়লাভ করলে লুণ্ঠিত হবার ভয় নেই, প্রিয়জনের অপমৃত্যুর আশঙ্কা সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি?

মীর আসলম কানে কানে বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন কাবুলের বড় বড় মহল্লার সর্দার আর বাচ্চার ভিতরে গোপনে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে যে, কাবুলিরা যদি আমানউল্লার হয়ে না লড়ে, তবে বাচ্চা শহর লুট করবে না।

কথাগুলো যিশুখ্রিস্টের করাঙ্গুলি হয়ে আমার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিল। মীর আসলমের খবর সত্য বলে ধরে নিলে কাবুলবাসীর নির্বিকল্প সমাধির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু হায়, অস্ত্রবলে হীন, অর্থ-সামর্থ্যে দীন যে রাজা শুদ্ধ সাহসের বলে বিশ্বরাজ ইংরেজকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করলেন, অনুর্বর অনুন্নত দেশকে যে রাজা প্রগতির পথে চালিত করবার জন্য আপন সুখশান্তি বিসর্জন দিলেন, বিশ্বের সম্মুখে যে নরপতি আপন দেশের মুখোজ্জ্বল করলেন, তাঁকে বিসর্জন করে কাবুলের লোক বরণ করল ঘৃণ্য নীচ দস্যুকে? একেই কি বলে কৃতজ্ঞতা, নিমকহালালি?

তবে কি আমানউল্লা 'কাফির'?

মীর আসলম গর্জন করে বললেন, 'আলবৎ না; যে-রাজা প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না, নামাজ, রোজা যিনি বারণ করেননি, হজে যেতে জকাত দিতে যিনি বাধা দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহাপাপ, তাঁর শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া তেমনি পাপ। পক্ষান্তরে বাচ্চায়ে সকাও খুনি ডাকাত— ওয়াজিব-উল-কত্ল, কত্লের উপযুক্ত। সে কস্মিনকালেও আমির-উল-মুমিনিন (বাদশা) হতে পারে না।

মীর আসলম বহু শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার বিবেকবুদ্ধিও তাঁর কথায় সায় দিল। তবু বললুম, 'কিন্তু আপনি আবার কবে থেকে আমানউল্লার খয়ের খাঁ হলেন?'

www.pathagar.com

মীর আসলম আরও জোর হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। আমি বলি, আমানউল্লা কাফির নয়। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না-জায়িজ— অশাস্ত্রীয়।'

নাস্তিক রাশান রাজদূতাবাসে গিয়ে শুনি সেখানেও ওই মত। দেমিদফকে বললুম, 'রেভলিউশন আরম্ভ হয়েছে।' তিনি বললেন 'না, রেবেলিয়ন।' আমি শুধালুম, 'তফাতটা কী?' বললেন, 'রেভলিউশন প্রগতিকামী, রেবেলিয়ন প্রগতিপরিপন্থী।'

ভাবলুম মীর আসলমকে এ-খবরটি দিলে তিনি খুশি হবেন। বুড়ো উল্টো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সমরখন্দ-বুখারার মুসলিমদের উচিত রুশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। রুশ সরকার তাদের মক্কায় হজ করতে যেতে দেয় না।'

খামখেয়ালি ছোটলাটের আশু আগমন সংবাদ শুনে যেরকম গাঁয়ের পণ্ডিত হতবুদ্ধি হয়ে যান, মৌলানা আর আমি সেইরকম একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই। মৌলানার বউ যে-বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করে বসে আছেন, তিনি কোন দিন কোন গাড়িতে কী কায়দায় আসবেন, তাঁকে কে অভ্যর্থনা করবেন, তিনি এলে তাঁকে কোথায় রাখতে হবে, কী খাওয়াতে হবে, সে সম্বন্ধে কোনওপ্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ আমাদের কারও হয়নি— মৌলানার বউও কিছুই জানেন না; তাঁর এই প্রথম বাচ্চা হচ্ছে।

শুনেছি আফগানি মেয়েরা ক্ষেতের কাজ খানিকক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে সন্তান প্রসব করে— আসন্নপ্রসবার জন্য আফগান পণ্যবাহিনীও নাকি প্রতীক্ষা করে না। সে নাকি বাচ্চা কোলে করে একটু পা চালিয়ে পণ্যবাহিনীতে আবার যোগ দেয়। মৌলানার বউ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে; তাঁর কাছ থেকে এরকম কসরত আশা করা অন্যায়। লক্ষণ দেখেও আমরা ঘাবড়ে গেলুম। কিছু খেতে পারেন না, রাত্তিরে ঘুম হয় না, সমস্ত দিন ঢুলুঢুলু চোখ, মৌলানাকে এক মিনিটের তরে সেই ঢুলুঢুলু চোখের আড়াল হতে দেন না।

অন্যের প্রাণহরণ করা ব্যবসা হলেও নিজের প্রাণ দেবার বেলা সব মানুষের একই আচরণ। ডাক্তার কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরুতে রাজি হল না। সেদিন তাকে যা সাধ্যসাধনা করেছিলুম, তার অর্ধেক তোষামোদে কালো ভঙ্গজ মেয়ের জন্য বিনাপণে নিকষ্যি নটবর বর মেলে। বাড়ি ফেরবার সময় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিলুম যে, মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ডাক্তারি পড়াব— শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো এ হল শ্মশানপ্রতিজ্ঞা।

সিভিল সার্জন যেরকম গরিব রোগীর অর্থ-সামর্থ্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আড়াইগজি প্রেসক্রিপ্‌শন্ ঝেড়ে যান, কাবুলি ডাক্তার তেমনি পথ্যির ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। শুনে ভয় পেয়ে মৌলানা আর আমি খাটের তলায় আশ্রয় নিলুম। চারদিন ধরে খাচ্ছি রুটি, দাল আর বিন-দুধ চা— এ দুর্দিনে স্বয়ং আমানউল্লা ওসব ফেন্সি পথ্যি যোগাড় করতে পারবেন না। দুধ! আঙুর!! ডিম!!! বলে কী? পাগল, না মাথা খারাপ?

আবদুর রহমান সবিনয় নিবেদন করল, সন্ধ্যার সময় তাকে একটা রাইফেল আর দু ঘণ্টার ছুটি দিলে সে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছে। ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই— যস্মিন দেশে যদাচার, তদুপরি প্রবাসে নিয়ম নাস্তি— কিন্তু সবসময় সব ডাকাত তো আর বাড়ি ফেরে না। যদি আবদুর রহমান বাড়ি না ফেরে? তবে যে বাড়ি অচল হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি বাচ্চায়ে সকাও যেন ডাক্তারের বেশ পরে স্টেথস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে করে আমাকে বলছে, 'হয় দাও আঙুর, না হয় নেব মাথা।'

সাঁইত্রিশ

চারদিনের দিন আবদুর রহমান তার দৈনিক বুলেটিনের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে খবর জানালো, বাচ্চা মাইল দশেক হটে গিয়েছে। দিন দশেকের ভিতর শহরের ইস্কুল-কলেজ, আপিস-আদালত খুলল।

আমানউল্লা দম ফেলবার ফুরসত পেলেন।

কিন্তু বাচ্চাকে তাড়াতে পেরেও তিনি ভেতরে ভেতরে হার মেনেছেন। দেরেশির আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, মেয়ে-স্কুল বন্ধ করা হয়েছে আর রাস্তা-ঘাট থেকে ফ্রক-ব্লাউজ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যেসব মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরোন তাঁরা পরেন সেই তাম্বু ধরনের বোরকা। হ্যাট পরার সাহস আর পুরুষ-স্ত্রীলোক কারও নেই— হয় পাগড়ি, নয় পশমের টুপি। যেসব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা এই ডামাডোলের বাজারে পালিয়েছিল তাদের ধরে আনবার কোনও চেষ্টা করা হল না— করার উপায়ও ছিল না। কারণ পুলিশের দল তখনও 'ফেরার', আসামি ধরবে কে?

মৌলানা বললেন, 'সবসুদ্ধ মিলিয়ে দেখলে বলতে হবে ভালোই হয়েছে। আমানউল্লা যদি এ যাত্রা বেঁচে যান তবে বুঝতে পারবেন যে দেরেশি চাপানো, পর্দা তুলে দেওয়া আর বৃহস্পতিবারে ছুটির দিন করা এই অনুন্নত দেশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার নয়। বাকি রইল শিক্ষাবিস্তার আর শিল্পবাণিজ্যের প্রসার— এবং এ দুটোর বিরুদ্ধে এখনও কেউ কোনও আপত্তি তোলেনি। বিপদ কাটার পর আমানউল্লা যদি এই দুটো নিয়ে লেগে যান তবে আর সব আপনার থেকেই হয়ে যাবে।'

মীর আসলম এসে বললেন, অবস্থা দেখে বিশেষ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। শিনওয়ারিরা এখনও মারমুখো হয়ে আছে। আমানউল্লার সঙ্গে তাঁদের সন্ধির কথাবার্তা চলছে। তার ভিতরে দুটো শর্ত হচ্ছে, তুর্কি থেকে কাবুলি মেয়ে ফিরিয়ে আনা আর রানি সুরাইয়াকে তালাক দেওয়া। রানি নাকি বিদেশে পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে মান-ইজ্জত খুইয়ে এসেছেন।'

আমরা বললুম, 'সে কী কথা? সমস্ত পৃথিবীর কোথাও তো রানি সুরাইয়া সম্বন্ধে এরকম বদনাম রটেনি। ভারতবর্ষের লোক পর্দা মানে, তারা পর্যন্ত রানি সুরাইয়ার প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা করেনি। শিনওয়ারিরা এ আজগুবি খবর পেলে কোত্থেকে আর রটাচ্ছে কোন লজ্জায়!'

মীর আসলম বললেন, 'শিনওয়ারি মেয়েরা বিনা পর্দায় খেতের কাজ করে বটে কিন্তু পরপুরুষের দিকে আড়নয়নে তাকালেও তাদের কী অবস্থা হয় সেকথা সকলেই জানে— আমানউল্লাও জানেন। তবে বল দেখি, তিনি কোন বুদ্ধিতে সুরাইয়াকে বল্ নাচে নিয়ে

www.pathagar.com

গেলেন? জলালাবাদের মতো জংলি শহরেও দু একখানা বিদেশি খবরের কাগজ আসে— তাতে ছবি বেরিয়েছে রানি পরপুরুষের গলা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক আমানউল্লা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি— তাঁর মা পেরেছেন, তিনি আমানউল্লাকে পীড়াপীড়ি করছেন সুরাইয়াকে তালাক দেবার জন্য।'

রানি-মার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। উল্লসিত হয়ে বললুম, 'রানি-মা ফের আসরে নেমেছেন? তা হলে আর ভাবনা নেই; শিনওয়ারি, খুগিয়ানি, বাচ্চা, কাচ্চা সবাইকে তিনি তিন দিনের ভেতর চাটনি বানিয়ে দেবেন।'

মীর আসলম বললেন, 'কিন্তু আমানউল্লা তাঁর উপদেশে কান দিচ্ছেন না।'

শুনে অত্যন্ত নিরাশ হলুম। মীর আসলম যাবার সময় বললেন, 'তোমাকে একটা প্রাচীন ফারসি প্রবাদ শিখিয়ে যাই। রাজ্য চালনা হচ্ছে সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে জীবন কাটানো। ভেবেচিন্তেই বললুম, 'জীবন কাটানো'— অর্থাৎ সে সিংহের পিঠ থেকে এক মুহূর্তের জন্য নামবার উপায় নেই। যতক্ষণ উপরে আছে, সিংহ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাকেও অহরহ সজাগ থাকতে হবে। আমানউল্লা সন্ধির কথাবার্তা তুলেছেন অর্থাৎ সিংহের পিঠ থেকে নেবে দু দণ্ড জিরোতে চান— সেটি হবার জো নেই। শিনওয়ারি-সিংহ এইবার আমানউল্লাকে গিলে ফেলবে।'

আমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, 'কিন্তু আমার মনে হয় প্রবাদটার জন্মভূমি এদেশ নয়। ভারতবর্ষেই তখ্‌তকে 'সিংহাসন' বলা হয়। আফগানিস্তানে কি সিংহ জানোয়ারটা আছে?'

এমন সময় আবদুর রহমান এসে খবর দিল পাশের বাড়ির কর্নেল এসেছেন দেখা করতে। যদিও প্রতিবেশী তবু তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়নি। খাতির-যত্ন করে বসাতেই তিনি বললেন যে, লড়াইয়ে যাবার পূর্বে আমাদের আশীর্বাদ-কামনা ভিক্ষা করতে এসেছেন। মীর আসলম তৎক্ষণাৎ হাত তুলে দোয়া (আশীর্বাদ-কামনা) পড়তে আরম্ভ করলেন, আমরা দু হাত তুলে 'আমেন, আমেন', (তথাস্তু, তথাস্তু) বললুম। আবদুর রহমান তামাক নিয়ে এসেছিল, সেও মাটিতে বসে প্রার্থনায় যোগ দিল।

কর্নেল চলে গেলেন। মীর আসলম বললেন, 'পাড়া-প্রতিবেশীর আশীর্বাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করে যুদ্ধযাত্রা করা আফগানিস্তানের রেওয়াজ।'

আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় বাচ্চা কাবুল শহরের উত্তর প্রান্তে শহর-আরায় ঢুকতে পেরেছিল। সেখানে হবিবিয়া ইস্কুল। ডাকাতদলের অগ্রভাগ— বাংলা 'আগডোম বাগডোম' ছড়ার তারাই 'অগ্রডোম' বা ভ্যানগার্ড— ইস্কুলের হস্টেলে প্রথম রাত কাটায়। বেশিরভাগ ছেলেই ভয়ে পালিয়েছিল, শুধু বাচ্চার জন্মস্থান কুহিস্তানের ছেলেরা 'দেশের ভাই, শুকর মুহম্মদের' প্রতীক্ষায় আগুন জ্বেলে তৈরি হয়ে বসেছিল। ডাকাতরা হস্টেলের চালচর্বি দিয়ে পোলাও রাঁধে, ইস্কুলের বেঞ্চি টেবিল, স্টাইনগাস ভলাস্টনের মোটা মোটা অভিধান, ছেলেদের ক্লাসের পাঠ্যবই খাতাপত্র দিয়ে উনুন জ্বালায়। তবে সবচেয়ে তারা নাকি পছন্দ করেছিল ক্যাম্বিস আর কাঠের তৈরি রোল করা মানচিত্র।

www.pathagar.com

আমানউল্লা 'কাফির', পুঁথিপত্র 'কাফিরি', চেয়ার টেবিলে 'কাফিরির' সরঞ্জাম— এসব পুড়িয়ে নাকি তাদের পুণ্যসঞ্চয় হয়েছিল!

ডাকাতেরও ধর্মজ্ঞান আছে। হস্টেলের ছেলেরা যদিও 'কাফির' আমানউল্লার তালিম পেয়ে কাফির হয়ে গিয়েছে তবু তারা তাদের অভুক্ত রাখেনি। শুধু খাওয়ার সময় একটু অতিরিক্ত উৎসাহের চোটে তাদের পিঠে দু চারটে লাথি-চাঁটি মেরেছিল। বাচ্চার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে নাকি হস্টেল-বাসিন্দা ছিল; সে মামার হয়ে ফপর দালালি করেছে; তবে বাচ্চার পলায়নের সময় অবস্থাটা বিবেচনা করে 'কাফিরি তালিম' ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে 'গাজিত্ব' লাভ করেছে।

বাড়ি ফেরার সময় দেখলুম ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তা থেকে বুলেটের খোসা কুড়োচ্ছে।

খবর পেলুম, ব্রিটিশ রাজদূত স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসের মতে কাবুল আর বিদেশিদের জন্য নিরাপদ নয়। তাই তিনি আমানউল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এদেশ থেকে সরিয়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করেছেন। আমানউল্লা সহজেই সম্মতি দিয়েছেন, কারণ তিনিও চাননি যে, বিদেশিরা আফগানিস্তানের এই ঘরোয়া ব্যাপারে অনর্থক প্রাণ দেয়। কাবুল বাকি পৃথিবী থেকে তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে অ্যারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

অ্যারোপ্লেন এল। প্রথম মেয়েদের পালা। ফরাসি গেল, জর্মন গেল, ইতালীয় গেল, পোল গেল— এককথায় দুনিয়ার অনেক জাতের অনেক স্ত্রীলোক গেল, শুধু ভারতীয় মেয়েদের কথা কেউ শুধাল না। অ্যারোপ্লেনগুলো ভারতীয় অর্থে কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়। অথচ সবচেয়ে বিপন্ন ভারতীয় মেয়েরাই— অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা আপন আপন লিগেশনের আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু ভারতীয়দের দেখে কে? প্রফেসর, দোকানদার, ড্রাইভারের বউকে ব্রিটিশ লিগেশনে স্থান দিলে স্যার ফ্রান্সিস বিদেশি সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে? বামুনের জাত গেলে প্রায়শ্চিত আছে, আর মুসলমানদের তো জাত যায় না। কিন্তু ইংরেজের জাতিভেদ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। তার দেশের যেরকম কাগজে-কলমে লেখা, আইনে বাঁধা কন্সটিটুশন নেই— ঠিক তেমনি তার জাতিভেদপ্রথা কোনও বাইবেল-প্রেয়ার বুকে আপ্তবাক্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অথচ সে জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথের ভূতের কানমলার মতো— 'সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।' দর্শন, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোন, মার্কসিজমের দিগ্বিজয়ী কৌটিল্যই হোন, অথবা কয়লার খনির মজুরই হোন, এই কানমলা স্বীকার করে করে হৌস অব লর্ডসে না পৌঁছানো পর্যন্ত দর্শন মিথ্যা, মার্কসিজ্‌ম ভুল, শ্রমিকসঙ্ঘের দেওয়া সম্মান ভণ্ডুল। যে এই কানমলা স্বীকার করে না ইংরেজের কাছে সে আধপাগল। তার নাম বার্নাড শ।

বাড়াবাড়ি করছি? মোটেই না। ধান ভানতে শিবের গীত? তাও নয়। বিপ্লব-বিদ্রোহ, রক্তপাত-রাহাজানি মাত্রই রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য— এতক্ষণ সেকথাই হচ্ছিল, এখন তাঁর নন্দীভৃঙ্গী-সম্বাদের পালা।

ইংরেজের এই 'আভিজাত্য', এই 'স্নবারি' ছাড়া অন্য কোনও কিছু দিয়ে ব্রিটিশ রাজদূতের মনোবৃত্তির যুক্তিযুক্ত অর্থ করা যায় না। ব্রিটিশ লিগেশনের যা আকার তাতে কাবুলের বাদবাকি

www.pathagar.com

সবকটা রাজদূতাবাস অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। একখানা ছোটখাটো শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না— নিজের জলের কল, ইলেকট্রিক পাওয়ার হৌস, এমনকি ফায়ার-ব্রিগেড পর্যন্ত মৌজুদ। শীতকালে সায়েব-সুবোদের খেলাধুলোর জন্য চা-বাগানের পাতা শুকোবার ঘরের মতো যে প্রকাণ্ড বাড়ি থাকে তারই ভেতর সমস্ত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থিনীর জায়গা হতে পারত। আহারাদি? ব্রিটিশ লিগেশন কাবুল থেকে পালিয়ে আসার সময় যে টিনের খাদ্য ফেলে এসেছিল তাই দিয়ে মেয়েদের পাকা ছ মাস চলতে পারত।

ফ্রেঞ্চ লিগেশনের যে মিনিস্টারকে বেনওয়া সায়েব রসিকতা করে 'মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন' বলতেন, তিনি পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থী ফরাসিদের মন চাঙ্গা করার জন্য ভাণ্ডার উজাড় করে শ্যাম্পেন খাইয়েছিলেন।

ডাক্তার আসে না, অন্ন জুটছে না, পথ্যের অভাব, দাই নেই, আসন্নপ্রসবার আশ্রয় জুটছে না; তাকে ফেলে রেখে ভারতীয় পয়সায় কেনা হাওয়াই জাহাজ ভারতবর্ষে যাচ্ছে ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন, সকল জাতের মেমসায়েবদের নিয়ে! হে দ্রৌপদী-শরণ, চক্রধারণ, এ দ্রৌপদী যে অন্তঃসত্ত্বা!

উত্তরদিক থেকে কাবুল শহর আক্রমণ করতে হলে ব্রিটিশ রাজদূতাবাস অতিক্রম করে আরও এক মাইল ফাঁকা জায়গা পেরোতে হয়। বাচ্চা তাই করে শহর-আরা হস্টেলে পৌঁছেছিল। সুবে আফগানিস্তান জানে সেসময় পাকা চারদিন ব্রিটিশ রাজদূতাবাস তথা মহামান্য স্যার ফ্রান্সিসের জীবন বাচ্চার হাতের তেলোয় পুঁটিমাছের মতো এক গণ্ডুষ জলে খাবি খাচ্ছিল। বাচ্চা ইচ্ছে করলেই যে-কোনও মুহূর্তে লিগেশনকে কচু-কাটা করতে পারত— একটু ঔদাসীন্য দেখালেই তার উদগ্রীব সঙ্গীরা সবাইকে কতল করে বাদশাহি লুট পেত, কিন্তু জলকরঙ্কবাহীর তস্করপুত্র অভিজাততনয়ের প্রাণ দান করল। তবু দস্যুদত্ত করুণালব্ধ সে-প্রাণ বিপন্না নারীর দুঃখে বিগলিত হল না।

গল্প শুনেছি, জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর নাতিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে এক নিগ্রো হ্যাট তুলে দু জনকে নমস্কার করল। ওয়াশিংটন হ্যাট তুলে প্রতিনমস্কার করলেন, কিন্তু নাতি নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে নমস্কার গ্রহণ করল না। জর্জ ওয়াশিংটন নাতিকে বললেন, 'নগণ্য নিগ্রো তোমাকে ভদ্রতায় হার মানাল।'

দয়া দাক্ষিণ্যে, করুণা-ধর্মে মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রতিভূ হিজ একসেলেন্সি লেফটেনেন্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিসকে হার মানাল ডাকুর বাচ্চা!

চিরকুট পেলুম, দেমিদফ লিখেছেন রাশান এম্বেসিতে যেতে। এরকম চিঠি আর কখনও পাইনি, কারণ কোনওকিছুর দরকার হলে তিনি নিজেই আমার বাড়িতে উপস্থিত হতেন।

চেহারা দেখেই বুঝলুম কিছু-একটা হয়েছে। দোরের গোড়াতেই বললুম, 'কী হয়েছে, বলুন। দেমিদফ কোনও উত্তর না দিয়ে আমাকে ঘরে এনে বসালেন। মুখোমুখি হয়ে বসে দু হাত দু জানুর উপর রেখে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলশফ মারা গিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'কী?'

www.pathagar.com

দেমিদফ বললেন, 'আপনি জানতেন যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হতেই বলশফ নিজের থেকে আমানউল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের উপর অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা ফেলার প্রস্তাব করেন। কাল বিকেলে—'

আমি ভাবছি, বলশফ কিছুতেই মরতে পারে না, অবিশ্বাস্য।

'— কাল বিকেলে অন্য দিনের মতো বোমা ফেলে এসে এম্বেসির ক্লাবঘরে দাবা খেলতে বসেছিলেন। ব্রিচেসের পকেটে ছোট একটি পিস্তল ছিল; বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছিলেন, ডান হাত পকেটে রেখে পিস্তলের ঘোড়াটা নিয়ে খেলা করছিলেন— জানেন তো, বলশফের স্বভাব, কিছু-একটা নাড়াচাড়া না করে বসতে পারতেন না। হঠাৎ ট্রিগারে একটু বেশি চাপ পড়াতেই গুলি পেটের ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছে পর্যন্ত চলে যায়। ঘণ্টা ছয়েক বেঁচে ছিলেন, ডাক্তার কিছু করতে পারলেন না।'

আমার তখনও কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বলশফের মতো বটগাছ কী করে বিনা ঝড়ে পড়ে যেতে পারে। এত লড়াই লড়ে, এত জখম কাটিয়ে ওঠে শেষে নিজের হাতে—?

দেমিদফ বললেন, 'আপনার খুব লাগবে আমি জানতুম তাই সংক্ষেপে বললুম; আর যদি কিছু জানতে চান— ?'

আমি বললুম, 'না।'

'চলুন, দেখতে যাবেন।'

আমি বললুম, 'না।' বাড়ি যাবার জন্যই উঠলুম।

মাদাম তাড়াতাড়ি আমার সামনে পথ বন্ধ করে বললেন, 'এখানে খেয়ে যান।'

আমি বললুম, 'না।'

টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে বেরোবার সময় হঠাৎ যেন শুনতে পেলুম বলশফের গলা, 'জদ্রাস্‌ভুইয়িতে, মই প্রিয়াতেল— এই যে বন্ধু, কীরকম?' চমকে উঠলুম। আমার মন তখনও বিশ্বাস করছে না, বলশফ নেই। এই টেনিস কোর্টেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল আর এই যে দেউড়ি দিয়ে বেরোচ্ছি এরই ভিতর দিয়ে কতবার তাঁর সঙ্গে প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছি।

বাড়ি এসে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার অজানতে মন সমস্ত রাত বলশফের কথা ভেবেছে। ঘুম ভাঙতেই যেন শুধু সচেতন হলুম। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তা। ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'বলশফ, তুমি আমানউল্লার হয়ে লড়ছ কেন? আমানউল্লা রাজা, বাচ্চার দল প্রলেতারিয়েস্ট অব দি প্রলেতারিয়া। তোমার উচিত বাচ্চার দলে যোগ দিয়ে লড়া।'

বলশফ বলেছিল, 'বাচ্চা কী করে প্রলেতারিয়া হল? সেও তো রাজার মুকুট পরে এসেছে। রাজায় রাজায় লড়াই। এক রাজা প্রগতিপন্থী, আরেক রাজা প্রগতির শত্রু। চিরকাল প্রগতির জন্য লড়েছি, এখনও লড়ছি, তা সে ত্রৎস্কির নেতৃত্বেই হোক আর আমানউল্লার আদেশেই হোক।'

আমানউল্লার সেই চরম দুর্দিনে সব বিদেশির মধ্যে একমাত্র বলশফের কর্তৃত্বে রাশান পাইলটরাই তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাচ্চা জিতলে তাদের কী অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে একদম পরোয়া না করে।

www.pathagar.com

দিন পনেরো পরে খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেন কাবুল থেকে বিদেশি সব স্ত্রীলোক কাচ্চা-বাচ্চা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে; বিদেশি বলতে এখন বাকি শুধু ভারতীয়। তিন লম্ফে ব্রিটিশ লিগেশনে উপস্থিত হয়ে মৌলানার বউয়ের কথাটা সকাতর সবিনয় নিবেদন করলুম। ব্রিটিশের দয়া অসীম। ভারতবাসিনী-লাদাই উড়োজাহাজের প্রথম ক্ষেপেই তিনি স্থান পেলেন। পুনরপি তিন লম্ফে বাড়ি পৌঁছে আঙিনা থেকেই চিৎকার করে বললুম, 'মৌলানা, কেল্লা ফতেহ্, সিট পেয়ে গিয়েছি। বউকে বলো তৈরি হতে। এখন ওজন করাতে নিয়ে যেতে হবে— কর্তারা ওজন জানতে চান।'

মৌলানা নিরুত্তর। আমি অবাক। শেষটায় বললেন যে, তাঁর বউ নাকি একা যেতে রাজি নন, বলছেন, মরবার হলে এদেশে স্বামীর সঙ্গেই মরবেন। আমি শুধালুম, 'তুমি কী বলছ?' মৌলানা নিরুত্তর। আমি বললুম, 'দেখ মৌলানা, তুমি পাঞ্জাবি, কিন্তু শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আর গুরুদেবের মোলায়েম গান গেয়ে গেয়ে তুমি বাঙালির মতো মোলায়েম হয়ে গিয়েছ। "বাঁধিনু যে রাখি-টাখি", এখন বাদ দাও।' মৌলানা তবু নিরুত্তর। চটে গিয়ে বললুম, 'তুমি হিন্দু হয়ে গিয়েছ, তাও আবার ১৮১০ সালের— সতীদাহে বিশ্বাস কর। কিন্তু জানো, যে গুরুদেবের নাম শুনে অজ্ঞান হও, তাঁরই ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর টাকা দিয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিলেতে মোকদ্দমা লড়িয়েছিলেন।' মৌলানা নিরুত্তর। এবারে বললুম, 'শোনো ব্রাদার, এখন ঠাট্টামশকরার সময় নয়, কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বউয়ের কবে বাচ্চা হবে, তার হিসেব-টিসেব রাখনি— না হয় বদ্যি পেলুম, ধাই পেলুম, কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার পর তোমার বউয়ের—' বার তিনেক গলা-খাঁকারি দিয়ে বললুম— 'তা হলে আমি দুধ যোগাড় করব কোথা থেকে? বাজারে ফের কবে দুধ উঠবে, তার তো কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।'

মৌলানা বউয়ের কাছে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। মৌলানা বেরিয়ে এসে বললেন, 'রাজি হচ্ছেন না।'

তখন মৌলানাকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলুম। বললুম, 'আপনি যে মৌলানাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তার কারণ যে আমি বুঝতে পারছিনে তা নয়; কিন্তু ভেবে দেখুন তো, আপনার না যাওয়াতে তাঁর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনি যদি চলে যান, তবে তিনি যেখানে খুশি কোনও ভালো জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন; শুধু তাই নয়, অবস্থা যদি আরও খারাপ হয়, তবে হয়তো তাঁকেও এদেশ ছাড়তে হবে। আপনি না থাকলে তখন তাঁর পক্ষে সবকিছুই অনেক সহজ হয়ে যাবে। এসব কথা তিনি আপনাকে কিছুই বলেননি, কারণ এখন তিনি নিজের কথা আদপেই ভাবছেন না, ভাবছেন শুধু আপনার মঙ্গলের কথা। আপনি তাঁর স্ত্রী, আপনার কি এদিকে খেয়াল করা উচিত নয়?'

ওকালতি করছি আর ভাবছি মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ব্যারিস্টারি পড়াব। মেয়ে হলে আমানউল্লার মায়ের হাতে সঁপে দেব।

ওষুধ ধরল। ভারত-নারীর শ্মশানচিকিৎসা স্বামীর স্বার্থের দোহাই পাড়া।

পরদিন সকালবেলা মৌলানা বউকে নিয়ে অ্যারোড্রামে গেলেন। বিপদ-আপদ হলে আবদুর রহমানের কাঁধ কাজে লাগবে বলে সেও সঙ্গে গেল। আমি রইলুম বাড়ি পাহারা দিতে। দিন পরিষ্কার ছিল বলে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, পুব থেকে প্রকাণ্ড ভিকার্স্ বমার

www.pathagar.com

এল, নামল, ফের পুবদিকে চলে গেল। মাটিতে আধ ঘণ্টার বেশি দাঁড়ায়নি— কাবুল নিরাপদ স্থান নয়।

জিয়াউদ্দিন ফিরে এসে মুখ ঝামর করে উপরে চলে গেলেন। আবদুর রহমান বলল, 'মৌলানা সাহেবের বিবির জামা-কাপড় দেখে পাইলট বলল যে, অ্যারোপ্লেন যখন আসমানে অনেক উপরে উঠবে, তখন ঠাণ্ডায় তাঁর পা জমে যাবে। তাই বোধহয় তারা সঙ্গে খড় এনেছিল— মৌলানা সাহেব সেই খড় দিয়ে তাঁর বিবির দু পা বেশ করে পেঁচিয়ে দিলেন— দেখে মনে হল যেন খড়ে জড়ানো বিলিতি সিরকার বোতল। সব মেয়েদেরই পা একরকম কায়দায় সফর-দুরস্ত করতে হল।'

আমরা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলুম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে কয়েকজন লোক চলে যাচ্ছে দেখে আবদুর রহমান হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভারবাহীরা আমার প্রতিবেশী কর্নেলের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আবদুর রহমান কড়া নাড়ল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, আর্ত ক্রন্দনধ্বনি যেন তীরের মতো বাতাস ছিঁড়ে আমার কানে এসে পৌঁছল— মড়া দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকাতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণ গলার পর গলা সে আর্তনাদে যোগ দিতে লাগল। চিৎকারে মানুষের বেদনা যেন সপ্তম স্বর্গে ভগবানের পায়ের কাছে পৌঁছতে চাইছে।

কান্না যেন হঠাৎ কেউ গলা টিপে বন্ধ করে দিল— মড়া বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই নিস্তব্ধতা তখন যেন আমাকে কান্নার চেয়ে আরও বেশি অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে গিয়ে মৌলানার ঘরে ঢুকলুম। আবদুর রহমান এসে খবর দিল, 'কর্নেল লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন।'

মৌলানা দু হাত তুলে দোয়া পড়তে আরম্ভ করলেন। আবদুর রহমান আর আমি যোগ দিলুম। দোয়া শেষে মৌলানা বললেন, 'লড়াইয়ে যাওয়ার আগে কর্নেল আমাদের দোয়া মাঙতে এসেছিলেন, আমাদের ওপর এখন তাঁর হক আছে!' তার পর মৌলানা ওজু করে কুরান শরিফ পড়তে আরম্ভ করলেন।

দুপুরবেলা মৌলানার ঘরে গিয়ে দেখি, কুরান পড়ে পড়ে তাঁর চেহারাটা অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছে। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বিরহ ও তাঁর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মন থেকে কেটে গিয়েছে।

কর্নেলের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা জাগল। কোনও কোনও মানুষ মরে গিয়েও অন্যের মনে শান্তির উপলক্ষ হয়ে যান।

কিন্তু আমার মনে খেদও রইল। যে-মানুষটিকে পাঁচ মিনিটের জন্য চিনেছিলুম তাঁর মৃত্যুতে মনে হল যেন একটি শিশু-সন্তান অকালে মারা গেল। আমাদের পরিচয় তার পরিপূর্ণতা পেল না।

আটত্রিশ

আফগান প্রবাদ 'বাপ-মা যখন গদগদ হয়ে বলেন, "আমাদের ছেলে বড় হচ্ছে" তখন একথা ভাবেন না যে, ছেলের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও গোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।'

www.pathagar.com

আমানউল্লা শুধু তাঁর প্রিয় সংস্কার-কর্মের দিকেই নজর রেখেছিলেন, লক্ষ করেননি যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজত্বের দিনও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু শুধু আমানউল্লাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই— তাঁর উজির-নাজির সঙ্গী-সাথি ও রাস্তার আর পাঁচজন বাচ্চার পালিয়ে যাওয়াতে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টাতে ছিল।

বাচ্চার আক্রমণের ঠিক একমাস পরে— জানুয়ারির কঠোর শীতের মাঝামাঝি— একদিন শরীর খারাপ ছিল বলে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় এক পাঞ্জাবি অধ্যাপক দেখা করতে এলেন। শহর তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দিনের বেলা চলাফেরা করাতে বিশেষ বিপদ নেই।

জিগ্যেস করলেন, 'খবর শুনেছেন?'

আমি শুধালুম, 'কী খবর?'

বললেন, 'তা হলে জানেন না, শুনুন। এরকম খবর আফগানিস্তানের মতো দেশেও রোজ রোজ শোনা যায় না।'

'ভোরবেলা চাকর বলল, রাজপ্রাসাদে কিছু একটা হচ্ছে, শহরের বহুলোক সেদিকে যাচ্ছে। গিয়ে দেখি প্রাসাদে আফগানিস্তানের সব উজির, তাদের সহকারী, ফৌজের বড় বড় অফিসার এবং শহরের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিও উপস্থিত। সক্কলের মাঝখানে মুইন-উস-সুলতানে, ইনায়েতউল্লা খান ও তাঁর বড় ছেলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, শহরের এত বড় মজলিশের মাঝখানে আমানউল্লা নেই। কাউকে জিগ্যেস করার আগেই এক ভদ্রলোক— খুব সম্ভব রইস-ই-শুরাই (প্রেসিডেন্ট অব দি কৌন্সিল) হবেন— একখানা ফরমান পড়তে আরম্ভ করলেন। দূরে ছিলুম বলে সবকথা স্পষ্ট শুনতে পাইনি; কিন্তু শেষের কথাগুলো পাঠক বেশ জোর দিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন বলে সন্দেহের কোনও অবকাশ রইল না। আমানউল্লা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ও বড় ভাই মুইন-উস-সুলতানে ইনায়েতউল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন।'

আমি উত্তেজিত হয়ে জিগ্যেস করলুম, 'হঠাৎ? কেন? কী হয়েছে?'

'শুনুন; ফরমান পড়া শেষ হলে কাবুলের এক মাতব্বর ব্যক্তি আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে ইনায়েতউল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তখন ইনায়েত উল্লা অত্যন্ত শান্ত এবং নির্জীব কণ্ঠে যা বললেন, তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তিনি কখনও সিংহাসনের লোভ করেননি— দশ বৎসর পূর্বে যখন নসরউল্লা-আমানউল্লার রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখন তিনি অযথা রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখে আপন অধিকার ত্যাগ করেছিলেন।'

অধ্যাপক দম নিয়ে বললেন, 'তার পর ইনায়েতউল্লা যা বললেন সে অত্যন্ত খাঁটি কথা। বললেন, 'দেশের লোকের মঙ্গলচিন্তা করেই আমি একদিন ন্যায্য সিংহাসন গ্রহণ করিনি; আজ যদি দেশের লোক মনে করেন যে, আমি সিংহাসন গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল হবে তবে আমি শুধু সেই কারণেই সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজি আছি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমানউল্লা?'

www.pathagar.com

অধ্যাপক বললেন, 'তখন খবর নিয়ে শুনলুম, আমানউল্লার ফৌজ কাল রাত্রে লড়াই হেরে গিয়ে পালিয়েছে। খবর ভোরের দিকে আমানউল্লার কাছে পৌঁছয়; তিনি তৎক্ষণাৎ ইনায়েতউল্লাকে ডেকে সিংহাসন নিতে আদেশ করেন। ইনায়েত নাকি অবস্থাটা বুঝে প্রথমটায় রাজি হননি— তখন নাকি আমানউল্লা তাঁকে পিস্তল তুলে ভয় দেখালে পর তিনি রাজি হন।

'আমানউল্লা ভোরের দিকে মোটরে করে কান্দাহার রওনা হয়েছেন। যাবার সময় ইনায়েতউল্লাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, পিতৃপিতামহের দুররানি ভূমি কান্দাহার তাকে নিরাশ করবে না। তিনি শীঘ্রই ইনায়েতউল্লাকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হবেন।'

আমানউল্লা তা হলে শেষ পর্যন্ত পালালেন। চুপ করে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলুম।

অধ্যাপক হেসে বললেন, 'আপনি তো টেনিস খেলায় ইনায়েতউল্লার পার্টনার হন। শুনেছি, তিনি তাঁর বিরাট বপু নাড়াচাড়া করতে পারেন না বলে আপনি কোর্টের বারোআনা জমি সামলান— এইবার আপনি আফগানিস্তানের বারোআনা না হোক অন্তত দু চারআনা চেয়ে নিন।'

আমি বললুম, 'তা তো বটেই। কিন্তু বাচ্চার বুলেটের অন্তত দু চারআনা ঠেকাবার ভার তা হলে আমার ওপর পড়বে না তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'তওবা, তওবা। বাচ্চা এখন আর লড়বে কেন, বলুন। তার কাছে ইত্যবসরে শোরবাজারের হজরত আর সর্দার ওসমান খান ইনায়েতউল্লার পক্ষ থেকে খবর নিয়ে গিয়েছেন যে, 'কাফির' আমানউল্লা যখন সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়েছে তখন আর যুদ্ধবিগ্রহ করার কোনও অর্থ হয় না। বাচ্চা যেন বাড়ি ফিরে যান— তাঁর সঙ্গে ইনায়েতউল্লার কোনও শত্রুতা নেই।'

অধ্যাপক চলে গেলে পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর্কের দিকে চললুম।

এবারে শহরের দৃশ্য আরও অদ্ভুত। বাচ্চার প্রথম ধাক্কার পর তবু কাবুল শহরে রাজা ছিলেন, তিনি দুর্বল না সবল, সাধারণ লোকে জানত না বলে রাজদণ্ডের মর্যাদা তখনও কিছু কিছু ছিল কিন্তু এখন যেন আকাশে বাতাসে অরাজকতার বিজয়লাঞ্ছন অঙ্কিত। যারা রাস্তা দিয়ে চলেছে তারা স্পষ্টত কাবুলবাসিন্দা নয়। তাদের চোখে-মুখে হত্যালুণ্ঠনের প্রতীক্ষা আর লুক্কায়িত নয়। এরা সব দল বেঁধে চলেছে— কেউ কোথাও একবার আরম্ভ করলে এদের আর ঠেকানো যাবে না।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু একটিমাত্র পরিচিত লোককেও দেখতে পেলুম না। তখন ভালো করে লক্ষ করলুম যে, প্রায় সবাই দল বেঁধে চলেছে, ভিখারি-আতুর ছাড়া একলা-একলি আর কেউ বেরোয়নি।

খাঁটি খবর দিতে পারে এমন একটি লোক পেলুম না। আভাসে আন্দাজে বুঝলুম, ইনায়েতউল্লা আর্কের ভিতর আশ্রয় নিয়ে দুর্গ বন্ধ করেছেন। আমানউল্লার কী পরিমাণ সৈন্য ইনায়েতউল্লার বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গের ভেতর আছে তার কোনও সন্ধান পেলুম না।

দোস্ত মুহম্মদ আমানউল্লার হয়ে লড়তে গিয়েছেন জানতুম, তাই একমাস ধরে তাঁর বাড়ি বন্ধ ছিল। ভাবলুম, এবার হয়তো ফিরেছেন, কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল।

www.pathagar.com

বাড়ি ফিরে দেখি মৌলানা তখনও আসেননি, তাই পাকাপাকি খবরের সন্ধানে মীর আসলমের বাড়ি গেলুম।

বুড়ো আবার সেই পুরনো কথা দিয়ে আরম্ভ করলেন, যখন কোনও দরকার নেই, তখন এই বিপজ্জনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করি কেন?

আমি বললুম, 'সামলে কথা বলবেন, স্যার। জানেন, বাদশা আমার পার্টনার। চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার কী চাই বলুন, যা দরকার বাদশাকে বলে করিয়ে দেব।'

মীর আসলম অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তার পর বললেন ফারসিতে একটা প্রবাদ আছে, জানো,

'রাজত্ববধূরে যেই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণ-ধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন।'

'কিন্তু তোমার বাদশাহ অদ্ভুত! সাধারণ বাদশাহ কামানবন্দুক চালিয়ে অন্ততপক্ষে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে, তোমার বাদশাহ ইনায়েতউল্লা পিস্তলের ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন!'

আমি বললুম, 'কিন্তু দেখুন, শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে যার হক ছিল তিনিই বাদশাহ হলেন। কাবুলের লোকজন তো আর ভুলে যায়নি যে, ইনায়েতউল্লা শহীদ বাদশাহ হবিবউল্লার বড় ছেলে।'

মীর আসলম বললেন, 'সেকথা ঠিক কিন্তু হক্কের এত মাল এত দেরিতে পৌঁছেছে যে, এখন সে মালের ওপর আর পাঁচজনের নজর পড়ে গিয়েছে। শুনেছ বোধহয় শোরবাজারের হজরত বাচ্চাকে ফেরাতে গিয়েছেন। তোমার কী মনে হয়?

আমি বললুম, 'ইনায়েতউল্লা তো আর "কাফির" নন। বাচ্চা ফিরে যাবে।'

মীর আসলম বললেন, 'শোরবাজারের হজরতকে চেন না— তাই একথাটা বললে। তিনি আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় মোল্লা, আমানউল্লা বিদ্রোহের গোড়ার দিকেই তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে ফাঁসি দিতে পারেননি। আজ শোরবাজার স্বাধীন, কিন্তু ইনায়েতউল্লা বাদশাহ হলে তাঁর কী লাভ? আজ না হয় তিনি বিপদে পড়ে শোরবাজারের হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাচ্চা যদি ফিরে যায় তবে দু দিন বাদে তাঁর শক্তি বাড়বে; সিংহাসনে কায়েম হয়ে বসার পর তিনি আর শোরবাজারের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। রাজার ছেলে রাজা হলেন, তিনি রাজত্ব চালাতে জানেন, শোরবাজারকে দিয়ে তাঁর কী প্রয়োজন?

'পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি ইনায়েতউল্লাকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা হতে পারে তবে তাতে শোরবাজারের লাভ। বাচ্চা ডাকাত, সে রাজ্যচালনার কী জানে? যে মোল্লাদের উৎসাহে বাচ্চা আজ লড়ছে সেই মোল্লাদের মুকুটমণি শোরবাজার তখন রাজ্যের কর্ণধার হবেন।

'কিন্তু তারও চেয়ে বড় কারণ রয়েছে, বাচ্চা কেন ফিরে যাবে না। তার যেসব সঙ্গী-সাথি এই একমাস ধরে বরফের উপর কখনও দাঁড়িয়ে কখনও শুয়ে লড়ল, বাচ্চা তাদের শুধু-হাতে বাড়ি ফেরাবে কী করে? কাবুল-লুটের লালসা দেখিয়েই তো বাচ্চা তাদের আপন ঝাণ্ডার তলায় জড়ো করেছে।'

www.pathagar.com

আমি বললুম, 'বাহ্! আপনিই তো সেদিন বললেন, বাচ্চা মহল্লা-সর্দারদের কথা দিয়েছে যে, কাবুলিরা যদি আমানউল্লার হয়ে না লড়ে তবে সে কাবুল লুট করবে না।'

মীর আসলম বললেন, 'এরই নাম রাজনীতি। ইংরেজ যেরকম লড়াইয়ের সময় আরবদের বলল তাদের প্যালেস্টাইন দেবে, ইহুদিদের বলল তাদেরও দেবে।'

বাড়ি ফিরে এসে দেখি পাঞ্জাবি অধ্যাপকরা দল বেঁধে মৌলানাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে আড্ডা জমিয়েছেন। আমাকে নিয়ে অনেক অনেক হাসিঠাট্টা করলেন, কেউ বললেন, 'দাদা, আমার ছ মাসের ছুটির প্রয়োজন', কেউ বললেন, 'পাঁচ বছর ধরে প্রোমোশন পাইনি, বাদশাহকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবেন।' মৌলানা আমার হয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, স্বপ্নেই যদি পোলাও খাবেন তবে ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছেন কেন? যা চাইবার দরাজ-দিলে চেয়ে নিন।'

দেখলুম, এদের সকলেরই বিশ্বাস বাচ্চা শুধু-হাতে বাড়ি ফিরে যাবে আর কাবুলে ফের হারুন-অর-রশিদের রাজত্ব কায়েম হবে।

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান বুলেটিন ঝেড়ে গেল, বাচ্চা ফিরতে নারাজ, বলছে, 'যে-তাজ পাঁচজন আমাকে পরিয়েছেন, সে তাজ আমার শিরোধার্য।' বুঝলুম, মীর আসলম ঠিকই বলেছেন, 'রাজা হওয়ার অর্থ সিংহের পিঠে সওয়ার হওয়া— একবার চড়লে আর নামবার উপায় নেই।'

সে রাত্রে বাড়িতে ডাকু হানা দিল। আবদুর রহমান তার রাইফেল ব্যবহার করতে পেয়ে যত-না গুলি ছুড়ল তার চেয়ে আনন্দে লাফাল বেশি। ফিচকে ডাকাতই হবে, আবদুর রহমানের রণনাদ শুনে পালাল।

আবদুর রহমান তার বুলেটিনের মাল-মসলা সংগ্রহ করে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকেই ডেকে পই পই করে নানারকম প্রশ্ন জিগ্যেস করে— আমানউল্লা চলে যাওয়ায় তার শেষ ডর ভয় কেটে গিয়েছে। তবে এখন বাচ্চায়ে সকাও না বলে সম্মানভরে হবিবউল্লা খান বলে।

দুপুরবেলার বুলেটিনের খবর 'ইনায়েতউল্লা খান আর্ক দুর্গের ভিতর বসে আমানউল্লার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতীক্ষা করছেন। বাচ্চা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছে। না হলে সে কাবুল শহরের কাউকে জ্যান্ত রাখবে না— ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। ইনায়েতউল্লা উত্তর দিয়েছেন, "কাবুলবাসীদের প্রচুর রাইফেল আর অপর্যাপ্ত বুলেট আছে, তাই দিয়ে তারা যদি আত্মরক্ষা না করতে পারে তবে এসব ভেড়ার পালের মরাই ভালো।" '

মৌলানা বললেন, 'বাচ্চা এখন আর কাবুলের মহল্লা-সর্দারদের কেয়ার করে না।' তার পর আবদুর রহমানকে পার্লিমেন্টি কায়দায় সপ্লিমেন্টরি শুধালেন, 'আর্কে কী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আছে? সৈন্যরা টিকতে পারবে কতদিন?' আবদুর রহমান কাঁচা ডিপ্লোমেট— নোটিসের হুমকি দিল না। বলল, 'অন্তত ছয় মাস।'

তৃতীয় দিনের বুলেটিন : 'বাচ্চা বলেছে, ইনায়েতউল্লা যদি আত্মসমর্পণ না করেন তবে যেসব আমির-ওমরাহ সেপাই-শান্ত্রি তাঁর সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের স্ত্রীপুত্রপরিবারকে সে খুন করবে। ইনায়েতউল্লা উত্তর দিয়েছে, 'কুছ পরোয়া নেই।'

www.pathagar.com

ফালতো প্রশ্ন, 'বাচ্চা দুর্গ আক্রমণ করছে না কেন?'

অবজ্ঞাসূচক উত্তর, 'রাইফেলের গুলি দিয়ে পাথরের দেয়াল ভাঙা যায় না।'

সে সন্ধ্যায় ব্রিটিশ লিগেশনের এক কেরানি প্রাণের ভয়ে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। শহরে এসেছিলেন কী কাজে; বাচ্চার ফৌজ দলে দলে শহরে ঢুকছিল বলে লিগেশনে ফিরে যেতে পারেননি। রাত্রে তাঁর মুখে শুনলুম যে, দুর্গের ভিতরে বন্ধ আমির-ওমরাহদের স্ত্রীপুত্রপরিবার দুর্গের বাইরে। ইনায়েতউল্লার পরিবার দুর্গের ভিতরে। আমিরগণ ও বাদশাহের স্বার্থ এখন আর সম্পূর্ণ এক নয়। আমিরগণ তাঁদের পরিবার বাঁচাবার জন্য আত্মসমর্পণ করতে চান। ইনায়েতউল্লা নাকি নিরাশ হয়ে বলেছেন, যেসব আমির-ওমরাহদের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছায় রাজা হয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তিনি আর দুর্গ রক্ষা করতে রাজি নন।

আবদুর রহমান সভাস্থলে উপস্থিত ছিল। বলল, 'আমি শুনেছি, সেপাইরা দুর্গ রক্ষা করতে রাজি, যদিও তাদের পরিবার দুর্গের বাইরে। তারা বলছে, "বউবাচ্চার জান আমানত দিয়ে তো আর ফৌজে ঢুকিনি।" ভয় পেয়েছেন অফিসার আর আমির ওমরাহদের দল।'

কেরানি বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু কোনটা খাঁটি কোনটা ঝুটা বুঝবার উপায় নেই। মোদ্দা কথা, ইনায়েতউল্লা সিংহাসন ত্যাগ করতে তৈরি, তবে তাঁর শর্ত : কোনও তৃতীয়পক্ষ যেন তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে নিরাপদে আফগানিস্তানের বাইরে নিয়ে যাবার জিম্মাদারি নেন। স্যার ফ্রান্সিস রাজি হয়েছেন।'

আমরা আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলুম, 'স্যার ফ্রান্সিসের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ল কে?'

'বলা শক্ত। শোরবাজার, ইনায়েতউল্লা, বাচ্চা— থুড়ি হবিবউল্লা খান— তিনজনের একজন, অথবা সকলে মিলে। এখন সেই কথাবার্তা চলছে।'

সে রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি মৌলানা আর কেরানি সায়েবেতে আফগান রাজনীতি নিয়ে আলোচনা তর্কবিতর্ক হল।

সকালবেলা আবদুর রহমান হাতে-সেঁকা রুটি, নুন আর বিনা দুধ-চিনিতে চা দিয়ে গেল। আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই স্পর্শ করতে পারলেন না। প্রবাদ আছে, 'কাজির বাড়ির বাঁদীও তিন কলম লিখতে পারে।' বুঝতে পারলুম, 'ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কেরানিও রাজভোগ খায়— এই দুর্ভিক্ষেও।'

দুপুরের দিকে কেরানি সায়েবের সঙ্গে শহরে বেরোলুম। বাচ্চার সেপাইয়ে সমস্ত শহর ভরে গিয়েছে। আর্কের পাশের বড় রাস্তায় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি— তিনি লিগেশনে যাবেন, আমি বাড়ি ফিরব— এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই একসঙ্গে শ খানেক রাইফেল আমাদের চারপাশে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, রাস্তায় লোকজন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে সেদিকে ছুটছে। আশ্রয়ের সন্ধানে নিশ্চয়ই, কিন্তু কে কোন দিকে যাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ না করে। চতুর্দিকে বাচ্চার ডাকাত, তাই সবাই ছুটেছে দিশেহারা হয়ে।

বাচ্চার প্রথম আক্রমণের দিনে শহরে যা দেখেছিলুম তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সেদিনকার কাবুলি ভয় পেয়েছিল যেন বাঘের ডাক শুনে; এবারকার ত্রাস হঠাৎ বাঘের থাবার

www.pathagar.com

সামনে পড়ে যাবার। কেরানি সায়েব পেশাওয়ারের পাঠান। সাহসী বলে খ্যাতি আছে। তিনি পর্যন্ত আমাকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছেন— মুশকিল-আসানই জানেন কোন দিক দিয়ে। পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে একটা ঘোড়া চলে গেল। নয়ানজুলিতে পড়তে পড়তে তাকিয়ে দেখি, ঘোড়-সওয়ারের পা জিনের পাদানে বেঁধে গিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝুলছে আর ঘোড়ার প্রতি গ্যালপের সঙ্গে সঙ্গে মাথা রাস্তার শানে ঠোক্কর খাচ্ছে।

ততক্ষণে রাস্তার সুর-রিয়ালিস্টিক ছবিটার এলোপাতাড়ি দাগ আমার মনে কেমন যেন একটা আবছা অর্থ এনে দিয়েছে। কেরানি সায়েবের হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে খালাস করে দাঁড়িয়ে গেলুম। ছবিটার যে জিনিস আমার অবচেতন মনে ততক্ষণে লক্ষ করে একটা অর্থ খাড়া করেছে, সে হচ্ছে যে ডাকুরা কাউকে মারার মতলবে, কোনও 'কত্‌লে আম' বা পাইকারি কচু-কাটার তালে নয়— তারা গুলি ছুড়ছে আকাশের দিকে। কেরানি সায়েবের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষণ করলুম।

ততক্ষণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে শুধু বাচ্চার ডাকাত দল, কেরানি সায়েব আর আমি; বাদবাকি নয়ানজুলিতে, দোকানের বারান্দায়, না হয় কাবুল নদীর শক্ত বরফের উপর উঁচু পাড়ির গা ঘেঁষে।

তিন-চার মিনিট ধরে গুলি চলল— আমরা কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার পর আবার সবাই এক-একজন করে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এল। ডাকাতের দল ততক্ষণে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছে— 'তাদের 'শাদিয়ানা' শুনে কাবুলের লোক এরকমধারা ভয় পেয়ে গেল।' "কিসের শাদিয়ানা?" জানো না খবর, ইনায়েতউল্লা তখ্‌ত ছেড়ে দিয়ে হাওয়াই জাহাজে করে হিন্দুস্তান চলে গিয়েছেন। তাই বাচ্চা— থুড়ি— বাদশাহ্ হবিবউল্লা খান হুকুম দিয়েছেন রাইফেল চালিয়ে "শাদিয়ানা" বা বিজয়োল্লাস প্রকাশ করার জন্য।'

জিন্দাবাদ 'বাদশাহ' 'গাজি' হবিবউল্লা খান!

বর্বর দেশে নতুন দলপতি উদূখলে বসলে নরবলি করার প্রথা আছে। আফগানিস্তানে এরকম প্রথা থাকার কথা নয়, তবু অনিচ্ছায় গোটা পাঁচেক নরবলি হয়ে গেল। 'শাদিয়ানা'র হাজার হাজার বুলেট আকাশ থেকে নামার সময় যাদের মাথায় পড়ল তাদের কেউ কেউ মরল— পুরু মীর আসলমি পাগড়ি মাথায় প্যাঁচানো ছিল না বলে।

পাগড়ি নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই। গরিব আফগানের মামুলি পাগড়ি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে আমানউল্লার রাজমুকুট খসে পড়ল।

উনচল্লিশ

ডাকাত সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরল।

মোল্লারা আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন ফরমান বেরোল। তার মূল বক্তব্য, আমানউল্লা কাফির, কারণ সে ছেলেদের এলজেব্রা শেখাত, ভুগোল পড়াত, বলত পৃথিবী গোল। বিংশ শতাব্দীতে এরকম ফরমান

www.pathagar.com

বেরুতে পারে সেকথা কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাচ্চার মতো ডাকাত যখন তখ্ত-নশিন হতে পারে তখন এরকম ফরমান আর অবিশ্বাস করার কোনও উপায় থাকে না। শুধু তাই নয়, ফরমানের তলায় মোল্লাদের সই ছাড়াও দেখতে পেলুম সই রয়েছে আমানউল্লার মন্ত্রীদের।

মীর আসলম বললেন, 'পেটের উপর সঙ্গিন ঠেকিয়ে সইগুলো আদায় করা হয়েছে। না হলে, বলো কোন সুস্থ লোক বাচ্চাকে বাদশাহি দেবার ফরমানে নাম সই করতে পারে? রাগের চোটে তাঁর চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে গিয়েছে, দাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্জন করে বললেন, 'ওয়াজিব্-উল্-কত্ল্— প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যাকে দেখামাত্র কত্ল করা সে কি না বাদশাহ হল!'

আমি বললুম, 'আপনি যা বলেছেন তা খুবই ঠিক; কিন্তু আশা করি এসব কথা যেখানে-সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো, সৈয়দ মুজতবা আলী, আমানউল্লার নিন্দা যখন আমি করেছি তখন সকলের সামনেই করেছি; বাচ্চায়ে সকাওয়ের বিরুদ্ধে যা বলবার তাও আমি প্রকাশ্যে বলি। তুমি কি ভাবছ কাবুল শহরের মোল্লারা আমাকে চেনে না, ফরমানের তলায় আমার সই লাগাতে পারলে ওরা খুশি হন না? কিন্তু ওরা ভালো করেই জানে যে, আমার বাঁ হাত কেটে ফেললেও আমার ডান হাত সই করবে না। ওরা ভালো করেই জানে যে, আমি ফতোয়া দিয়ে বসে আছি, "বাচ্চায়ে সকাও ওয়াজিব্-উল-কত্ল— অবশ্য বধ্য।" '

মীর আসলম চলে যাওয়ার পর মৌলানা বললেন, 'যতদিন আফগানিস্তানে মীর আসলমের মতো একটি লোকও বেঁচে থাকবেন ততদিন এদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'হক কথা, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা এইবেলা একটু ভেবে নিলে ভালো হয় না?'

দু জনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম; কখনও মুখ ফুটে কখনও যার যার আপন মনে। বিষয় : বাচ্চা তার ফরমানে আমানউল্লা যে কাফির সেকথা সপ্রমাণ করে বলেছে, 'এবং যেসব দেশি-বিদেশি মাস্টার প্রফেসর আমানউল্লাকে এসব কর্মে সাহায্য করত, তাদের ডিসমিস করা হল; স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।'

শেষটায় মৌলানা বললেন, 'অত ভেবে কদ্দু হবে। আমরা ছাড়া আরও লোকও তো ডিসমিস হয়েছে— দেখাই যাক না তারা কী করে।' মৌলানার বিশ্বাস দশটা গাধা মিললে একটা ঘোড়া হয়।

কিন্তু এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা।

'আবু হোসেন' নাটক যারা দেখেছেন, তাঁরা হয়তো ভাবছেন যে, কাবুলে তখন জোর রগড়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় তখন আমির-ফকির সকলেরই রসকষ কাবুল নদীর জলের মতো জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছে। বাচ্চাও শহরবাসীকে সন্দেহের দোদুল দোলায় বেশিক্ষণ দোলাল না। হুকুম হল আমানউল্লার মন্ত্রীদের ধরে নিয়ে এস, আর তাদের বাড়ি লুট কর।

www.pathagar.com

সে লুট কিস্তিতে কিস্তিতে হল। বাচ্চার খাস-পেয়ারারা প্রথম খবর পেয়েছিল বলে তারা প্রথম কিস্তিতে টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি দামি টুকিটাকি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় কিস্তিতে সাধারণ ডাকাতরা আসবাবপত্র, কার্পেট, বাসন-কোসন, জামাকাপড় বেছে বেছে নিয়ে গেল, তৃতীয় কিস্তিতে আর সব ঝড়ের মুখে উড়ে গেল— শেষটায় রাস্তার লোক কাঠের দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গিয়ে শীত ভাঙাল।

মন্ত্রীদের খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে হরেকরকম সম্ভব-অসম্ভব অত্যাচার করা হল গুপ্তধন বের করবার আশায়। তার বর্ণনা শুনে কাবুলের লোক পর্যন্ত শিউরে উঠেছিল— মৌলানা আর আমি শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিলুম।

তার পর আমানউল্লার ইয়ারবক্সি, ফৌজের অফিসারদের পালা। বন্ধ দোর-জানালা ভেদ করে গভীর রাত্রে চিৎকার আসত— ডাকু পড়েছে। সে আবার সরকারি ডাকু— তার সঙ্গে লড়াই করবার উপায় নেই, তার হাত থেকে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেল— রাস্তার উপর শীতে জমে-যাওয়া রক্ত, উলঙ্গ মড়া, রাত্রে ভীত নরনারীর আর্তচিৎকার— সবই সহ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, অভ্যাস হল না শুধু শুকনো রুটি, নুন আর বিনা দুধ-চিনিতে চা খাওয়ার। মায়ের কথা মনে পড়ল; তিনি একদিন বলেছিলেন, চা-বাগানের কুলিরা যে প্রচুর পরিমাণে বিনা দুধ-চিনিতে লিকার খায় সে পানের তৃপ্তির জন্য নয়, ক্ষুধা মারবার জন্য। দেখলুম অতি সত্যি কথা, কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কাবুলে ম্যালেরিয়া নেই, থাকলে তার পর চা-বাগানের কুলির যা হয়, আমারও তাই হত এবং তার পরমা গতি কোথায়, বাঙালিকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। মৌলানাকে জিগ্যেস করলুম, 'না খেতে পেয়ে, বুলেট খেয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে, এ-তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশস্ততম বল তো।'

মৌলানা কবিতা আওড়ালেন আরেক মৌলানা কবি সাদির—

চুন আহঙ্গে রফ্‌তন্ কুনদ্ জানে পাক্,
চিল বর তখ্‌ত মুরদন্ চি বর্ সরে খাক্?

পরমায়ু যবে প্রস্তুত হয় মহাপ্রস্থান তরে
একই মৃত্যু— সিংহাসনেতে অথবা ধূলির 'পরে।

বাচ্চার ফরমান জারির দিন সাতেক পরে ভারতীয়, ফরাসি, জর্মন শিক্ষক-অধ্যাপকেরা এক ঘরোয়া সভায় স্থির করলেন, স্যার ফ্রান্সিসকে তাদের দুরবস্থা নিবেদন করে হাওয়াই জাহাজে করে ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য বন্দোবস্ত ভিক্ষা করা।

অধ্যাপকেরা বললেন, কাবুল থেকে বেরোবার রাস্তা চতুর্দিকে বন্ধ : স্যার ফ্রান্সিস বললেন হ্যাঁ; অধ্যাপকেরা নিবেদন করলেন, কাবুলে কোনও ব্যাংক নেই বলে তাদের জমানো যা কিছু সম্বল তা পেশাওয়ারে এবং সে পয়সা আনাবার কোনও উপায় নেই; স্যার ফ্রান্সিস বললেন হুঁ; অধ্যাপকেরা কাতর অনুনয়ে জানালেন, স্ত্রী-পরিবার নিয়ে তাঁরা অনাহারে আছেন; সায়েব বললেন, 'অ'; অধ্যাপকেরা মরিয়া হয়ে বললেন, এখানে থাকলে তিলে তিলে মৃত্যু; সায়েব বললেন, আ।

www.pathagar.com

একদিকে ফুল্লরার বারমাসী, অন্যদিকে সায়েবের অ, আ করে বর্ণমালা পাঠ। ক্লাস সিক্সের ছেলে আর প্রথম ভাগের খোকাবাবু যেন একই ঘরে পড়াশোনা করছেন।

বর্ণমালা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন সায়েব বললেন, 'এখানকার ব্রিটিশ লিগেশন ইংলন্ডের ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র। ভারতবাসীদের সুখ-সুবিধে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্রিটিশ লিগেশনের কর্তব্য নয়। আমি যদি কিছু করতে পারি, তবে সেটা "ফেবার" হিসেবে করব, আপনাদের কোনও রাইট নেই।'

যাত্রাগানে বিস্তর দুর্যোধন দেখেছি। সায়েবের চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না, কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। দুর্যোধন 'ফেবার, রাইট' কোনও হিসেবেই পাঁচখানা গাঁ দিতে রাজি হয়নি, ইনি 'ফেবারেবল কনসিডারেশন' করতে রাজি আছেন।

এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ হলে হয়তো তিনি বগল বাজিয়ে সুখবর দেবার জন্য পাণ্ডবশিবিরে ছুটে যেতেন, কিন্তু আমার মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরের কথা। একটি মিথ্যে কথা বলবার জন্যে তাঁকে নরকদর্শন করতে হয়েছিল। ভাবলুম, এদিকে দুর্যোধন, ওদিকে বাচ্চায়ে সকাও, এর মাঝখানে যদি সাহস সঞ্চয় করে একটিবারের মতো এই জীবনে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারি তবে অন্তত একবারের মতো স্বর্গদর্শন লাভ হলে হতেও পারে।

বললুম, 'হাওয়াই জাহাজগুলো ভারতীয় পয়সায় কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়, পেশাওয়ারের বিমানঘাঁটি ভারতের নিজস্ব— এ অবস্থায় আমাদের কি কোনও হক নেই? ব্রিটিশ লিগেশন যে ভারতীয় অর্থে তৈরি, সায়েব যে ভারতীয় নিমক খান, সেকথা আর ভদ্রতা করে বললুম না।

সায়েব ভয়ঙ্কর চটে গেলেন, অধ্যাপকরাও ভয় পেয়ে গেলেন, বুঝলুম, জীবনমরণের ব্যাপার— ভারতীয়েরা কোনও গতিতে দেশে ফিরে যেতে পেলে রক্ষা পান— 'মেহেরবানি, হক' নিয়ে নাহক তর্ক করে কোনও লাভ নেই। বললুম, 'আমি যা বলেছি, সে আমার ব্যক্তিগত মত। আমি নিজে কোনও "ফেবার" চাইনে, কিন্তু আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন আর পাঁচজনের স্বার্থে আঘাত না করে।'

এর পর কথা কাটাকাটি করে আর কোনও লাভ নেই। আমার যা বক্তব্য সায়েব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, আর সায়েবের বক্তব্য ভারতবাসীর কাছে কিছু নতুন নয়— 'ফেবার' শব্দ দরখাস্তে যিনি যত ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে পারেন, তাঁকেই আমরা ভারতবর্ষে গেলে একশো বছর ধরে ইংরেজিতে সুপণ্ডিত বলে সেলাম করে আসছি।

সেই সন্ধ্যায়ই খবর পেলুম, যেসব ভারতবাসী স্বদেশে ফিরে যেতে চান, তাঁদের একটা ফিরিস্তি তৈরি করা হয়েছে। সায়েব স্বহস্তে আমার নামে ঢ্যারা কেটে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান এখন শুধু আগুনের তদারকি করে। বাদাম নেই যে খোসা ছাড়াবে, কালি নেই যে জুতো পালিশ করবে। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, দেখলে দুঃখ হয়।

মৌলানা শুতে গিয়েছেন। আবদুর রহমান ঘরে ঢুকল। আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, সবদিকে তো ডাকাতের পাল রাস্তা বন্ধ করে আছে। পানশিরে যাবার উপায় আছে?'

আবদুর রহমান আমার দুহাত আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধু চুমো খায়, আর চোখে চেপে ধরে; বলে 'সেই ভালো হুজুর, সেই ভালো। চলুন আমার দেশে। এরকম শুকনো রুটি আর

www.pathagar.com

নুন খেয়ে দু দিন বাদে আপনি আর বিছানা থেকে উঠতে পারবেন না। তার চেয়ে ভালো খাওয়ার জিনিস আমাদেরই বাড়িতে আছে। কিছু না হোক, বাদাম, কিশমিশ, পেস্তা, আঞ্জির, মোলায়েম পনির, আর হুজুর, আমার নিজের তিনটে দুম্বা আছে। আর একটি মাস, জোর দেড় মাস, তার পর বরফ গলতে আরম্ভ করলেই আপনাকে নদী থেকে মাছ ধরে এনে খাওয়াব। ভেজে, সেঁকে, পুড়িয়ে যেরকম আপনার ভালো লাগে। আপনি আমাকে মাছের কত গল্প বলেছেন, আমি আপনাকে খাইয়ে দেখাব। আরামে শোবেন, ঘুমোবেন, জানালা দিয়ে দেখবেন— '

আবদুর রহমানকে বাধা দিতে কষ্টবোধ হল। বেচারি অনেকদিন পর আবার প্রাণ খুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, পানশিরের পুরনো স্বপ্নে নতুন রঙ লাগিয়ে আমার চোখে চটক লাগাবার চেষ্টা করছে; তার মাঝখানে ভোরের কাকের কর্কশ কা-কা করে তার সুখ-স্বপ্ন কেটে ফেলতে অত্যন্ত বাধো বাধো ঠেকল। বললুম, 'না, আবদুর রহমান, আমি যাব না, আমি বলছি, তুমি চলে যাও। জানো তো আমার চাকরি গেছে, তোমাকে মাইনে দেবার টাকা আমার নেই। ডাল-চাল ফুরিয়ে গিয়ে গমে এসে ঠেকেছে, তাও তো আর বেশিদিন চলবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, খুদা যদি ফের সুদিন করেন তবে আবার দেখা হবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে আবদুর রহমানের একটু সময় লাগল। যখন বুঝল, তখন চুপ করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু করিই-বা কী? আবদুর রহমানের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা বহু যামিনী কাটিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, সে যদি নিজের থেকে কোনও জিনিস না বোঝে, তবে আমার যুক্তিতর্ক তার মনের কোনও কোণে ঠাঁই পায় না। আমার ব্যবস্থাটা যে তার আদপেই পছন্দ হয়নি, সেটা বুঝতে পারলুম, কিন্তু আমি আশা করেছিলুম, সে আপত্তি জানাবে, আমি তা হলে তর্কাতর্কি করে তাকে খানিকটা শায়েস্তা করে নিয়ে আসব। দেখলুম তা নয়, সরল লোক আর সোজা সুপারিগাছে মিল রয়েছে; একবার পা হড়কালে আপত্তি-অজুহাতের শাখা-প্রশাখা নেই বলে সোজা ভূমিতলে অবতরণ।

খানিকক্ষণ পরে নিজের থেকেই ঘরে ফিরে এল। মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি নিজের হাতে মেপে সকালবেলা দু মুঠো আটা দেবেন। আমার তাইতেই চলবে।'

কী করে লোকটাকে বোঝাই যে, আমার অজানা নয় যে মাসখানেক ধরে দু মুঠো আটা দিয়েই দু বেলা চালাচ্ছে। আর খাবারের কথাই তো আসল কথা নয়— আমার প্রস্তাবে যে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছে, সেটা লাঘব করি কী করে? যুক্তিতর্ক তো বৃথা— পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম, মৌলানাকে ডাকি। কিন্তু ডাকতে হল না। আবদুর রহমান বলল, 'যখন সবকিছু পাওয়া যেত, তখন আমি এখানে যা খেয়েছি, আমার বাবা তার শ্বশুর বাড়িতেও সেরকম খায়নি।' তার পর বেশ একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'আর আজ কিছু জুটছে না বলে আমাকে খেদিয়ে দিতে চান? আমি কি এতই নিমকহারাম?'

অনেক কিছু বলল। কিছুটা যুক্তি, বেশিরভাগ জীবনস্মৃতি, অল্পবিস্তর ভর্ৎসনা, সবকিছু ছাপিয়ে অভিমান। কখনও বলে, 'দেরেশি করিয়ে দেননি', কখনও বলে, 'নতুন লেপ কিনে দেননি—

www.pathagar.com

কাবুলের কটা সর্দারের ওরকম লেপ আছে, আমি গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে, আমাকে তাড়িয়ে দেবার হক আপনার সম্পূর্ণ আছে— আপনার আমি কী খেদমত করতে পেরেছি?'

যেন পানশিরের বরফপাত। গাদা-গাদা, পাঁজা-পাঁজা। আমি যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আর আমার উপর সে বরফ জমে উঠেছে। আবদুর রহমানই আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন বলেছিল, তখন নাকি সেই বরফ-আস্তরণের ভিতর বেশ ওম বোধ হয়। আমিও আরাম বোধ করলুম।

কিন্তু না খেতে পেয়ে আবদুর রহমানের পানশিরি তাগদ মিইয়ে গিয়েছে। সাত দিন ধরে বরফ পড়ল না— মিনিটখানেক বর্ষণ করেই আবদুর রহমান থেমে গেল। আমি বললুম, 'তা তো বটেই, তুমি চলে গেলে আমাকে বাঁচাবে কে? অতটা ভেবে দেখিনি।'

আবদুর রহমান তদ্দণ্ডেই খুশ। সরল লোককে নিয়ে এই হল মস্ত সুবিধে। তক্ষুনি হাসিমুখে আগুনের তদারকিতে বসে গেল।

তার পর মন থেকে যে শেষ গ্লানিটুকু কেটে গিয়েছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলুম শুতে যাবার সময়। তোষকের তলায় লেপ গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'জানেন, সায়েব, আমি যদি বাড়ি চলে যাই তবে বাবা কী করবে? প্রথম আমার কাছ থেকে একটা বুলেটের দাম চেয়ে নেবে; তার পর আমাকে গুলি করে মারবে। কতবার আমাকে বলেছে, "তোর মতো হতভাগাকে মারবার জন্য যে গাঁটের পয়সায় বুলেট কেনে সে তোর চেয়ে হতভাগা।" '

আমি বললুম, 'ও, তাই বুঝি তুমি পানশির যেতে চাও না? প্রাণের ভয়ে?'

আবদুর রহমান প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তার পর হাসল। আমারও হাসি পেল— যে আবদুর রহমান এতদিন ধরে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' রূপ ধারণ করে বিরাজ করত আমার আলবাল-সিঞ্চনে সে যে একদিন রসবোধকিশলয়ে মুকুলিত হয়ে সরসতরুবর হবে সে আশা করিনি।

আবদুর রহমান একখানা খোলা-চিঠি দিয়ে গেল; উপরে আমানউল্লার পলায়নের তারিখ।

'কমরত ব্ শিকনদ—

এতদিন বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আগা আহমদের মাইনের পাঁচ বছরের জমানো তিনশো টাকা আর তার ভাইয়ের রাইফেল লোপাট মেরে আফ্রিদি মুল্লুকে চললুম। সেখানে গিয়ে পিতৃ-পিতামহের ব্যবসা ফাঁদব। শুনতে পাই খাইবারপাসের ইংরেজ অফিসার পাকড়ে পাকড়ে খালাসির পয়সা আদায় করার প্রাচীন ব্যবসা উপযুক্ত লোকের অভাবে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে।

কিন্তু আচ্ছা ইংরিজি জাননেওয়ালা একজন দোভাষীর আমার প্রয়োজন— আমার ইংরিজি বিদ্যে তো জান! তোমার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে তবে পত্রপাঠ জলালাবাদের বাজারে এসে আমার অনুসন্ধান কর। মাইনে? কাবুলে এক বছরে যা কামাও, আমি এক মাসে তোমাকে তাই দেব। কাবুলের ডাকাতের চাকর হওয়ার চেয়ে আমার বেরাদর হয়ে ইমান-ইনসাফে কামানো পয়সার বখরাদার হওয়া ঢের ভালো।

আমানউল্লা নেই— তবু ফি আমানিল্লা।* দোস্ত মুহম্মদ

---

* 'আমান উল্লা' কথার অর্থ 'আল্লার আমানত' এবং 'ফি আমানিল্লা' কথার অর্থ' (তোমাকে) আল্লার আমানতে রাখলুম'।

www.pathagar.com

পু.। আগা আহমদ সঙ্গে আছে। কাঁধে আমানউল্লার বিলি করা একখানা উৎকৃষ্ট 'মাউজার রাইফেল'।

রাজা হয়ে ভিস্তিওয়ালার ডাকাত ছেলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় রাজপ্রাসাদে কী রঙ্গরস করল তার গল্প আস্তে আস্তে বাজারময় ছড়াতে আরম্ভ করল। আধুনিক উপন্যাসে বালিগঞ্জের কাল্পনিক ডাইনিংরুমে পাড়াগেঁয়ে ছেলে যা করে তারই রাজসংস্করণ। নতুনত্ব কিছু নেই— তবে একটা গল্প আমার বড় ভালো লাগল। মৌলানার কপি-রাইট।

আমানউল্লা লন্ডনে পঞ্চম জর্জের সঙ্গে যে রোলস-রয়েস চড়ে কুচ-কাওয়াজ পালাপর্বে যেতেন রাজা জর্জ সেই বজরার মতো মোটর আমানউল্লাকে বিদায়ভেট দেন। সে গাড়ি রাক্ষসের মতো তেল খেত বলে আমানউল্লা পালাবার সময় সেখানা কাবুলে ফেলে যান।

বাচ্চা রাজা হয়ে বিশেষ করে সেই মোটরই পাঠাল বাস্তুগাঁয়ে বউকে নিয়ে আসবার জন্য। বউ নাকি তখন বাচ্চার বাচ্চার মাথার উকুন বাছছিল। সারা গাঁয়ের হুলস্থুলের মাঝখানে বাচ্চার বউ নাকি ড্রাইভারকে বলল, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বল, নিজে এসে আমাকে খচ্চরে বসিয়ে যেন নিয়ে যায়।'

দিগ্বিজয় করে বুদ্ধদেব তখন কপিলাবস্তু ফিরেছিলেন তখন যশোধরা এমনিধারা অভিমান করেছিলেন।

চল্লিশ

ফরাসডাঙ্গার জরিপেড়ে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ফুরফুরে রেশমি উড়ুনি পরে বসে আছি। কবজিতে গোড়ে, গোঁপে আতর। চাকর ট্যাক্সি আনতে গিয়েছে— বায়স্কোপে যাব।

সত্যি নয়, তুলনা দিয়ে বলছি।

তখন যেন ট্যাক্সির অপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোনও কাজে মন দেওয়া যায় না আমাদের অবস্থা হল তখন তাই। তফাত শুধু এই, স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যাক্সি রয়েছে— কিন্তু সাঁঝের বেলা শিখ ড্রাইভার যেরকম মদমত্ত হয়ে 'চক্ষু দুইডা রাঙা কইরা, এড্ডা চিক্কের দিয়া' বলে 'নহি জায়েঙ্গে', সায়েব তেমনি স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে বলেছেন— চুলোয় যাকগে কী বলছেন।

অপেক্ষা করে করে একমাস কাটিয়ে দিয়েছি।

চা ফুরিয়ে গিয়েছে— ক্ষুধা মারবার আর কোনও দাওয়াই নেই। এখন শুধু রুটি আর নুন— নুন আর রুটি। রুটিতে প্রচুর পরিমাণ নুন দিয়ে শুধু রুটিতেই চলে কিন্তু ভোজনের পদ বাড়াবার জন্য আবদুর রহমান নুন রুটি আলাদা আলাদা করে পরিবেশন করত।

সপ্তাহ তিনেক হল বেনওয়া সায়েব অ্যারোপ্লেন করে হিন্দুস্তান চলে গিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা হলে কী হয়। পাসপোর্টখানা তো ফরাসি দেশের— এবং তার রঙটা তো সাদা। তাই ভারতীয় বিমানে তিনি জায়গা পেলেন বিনা মেহন্নতে। আমাদের তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই কিন্তু সব ফরাসির জন্য তো আর এরকম দরাজদিল হতে পারব না।

www.pathagar.com

যাবার আগের দিন বেনওয়া বাড়িতে এসে মৌলানা আর আমাকে গোপনে এক টিন ফরাসি তরকারি দিয়ে যান— সার্ডিন টিনের সাইজ। বহুকাল ধরে রুটি ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু পেটে পড়েনি; মৌলানাতে-আমাতে সেই তরকারি গো-গ্রাসে গোশ্‌ত-গেলার পদ্ধতিতে খেয়ে পেটের অসুখে সপ্তাহখানেক ভুগলুম। আমাদের ভুগন্তি অনেকটা গরিব চাষির ম্যালেরিয়ায় ভোগার মতো হল। চাষি যেরকম ভোগার সময় বিলক্ষণ বুঝতে পারে কুইনিন ফুইনিন কোনওকিছুরই প্রয়োজন নেই, সাত দিন পেট ভরে খেতে পেলে দুনিয়ার কুল্লে জ্বর ঝেড়ে ফেলে উঠতে পারবে, আমরা তেমনি ঠিক জানতুম, তিন দিন পেট ভরে খেতে পেলে আমাদেরও পেটের অসুখ আমানউল্লার সৈন্যবাহিনীর মতো কর্পূর হয়ে উবে যাবে।

সেই অনাহার আর অসুখের দরুন মৌলানা আর আমার মেজাজ তখন এমনি তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছে যে, বেড়ালটা কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তার শব্দে লাফ দিয়ে উঠি (অথচ স্নায়ু জিনিসটা এমনি অদ্ভুত যে, বন্দুক-গুলির শব্দে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না), কথায় কথায় দু জনাতে তর্ক লাগে, মৌলানার দিকে তাকালেই আমার মনে হয় ওরকম জংলি দাড়ি মানুষ রাখে কেন, মৌলানা আমার চেহারা সম্বন্ধে কী ভাবতেন জানিনে, তবে প্রকাশ করলে খুব সম্ভব খুনোখুনি হয়ে যেত। মৌলানা পাঞ্জাবি, কিন্তু আমিও তো বাঙাল।

মৌলানা লোকটা ভারি কুতর্ক করে। আমি যা বললুম সেকথা তাবৎ দুনিয়া সৃষ্টির আদিম কাল থেকে স্বীকার করে আসছে। আমি বললুম, 'সরু চালের ভাত আর ইলিশ মাছ ভাজার চেয়ে উপাদেয় খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না।' মূর্খ বলে কি না বিরিয়ানি-কুর্মা তার চেয়ে অনেক ভালো। পাঞ্জাবিদের সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিকতার আর কী উদাহরণ দিই বলুন। শান্তিনিকেতনে থেকেও লোকটা মানুষ হল না। যে নরাধম ইলিশ মাছের অপমান করে তার মুখদর্শন করা মহাপাপ, অথচ দেখুন, বাঙালির চরিত্র কী উদার, কী মহান— আমি মৌলানার সঙ্গে মাত্র তিন দিন কথা বন্ধ করে ছিলুম।

আর শীতটা যা পড়েছিল। বায়স্কোপে জব্বর গরমের ছ হাজার ফুটি বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক শীতের বয়ান তার তুলনায় বহুত কম। কারণ বায়স্কোপ, বানানো হয় প্রধানত সায়েবসুবোদের জন্য আর তেনারা শীতের তকলিফ বাবতে ওকিবহাল, কাজেই সে জিনিস তাঁদের দেখিয়ে বক্স-আপিস ভরবে কেন? আর যদি-বা দেখানো হয় তবে শীতের সঙ্গে হামেশাই ঝড় বা ব্লিজার্ড জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে যেমন কালবৈশাখী বিপজ্জনক হলেও তার সঙ্গে দিনের পর দিনের ১১২ ডিগ্রির অত্যাচারের তুলনা হয় না, তেমনি বরফের ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক দিনের পর দিনের ১০ ডিগ্রির অত্যাচার।

জামা ধুয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিলেম। জামার জল জমে বরফ হল, রোদ্দুরে সে জল শুকোনো দূরের কথা, বরফ পর্যন্ত গলল না। রোদ থাকলে টেম্পারেচার ফ্রিজিঙের উপরে ওঠে না। জামাটা জমে তখন এমনি শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, এক কোণে ধরে রাখলে সমস্ত জামাটা খাড়া হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে এনে আগুনের কাছে ধরলে পর জামা চুবসে গিয়ে জবুথবু হয়।

www.pathagar.com

বলবেন বানিয়ে বলছি, কিন্তু দেশভ্রমণের হলপ, দোতলা থেকে থুথু ফেললে সে থুথু মাটি পৌঁছবার পূর্বেই জমে গিয়ে পেঁজা বরফের মতো হয়ে যায়। আবদুর রহমান একদিন দুটো পেঁয়াজ যোগাড় করে এনেছিল— খুদায় মালুম চুরি না ডাকাতি করে— কেটে দেখি পেঁয়াজের রস জমে গিয়ে পরতে পরতে বরফের গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

সেই শীতে জ্বালানি কাঠ ফুরোল।

খবরটা আবদুর রহমান দিল বেলা বারোটার সময়। বাইরের কড়া রৌদ্র তখন বরফের উপর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু সে-সংবাদ শুনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলুম। রোদ সত্ত্বেও টেম্পারেচার তখন ফ্রিজিঙপয়েন্টের বহু নিচে।

সে রাত্রে গরম বানিয়ান, ফ্ল্যানেলের শার্ট, পুল-ওভার, কোট, ইস্তেক ওভারকোট পরে শুলুম। উপরে দু খানা লেপ ও একখানা কার্পেট। মৌলানা তাঁর প্রিয়তম গান ধরলেন,

'দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে—'

আমি সাধারণত বেসুরো পোঁ ধরি। সে রাত্রে পারলুম না, আমার দাঁতে দাঁতে করতাল বাজছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকে পর্দা সরিয়ে দিল। আকাশ তারায় তারায় ভরা। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বলেছেন,

'আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে।'

ফরাসি কবি অন্য তুলনা দিয়েছেন; আকাশের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে গিয়েছে। আরেক নাম-না-জানা বিদেশি কবি বলেছেন; মৃতা ধরণীর কফিনের উপর সাজানো মোমবাতির গলে-যাওয়া জমে-ওঠা ফোঁটা ফোঁটা মোম তারা হয়ে গিয়েছে।

সব বাজে বাজে তুলনা, বাজে বাজে কাব্যি।

হে দিগম্বর ব্যোমকেশ, তোমার নীলাম্বরের নীলকম্বল যে লক্ষ লক্ষ তারার ফুটোয় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। তাই কি তুমিও আমারই মতন শীতে কাঁপছ? কাবুলে যে শ্মশান জ্বালিয়েছ তার আগুন পোয়াতে পার না?

তিন দিন তিন রাত্তির লেপের তলা থেকে পারতপক্ষে বেরোইনি। চতুর্থ দিনে আবদুর রহমান অনুনয় করে বলল, 'ওরকম একটানা শুয়ে থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে সায়েব; একটু চলাফেরা করুন, গা গরম হবে।'

আমাদের দেশের গরিব কেরানিকে যেরকম ডাক্তার প্রাতঃভ্রমণ করার উপদেশ দেয়। গরিব কেরানিরই মতন আমি চিঁ চিঁ করে বললুম, 'বড্ড ক্ষিধে পায় যে। শুয়ে থাকলে ক্ষিধে কম পায়।'

ডাকাতি করলে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব এ কথা আবদুর রহমান জানত বলেই সে তখনও রাইফেল নিয়ে রাজভোগের সন্ধানে বেরোয়নি। আবদুর রহমান মাথা নিচু করে চুপ করে চলে গেল।

www.pathagar.com

বেড়াল পারতপক্ষে বাস্তুভিটা ছাড়ে না। তিন দিন ধরে আমার বেড়াল দুটো না-পাত্তা। তার থেকে বুঝলুম, আমার প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো খাওয়াদাওয়া করছে। তারা বিচক্ষণ, রাষ্ট্রবিপ্লবে ওকিবহাল। গোলমালের গোড়ার দিকেই সবকিছু কিনে রেখেছিল।

শীতের দেশে নাকি হাতি বেশিদিন বাঁচে না। তবু আমানউল্লা শখ করে একটা হাতি পুষেছিলেন। কাবুলে কলাগাছ, আনারস গাছ, বনবাদাড় নেই বলে সে কালো হাতিকে পুষতে প্রায় সাদা হাতি পোষার খরচাই লাগত। কাবুলে তখন কাঠের অভাব; তাই হাতি-ঘরে আর আগুন জ্বালানো হত না। বাচ্চার ডাকাত ভাই-বেরাদরের শখ চেপেছে হাতি চাপার। সেই দুর্দান্ত শীতে তারা হাতিকে বের করেছে চড়ে নগর প্রদক্ষিণ করার জন্য। তাকিয়ে দেখি হাতির চোখের কোণ থেকে লম্বা লম্বা আইসিক্‌ল্ বা বরফের ছুঁচ ঝুলছে— হাতির চোখের আর্দ্রতা জমে গিয়ে।

আমি জানতুম, হাতিটা ত্রিপুরা থেকে কেনা হয়েছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিয়ে-শাদি লেন-দেন বহুকালের— সিলেটের জমিদার খুন করে ফেরারি হলে চিরকালই ত্রিপুরার পাহাড়ে টিপারাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

হাতিটার কষ্ট আমার বুকে বাজল। তখন মনে পড়ল রেমার্কের চাষা বন্দুক-গুলি অগ্রাহ্য করে ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, জখমি ঘোড়াকে গুলি করে মেরে তাকে তার যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য।

কুকুরের চোখেমুখে বেদনা সহজেই ধরা পড়ে। হাতিকে কাতর হতে কেউ কখনও দেখেনি, তাই তার বেদনাবোধ যখন প্রকাশ পায় তখন সে দৃশ্য বড় নিদারুণ।

আমানউল্লার বিস্তর মোটরগাড়ি ছিল। বাচ্চার সঙ্গী-সাথিরা সেই মোটরগুলো চড়ে চড়ে তিন দিনের ভেতর সব পেট্রল শেষ করে দিল। শহরের সর্বত্র এখন দামি দামি মোটর পড়ে আছে— যেখানে যে গাড়ির পেট্রল শেষ হয়েছে বাচ্চার ইয়াররা সেখানেই সে গাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে। জানালার কাচ পর্যন্ত তুলে দিয়ে যায়নি বলে গাড়িতে বৃষ্টি বরফ ঢুকছে; পাড়ার ছেলেপিলেরা গাড়ি নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করাতে দু একটা নর্দমায় কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের বাড়ির সামনে একখানা আনকোরা বিয়ুইক ঝলমল করছে। আবদুর রহমানের ভারি শখ গাড়িখানা বাড়ির ভিতর টেনে আনার। বিদ্রোহ শেষ হলে চড়বার ভরসা সে রাখে।

আমানউল্লা তো সেই কোন ফরাসি রাজার মতো 'আপ্রে মওয়া ল্য দেল্যুজ' (হম্ গয়া তো জগ গয়া) বলে কান্দাহার পালালেন— আবদুর রহমান বলে, 'আপ্রে ল্য দেল্যুজ, অতমবিল্' (বন্যার পর পলিমাটি)।

আমাদের কাছে যেমন সব ব্যাটা গোরার মুখ একরকম মনে হয়, আবদুর রহমানের কাছে তেমনি সব মোটরের এক চেহারা। কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, 'দেল্যুজের' পর রাজবাড়ির লোক চোরাই-গাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গাড়িখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গারাজে আর তাকে পুরবে জেলে।

অপ্‌টিমিস্ট।

www.pathagar.com

কাবুলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। অনেকটা শিলঙের মতো। হলে সবাই ছুটে ঘর থেকে বেরোয়।

দুপুরবেলা জোর ভূমিকম্প হল। আমি আর মৌলানা দুই খাটে শুয়ে ধুঁকছি। কেউ খাট ছেড়ে বেরুলুম না।

একচল্লিশ

যেন অন্তহীন মহাকাল ভ্যাজর ভ্যাজর করার পর এক ভাষণবিলাসী আপন বক্তৃতা শেষ করে বললেন, 'আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় অজানতে নষ্ট করে ফেলেছি বলে মাপ চাইছি। আমার সামনে ঘড়ি ছিল না বলে সময়ের আন্দাজ রাখতে পারিনি।' শ্রোতাদের একজন চটে গিয়ে বলল, 'কিন্তু সামনের দেয়ালে যে ক্যালেন্ডার ছিল, তার কী? সেদিকে তাকালে না কেন?

মৌলানা আর আমি বহুদিন হল ক্যালেন্ডারের দিকে তাকানো বন্ধ করে দিয়েছি। তবু জমে-যাওয়া হাড় ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এখনও শীতকাল।

ইতোমধ্যে ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি বিদেশি পুরুষেরা ভারতীয় প্লেনে কাবুল ত্যাগ করেছেন— স্ত্রীলোকেরা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। শেষটায় শুনলুম ভারতীয় পুরুষদের কেউ কেউ স্যার ফ্রান্সিসের ফেবারে স্বদেশে চলে যেতে পেরেছেন। আমার নামে তো ঢ্যারা, কাজেই মৌলানাকে বললুম, তিনি যদি প্লেনে চাপবায় মোকা পান তবে যেন পিছন পানে না তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরের মতো সোজা পিতৃলোক চলে যান। অনুজ যদি অনুগ হবার সুবিধে না পায় তবে তার জন্য অপেক্ষা করলে ফল পিতৃলোকে প্রত্যাগমন না হয়ে পিতৃলোকে মহাপ্রয়াণই হবে। চাণক্য বলেছেন, উৎসবে, ব্যসনে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবে যে কাছে দাঁড়ায় সে বান্ধব। এস্থলে সে-নীতি প্রযোজ্য নয়, কারণ, চাণক্য স্বদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের কথাই ভাবছিলেন, বিদেশের চক্রব্যূহের খাঁচার ইদুরের মতো না খেয়ে মরবার উপদেশ দেননি।

অল্প অল্প জ্বরের অবচেতন অবস্থায় দেখি দরজা দিয়ে উর্দিপরা এক বিরাট মূর্তি ঘরে ঢুকছে। দুর্বল শরীর, মনও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ভাবলুম বাচ্চায়ে সকাওয়ের জল্লাদই হবে; আমার সন্ধানে এখন আর আসবে কে?

নাহ্। জর্মন রাজদূতাবাসের পিয়ন। কিন্তু আমার কাছে কেন? ওদের সঙ্গে তো আমার কোনও দহরম-মহরম নেই। জর্মন রাজদূত আমাকে এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণই-বা করবেন কেন? আবার পইপই করে লিখেছেন, বড্ড জরুরি এবং পত্রপাঠ যেন আসি।

দু মাইল বরফ ভেঙে জর্মন রাজদূতাবাস। যাই কী করে, আর গিয়ে হবেই-বা কী? কোনও ক্ষতি যে হতে পারে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কারণ আমি বসে আছি সিঁড়ির শেষ ধাপে, আমাকে লাথি মারলেও এর নিচে আমি নামতে পারি না।

শেষটায় মৌলানার ধাক্কাধাক্কিতে রওনা হলুম। জর্মন রাজদূতাবাস যাবার পথ সুদিনে অভিসারিকাদের পক্ষে বড় প্রশস্ত— নির্জন, এবং বনবীথিকার ঘনপল্লবে মর্মরিত। রাস্তার

www.pathagar.com

একপাশ দিয়ে কাবুল নদী এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে; তারই রসে সিক্ত হয়ে হেথায় নব-কুঞ্জ, হোথায় পঞ্চ-চিনার। নিতান্ত অরসিকজনও কল্পনা করে নিতে পারে যে লুকোচুরি রসকেলির জন্য এর চেয়ে উত্তম বন্দোবস্ত মানুষ চেষ্টা করেও করতে পারত না।

কিন্তু এ দুর্দিনে সে রাস্তা চোরডাকাতের বেহ্শেত, পদাতিকের গোরস্তান।

আবদুর রহমান বেরোবার সময় ছোট পিস্তলটা জোর করে ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়েছিল। নিতান্ত ফিচেল চোর হলে এটা কাজে লেগে যেতেও পারে।

এসব রাস্তায় হাঁটতে হয় সগর্বে, সদম্ভে, ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে মাথা খাড়া করে। কিন্তু আমার সে তাগদ কোথায়? তাই শিস দিয়ে দিয়ে চললুম এমনি কায়দায় যেন আমি নিত্যি নিত্যি এ-পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করি।

পথের শেষে পাহাড়। বেশ উঁচুতে রাজদূতাবাস। সে চড়াই ভেঙে যখন শেষটায় রাজদূতের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম তখন আমি ভিজে ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে পড়েছি। রাজদূত মুখের কাছে ব্রান্ডির গেলাশ ধরলেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পেল, মুসলমান মরবার পূর্বে মদ খাওয়া ছাড়ে, আমি মরবার আগে মদ ধরব নাকি? মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালুম।

জর্মনরা কাজের লোক। ভণিতা না করেই বললেন, 'বেনওয়া সায়েবের মুখে শোনা, আপনি নাকি জর্মনিতে পড়তে যাবার জন্য টাকা কামাতে এদেশে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ'।

'আপনার সব টাকা নাকি এক ভারতীয় মহাজনের কাছে জমা ছিল, এবং সে নাকি বিপ্লবে মারা যাওয়ায় আপনার সব টাকা খোয়া গিয়েছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

রাজদূত খানিকক্ষণ ভাবলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিশেষ করে কেন জর্মনিতেই যেতে চেয়েছিলেন, বলুন তো।'

আমি বললুম, 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে কাজ করে ও বিশ্বভারতীর বিদেশি পণ্ডিতদের সংসর্গে এসে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার জন্য আমার পক্ষে জর্মনিই সবচেয়ে ভালো হবে।'

এছাড়া আরও একটা কারণ ছিল, সেটা বললুম না।

রাজদূতেরা কখন খুশি কখন বেজার হয় সেটা বোঝা গেলে নাকি তাঁদের চাকরি যায়। কাজেই আমি তাঁর প্রশ্নের কারণের তাল ধরতে না পেরে, বাঁয়াতবলা কোলে নিয়ে বসে রইলুম।

বললেন, 'আপনি ভাববেন না এই কটি খবর সঠিক জানবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই, আমাদ্বারা যদি আপনার জর্মন যাওয়ার কোনও সুবিধা হয় তবে আমি আপনাকে সে সাহায্য আনন্দের সঙ্গে করতে প্রস্তুত। আপনি বলুন, আমি কী প্রকারে আপনার সাহায্য করতে পারি?'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানালুম। রাজদূত উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন, কিন্তু আমার চোখে কোনও পন্থাই ধরা দিচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল— খোদা আছেন, গুরু আছেন— বললুম, 'জর্মন সরকার প্রতিবৎসর দু একটি ভারতীয়কে জর্মনিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেন। তারই একটা যদি যোগাড় করে দিতে পারেন তবে— '

www.pathagar.com

বাধা দিয়ে রাজদূত বললেন, 'জর্মন সরকার যদি একটিমাত্র বৃত্তি একজন বিদেশিকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, 'পোয়েট টেগোরের কলেজে আমি পড়েছি, তিনি খুব সম্ভব আমাকে সার্টিফিকেট দিতে রাজি হবেন।'

রাজদূত বললেন, 'তা হলে আপনি এত কষ্ট করে কাবুল এলেন কেন? টেগোরকে জর্মনিতে কে না চেনে?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পোয়েট সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন। এমনকি এক তেল-কোম্পানিকে পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে, তাদের তেল ব্যবহার করলে নাকি টাকে চুল গজায়।'

রাজদূত মৃদুহাস্য করে বললেন, 'টেগোর, বড় কবি জানতুম, কিন্তু এত সহৃদয় লোক সেকথা জানতুম না।'

অন্য সময় হলে হয়তো এই খেই ধরে 'জর্মনিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের মালমশলা যোগাড় করে নিতুম, কিন্তু আমার দেহ তখন বাড়ি ফিরে খাটে শোবার জন্য আঁকুবাঁকু লাগিয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'এ দুর্দিনে যে আপনি নিজের থেকে আমার অনুসন্ধান করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। বৃত্তি হলে ভালো, না হলেও আমি সয়ে নিতে পারব। কিন্তু আপনার সৌজন্যের কথা কখনও ভুলতে পারব না।'

রাজদূতও উঠে দাঁড়ালেন। শেকহ্যান্ডের সময় হাতে সহৃদয়তার চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বৃত্তিটা পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দূতাবাস থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকালুম। সমস্ত বাড়িটা আমার কাছে যেন মধুময় বলে মনে হল। তীর্থের উৎপত্তি কী করে হয় সে সম্বন্ধে আমি কখনও কোনও গবেষণা করিনি; আজ মনে হল, সহৃদয়তা, করুণা মৈত্রীর সন্ধান যখন এক মানুষ অন্য মানুষের ভেতর পায় তখন তাঁকে কখনও মহাপুরুষ কখনও 'অবতার' কখনও 'দেবতা' বলে ডাকে এবং তাঁর পাদপীঠকে জড় জেনেও পুণ্যতীর্থ নাম দিয়ে অজরামর করে তুলতে চায়। এবং সে বিচারের সময় মানুষ উপকারের মাত্রা দিয়ে কে 'মহাপুরুষ' কে 'দেবতা' সেকথা যাচাই করে না, তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যায় সব তর্ক সব যুক্তি সব পরিপ্রেক্ষিতে, সব পরিমাণজ্ঞান ভাসিয়ে দেয়।

শুধু একটি পরিমাণজ্ঞান আমার মন থেকে তখনও ভেসে যায়নি এবং কস্মিনকালেও যাবে না—

যে ভদ্রলোক আমাকে এই দুর্দিনে স্মরণ করলেন তিনি রাজদূত, স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসও রাজদূত।

কিন্তু আর না! ভাবপ্রবণ বাঙালি একবার অনুভূতিগত বিষয়বস্তুর সন্ধান পেলে মূল বক্তব্য বেবাক ভুলে যায়।

তিতিক্ষু পাঠক, এস্থলে আমি করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জর্মন রাজদূতের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কাহিনীটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং তার বয়ান ভ্রমণকাহিনীতে চাপানো যুক্তিযুক্ত কি না সে-বিষয়ে আমার মনে বড় দ্বিধা রয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে

www.pathagar.com

হিরণ্ময় পাত্রে সত্যস্বরূপ রস লুক্কায়িত আছেন তার ব্যক্তি-হিরণ আপন চাকচিক্য দিয়ে আমার চোখ এমনি ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে, তাই দেখে আমি মুগ্ধ, সে-পূষণ কোথায় যিনি পাত্রখানি উন্মোচন করে আমার সামনে নৈর্ব্যক্তিক, আনন্দঘন, চিরন্তন রসসত্তা তুলে ধরবেন?

বিপ্লবের একাদশী, ইংরেজ রাজদূতের বিদগ্ধ বর্বরতা, জর্মন রাজদূতের অযাচিত অনুগ্রহ অনাত্মীয় বৈরাগ্যে নিরীক্ষণ করা তো আমার কর্ম নয়।

জর্মন রাজদূতাবাস থেকে বেরিয়ে মনে পড়ল, বারো বৎসর পূর্বে আফগানিস্তান যখন পরাধীন ছিল তখন আমির হবিবউল্লা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এই বাড়িতে রেখে অতিথি সৎকার করেছিলেন। এই বাড়ির পাশেই হিন্দুস্তানের সম্রাট বাবুর বাদশার কবর। সে কবর দেখতে আমি বহুবার গিয়েছি, আজ যাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন জানিনে, পা দু খানা আমাকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল।

খোলা আকাশের নিচে কয়েকফালি পাথর দিয়ে বানানো অত্যন্ত সাদাসিধে কবর। মোগল সরকারের নগণ্যতম মুহুরিদের কবরও হিন্দুস্তানে এর চেয়ে বেশি জৌলুশ ধরে। এ কবরের তুলনায় পুত্র হুমায়ুনের কবর তাজমহলেরও বাড়া। আর আকবর জাহাঙ্গীর যেসব স্থাপত্য রেখে গিয়েছিলেন সেসব তো বাবুরের স্বপ্নও ছাড়িয়ে যায়।

বাবুরের আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এই কবরের পাশে দাঁড়ালে যে অনুভূতি পাবেন সে-অনুভূতি হুমায়ুন বা শাহজাহানের কবরের কাছে পাবেন না। বাবুর মোগলবংশের পত্তন করে গিয়েছেন এবং আরও বহু বহু বীর বহু বহু বংশের পত্তন করে গিয়েছেন কিন্তু বাবুরের মতো সুসাহিত্যিক রাজা-রাজড়াদের ভিতর তো নেই-ই, সাধারণ লোকের মধ্যেও কম। এবং সাহিত্যিক হিসেবে বাবুর ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মাটির মানুষ এবং সেই তত্ত্বটি তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বার বার ধরা পড়ে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় আমি আমারই মতো মাটির মানুষ, যেন এক আত্মজনের সমাধির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের দেশের একজন ঐতিহাসিক সিজারের আত্মজীবনীর সঙ্গে বাবুরের আত্মজীবনীর তুলনা করতে গিয়ে প্রথমটির প্রশংসা করেছেন বেশি। তাঁর মতে বাবুরের আত্মজীবনী এ শ্রেণির লেখাতে দ্বিতীয় স্থান পায়। আমি ভিন্নমত পোষণ করি। কিন্তু এখানে সে তর্ক জুড়ে পাঠককে আর হয়রান করতে চাইনে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু : দুটি আত্মজীবনীই সাহিত্যসৃষ্টি, নীরস ইতিহাস নয়। এর মধ্যে ভালোমন্দ বিচার করতে হলে ঐতিহাসিক হবার কোনও প্রয়োজন নেই। যে কোনও রসজ্ঞ পাঠক নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে নিতে পারবেন। তবে আপসোস শুধু এইটুকু, বাবুর তাঁর কেতাব জগতাই তুর্কিতে ও সিজার লাতিনে লিখেছেন বলে এই দু খানি মূলে পড়া আমাদের পক্ষে সোজা নয়। সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকও কেতাব দু খানা অনুবাদে পড়েছেন।

পূর্বেই বলেছি কবরটি অত্যন্ত সাদামাটা এবং এতই অলঙ্কারবর্জিত যে, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু জবরদস্ত আলঙ্কারিকই। কারণ, বাবুর তার দেহাস্থি কীভাবে রাখা হবে সে সম্বন্ধে এতই উদাসীন ছিলেন যে, নূর-ই-জাহানের মতো

www.pathagar.com

'গরিব-গোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিও না।
কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায়
বুলবুলে।'
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

কবিত্ব করেননি, বা জাহান-আরার মতো

বহুমূল্য আভরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণ শ্রেষ্ঠ আভরণ দীনা আত্মা জাহান-আরা
সম্রাট-কন্যার।*

বলে পাঁচজনকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে একথা ঠিক, তিনি তাঁর শেষশয্যা যেমন কর্মভূমি ভারতবর্ষে গ্রহণ করতে চাননি ঠিক জন্মভূমি ফরগনাকেও মৃত্যুকালে স্মরণ করেননি।

যিশুখ্রিস্ট বলেছেন—

'The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head'

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?

জীবিতাবস্থায়ই যখন মহাপুরুষের আশ্রয়স্থল নেই তখন মৃত্যুর পর তার জন্মভূমিই-বা কী আর মৃত্যুস্থলই-বা কী?

ইংরেজি 'সার্ভে' কথাটা গুজরাতিতে অনুবাদ করা হয় 'সিংহাবলোকন' দিয়ে। 'বাবুর' শব্দের অর্থ সিংহ। আমার মনে হল এই উঁচু পাহাড়ের উপর বাবুরের গোর দেওয়া সার্থক হয়েছে। এখান থেকে সমস্ত কাবুল উপত্যকা, পূর্বে ভারতমুখী গিরিশ্রেণি, উত্তরে ফরগনা যাবার পথের হিন্দুকুশ, সবকিছু ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহাবলোকনে দেখছেন সিংহরাজ বাবুর।

নেপোলিয়নের সমাধি-আস্তরণ নির্মাণ করা হয়েছে মাটিতে গর্ত করে সমতলভূমির বেশ খানিকটা নিচে। স্থপতিকে এরকম পরিকল্পনা করার অর্থ বোঝাতে অনুরোধ করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যে-সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হত, মৃত্যুর পরও তাঁর সামনে এলে সব জাতিকে যেন মাথা নিচু করে তাঁর শেষশয্যা দেখতে হয়।

* অনুবাদকের নাম ভুলে যাওয়ায় তাঁর কাছে লজ্জিত আছি।

www.pathagar.com

ফরগনার গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে যে-বাবুর সিংহাবলোকন দিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যে-সিংহাবলোকনদক্ষতা বাবুরের শিরে হিন্দুস্থানের রাজমুকুট পরিয়েছিল, সেই বাবুর মৃত্যুর পরও কি সিংহাবলোকন করতে চেয়েছিলেন?

জীবনমরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই কি বাবুর কাবুলের গিরিশিখরে দেহাস্থি রক্ষা করার শেষ আদেশ দিয়েছিলেন?

কিন্তু কী পরস্পরবিরোধী প্রলাপ বকছি আমি? একবার বলছি বাবুর তাঁর শেষ-শয্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, আর তার পরক্ষণেই ভাবছি মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর বিহারস্থলের সম্মোহন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে কি মানুষের চিন্তা করার কল মগজে নয়, সেটা পেটে? না-খেতে পেয়ে সে যন্ত্র স্টিয়ারিঙ ভাঙা মোটরের মতো চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়েছে?

পিছন ফিরে শেষবারের মতো কবরের দিকে তাকাতে আমার মনের সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। বরফের শুভ্র কম্বলে ঢাকা ফকির বাবুর খোদাতালার সামনে সেজদা (ভূমিষ্ঠ প্রণাম) নিয়ে যেন অন্তরের শেষ কামনা জানাচ্ছেন। কী সে কামনা?

ইংরেজ-ধর্ষিত ভারতের জন্য মুক্তি-মোক্ষ-নজাত কামনা করছেন।

শিবাজি-উৎসবে গুরুদেব গেয়েছিলেন :

'মৃত্যু সিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমর মুরতি।
সমুন্নত ভালে
যে রাজ কিরীট শোভে তার দিব্যজ্যোতি লুকাবে না।
কভু কোনও কালে।
তোমারে চিনেছি আজি হে রাজন, চিনেছি চিনেছি
তুমি মহারাজ
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ ॥'

প্রথম সেটি আবৃত্তি করলুম; তার পর কুরান শরিফের আয়াত পড়ে, পরলোকগত আত্মার সদগতির জন্য মোনাজাত করে পাহাড় থেকে নেমে নিচে 'বাবুর-শাহ' গ্রামে এলুম।

শুনেছি মানস-সরোবর যাবার পথে নাকি তীর্থযাত্রীরা অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও মরে না— মরে ফেরার পথে— শীত, বরফ, পাহাড়ের চড়াই-উতরাই সহ্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তখন নাকি তাদের সম্মুখে আর কোনও কাম্যবস্তু থাকে না বলে মনের জোর একদম লোপ পেয়ে যায়। ফিরে তো যেতে হবে সেই আপন বাসভূমে, দৈনন্দিন দুঃখযন্ত্রণা, আশা-নিরাশার একটানা জীবনস্রোতে। এ বিরাট অভিজ্ঞতার পর সে-পতন এতই ভয়াবহ বলে মনে হয় যে, তখন সামান্যতম সঙ্কটের সামনে তীর্থযাত্রী ভেঙে পড়ে আর বরফের বিছানায় সেই যে শুয়ে পড়ে তার থেকে আর কখনও ওঠে না।

আমার পা আর চলে না। কোমর ভেঙে পড়ছে। মাথা ঘুরছে।

শীতে হাত-পায়ের আঙুলের ডগা জমে আসছে। কান আর নাক অনেকক্ষণ হল সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গিয়েছে। জোরে হেঁটে যে গা গরম করব সে শক্তি আমার শরীরে আর নেই।

www.pathagar.com

নির্জন রাস্তা। হঠাৎ মোড় ঘুরতেই দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে গোটা আষ্টেক উর্দিপরা সেপাই। ভালো করে না তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, এরা বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের ডাকাত— আমানউল্লার পলাতক সৈন্যদের ফেলে-দেওয়া উর্দি পরে নয়া শাহানশাহ বাদশার ভুঁইফোড় ফৌজের গণ্যমান্য সদস্য হয়েছেন। পিঠে চকচকে রাইফেল ঝোলানো, কোমরে বুলেটের বেল্ট আর চোখেমুখে যে ক্রূর, লোলুপ ভাব, তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন চেহারা আমি জেলের বাইরে-ভিতরে কোথাও দেখিনি। জীবনের বেশিরভাগ এরা কাটিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, হয় গোরস্তানে, নয় পর্বতগুহার আধা-আলো-অন্ধকারে। পুঞ্জীভূত আশুষ্ক পুরীষস্তূপকে শূকর উল্টেপাল্টে দিলে যে বীভৎস দুর্গন্ধ বেরোয়, রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎক্ষিপ্ত এই দস্যুদল আমার সামনে সেই রূপ সেই গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ডাকাতগুলোর গায়ে ওভারকোট নেই। সেই লোভেতেই তো তারা আমাকে খুন করতে পারে। নির্জন রাস্তায় নিরীহ পথিককে খুন করে তার সবকিছু লুটে নেওয়া তো এদের কাছে কোনও নতুন পুণ্যসঞ্চয় নয়।

আমার পালাবার শক্তি নেই, পথও নেই। তার ওপরে আমি গাঁয়ের ছেলে। বাঘ দেখলে পালাই, কিন্তু বুনো শুয়োরের সামনে থেকে পালাতে কেমন যেন ঘেন্না বোধ হয়। পালাই অবশ্য দুই অবস্থাতেই।

আমার থেকে ডাকাতরা যখন প্রায় দশ গজ দূরে তখন তাদের সর্দার হঠাৎ হুকুম দিল 'দাঁড়া'! সঙ্গে সঙ্গে আটজন লোক ডেড্ হল্ট করল। দলপতি বলল, 'নিশান কর'। সঙ্গে সঙ্গে আটখানা রাইফেলের গোল ছ্যাঁদা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল।

ততক্ষণে আমিও থমকে দাড়িয়েছি কিন্তু তার পর কী হয়েছিল আমার আর ঠিক ঠিক মনে নেই।

আমার স্মরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তর ডেভলাপ করেও তার থেকে এতটুকু আঁচড় বের করতে পারিনি। আমার চৈতন্যের শাটার তখন বিলকুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনের সুপার ডবল এক্সও কোনও ছবি তুলতে পারেনি।

আটখানা রাইফেলের অন্ধকোটর আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে, এ দৃশ্যটা আমি তার পর বারকয়েক স্বপ্নেও দেখেছি, কাজেই আজ আর হলপ করে বলতে পারব না কোন ঘটনা কোন চিন্তাটা সত্যি বাবুর শাহ গ্রামের কাছে বাস্তবে ঘটেছিল আর কোনটা স্বপ্নের কল্পনামাত্র।

আবছা আবছা শুধু একটি কথা মনে পড়ছে, কিন্তু আবার বলছি হলপ করতে পারব না।

আমার ডান হাত ছিল ওভারকোটের পকেটে ও তাতে ছিল আবদুর রহমানের গুঁজে দেওয়া ছোট্ট পিস্তলটি। একবার বোধ করি লোভ হয়েছিল সেই পিস্তল বের করে অন্তত এক ব্যাটা বদমাইশকে খুন করার। মনে হয়েছিল, মরব যখন নিশ্চয়ই তখন স্বর্গে যাবার পুণ্যটাও জীবনের শেষ মুহূর্তে সঞ্চয় করে নিই।

আজ আমার আর দুঃখের সীমা নেই, কেন সেদিন গুলি করলুম না।

পাগলা বাদশা মুহম্মদ তুগলুক তাঁর প্রজাদের ব্যবহারে, এবং প্রজারা তাঁর ব্যবহারে এতই তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি যখন মারা গেলেন তখন তুগলুকের সহচর ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

জিয়াউদ্দীন বরনী বলেছিলেন, 'মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বাদশা তাঁর প্রজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, প্রজারা বাদশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।'

সেদিন পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে যদি গুলি চালাতুম তা হলে সংসারের পাঁচজন আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, আমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতুম।

হঠাৎ শুনি অট্টহাস্য। 'তরসিদ', 'তরসিদ', সবাই চেঁচিয়ে বলছে, 'তরসিদ— অর্থাৎ 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, লোকটা ভয় পেয়েছে রে।' আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে কুটিকুটি। কেউ মোটা গলায় খক্ খক্ করে, কেউ বন্দুকটা বগলদাবায় চেপে খ্যাঁক খ্যাঁক করে, কেউ ড্রয়িংরুমবিহারিণীদের মতো দু হাত তুলে কলরব করে, আর দু একজন আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মিটমিটিয়ে।

একজন হেঁড়ে গলায় বলল, 'এই মুরগিটাকে মারার জন্য আটটা বুলেটের বাজে খর্চা! ইয়া আল্লা!'

আমার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বর্ণনা দেব না, কারণ বাঙালিকে 'মুরগি' বলার হক এদের আছে।

'মুরগি' হই আর মোরগই হই, আমি কসাইয়ের হাত থেকে খালাস পাওয়া মুরগির মতো পালাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পেটের ভিতর কীরকম একটা অদ্ভুত ব্যথা আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে অতি আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলুম।

আফগান রসিকতা হাস্যরস না রুদ্ররসের পর্যায়ে পড়ে সে বিচার আলঙ্কারিকেরা করবেন। আমার মনে হয় রসটা বীভৎসতা-প্রধান বলে 'মহামাংসের' ওজনে এটাকে 'মহারস' বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই আমার শেষ পরীক্ষা নয়।

বাড়ি থেকে ফার্লংখানেক দূরে আরেক দল ডাকাতের সঙ্গে দেখা; কিন্তু এদের সঙ্গে নতুন ঝকমকে য়ুনিফর্ম-পরা একটি ছোকরা অফিসার ছিল বলে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলুম না। দলটা যখন কাছে এসেছে, তখন অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চেনা-চেনা বলে মনে হল। আরে! এ তো দু দিন আগেও আমার ছাত্র ছিল। আর পড়াশোনায় এতই ডডনং এবং আকাটমূর্খ ছিল যে, তাকেই আমি আমার মাস্টারি জীবনে বকাঝকা করেছি সবচেয়ে বেশি।

সেই কথাটা মনে হতেই আমি আবার আটটা রাইফেলের চোঙা চোখের সামনে দেখতে পেলুম। ডাইনে গলি ছিল; বেয়াড়া ঘুড়ির মতো গোত্তা খেয়ে সেদিকে টুঁ দিলুম। ছেলেটা যদি দাদ তোলার তালে থাকে, তবে অক্কা না হোক কপালে বেইজ্জতি তো নিশ্চয়ই। হে মুরশিদ, কী কুক্ষণেই-না এই দুশমনের পুরীতে এসেছিলুম। হে মৌলা আলীর মেহেরবান, আমি জোড়া বকরি—

পিছনে শুনি মিলিটারি বুটের ছুটে আসার শব্দ। তবেই হয়েছে। মুরশিদ, মৌলা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছেন। ইংরিজি প্রবাদেরই তবে আশ্রয় নিই— 'ইভ্ন দি ওয়ার্ম টার্নস।' ঘুরে দাঁড়ালুম। ছেলেটা চেঁচাচ্ছে 'মুআল্লিম সায়েব, মুআল্লিম সাহেব।' কাছে এসে আবদুর রহমানি কায়দায় সে আমার হাত-দুখানা তুলে ধরে বার বার চুমো খেল, কুশল জিগ্যেস করল এবং শেষটায় বেমক্কা ঘোরাঘুরির জন্য মুরুব্বির মতো ঈষৎ তম্বিও করল। আমি 'হেঁ হেঁ, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, তা আর বলতে, অল্‌হমদুলিল্লা, অল্ হমদুলিল্লা তওবা

www.pathagar.com

তওবা' বলে গেলুম— কখনও তাগ-মাফিক ঠিক জায়গায়, কখনও ভয়ের ধকল কাটাতে গিয়ে উল্টো-পাল্টা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ায়, আমারও সাহস বেড়ে গিয়েছে। জিগ্যেস করলুম, 'এ বেশ কোথায় পেলে বৎস?'

বাবুর-শাহ পাহাড়ের মতো বুক উঁচু করে বৎস বলল, 'কর্নাইল শুদম্' অর্থাৎ আমি কর্নেল হয়ে গিয়েছি।

ইয়া আল্লা! উনিশ বছর বয়সে রাতারাতি কর্নেল। আমাদের সুরেশ বিশ্বাসও— চেনার মধ্যে তো উনিই আমাদের নীলমণি— তো এত বড় কসরত দেখাতে পারেননি। আমার লোভ বেড়ে গেল। শুধালুম, 'জেনারেইল হবার দিল্লি কতদূর?'

গম্ভীরভাবে বলল 'দূর নীস্ত।'

খুদাতালা মেহেরবান, বিপ্লবটা বড়ই পয়মন্ত।

কর্নেল সায়েব বুঝিয়ে বললেন, 'আমির হবিবউল্লা খান আমার পিসির দেবরের মামাশ্বশুর।'

সম্পর্কটা ঠিক কী বলেছিল, আমার মনে নেই, তবে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠতর নয়। আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করলুম; ধন্য আমার মাস্টারি, ধন্য আমার শিষ্য, ধন্য এ বিপ্লব, ধন্য এ উপবাস। আমার শিষ্য রাতারাতি কর্নেল হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই অবস্থায়ই গেয়েছিলেন—

> 'এতদিনে জানলেম, যে কাঁদন কাঁদলেম
> সে কাহার জন্য,
> ধন্য এ-জাগরণ, ধন্য এ-ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য!'

স্থির করলুম, ফুরসত পাওয়ামাত্রই 'প্রবাসী'তে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালি' পর্যায়ে আমার কীর্তির খবরটা পাঠাতে হবে। এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বাঙালি দারোয়ান মারা গেলে যখন সাড়ম্বর খবর বেরোতে পারে, তখন আমার এ কীর্তি উড়ে বলে কি বামুন নয়? পরের বাড়ি জ্বলছে সত্যি, তাই বলে সে আগুনে আমি সিগারেট ধরাব না? আব্দার?

বললুম, 'তা হলে বৎস, যদি অনুমতি দাও তবে বাড়ি যাই।'

মিলিটারি কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। রাস্তায় অনেক ডাকু।' বলে অজানায় সে আপন সঙ্গীদের দিকেই তাকাল। তাই সই। দান উল্টে গিয়েছে। এখন তুমি গুরু, আমি শিষ্য।

আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার বসবার ঘরে কর্নেল দু দণ্ড রসালাপ করলেন, আমানউল্লাকে শাপমন্যি দিলেন ও মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে তালিম দিলেন।

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় কর্নেল আবদুর রহমানের খাস কামরায় ঢুকল। কাবুলে ছাত্রেরা গুরুগৃহে ভৃত্যের সঙ্গে ধূমপান করে। কিন্তু আবদুর রহমান তো বিপদে পড়ল, বহুকাল থেকে তার তামাক বাড়ন্ত। লোকটা আবার ধাপ্পা দিতে জানে না— আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবারই-বা কী? বনমালীও গুরুদেবের সঙ্গে বাস করে কবিতা লিখতে শেখেনি।

মৌলানা বললেন, 'সমস্ত সকাল কাটালুম ব্রিটিশ লিগেশন আর বাচ্চার পররাষ্ট্র দফতরে। কান্নাকাটিও কম করিনি। দাড়িতে হাত রেখে শপথ করে বললুম, "দু মাস হল শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। আসছে পরশু থেকে সে রুটিও আর জুটবে

www.pathagar.com

না।' ব্রিটিশ লিগেশনে বললুম, "কাবুলের পিঁজরা থেকে মুক্তি দাও।" পররাষ্ট্র-দফতরে বললুম, "দু মুঠো অন্ন দাও।"

আমি বললুম, 'পররাষ্ট্র-দফতর আর মুদির দোকান এক প্রতিষ্ঠান নাকি? তোমার উচিত ছিল বলা—

'মুরগে সইয়াদ তু অম্ ইফতাদে অম্ দর দামে ইশ্‌ক্।
ইয়া ব কুশ, ইয়া দানা দেহ্ ইয়া অজ কফস আজাদ কুন ॥'

পাখির মতন বাঁধা পড়ে গেছি কঠিন প্রেমের ফাঁদ।
হয় মেরে ফেল, নয় দানা দাও, নয় খোলো এই বাঁধ ॥'

'তুমি তো মাত্র দুটো পন্থা বাতলালে, হয় দানা দাও, নয় খোলো বাঁধ। তৃতীয়টা বললে না কেন? নয় মেরে ফেল। আপ্তবাক্যের বিকলাঙ্গ উদ্ধৃতি গোবধের ন্যায় মহাপাপ।'

মৌলানা বললেন, 'তাই সই। শিক-কাবাব করে খাব।'

শীতে ধুঁকছি, যেন কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর। মাঝে মাঝে তন্দ্রা লাগছে। কখনও মনে হয় খাট থেকে পড়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পা-দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ সটান লম্বা হয়ে যায়। কখনও চিৎকার করে উঠি, 'আবদুর রহমান, আবদুর রহমান।' কেউ আসে না। কখনও দেখি আবদুর রহমান খাটের বাজুতে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে; কিন্তু কই, তাকে তো ডাকিনি। শুনি, যে দু চারটে সামান্য মন্ত্র সে জানে তাই বিড়বিড় করে পড়ছে।

তার সঙ্গে দুঃস্বপ্ন; অ্যারোপ্লেনে বসে আছি, বাচ্চার ডাকাত দল আটটা রাইফেল বাগিয়ে ছুটে আসছে, অ্যারোপ্লেন থামাবার জন্য, ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। একসঙ্গে আটটা রাইফেলের শব্দ। ঘুম ভেঙে যায়। শুনি সত্যিকার রাইফেলের আওয়াজ আর চিৎকার। পাড়ায় ডাকু পড়েছে।

আর দেখি মা ইলিশ মাছ ভাজছেন।

মাগো।

অন্ধকার হয়ে আসছে। আবদুর রহমান সাঁঝের পিদিম দেখাচ্ছে না কেন? ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলুম, কেরোসিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কীই-বা হবে তেল দিয়ে, জীবনপ্রদীপ যখন— । চুলোয় যাকগে কবিত্ব।

কিন্তু সামনে এ কী? প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি। তার ভিতরে আটা, রওগন, মটন, আলু, পেঁয়াজ, মুরগি আরো কত কী! তার সামনে বসে ভুঁইফোড় কর্নেল; মিটমিটিয়ে হাসছে। ভারি বেয়াদব। আবার আবদুর রহমানের মুখ এত পাঙাশ কেন? আমার ঘুম ভাঙছে না দেখে ভয় পেয়েছে? নাহ্, এ তো ঘুম নয়, স্বপ্নও নয়!

আবদুর রহমান বলল, 'হুজুর কর্নাইল সায়েব সওগাত এনেছেন।'

একদিনে মানুষ কত উত্তেজনা সইতে পারে?

আবদুর রহমান আবার তাড়াতাড়ি বলল, 'হুজুর, আমাকে দোষ দেবেন না, আমি কিছু বলিনি।'

www.pathagar.com

কর্নেল বলল, 'হুজুর যে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আপনার চেহারা থেকেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবই খুদাতালার মরজি। এখন খুদাতালার মরজিতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল! আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করতেন, সেকথা কি আমি ভুলে গিয়েছি?'

আমি বললুম, 'সে কী কথা। তোমাকেই তো আমি সবচেয়ে বেশি বকেছি।'

কর্নেল ভারি খুশি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুজুর সেই কথাই তো হচ্ছে। আপনারও তা হলে মনে আছে। আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ না করলে সবচেয়ে বেশি বকলেন কেন?' তার পর মৌলানার দিকে তাকিয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'জানেন সায়েব, একদিন মুআল্লিম সায়েব আমার ওপর এমনি চটে গেলেন যে, আমাকে বললেন, একটা বেত নিয়ে আসতে। ক্লাসের সবাই তাজ্জব হয়ে গেল। আমাদের দেশের মাস্টার বেত আনায় কাপ্তেনকে দিয়ে, না হয় দুষ্ট ছেলের দুশমনকে দিয়ে। সে তখন বেছে বেছে তেজ বেত নিয়ে আসে। আমি তখন কী করলুম জানেন? ভাবলুম, মুআল্লিম সায়েব যখন আর কাউকে কখনও চাবুক মারেননি, তখন তাঁর বউনিতে ফাঁকি দিলে আমার অমঙ্গল হবে। নিয়ে এলুম একখানা পয়লা নম্বরের বেত।' তার পর কর্নেল মৌলানার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'মুআল্লিম সায়েব তখন কী করলেন, জানেন? বেতখানা হাতে নিয়ে আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'বেতের কাঁটাগুলো কেটে ফেলিসনি কেন?' ছেলেরা সবাই বলল, 'তা হলে লাগবে কী করে?'

মৌলানা বললেন, 'সেদিন মার খেয়েছিলে বলেই তো আজ কর্নেল হয়েছ।'

কর্নেল আপসোস করে বলল, 'না, মুআল্লিম সায়েব মারেননি। আমি তো তৈরি ছিলুম। আমার হাতে বেত লাগে না।' বলে তার হাত দু খানা মৌলানার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল।

চাষার ছেলের হাত। অল্পবয়স থেকে কুহিস্তানের (কুহপর্বত) শক্ত জমিতে হাল ধরে ধরে দু খানা হাতে কড়া পড়ে গিয়ে চেহারা হয়েছে মোষের কাঁধের মতো। নখে-চামড়ায় কোনও তফাত নেই, আর হাতের রেখা দেখে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার ভক্তি বেড়ে গেল। লাঙলের ঘষায় হাতে অবশিষ্ট রয়েছে কুল্লে দেড়খানা রেখা। আয়ুরেখা তেলোর ইস্‌পার, উস্‌পার, হেডলাইন নেই, আর হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে 'মরুপথে হারাল ধারা'। ব্যস্‌। এই দেড়খানা লাইন নিয়ে সে সংসার চালাচ্ছে— জুপিটার, ভিনাস, সলমনের মাউন্টরেখা কোনও কিচ্ছুর বালাই নেই। আর আঙুলগুলো এমনি কুষ্ঠরোগীর মতো এবড়ো-থেবড়ো যে, হাতের আর জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনও পর্যায়েই পড়ে না। না পড়ারই কথা, কারণ ডাকাত-গুষ্ঠির ছেলে কর্নেল হয়েছে সবসুদ্ধ কটা, আর তাদের সংস্পর্শে এসেছেন কজন বরাহ মিহির কজন কেইরো?

আবদুর রহমান ঝুড়ির সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে।

মৌলানা কর্নেলকে ধন্যবাদ দিয়ে আবদুর রহমানকে ঝুড়ি রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। সে ঝুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ঘর থেকে বেরুল না। আমি নিরুপায় হয়ে কর্নেলকে বললুম, 'রাত্রে এখানেই খেয়ে যাও।'

আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে চলে গেল।

কর্নেল বলল, 'আমাকে মাফ করতে হবে হুজুর। বাদশার সঙ্গে আমার রাতে খানা খাওয়ার হুকুম।'

www.pathagar.com

মৌলানা শুধালেন, 'বাদশা কী খান?'

কর্নেল বললেন, 'সেই রুটি, পনির অর কিশমিশ। কৃচিৎ কখনও দু মুঠো পোলাও। বলেন, "যে-খানা খেয়ে আমানউল্লা কাপুরুষের মতো পালাল, আমি সে-খানা খেলে কাপুরুষ হয়ে যাব না?" তার পর দুষ্টুহাসি হেসে বলল, আমি ওসব কথায় কান দিই না। আমানউল্লার বাবুর্চিই এখনও রাজবাড়িতে রাঁধে। আমি তাই পেট ভরে খাই।'

কর্নেল যাবার সময় বলে গেল, আমি যেন আহারাদি সম্বন্ধে আর দুশ্চিন্তা না করি।

দশ মিনিটের ভেতর আবদুর রহমান কর্নেলের আনা কাঠ দিয়ে ঘরে আগুন জ্বেলে দিল।

আমি সে-আগুনের সামনে বসে সর্বাঙ্গে, মাংসে, রক্তে, হাড়ে, মজ্জায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে সঞ্জীবনী বহ্নির অভিযান অনুভব করলুম, তার তুলনা বা বর্ণনা দিতে পারি এমনতরো শারীরিক অভিজ্ঞতা বা আলঙ্কারিক ক্ষমতা আমার নেই। রোদে-ফাটা জমি যেরকম সেচের জল ফাটলে ফাটলে ছিদ্রে ছিদ্রে কণায় কণায় শুষে নেয়, আমার শরীরের অণু-পরমাণু যেন ঠিক তেমনি আগুনের গরম শুষে নিল। আমার মনে হল, ভগীরথ যেরকম জহ্নুধারা নিয়ে সগররাজের সহস্র সন্তানের প্রাণদান করার বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিলেন স্বয়ং ধন্বন্তরি ঠিক সেইরকম সূক্ষ্মশরীর ধারণ করে বহ্নিধারা সঙ্গে নিয়ে আমার অঙ্গে প্রবেশ করলেন।

মুদিত নয়নে শিহরণে শিহরণে অনুভব করলুম প্রতি ভস্মকণায় জহ্নুকণার স্পর্শ, আমার শিশিরবিদ্ধ অচেতন অণুতে অণুতে কৃশানুর দীপ্ত স্পর্শের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অভিষেক।

সমস্ত দেহমন দিয়ে বুঝলুম আর্য ঐতিহ্য, ভারতীয় সভ্যতা, সনাতন ধর্মের প্রথম শব্দব্রহ্ম ঋগ্বেদের প্রথম পদে কেন

'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্'

রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

এবং সেমিতি ধর্মজগতেও তো তাই। ইহুদি, খ্রিস্ট, ইসলাম তিন ধর্মই সম্মিলিত কণ্ঠে স্বীকার করে, একমাত্র মানুষ যিনি পরমেশ্বরের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি মুসা (মোজেস) এবং তখন পরমেশ্বর তাঁর প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রুদ্ররূপে বা 'তজল্লিতে'। মুসা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন দেখলেন তাঁর সামনের সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

গ্রিক দেবতা প্রমিথিয়ুস ও দেবরাজ জুপিটারে কলহ হয়েছিল অগ্নি নিয়ে। মানব-সভ্যতা আরম্ভ হয় প্রমিথিয়ুসের কাছ থেকে পাওয়া সেই অগ্নি দিয়ে। নলরাজ ইন্ধন প্রজ্বালনে সুচতুর ছিলেন বলেই কি তিনি দেবতাদের ঈর্ষাভাজন হলেন? 'নল' শব্দের অর্থ 'চোঙা', প্রমিথিয়ুসও আগুন চুরি করেছিলেন চোঙার ভেতরে করে।

ভারতীয় আর্য, গ্রিক আর্য দুই গোষ্ঠী, এবং তৃতীয় গোষ্ঠী ইরানি আর্য জরথুস্ত্রী— সকলেই অগ্নিকে সম্মান করেছিলেন। হয়তো এরা সকলেই এককালে শীতের দেশে ছিলেন এবং অগ্নির মূল্য এঁরা জানতেন, কিন্তু সেমিতি ভূমি উষ্ণপ্রধান, সেখানে অগ্নিমাহাত্ম্য কেন? তবে কি মরুভূমির মানুষ সূর্যের একচ্ছত্রাধিপত্য সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্রাধিপতির রুদ্ররূপ বা 'তজল্লিতে' অগ্নিরই আভাস পায়?

www.pathagar.com

আগুনের পরশমণির ছোঁয়া লেগে শরীর ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হচ্ছে আর ওদিকে মগজে হুশ হুশ করে থিয়োরির পর থিয়োরি গড়ে উঠেছে; নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি এতই গভীর শ্রদ্ধা হল যে, 'সাধু সাধু' বলে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াতে গিয়ে হাতটা মচকে গেল। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শয়তান, ডেভিল, বিয়ালজিবাব, লুসিফার সবাই আগুনের তৈরি; তাঁরা আগুনের রাজা। নরকের আবহাওয়া আগুন দিয়ে ঠাসা, এঁদের শরীর আগুনে গড়া না হলে এঁরা সেখানে থাকবেন কী প্রকারে?

হায়, হায়, আমার বহু মূল্যবান থিয়োরিখানা শয়তানের পাল্লায় পড়ে নরকের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

কোথায় লাগে নরগিস, রজনীগন্ধাকে বাখানিয়া কবিতা লেখে কোন মূর্খ! বিরিয়ানি— কোর্মা— কাবাব— মুসল্লম থেকে যে খুশবাই বেরোয় তার কাছে সব ফুল হার তো মানেই, প্রিয়ার চিকুরসুবাসও তার কাছে নস্যি।

চোখ মেলে দেখি, আবদুর রহমান বেনকুয়েট সাজিয়েছে। মৌলানা ফপরদালালি করছেন আর আমার বেড়াল দুটো একমাস অজ্ঞাতবাস করে ফের খানা-কামরায় এসে উন্নাসিক হয়ে মাইডিয়ার মাইডিয়ার আওয়াজ বের করেছে।

আবদুর রহমান আমাদের পরিচয়ের পয়লা রাত্তিরে যে ডিনার ছেড়েছিল এ ডিনার সে মালেরই সিল্কে বাঁধানো, প্রিয়জনের উপহারোপযোগী, পূজার বাজারের রাজ-সংস্করণ। জানটা তর হয়ে গেল। মৌলানা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,

'জিন্দাবাদ গাজি আবদুর রহমান খান।'

আমি গলা এক পর্দা চড়িয়ে দোস্ত মুহম্মদি কায়দায় বললুম,

'কমরৎ ব শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পুন্দি, ব তরকি' (তোর কোমর ভেঙে দু টুকরো হোক, খুদা তোর দু চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মতো হয়ে যা, তার পর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা)।'

মৌলানা বজ্রাহত। গুণী লোক, এসব কটু-কাটব্যের সন্ধান তিনি পাবেন কী করে? কিন্তু বালাই দূর করবার এই জনপদ পন্থা আবদুর রহমান বিলক্ষণ জানে।* অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'হাত ধুয়ে নিন সায়েব, গরম জল আছে।'

কী বললে? গরম জল! আ-হা-হা। কতদিন বাদে গরম জলের সুখস্পর্শ পাব! কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষণের স্তনান্ধয়া বসন্তসেনার জলাভিষেক, কোথায় লাগে তার কাছে মুগ্ধ চারুদত্তের বিহ্বল প্রশস্তি। বললুম, 'বরাদর আবদুর রহমান, এই গরম জল দিয়ে তুমি যেন তোমার ডিনারখানা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিলে।'

আবদুর রহমানের খুশির অন্ত নেই। আমার কোনও কথার উত্তর দেয় না, আর বেশি প্রশংসা করলে শুধু বলে, 'অল্‌হমদুলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধন্যবাদ।' যতক্ষণ এটা ওটা গুছোচ্ছিল আমার বার বার নজর পড়ছিল তার হাত দু খানা কীরকম শুকিয়ে গিয়েছে, আর বাসন-বর্তন নাড়াচাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।

* উনবিংশ অধ্যায় পশ্য।

www.pathagar.com

মৌলানা আমাকে সাবধান করে দিলেন, প্রতি গ্রাস যেন বত্রিশবার চিবিয়ে খাই। কাজের বেলা দেখা গেল, ডাকগাড়ি থেকে নেমে গোরারা যেরকম রিফ্রেশমেন্টরুমে খানা খায় আমরা সেই তালেই খাচ্ছি। পেটের এক কোণ ভর্তি হতেই আমি আবদুর রহমানকে লক্ষ করে বললুম, 'এরকম রান্না পেলে আমি আরও কিছুদিন কাবুলে থাকতে রাজি আছি।' সে দুর্দিনে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কী করা যায়।

কিন্তু মৌলানা প্রোষিত-ভার্যা! পেট খানিকটা ভরে যাওয়ায় তাঁর বিরহযন্ত্রণাটা যেন মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। বললেন, 'না,

ষন্‌গে ওতন্ অজ্ তখতে সুরেমান বেশতর,
খারে ওতন্ অজ্ গুলে রেহান বেহ্তর,
ইউসুফ কি দর মিস্‌র্ পাদশাহি মিকরদ
মিগুফ্‌ত 'গদা বুদনে কিনান খুশতর।'

দেশের পাথর সুলেমান শার
তখতের চেয়ে সেরা,
বিদেশের ফুল হার মেনে যায়
দিশি কাঁটা প্রাণ কাড়া।
মিশর দেশের সিংহাসনেতে
বসিয়ে ইসুফ রাজা
কহিত, 'হায়রে, এর চেয়ে ভালো
কিনানে ভিখারি সাজা।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—

ইউসুফে গুম্ গশ্‌তে বাজ্ আয়দ ব্ কিনান,
গম্ ম্ খুর।
কুলবয়ে ইহজান্ শওদ রুজি গুলিস্তান্,
গম্ ম্ খুর্ ॥

দুঃখ করো না হারানো ইসুফ
কিনানে আবার আসিবে ফিরে
দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

(কাজী নজরুল ইসলাম)

কিন্তু বয়েত-বাজি বা কবির লড়াই বেশিক্ষণ চলল না। সাঁতারের সময় পয়লা দম ফুরিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরে মানুষ যেরকম দুসরা দম পায়, আমরা ঠিক সেইরকম খানিকক্ষণ ক্ষান্ত দিয়ে আবার মাথায় গামছা বেঁধে খেতে লেগেছি। এদিকে দেখি সবকিছু ফুরিয়ে আসছে— প্রথম পরিবেশনে কম মেকদারে দেওয়ার তালিম আবদুর রহমান আমার কাছ

www.pathagar.com

থেকেই পেয়েছে— কিন্তু আর কিছু আনছে না। থাকতে না পেরে বললুম 'আরও নিয়ে এস।'

আবদুর রহমান চুপ। আমি বললুম, 'আরও নিয়ে এস।' তখন বলে কি না সবকিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মৌলানা আর আমি তখন যেন রক্তের স্বাদ পেয়ে হন্যে হয়ে উঠেছি। আমি ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললুম, 'তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। যাও, তোমার নিজের জন্য যা রেখেছ তাই নিয়ে এস।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বললে, সে সবকিছুই পরিবেশন করে দিয়েছে, নিজে রুটি-পনির খাবে।

আমি তার কঞ্জুসি দেখে ক্ষিপ্ত-প্রায়। উন্মাদ, মূর্খ, হস্তী হেন শব্দ নেই যা আমি গালাগালে ব্যবহার করিনি। মৌলানা শান্ত প্রকৃতির লোক, কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না। তিনি পর্যন্ত আপন বিরক্তি সুস্পষ্ট ফারসি ভাষায় জানিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান চুপ করে সবকিছু শুনল। হাসল না সত্যি— কিন্তু কই, মুখখানা একটু মলিনও হল না। আমি আরও চটে গিয়ে বললুম, 'তোমাকে চাকর রাখার ঝকমারিটা বোঝাবার এই কি মোকা? এর চেয়ে তো শুকনো রুটি আর নুনই ভালো ছিল।' কথা যতই বলছি চটে যাচ্ছি ততই বেশি। শেষটায় বললুম, 'আমি মরে গেলে আচ্ছা করে খানা রেঁধে— আর প্রচুর পরিমাণে, বুঝলে তো?— মসজিদে নিয়ে গিয়ে আমার ফাতেহা বিলিয়ো।' অর্থাৎ আমার পিণ্ডি চটকিও।

তখন মৌলানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু লহমা সবুর করুন, পেট আপনা থেকেই ভরে যাবে।'

মৌলানা পর্যন্ত রেগে টং। পুরুষ্টু পাঁঠার মতো ঘোঁত ঘোঁত করে পাদ্রি সায়েবেরা গাঁয়ে ঢুকে ক্ষুধাতুর চাষাকে এইরকম উপদেশ দেয় বটে। 'স্বর্গরাজ্য ফর্গরাজ্য' কী সব বলে। কিন্তু আবদুর রহমান খালি পেটে উপদেশটা দিয়েছে বলে মৌলানা দাড়িতে হাত রেখে অভিসম্পাত দিতে দিতে থেমে গেলেন। আমি বললুম, 'বিদ্রোহে কত লোক গুলি খেয়ে মরল, তোমার জন্য—'

ততক্ষণে আবদুর রহমান বেরিয়ে গিয়েছে। একেই বলে কৃতজ্ঞতা। যে আবদুর রহমানকে পাঁচ মিনিট আগে সুলেমানের তখ্‌তে বসাবার জন্য লাজারুসে সিংহাসন অর্ডার দেব দেব করেছিলুম সেই আবদুর রহমানকে তখন জাহান্নমে পাঠাবার জন্য টিকিট কাটবার বন্দোবস্ত করছি।

আবদুর রহমান নিশ্চয়ই ফলিত জ্যোতিষ জানে। দু মিনিটের ভেতর ক্ষুধা গেল। পাঁচ মিনিট পরে পেটের ভিতর মহারানির রাজত্ব— বিলকুল ঠাণ্ডা। কিন্তু তার পর আরম্ভ হল বিপ্লব। সে কী অসম্ভব হাঁচড়-পাঁচড় আর আইতাই। খাটে শুয়ে পড়েছি, অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করছি আর গরমের চোটে কপাল দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। মৌলানারও একই অবস্থা। তিনিই প্রথম বললেন, 'বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

প্রাণ যায় আর কী। আর বেশি খেলে দেখতে হত না। 'ও, আবদুর রহমান, এদিকে আয় বাবা।'

আবদুর রহমান এসে বলল, 'আমার কাছে সুলেমানি নুন আছে, তারই খানিকটা দেব?'

এরকম গুণীর চন্নামেত্যো খেতে হয়, এর হাতের হজমি ডাঙ্গস হয়ে আমার পেটের বিপ্লব নিশ্চয়ই কাবু করে নিয়ে আসবে। বললুম, 'তাই দে, বাবা।' কিন্তু গিলতে গিয়ে দেখি,

www.pathagar.com

শ্রাদ্ধভোজনের পর আমাদের ব্রাহ্মণের গুলি গিলতে গিয়ে যে অবস্থা হয়েছিল আমারও তাই। শুনেছি অত্যধিক সংযম করে মুনি-ঋষিরা ঊর্ধ্ব-রেতা হন, আমি অত্যধিক ভোজন করে ঊর্ধ্ব-ভোজা হয়ে গিয়েছি।

নুন খেয়ে আরাম বোধ করলুম। আবদুর রহমানকে আশীর্বাদ করে বললুম, 'বাবা তুমি দারোগা হও।' ইচ্ছে করেই 'রাজা হও' বললুম না— কাবুলে রাজা হওয়ার কী সুখ সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম।

উত্তেজনার শেষ নেই। আবদুর রহমানের পিছনে ঢুকল উর্দি-পরা এক মূর্তি। ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের পিয়ন। দেখেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। মৌলানাকে বললুম, 'তদারক করো তো ব্যাপারটা কী?'

একখানা চিরকুট। তার মর্ম আগামীকল্য দশটার সময় যে প্লেন ভারতবর্ষ যাবে তাতে মৌলানা ও আমার জন্য দুটি সিট আছে। আনন্দের আতিশয্যে মৌলানা সোফার উপর শুয়ে পড়লেন। আমাদের এমনই দুরবস্থা যে, পিয়নকে বখশিশ দেবার কড়ি আমাদের গাঁটে নেই।

'ফেবার' না 'রাইট' হিসেবে জায়গা পেলুম তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল না। আবদুর রহমান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে— চুপ করে চলে গেল। মৌলানার আনন্দ ধরে না। বিবি সম্বন্ধে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি তাঁকে কাবুল নিয়ে এসেছিলেন বলে নতুন বউ বাড়ির আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাননি। এখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি কী করে দিন কাটাচ্ছেন সেকথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছিলেন।

আমিও কম খুশি হইনি। মা-বাবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। বাবা আবার 'দি *স্টেটসমেন*' থেকে আরম্ভ করে 'প্রিন্টেড অ্যান্ড পাবলিশড বাই' পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন। অ্যারোপ্লেনে করে ব্রিটিশ লিগেশনের জন্য ভারতীয় খবরের কাগজ আসত। তারই একখানা মৌলানা কী করে যোগাড় করেছিলেন এবং তাতে আফগান রাষ্ট্রবিপ্লব ও কাবুলের বর্ণনা পড়ে বুঝলুম খবরের কাগজের রিপোর্টারের কল্পনাশক্তি সত্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। গাছে আর মাছে বানানো গল্প, পেশাওয়ারের বোতলের পাশে বসে লেখা। এ বর্ণনাটি বাবা পড়লেই হয়েছে আর কী। আমার খবরের আশায় ডাকঘরে থানা গাড়বেন।

মৌলানা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। মানুষ যখন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখে তখন কথা কয় কম।

ওদিকে এখনও কান্না থামেনি। পাশের বাড়ির দরজা খুললে এখনও মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ আসে। আবদুর রহমান বলেছে, কর্নেলের বড় মা কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না। ওই তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন।

মায়ে মায়ে তফাত নেই। বীরের মা যেরকম ডুকরে কাঁদছে ঠিক সেইরকমই শুনেছি দেশে, চাষা মরলে।

ঘুমিয়ে পড়ব পড়ব, এমন সময় দেখি খাটের বাজুতে হাত রেখে নিচে বসে আবদুর রহমান। জিগ্যেস করলুম, 'কী বাচ্চা?'

www.pathagar.com

আবদুর রহমান বলল, 'আমাকে সঙ্গে করে আপনার দেশে নিয়ে চলুন।'

'পাগল নাকি? তুই কোথায় বিদেশ যাবি? তোর বাপ মা, বউ?' কোনও কথা শোনে না, কোনও যুক্তি মানে না। 'অ্যারোপ্লেন তোকে নেবে কেন? আর তারা রাজি হলেও বাচ্চার কড়া হুকুম রয়েছে কোনও আফগান যেন দেশত্যাগ না করে। তোকে নিলে বাচ্চা ইংরেজের গলা কেটে ফেলবে না? ওরে পাগল, আজ কাবুলের অনেক লোক রাজি আছে, প্লেনে একটা সিটের জন্য লক্ষ টাকা দিতে।'

নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলে, আমি রাজি হলে সে সকলের হাতে-পায়ে ধরে এক কোণে একটু জায়গা করে নেবে।

কী মুশকিল। বললুম, 'তুই মৌলানাকে ডাক। তিনি তোকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বলল, 'উনি আমার কে?'

তার পর ফের অনুনয়বিনয় করে। তবে কি তার খেদমতে বড্ড বেশি ত্রুটি, গলদ, না আমার বাপ-মা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চটে যাবেন? আমার বিয়ের 'শাদিয়ানাতে' বন্দুক ছুড়বে কে?

আবদুর রহমান পানশির আর বরফ এই দুই বস্তু ছাড়া আর কোনও জিনিস গুছিয়ে বলতে পারে না। তার ওপর সে আমার কাছ থেকে কোনওদিন কোনও জিনিস, কোনও অনুগ্রহ চায়নি। আজ চাইতে গিয়ে সে যেসব অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি করল সেগুলো গুছিয়ে বললে তো ঠিকঠিক বলা হবে না। ওদিকে তার এক-একটা কথা, এক-একটা অভিমান আমার মনের ওপর এমনি দাগ কেটে যাচ্ছিল যে, আমিও আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আর বলবই-বা কী ছাই। সমস্ত জিনিসটা এমনি অসম্ভব, এমনি অবিশ্বাস্য যে, তার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি চালাব কোথায়? ভূতকে কি পিস্তলের গুলি দিয়ে মারা যায়?

আমি দুঃখে-বেদনায় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেলে আবদুর রহমান ভাবে সে বুঝি আমাকে শায়েস্তা করে এনেছে। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে আরও আবোল-তাবোল বকে। কথার খেই হারিয়ে ফেলে এককথা পঞ্চাশ বার বলে। আমার মা-বাপকে এমনি খেদমত করবে যে, তাঁরা গ্রহণ না করে থাকতে পারবেন না। আমি যদি তখন বলতুম যে, আমার মা গরিব কাবুলিওয়ালাকেও দোর থেকে ফেরান না, তা হলে আর রক্ষে ছিল না।

আমারই বরাত। কী কুক্ষণে তাকে একদিন গুরুদেবের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটা ফারসিতে তর্জমা করে শুনিয়েছিলুম, সে আজ সেই গল্প থেকে নজির তুলতে আরম্ভ করল। মিনি যখন অচেনা কাবুলিওয়ালাকে ভালোবাসতে পারল, তখন আমার ভাইপো-ভাইঝিরাই তাকে ভালোবাসবে না কেন?

'সব হবে, কিন্তু তুমি যাবে কী করে?'

'সে আমি দেখে নেব।'

ছোট্ট শিশু মায়ের কাছে যে-রকম অসম্ভব জিনিস চায়। কোনও কথা শুনতে চায় না, কোনও ওজর-আপত্তিতে কান দেয় না।

এত দীর্ঘকাল ধরে আবদুর রহমান আমার সঙ্গে কখনও কথা কাটাকাটি করেনি। আমি শেষটায় নিরুপায় হয়ে বললুম, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কীরকম কষ্ট হচ্ছে তুমি

www.pathagar.com

জানো, তুমি সেটা আর বাড়িও না। তোমাকে আমার শেষ আদেশ, তুমি এখানে থাকবে এবং যে মুহূর্তে পানশির যাবার সুযোগ পাবে, সেই মুহূর্তেই বাড়ি চলে যাবে।'

আবদুর রহমান চমকে উঠে জিগ্যেস করল, তবে কি হুজুর আর কাবুল ফিরে আসবেন না?'

আমি কী উত্তর দিয়েছিলুম, সেকথা দয়া করে আর শুধাবেন না।

বিয়াল্লিশ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল আবদুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। রুটি, মমলেট, পনির, চা। অন্যদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল।

মৌলানা এসে বললেন, 'চিরকুটে লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পৌন্ড লগেজ নিয়ে যেতে হবে। কী রাখি, কী নিয়ে যাই?'

আমি বললুম, 'যা রেখে যাবে তা আর কোনওদিন ফিরে পাবে না। আমি আবদুর রহ্‌মানকে বলেছি পানশির চলে যেতে। বাড়ি পাহারা দেবার জন্য কেউ থাকবে না। কাজেই সবকিছু লুট হবে।'

'কারও বাড়িতে সবকিছু সমঝিয়ে দিয়ে গেলে হয় না?'

আমি বললুম, এ পরিস্থিতিটি একদিন হতে পারে জেনে আমি ভেতরে ভেতরে খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম, যখন চতুর্দিকে লুটতরাজের ভয়, তখন কাউকে মালের জিম্মাদারি নিতে অনুরোধ করা এ দেশের রেওয়াজ নয়। কারণ কেউ যদি জিম্মাদারি নিতে রাজিও হয়, তখন তার বাড়িতে ডবল মালের আশায় লুটের ডবল সম্ভাবনা। মালপত্র যখন সদর রাস্তা দিয়ে যাবে, তখন ডাকাতেরা বেশ করে চিনে নেবে মালগুলো কোন বাড়িতে গিয়ে উঠল।'

বলে তো দিলুম মৌলানাকে সবকিছু প্রাঞ্জল ভাষায় কিন্তু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চারিদিকে তাকালুম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনও উত্তর নেই। নিয়ে যাব কী, আর রেখে যাব কী?

ওই তো আমার দু ভলুম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মস্কো থেকে ট্রেনে করে তাশকন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আমুদরিয়া, তার পর খেয়া পেরিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে সমস্ত উত্তর আফগানিস্তান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের চড়াই-উতরাই ভেঙে এসে পৌঁছেছে কাবুল। ওজন পৌন্ড ছয়েক হবে।

আমি সাহিত্য সৃষ্টি করি না, কাজেই পাণ্ডুলিপির বালাই নেই— মৌলানার থেকে সেদিক দিয়ে আমার কপাল ভালো— কিন্তু শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ক্লাসে বলাকা, গোরা, শেলি, কিটস সম্বন্ধে যে গাদা গাদা নোট নিয়েছিলুম, এবং মূর্খের মতো এখানে নিয়ে এসেছিলুম, বরফবর্ষণের দীর্ঘ অবসরে সেগুলোকে যদি কোনও কাজে লাগানো যায় সেই ভরসায়, তার কী হবে? ওজন তো কিছু কম নয়।

আর সব অভিধান, ব্যাকরণ, মিনুদির দেওয়া 'পূরবী', বিনোদের দেওয়া ছবি, বন্ধুবান্ধবের ফটোগ্রাফ, আর এক বন্ধুর জন্য কাবুলে কেনা দু খানা বোখারা কার্পেট? ওজন তিন লাশ।

www.pathagar.com

কাপড়চোপড়? দেরেশি-পাগল কাবুলের লৌকিকতা রক্ষার জন্য স্মোকিঙ, টেল, মর্নিংসুট (কাবুলের সরকারি ভাষায় 'বঁ জুর দেরেশি'!) এগুলোর জন্য আমার সিকি পয়সার দরদ নেই কিন্তু যদি জর্মনি যাবার সুযোগ ঘটে, তবে আবার নতুন করে বানাবার পয়সা পাব কোথায়?

ভুলেই গিয়েছিলুম। একজোড়া চীনা 'ভাজ'। পাতিনেবুর মতো রঙ আর চোখ বন্ধ করে হাত বুলোলে মনে হয় যেন পাতিনেবুরই গায়ে হাত বুলোচ্ছি, একটু জোরে চাপ দিলে বুঝি নখ ভিতরে ঢুকে যাবে।

কত ছোটখাটো টুকিটাকি। পৃথিবীর আর কারও কাছে এদের কোনও দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাউদ্দিনের প্রদীপ।

সোক্রাতেসকে একদিন তাঁর শিষ্যের পাল শহরের সবচেয়ে সেরা দোকান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সে দোকানে দুনিয়ার যত সব দামি দামি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, অদ্ভুত অদ্ভুত বিলাসসম্ভার, মিসর বাবিলনের কলা-নিদর্শন, পাপিরসের বান্ডিল, আলকেমির সরঞ্জাম সবকিছুই ছিল। সোক্রাতেসের চোখের পলক পড়ে না। এটা দেখলেন, সেটা নাড়ছেন আর চোখদুটো ছানাবড়ার সাইজ পেরিয়ে শেষটায় সসারের আকার ধারণ করেছে। শিষ্যেরা মহাখুশি—গুরু যে এত কৃচ্ছ্রসাধন আর ত্যাগের উপদেশ কপচান সে শুধু কোনও সত্যিকার ভালো জিনিস দেখেননি বলে— এইবার দেখা যাক, গুরু কী বলেন। স্বয়ং প্লাতো গুরুর বিহ্বল ভাব দেখে অস্বস্তি অনুভব করছেন।

দেখা শেষ হলে সোক্রাতেস করুণকণ্ঠে বলেন, 'হায়, হায়। দুনিয়া কত চিত্র-বিচিত্র জিনিসে ভর্তি যার একটাও আমার প্রয়োজন নেই।'

আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, সোক্রাতেসে-আমাতে মাত্র একটি সামান্য তফাত— এ ঘরে প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমার প্রয়োজন। ব্যস— ওই একটিমাত্র পার্থক্য। ডার্বি জিতেছে ৫৩৭৮৬ নম্বরের টিকিট। আমি কিনেছিলুম ৫৩৭৮৫ নম্বরের টিকিট। তফাতটা এমন কী হল?

মুসলমানের ছেলে, নিমতলা যাব না, যাব একদিন গোবরা— অবশ্য যদি এই কাবুলি-গর্দিশ কাটিয়ে উঠতে পারি। সেদিন কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব না, সেকথাও জানি; কিন্তু তারই জন্য কি আজ সবকিছু কাবুলে ফেলে দেশে যেতে হবে? মকশো করলে সব জিনিসই রপ্ত হয়, এই কি খুদাতালার মতলব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ কুষ্টিয়ার লালন ফকির বলেছেন।

> 'মরার আগে ম'লে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
> জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়!'

আবার আরও কে একজন, দাদু না কী, তিনিও তো বলেছেন—

> "দাদু মেরা বৈরী মৈ মুওয়া মুঝে ন
> মারে কোই।'

('হে দাদু আমার বৈরী 'আমি' মরে গিয়েছে, আমাকে কেউ মারতে পারে না')।

কী মুশকিল। সব গুণীরই এক রা। শেয়ালকে কেন বৃথা দোষ দেওয়া। কবীরও তো বলেছেন—

www.pathagar.com

'তজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সতগরু সঙ্গত তরতা হৈ।
কহৈঁ কবির কোই বিরল হংস
জীবত হি জো মরতা হৈ ॥'

('অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুকে লাভ করেছেন সেরকম হংস-সাধক বিরল')।

কিন্তু কবীরের বচনে বাঁচাওতা রয়ে গিয়েছে। গোবরার গোরস্তানে যাবার পূর্বেই মৃতের ন্যায় সবকিছুর মায়া কাটাতে পারেন এমন পরমহংস যখন 'বিরল' তখন সে কস্ত করার দায় তো আমার ওপর নয়।

ডোম শেষ পর্যন্ত কোন বাঁশ বেছে নিয়েছিল আমাদের প্রবাদে তার হদিস মেলে না। বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত কাঁচা এবং গিঁটে ভর্তি— না হলে প্রবাদটার কোনও মানে হয় না। এ ডোম তাই শেষ পর্যন্ত কি দিয়ে দশ পৌন্ডের পুঁটুলি বেঁধেছিল, সেকথা ফাঁস করে দিয়ে আপন আহাম্মুখির শেষ প্রমাণ আপনাদের হাতে তুলে দেবে না।

কিন্তু সেটা পুরনো ধুতিতে বাঁধা বেনের পুঁটুলিই ছিল— 'লগেজ' বা সুটকেসের ভিতরে গোছানো মাল অন্য জিনিস— কারণ দশ পৌন্ড মালের জন্য পাঁচ পৌন্ডের সুটকেস ব্যবহার করলে মালের পাঁচ পৌন্ড গিয়ে রইবে হাতে সুটকেসটা। সুকুমার রায়ের কাক যেরকম হিসেব করতো 'সাত দুগুণে চৌদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল।'

অবশ্য জামা-কাপড় পরে নিলুম একগাদা— একপ্রস্ত না। কর্তারাও উপদেশ পাঠিয়েছিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে গরম জামা-কাপড় না পরা থাকলে উপরে গিয়ে শীতে কষ্ট পাব এবং মৌলানার বউয়ের পা খড় দিয়ে কীরকম পেঁচিয়ে বিলিতি সিরকার বোতল বানানো হয়েছিল, আবদুর রহমানের সে বর্ণনাও মনে ছিল।

মৌলানা তাঁর এক পাঞ্জাবি বন্ধুর সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আবদুর রহমান বসবার ঘরে প্রাণভরে আগুন জ্বালিয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসে। আবদুর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, তোমার ওপর অনেকবার খামকা রাগ করেছি, মাফ করে দিয়ো।'

আবদুর রহমান আমার দু হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের উপর চেপে ধরল। ভেজা।

আমি বললুম, 'ছিঃ আবদুর রহমান, এ কী করছ? আর শোনো, যা রইল সবকিছু তোমার।'

আমি জানি আমার পাঠকমাত্রই অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন, কিন্তু তবু আমি জোর করে বলব, আবদুর রহমান আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম লেখা রয়েছে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং?

রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটুলি হাতে আবদুর রহমান।

www.pathagar.com

দু একবার তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

প্রথমেই ডানদিকে পড়ল রুশ রাজদূতাবাস। দেমিদফ পরিবারকে কখনও ভুলব না। বলশফের আত্মাকে নমস্কার জানালুম।

তার পর কাবুল নদী পেরিয়ে লব-ই-দরিয়া হয়ে আর্কের দিকে চললুম। বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ— তবু দূর থেকেই দেখতে পেলুম পাঞ্জাবির দোকান খোলা। দোকানদার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। জিগ্যেস করলুম, 'দেশে যাবেন না?' মাথা নাড়িয়ে নীরবে জানাল 'না'। তার পর বিদায়ের সালাম জানিয়ে মাথা নিচু করে দোকানের ভিতরে চলে গেল। আমি জানতুম, কারবার ফেলে এদের কাবুল ছাড়ার উপায় নেই, সবকিছু তৎক্ষণাৎ লুট হয়ে যাবে। অথচ এর চিত্ত এমনি বিকল হয়ে গিয়েছে যে, শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে দুটি কথা বলবার মতো জোর এর আর নেই।

বিশ কদম পরে বাঁ-দিকে দোস্ত মুহম্মদের বাসা। অবস্থা দেখে বুঝতে বেগ পেতে হল না যে, বাসা লুট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর কণামাত্র শোক হওয়ার কথা নয়। এ-বাবতে তিনি সোক্রাতেসের ন্যায়— সোক্রাতেস যেমন তত্ত্বচিন্তায় বুঁদ হয়ে অন্য কোনও বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করতেন না, দোস্ত মুহম্মদ ঠিক তেমনি রসের সন্ধানে, অদ্ভুতের খোঁজে গ্রোটেস্কের (উদ্ভটের) পিছনে এমনি লেগে থাকতেন যে, অন্য কোনও বস্তুর অভাব তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারত না। পতঞ্জলিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। চিত্তবৃত্তিনিরোধের পন্থা বাতলাতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর, এবং বীতরাগ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বশেষে বলেছেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা', 'যা খুশি তাই দিয়ে চিত্তচাঞ্চল্য ঠেকাবে।' অর্থাৎ ধ্যানটাই মুখ্য, ধ্যানের বিষয়বস্তু গৌণ। দোস্ত মুহম্মদের সাধনা রসের সাধনা।

আরও খানিকটে এগিয়ে বাঁ-দিকে মেয়েদের ইস্কুল। বাচ্চার আক্রমণের কয়েকদিন পূর্বে এখানে কর্নেলের বউ তাঁর স্বামীর কথা ভেবে ডুকরে কেঁদেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কি না কে জানে। আমার পাশের বাড়ির কর্নেলের মায়ের কান্না— ইস্কুলের কর্নেল বউয়ের কান্না আরও কত কান্না মিশে গিয়ে অহরহ খুদাতালার তখ্‌তের দিকে চলেছে। কিন্তু কেন? কবি বলেছেন :

For men must work
And women must weep

অর্থাৎ কোনও তর্ক নেই, যুক্তি নেই, ন্যায়-অন্যায় নেই, মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আকাট মূর্খতার জন্য চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, এ বেদনাটা প্রকাশও করে আসছে পুরুষই কবিরূপে। শুনেছি পাঁচ হাজার বৎসরের পুরনো বাবিলনের প্রস্তরগাত্রে কবিতা পাওয়া গিয়েছে— কবি মা-জননীদের চোখের জলের উল্লেখ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইস্কুলের পরেই একখানা ছোট বসতবাড়ি। আমানউল্লার বোনের বিয়ের সময় লক্ষ্ণৌ থেকে যেসব গানেওয়ালি-নাচনেওয়ালিদের আনানো হয়েছিল তারা উঠেছিল এই বাড়িতে। তাদের তত্ত্বতাবাস করার জন্য আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে সেই অনাত্মীয় নির্বাসনে তারা কী খুশিটাই না হয়েছিল। জানত, কাবুলে পান পাওয়া যায় না— আর পান না হলে মজলিস জমবে কী করে, ঠুংরি হয়ে যাবে ভজন—

www.pathagar.com

তাই তারা সঙ্গে এনেছিল বাস বোঝাই পান। আমাদের সেই পান দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে, দরাজ-দিলে। লক্ষ্ণৌয়ের পান, কাশীর জর্দা, সেদ্ধ-ছাঁকা খয়ের তিনে মিলে আমার মুখের জড়তা এমনি কেটে দিয়েছিল যে, আমি তখন উর্দু ছেড়েছিলুম একদম লখ্‌নওয়ি কায়দায়— বিস্তর 'মেহেরবানি' 'গরিব-পরওরি', 'বন্দা-নওয়াজি'র প্রপঞ্চ-ফোঁড়ন দিয়ে।

কাবুলের নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নেই। ইরানের ঐতিহ্যও কাবুল স্বীকার করে না। যে দেড় জন কলাবত আছেন তাঁরা গান শিখেছেন যুক্তপ্রদেশে। বাঈজিদের মজলিশে তাই 'সম' দেনেওয়ালার অভাব হতে পারে এই ভয়ে গানের মজলিশে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতীয়দের সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছিল। আমরা সামনে বসে বিস্তর মাথা নেড়েছিলুম আর ঘন ঘন 'শাবাশ' 'শাবাশ' চিৎকারে মজলিশ গরম করে তুলেছিলুম।

বাড়ি ফিরে আহারাদির পর যখন শেষ পানটা পকেট থেকে বের করে খেয়ে জানালা দিয়ে পিক ফেললুম তখন আবদুর রহমান ভয়ে ভিরমি যায় আর কী। কাবুলে পানের পিক অজানা কিন্তু যক্ষ্মা অজানা বস্তু নয়।

তার পরই শিক্ষামন্ত্রীর দফতর। একসেলেন্সি ফয়েজ মুহম্মদ খানকে দোস্ত মুহম্মদ দু চোখে দেখতে পারতেন না। আমার কিন্তু মন্দ লাগত না। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং বড়ই নিরীহ প্রকৃতির লোক। আর পাঁচজনের তুলনায় তিনি লেখাপড়া কিছু কম জানতেন না, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী হতে হলে যতটা দরকার ততটা হয়তো তাঁর ঠিক ছিল না। বাচ্চা রাজা হয়ে আর তাবৎ মন্ত্রীদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে গুপ্তধন বের করেছে, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীকে নাকি, 'তুই যা, তুই তো কখনও ঘুষ খাসনি' বলে নিষ্কৃতি দিয়েছিল। অথচ শিক্ষা বিভাগে টু পাইস কামাবার যে উপায় ছিল তা নয়। কাবুলে নাকি ঢেউ গোনার কাজ পেলেও— অবশ্য সে-কাজ সরকারি হওয়া চাই— দু পয়সা মারা যায়।

লোকটিকে আমার ভালো লাগত নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে। এই বেলা সেটা বলে ফেলি, হাওয়াই জাহাজ কারও জন্য দাঁড়ায় না, উড়তে পারলেই বাঁচে।

চাকরিতে উন্নতি করে মানুষ হয় বুদ্ধির জোরে, নয় ভগবানের কৃপায়। বুদ্ধিমানকে ভগবানও যদি সাহায্য করেন তবে বোকাদের আর পৃথিবীতে বাঁচতে হত না। আমার প্রতি ভগবান সদয় ছিলেন বলেই বোধ করি শিক্ষামন্ত্রী প্রথমদিন থেকেই আমার দিকে নেকনজরে তাকিয়েছিলেন। তার পর এক বৎসর যেতে না যেতে অহেতুক একধাক্কায় মাইনে একশো টাকা বাড়িয়ে সব ভারতীয় শিক্ষকদের উপরে চড়িয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবি শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রি বিশ্বভারতীয়, এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড্ য়ুনিভার্সিটি নয়।'

খাঁটি কথা। সদাশয় ভারতীয় সরকারের নেকনজরে আমার ডিগ্রি এখনও ব্রাত্য। আপনারা কেউ আমাকে চাকরি দিলে বিপদগ্রস্ত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছিলেন— আমি বয়ানটা শুনেছি অন্য লোকের কাছ থেকে— সে-কথা তাঁর অজানা নয়।

পাঞ্জাবিদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনার সনদ সার্টিফিকেটে রয়েছে পাঞ্জাব গবর্নরের দস্তখত। আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গবর্নরের

www.pathagar.com

অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্যদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন (চশ্‌ম্ রওশন্ করদে অন্দ্)— ।'

ভদ্রলোকের ভারি শখ ছিল গুরুদেবকে কাবুলে নিমন্ত্রণ করার। তাঁর শুধু ভয় ছিল যে, দু শ মাইলের মোটর-ঝাঁকুনি খেয়ে কবি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে বাধা পড়ে তবে তাতে করে ক্ষতি হবে সমস্ত পৃথিবীর। কাবুল কবিকে দেখতে চায়, কিন্তু এমন দুর্ঘটনার নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে কেন? আমি সাহস দিয়ে বললুম, 'কবি ছ-ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু, তাঁর দেহ সুগঠিত এবং হাড়ও মজবুত।'

শেষটায় তিনি আল্লা বলে ঝুলে পড়েছিলেন কিন্তু আমানউল্লা বিলেত যাওয়ায় সে গ্রীষ্মে কবিকে আর নিমন্ত্রণ করা গেল না। শীতে বাচ্চা এসে উপস্থিত।

যাক্‌গে এসব কথা।

বাঁ-দিকে মুইন-উস্-সুলতানের বাড়ি, খানিকটে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেনিস কোর্ট। আজ মুইন-উস্-সুলতানে ভাগ্যের হাতে টেনিস বল। কান্দাহার-কাবুল তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

এই তো মকতব-ই-হবিবিয়া। বাচ্চা আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় মকতবটা দখল করে টেবিল চেয়ার বই ম্যাপ পুড়িয়ে ফেলেছিল। এ শিক্ষায়তন আবার কখন খুলবে কে জানে? এখানেই আমি পড়িয়েছি। শীতে পুকুর জমে গেছল, ছেলেদের সঙ্গে তার উপর স্কেটিং করেছি। গাছতলায় বসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আঙুর কিনে খেয়েছি। মীর আসলমের কাছ থেকে কত তত্ত্বকথা শুনেছি।

রাহুকবলিত কাবুল ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। মকতব-ই-হবিবিয়ার বন্ধদ্বার যেন সমস্ত আফগানিস্তানের প্রতীক। শিক্ষাদীক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা, সভ্যতা সংস্কৃতি বর্জন করে আফগানিস্তান তার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলুম। হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি আর বেশি দূর নয়। পিছন ফিরে আরেকবার কাবুলের দিকে তাকালুম। এই নিরস নিরানন্দ বিপদসঙ্কুল পুরী ত্যাগ করতে কোনও সুস্থ মানুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, কিন্তু বোধহয় এইসব কারণেই যে যে লোকের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মেছিল তাঁদের প্রত্যেককে অসাধারণ আত্মজন বলে মনে হতে লাগল। এঁদের প্রত্যেকেই আমার হৃদয় এতটা দখল করে বসে আছেন যে, এঁদের সকলকে একসঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হল আমার সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। ফরাসিতে বলে 'পার্তির সে তাঁ প্য মুরির' প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের বুঁচকিগুলো সাড়ম্বরে ওজন করা হল। কারও পোঁটলা দশ পৌন্ডের বেশি হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। অনেক ভেবেচিন্তে যে কয়টি সামান্য জিনিস নিয়ে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে ফের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা দাঁড়িয়ে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

ডোম যে কানা হয় তার শেষ প্রমাণও বিমানঘাঁটিতে পেলুম। এইটুকু ওজনের ভিতর আবার এক গুণী একখানা আয়না এনেছেন! লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, কই তেমন কিছু খাপসুরত অ্যাপলো তো নন। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ নাকি ছুটে বেরোবার সময় ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, একথা তা হলে মিথ্যা নয়।

www.pathagar.com

ওরে আবদুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পৌন্ডের পুঁটুলিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ-হাতে আমার টেনিস র‍্যাকেটখানা কেন? আবদুর রহমান কী একটা বিড়বিড় করল। বুঝলুম, সে ওই র‍্যাকেটখানাকেই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ, ও জিনিসটা আমি তাকে কখনও ছুঁতে দিতুম না। আবদুর রহমান আমাদের দেশের ড্রাইভারদের মতো। তার বিশ্বাস স্ক্রু মাত্রই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা যেন আর কখনও খোলা না যায়। 'অপটিমাম' শব্দটা আমি আবদুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হুকুম দিয়েছিলুম, র‍্যাকেটটা প্রেসে বাঁধা দূরে থাক, সে যেন ওটার ছায়াও না মাড়ায়।

আবদুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্তানে যাবে।

দেখি স্যার ফ্রান্সিস। নিতান্ত সামনে, বয়সে বড়, তাই একটা ছোটাসে ছোট নড্ করলুম। সায়েব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং, আই উইশ এ গুড জর্নি।'

আমি ধন্যবাদ জানালাম।

সায়েব বললেন, 'ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে আশা করি, ভারতবর্ষে সেকথাটি আপনি বলবেন।'

আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয়ই সবকথা বলব।'

সায়েব ভোঁতা, না ঘড়েল ডিপ্লোমেট, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্তানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে 'ব্ অমানে খুদা'— 'তোমাকে খোদার আমানতে রাখলুম', যে যাচ্ছে না সে বলে 'ব্ খুদা সপুর্দমত'— 'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলুম।'

আবদুর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললুম, 'ব্ আমানে খুদা, আবদুর রহমান', আবদুর রহমান মন্ত্রোচ্চারণের মতো একটানা বলে যেতে লাগল। 'ব্ খুদা সপুর্দমত, সায়েব, ব্ খুদা সপুর্দমত, সায়েব।'

হঠাৎ শুনি স্যার ফ্রান্সিস বলছেন, 'এ দুর্দিনে যে টেনিস র‍্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্পোর্টসম্যান।'

লিগেশনের এক কর্মচারী বললেন, 'ওটা দশ পৌন্ডের বাইরে পড়েছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

সাহেব বললেন, 'ওটা প্লেনে তুলে দাও।'

ওই একটা গুণ না থাকলে ইংরেজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবদুর রহমান এবার চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্ খুদা সপুর্দমত, সায়েব, ব্ খুদা সপুর্দমত।' প্রপেলার ভীষণ শব্দ করছে।

আবদুর রহমানের তারস্বরে চিৎকার প্লেনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি। হাওয়াই জাহাজ জিনিসটাকে আবদুর রহমান বড্ড ডরায়। তাই খোদাতালার কাছে সে বার বার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।

প্লেন চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলুম, 'সপুর্দমত'। আফগানিস্তানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবদুর রহমান; শেষ দিনে সেই আবদুর রহমান আমায় বিদায় দিল।

www.pathagar.com

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শ্মশান বলি তবে আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল। স্বয়ং চাণক্য যে কটা পরীক্ষা উল্লেখ করে আপন নির্ঘণ্ট শেষ করেছেন আবদুর রহমান সবকটাই উত্তীর্ণ হল। তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব?

বন্ধু আবদুর রহমান, জগদ্বন্ধু তোমার কল্যাণ করুন।

মৌলানা বললেন, 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও' বলে আপন সিটটা আমায় ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর অ্যারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের গাপড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।

পরিশিষ্ট

আমানউল্লা হৃতসিংহাসন উদ্ধার না করতে পেরে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতালির রাজা তাঁকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দেন। মুইন-উস্-সুলতানে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমানউল্লার হয়ে যে সেনাপতি ইংরেজের সঙ্গে আফগান স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন তাঁর নাম নাদির শাহ। তিনি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে ছিলেন। পরে পেশাওয়ার এসে সেখানকার ভারতীয় বণিকদের অর্থ সাহায্য এবং আপন শৌর্যবীর্য দ্বারা কাবুল দখল করে বাদশাহ হন। বাচ্চাকে সঙ্গিন দিয়ে মারা হয়— পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এসব আমি খবরের কাগজে পড়েছি।

দেশে এসে জানতে পেলুম, আমার আত্মীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মরহুম মৌলবি আবদুল মতিন চৌধুরীর উষ্মা দর্শনে ভারত-সরকার স্যার ফ্রান্সিসকে আদেশ (বা অনুরোধ) করেন আমাকে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য।

আমি কাবুল ছাড়ার কয়েকদিন পরেই ব্রিটিশ লিগেশন বহু অসহায় ভারতীয়কে কাবুলে ফেলে ভারতবর্ষে চলে আসেন।

এই 'বীরত্বের' জন্য স্যার ফ্রান্সিস অল্পদিন পরেই খেতাব ও প্রমোশন পেয়ে ইরাকে বদলি হন!

মৌলানা জিয়াউদ্দিন ভারতবর্ষে ফিরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন (ফারসিতে লেখা ব্রজভাষার একখানা প্রাচীন ব্যাকরণ প্রকাশ তার অন্যতম)। এবং গুরুদেবের অনেক কবিতা উত্তম ফারসিতে অনুবাদ করেন।

www.pathagar.com

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি অল্পবয়সে মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যু উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বলেন তার অনুলিপি 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র রচনাবলির চতুর্বিংশ খণ্ডে অনুলিপিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গুরুদেব রচিত 'মৌলানা জিয়াউদ্দিন' কবিতাটি এখানে বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে ছাপানোটা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম—

মৌলানা জিয়াউদ্দিন

কখনও কখনও কোনও অবসরে
        নিকটে দাঁড়াতে এসে;
'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে
        'বোসো' বলিতাম হেসে।
দু চারটে হত সামান্য কথা
        ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
        হাসিতামাশার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়
        অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
        আজিকে সে-কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
        সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
        খুঁজে নাহি পাই ভাষা।
তব জীবনের বহু সাধনার
        যে পণ্য-ভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
        তোমার নবীন তরী,
যেমনি তা হোক মনে জানি তার
        এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
        আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বারবার আজ
        লাগে ধিক্‌কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
        নাই কি গো কোনও খানে।

www.pathagar.com

এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারও কবিত্ব, কারও বীরত্ব,
কারও অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়,
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের সে মালতীগুলি
আনন্দ মহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভ নিঃশ্বাসে।

(নবজাত)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সত্যপীরের কলমে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লাক্ষাদ্বীপ

বহু বৎসর পূর্বে আমি মাদ্রাজ শহরে এক বন্ধুর বাড়িতে বাস করতুম। তখন চিনি বড্ড রেশনড্ ছিল। যে-ঘরের বারান্দায় বসেছিলুম সেখানে বন্ধুপত্নী কাগজে মোড়া চিনি একটা বোয়ামে রেখে কাগজটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। সেই কাগজের টুকরোটা হাওয়ায় ভেসে ভেসে এসে আমার পায়ের কাছে ঠেকল। আমার চোখ গেল যে, কাগজটাতে আরবি হরফে কী যেন লেখা। আশ্চর্য। এই মাদ্রাজ শহরে চিনির দোকানে আরবি কাগজ এল কোথা থেকে? কৌতূহল হল। কাগজটি তুলে ধরে পড়বার চেষ্টা দিলুম। তখন দেখি আরবি হরফে যেসব ভাষা লেখা হয় এটা তার কোনওটাই নয়, আরবি নয়, ফারসি নয়, উর্দু নয়, সিন্ধি নয় (সিন্ধি আরবি হরফে লেখা হয়), কিছুই নয়। তুর্কি ভাষা আমি জানি না। কিন্তু তুর্কি ভাষা এই মাদ্রাজে এসে পৌঁছবে কী প্রকারে? একটি পাতার তো ব্যাপার; ধৈর্য সহকারে পড়ে যেতে লাগলাম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ শব্দটি দেখি "মুদরায়ে" অর্থাৎ মদুরা। তা হলে ইটি ভারতীয় ভাষা। তখন ছিন্ন পত্রখানা ফের সযত্নে পড়ে দেখি, খাস আরবি শব্দের সঙ্গে মিশে আছে মালায়লাম ও তামিল শব্দও। হঠাৎ মাথায় খেলল, এটি তা হলে মপলাদের ভাষা। এরা আরব ও মালয়ালমের বর্ণসঙ্কর। পরের দিন বন্ধু যখন কর্মস্থলে গেলেন তখন ছিন্ন পত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে আমার অনুমানটি কনফার্ম করিয়ে নিলুম। এবং অনুসন্ধান করে আরও জানলুম, লাক্ষাদ্বীপকে নিয়ে যে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত সেগুলোর ভাষাও নাকি মোটামুটি ওই একই।

হালে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী এই দ্বীপপুঞ্জটির সফরে গিয়েছিলেন। আমি আশা করেছিলুম, এই সুবাদে আমাদের দেশের ওই অংশটি সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানতে পাব। তা জেনেছি নিশ্চয়— এঁদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সাংবাদিক সবিস্তর বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু আমার কৌতূহল ছিল এঁদের প্রাচীন ইতিহাস জানবার। সে-বাবদে "যে তিমিরে সে তিমিরেই" রয়ে গেলুম।

প্রথম প্রশ্ন লাক্ষাদ্বীপ কথাটার অর্থ কী? ইংরেজিতে বানান করা হয় Laccadive এবং এর শেষাংশ "দীব" যে দ্বীপ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আরবি ভাষায় "প" অক্ষরটি নেই বলে সে স্থলে "ব" বা "ওয়া" (অর্থাৎ ইংরেজি V অক্ষর) ব্যবহৃত হয় : তাই "দীব" বা "দীও" নিশ্চয়ই দ্বীপ। কিন্তু প্রশ্ন "লাক্ষা" শব্দের অর্থ কী? পণ্ডিতেরা বলেন, ওটা সংস্কৃত লক্ষ (১,০০,০০০) থেকে এসেছে। অথচ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা মাত্র চোদ্দটি। এমনকি এই দ্বীপপুঞ্জের সংলগ্ন, মাত্র আশি মাইল দূরে অবস্থিত মালদ্বীপের (এ-এলাকা ভারতের অংশ নয়।)

www.pathagar.com

চতুর্দিকে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে তার সংখ্যাও তিন শো (এর মধ্যে মাত্র সতেরোটিতে লোকাবাস আছে এবং এদের ভাষা আরবি মিশ্রিত সিংহলি)। এই তিনশো এবং লাক্ষাদ্বীপে চৌদ্দটি (বসতি আছে সাকুল্যে তা হলে বাইশটি দ্বীপে) নিলেও তাকে লক্ষ সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে হলে এদেরকে হাজার হাজার ডবল প্রমোশন দিতে হয়। তবে কি না, কি হিন্দু পুরাণকার কি মুসলমান পর্যটক ঐতিহাসিক গণনা করার (শুমার করার) সময় বেশ-কিছুটা কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিয়ে ১০০ বা ১০০০-র পিছনে গোটা তিনেক শূন্য বসিয়ে দিতে কার্পণ্য করতেন না। এরই একটি উদাহরণ পাওয়া যায় বাঙলা দেশের কেচ্ছাসাহিত্যে : "লোক মরে লক্ষ লক্ষ, কাতারে কাতার।/ শুমার করিয়া দেখি আড়াই হাজার।" তবু এ কবিটির কিঞ্চিৎ বিবেক-বুদ্ধি ছিল। উৎসাহের তোড়ে প্রথম ছত্রে "লক্ষ লক্ষ" বলে শেষটায় মাথা ঠাণ্ডা করে বললেন, "না, পরে গুনে দেখি, আড়াই হাজার।" অতএব আড়াই হাজার যদি লক্ষ লক্ষ হতে পারে তবে তিনশো দ্বীপকে মাত্র এক লক্ষে পরিণত করতে আর তেমন কি "ভয়াঙ্কর অসুবিস্তে"! তদুপরি মূল পাণ্ডুলিপির কপি করার সময় নকলনবিসরা শূন্য সংখ্যা বাড়াতে ছিলেন বড়ই উদারচিত্ত।

এতসব "যুক্তি" থাকা সত্ত্বেও আমি অতিশয় সভয়ে একটি নিতান্ত এমেচারি (ফোক ইটিমলজি) শব্দতাত্ত্বিক "গবেষণা" পেশ করি।

লাক্ষা শব্দের অর্থ গালা। "পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় পুঞ্জীভূত কীট-বিশেষের দেহজ রস হইতে ইহা উৎপন্ন হয়" (হরিচরণ)। এর রঙ লাল। হিন্দিতে এর নাম লাক এবং ইংরেজি ল্যাক এর থেকে এসেছে।... লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ নির্মিত হয়েছে এক প্রকারের কীটের রস থেকে। এর নাম প্রবাল এবং এর রঙ লাল গোলাপি, সাদা ইত্যাদি হয়। কিন্তু প্রবাল বলতে সংস্কৃতে সর্বপ্রথম অর্থ : অঙ্কুর, কিসলয়, নবপল্লব— অতএব বৃক্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

তাই আমার মনে সন্দেহ জাগে সেই প্রাচীন যুগে যখন লাক্ষাদ্বীপের নামকরণ হয় (এবং আর্যরা ওই প্রথম প্রবালদ্বীপ, কোরাল্ আইল্যান্ড-এর সংস্পর্শে আসেন) তখন তাঁরা হয়তো "লক্ষ" সংখ্যার কথা ভাবেননি, তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন লাক্ষার সঙ্গে এর জন্মগত, বর্ণগত, রসাগত রূপ দেখে।

সিন্ধুপারে

লাক্ষা দ্বীপ নিয়ে বড্ড বেশি তুলকালাম করার কোনওই প্রয়োজন থাকত না, যদি না তার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত থাকত।

প্রথম প্রশ্ন : পশ্চিমদিকে ভারতীয়রা কতখানি রাজত্ব বিস্তার করেছিল? কোন কোন জায়গায় তারা কলোনি নির্মাণ করেছিল?

আমার সীমাবদ্ধ ইতিহাস ভূগোল জ্ঞান বলে, পশ্চিম দিকে, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী থেকে প্রায় দু হাজার মাইল দূরে, আদন বন্দরের প্রায় ছ শো মাইল পুব দিকে সোকোত্রা দ্বীপে। ম্যাপ খুললেই দেখা যায়, এ-দ্বীপ যার অধিকারে থাকে সে তাবৎ লোহিত সাগর, আরব সমুদ্র এবং পার্শিয়ান গালফের ওপরও আধিপত্য করতে পারে।

www.pathagar.com

এই সোকোত্রা দ্বীপের গ্রিক নাম 'দিয়োস্‌করিদেস্‌' এবং পণ্ডিতেরা বলেন এ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত "দ্বীপ-সুখাধার" থেকে। মনে হয়, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত থেকে নৌকোয় বেরিয়ে, দু হাজার মাইল ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যে কোনও জায়গায় পৌঁছলেই মানুষ সেটাকে 'সুখাধার' বলবেই বলবে। কিন্তু এ-দ্বীপের পরিষ্কার ইতিহাস জানবার তো উপায় নেই। প্রাচীন গ্রিক ভৌগোলিকেরা বলছেন, এ দ্বীপে বাস করত ভারতীয়, গ্রিক ও আরব বণিকরা। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকরা বলছেন, এটা তখন ভারতীয় বম্বেটেদের থানা। তারা তখন আরব ব্যবসায়ী জাহাজ লুটপাট করত।

মনে বড় আনন্দ হল। এদানির 'অহিংসা' 'অহিংসা' শুনে শুনে প্রাণ অতিষ্ঠ। আমরাও যে একদা বম্বেটে ছিলুম সেটা শুনে চিত্তে পুলক জাগল। বম্বেটেগিরি হয়তো পুণ্যপন্থা নয়, কিন্তু এ-কথা তো সত্য যেদিন থেকে আমরা সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করে দিলুম সেইদিন থেকেই ভারতের দুঃখ দৈন্য, অভাব দারিদ্র্য আরম্ভ হল।

সোকোত্রা দ্বীপকে মিশরিরা নাম দিয়েছিল 'সুগন্ধের সারিভূমি'— অর্থাৎ সারি কেটে কেটে যেখানে সুগন্ধ দ্রব্যের চাষ হয়। এবং এখন সেখানে ঘৃতকুমারী (মুসব্বর), মস্তকি (Myrrh), গুগ্‌গুল এবং আরও কী একটা উৎপাদিত হয়। মামি তৈরি করার জন্য মিশরীয়দের অনেক-কিছুর প্রয়োজন হত। এবং খুশবাইয়ের প্রতি ওদের এখনও খুবই শখ। খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছর আগে রচিত রাজা 'সুলেমানের গীতে' বিস্তর সুগন্ধের উল্লেখ আছে। এদের অধিকাংশই যেত ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সোকোত্রা থেকে। এবং এই সোকোত্রাই ছিল ভারত ও আরব বণিকদের পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের মিলনভূমি। আরবদের মারফতে সেসব গন্ধদ্রব্য বিলেত পর্যন্ত পৌঁছত। তাই শেকসপিয়র ভেবেছিলেন এসব গন্ধদ্রব্য বুঝি আরব দেশেই জন্মায়— লেডি মেকবেথ বলছেন, "অল দি পারফিউমজ অব আরাবিয়া উইল নট সুইটেন দিস লিটিল হ্যান্ড"। এই গন্ধের ব্যবসা তখন খুবই লাভজনক ছিল। এবং কাঠিয়াওয়াড়ের গন্ধবণিকরা এর একটা বড় হিস্যা পেতেন। মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে এই সুবাদে স্মরণ যেতে পারে যে তিনি জাতে গন্ধবণিক— সেই 'গন্ধ' থেকে তাঁর পরিবারের নাম গাঁধী।

ভারতীয় বণিকরা লাক্ষাদ্বীপ বা মালদ্বীপ থেকে তাদের শেষ রসদ— এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস জল— নিয়ে এখান থেকে পাগের নৌকায় করে দু হাজার মাইলের পাড়ি দিতেন।

* * *

সচরাচর বলা হয়, আরব নাবিকরাই প্রথম মৌসুমি বায়ু আবিষ্কার করে। আমি কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার ধারণা, ভারতীয়রাই প্রথম লক্ষ করে যে শীতকালে বাতাস পশ্চিমবাগে বয়। তারই সুবিধে নিয়ে পাল তুলে দিয়ে পণ্যসম্ভার নিয়ে তারা যেত সোকোত্রা। ফিরে আসত গ্রীষ্মারম্ভে— যখন সোকোত্রা থেকে পুব বাগে বাতাস বয়। ভারতীয় নাবিক যদি কোস্টাল সেলিংই (পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে) করবে তবে তো তারা সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্তান, ইরানের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে দক্ষিণ আরবিস্তানে পৌঁছে যেত। অর্থাৎ আদন বন্দরের কাছাকাছি। সেখান থেকে আবার ছ শো মাইল পুব বাগে সোকোত্রা আসবে কেন?

তার পর কর্তারা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

সে-কথা আরেকদিন হবে।

www.pathagar.com

প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ

সঠিক বাঙলা অনুবাদ করা হল কি না তাই নিয়ে অনেকেরই মনে ন্যায্য সন্দেহ হতে পারে। ইংরেজিতে একে বলে 'অল্ ইনডিয়া অরিএনটাল কনফারেন্স'। আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল এর নাম 'অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস কনফারেন্স' দুটো নামই আমার কাছে কেমন যেন সামান্য বেখাপ্পা ঠেকে। 'অল্ ইনডিয়াই' যদি হবে তবে তার সঙ্গে 'অরিএনটাল' জোড়া যায় কী প্রকারে? পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নাম 'অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস'ও কেমন যেন মনে সাড়া জাগায় না। অরিএনটালিসট বলতে বোঝায়, অরিএনট সম্বন্ধে যিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু রূঢ়ার্থে বোঝায়, যেসব ইউরোপীয় পণ্ডিত অরিএনট নিয়ে চর্চা করেন। এই নিয়ে যখন আমি আমার এক দর্শনে সুপণ্ডিতা বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করছি তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কেমন যেন ঠিক মনে হয় না। মাকসম্যুলার অরিএনটালিসট আবার রাধাকৃষ্ণনও অরিএনটালিসট?' আমার মনে হল, তাঁর মনে ধোঁকা জেগেছে, দু জনার মাহাত্ম্য কি একই? রাধাকৃষ্ণন তাঁর আপন দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করছেন, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু ওই যে সাত সমুদ্রের ওপারের মাকসম্যুলার ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করলেন— এ দু জনাতে তো একটা পার্থক্য আছে। তুলনা দিয়ে বলি, আপনি ভারতীয়, তাই আপনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাতসমুদ্রের ওপারের পুণ্যশ্লোকা এ্যানি বেসানত, দীনবন্ধু এ্যানড্রুজ যখন এ-আন্দোলনে যোগ দিলেন, সে দুটো কি একই?

যদ্যপি জর্মন ভাষা কাঠখোট্টা তবু প্রাচী = অরিএনট এবং প্রতীচী = অকসিডেনট নিয়ে কথা বলতে গেলে ওরা ওই দু ভূখণ্ডের জন্য দুটি বড়ই সুন্দর নাম দেয়। এই প্রাচ্যভূমিকে বলে 'মরগেন লানট' = 'ভোরের দেশ' 'সূর্যোদয়ের দেশ'— জর্মন ভাষায় 'মরগেন' শব্দের অর্থ 'সকাল' 'ভোর'। তাই তারা সকালবেলা কারও সঙ্গে দেখা হলে বলে 'গুটেন মরগেন' = গুড মরনিং। পক্ষান্তরে তাদের নিজের দেশ তথা ইউরোপকে বলে 'আবেনট লানট' অর্থাৎ 'সূর্যাস্তের দেশ'। তাই বিকেলবেলা সন্ধেবেলা, এমনকি রাত্রেও দেখা হলে বলে 'গুটেন আবেনট'।

খুব সম্ভব এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি জর্মন পণ্ডিতদের একটা বিনয়নম্র ভাব-শ্রদ্ধা আছে। ইংরেজি-ফরাসি-ডাচদের সে শ্রদ্ধা নেই। কারণ তারা প্রাচ্যভূমি এশিয়াতে রাজত্ব করত। তাই এনারা যখন ইউরোপের কোনও 'অরিএনটালিসটস কনফারএনসে' যান তখন কেমন যেন মুরুব্বিয়ানা করেন। ভাবটা এই, তাঁরা যে ভারতের ব্যাপারে ইনটরেসট দেখাচ্ছেন সেটা যেন, অনেকটা মুনিব তার চাকরের বউবাচ্চার সম্বন্ধে পলাইট বাট ডিসটেনট খবর নিচ্ছেন (পাছে না দু টাকা খসাতে হয়)।

এই মুরুব্বিয়ানাটা আমাকে ঈষৎ পীড়িত করে। হপ্তা তিনেক পরে পূর্বে আমি বলেছিলাম আমি অত সহজে অপমানিত হই না। ইতোমধ্যে খান আবদুল গফফার বাদশাহ্ মিঞা বলেছেন, ভারত যে রাবাতে গিয়েছিল সেটা অনুচিত হয়নি। কিন্তু পত্রান্তরে জনৈক সম্পাদক অতিশয় ভদ্র ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'কিন্তু সকলেই এ মত পোষণ না-ও করতে পারেন' (নট এভরিবডি শেয়ারজ ইট) এবং এই *আনন্দবাজারেই* জনৈক পত্রলেখক আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি জানান। ধর্ম সাক্ষী করে বলছি, এঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনও

www.pathagar.com

ফরিয়াদ নেই। কে কোন আচরণে অপমানিত হবেন না হবেন সেটা তাঁর স্পর্শকাতরতার ওপর নির্ভর করে। এঁরা স্পর্শকাতর। কিন্তু আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া। মরক্কো লেদার তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ— লস্যি লস্যি।

মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

ইউরোপীয়রা বিশেষ করে ইংরেজ-ফরাসি-ডাচ যদি আমাদের প্রতি মেহেরবানি দেখায় তবে আমরাই-বা তাদের প্রতি মেহেরবানি দেখাব না কেন?

অতএব আমি প্রস্তাব করি এই ভারতবর্ষে যেন 'অকসিডেনটালিসট কনফারেন্স্' নির্মিত হয়। ইউরোপের ইংরেজ ফরাসি ডাচ অরিএনটালিসটরা যেরকম আমাদের সতীদাহ, বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা করেন, আমরা ওই কনফারেনসে সাহেবদের কল গার্ল, কিলার প্রফুমো ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু বিপদ এই : আমাদের ভারতীয় সভ্যতা যায় নিদেন খ্রি.পূ. দু হাজার বছর পূর্বে। ইউরোপীয়দের সভ্যতা মেরে কেটে ছ-শো বছর পূর্বে। যতই প্রাচীন সভ্যতা হয়, তত তাকেই আঘাত করা যায় বেশি। বুড়ো-ঠাকুরদাকে গাঁট্টা মারা খুবই সহজ।

এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য আমি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীরদ সি চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করি। ইউরোপীয় কাণ্ডকারখানা উনি বিলক্ষণ বিচক্ষণরূপে জানেন। তদুপরি তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে উত্তমরূপে সুপরিচিত। সেয়ানা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ শুধুমাত্র ইউরোপীয় গুণীজ্ঞানীরই উদ্ধৃতি দেন।

পুনরপি প্রাচ্য

না আর রসিকতা না। এবারে আমাকে সিরিয়স হতে হবে। স্বর্গত প্রমথ চৌধুরীও প্রতি বছরে এই শপথ নিতেন এবং সে-লিখিত শপথের কালি শুকোতে না-শুকোতেই সেটি পরমানন্দে ভঙ্গ করতেন। আমি সেই মহাজনপন্থাই অবলম্বন করছি।

প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে কী-সব সমস্যা কী-সব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার কিছু কিছু বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছে এবং কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের সম্পাদক মহাশয় সে সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত তথা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু যেসব বিষয়বস্তু কনফারেনসে আলোচিত হয়নি সে-সংবাদ জানব কী প্রকারে? তাই আমার মনে দুটি সমস্যা জেগেছে। এ-দুটি নতুন নয়। আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে আমি যাই তিরু অনন্তপুরমে বরদা সরকারের প্রতিভূরূপে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি। সেই থেকে।

প্রথম : এই যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়রা এশিয়াতে রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন— ইংরেজ ফরাসি অস্ট্রিয়ান ডাচ পর্তুগিজ ইত্যাদি ইত্যাদি— এদের মহাফেজখানাতে (আর্কাইভে) বিস্তর দলিলপত্র রয়েছে। এগুলোর সাহায্য বিনা ভারতের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু এসব দলিলদস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করে সেগুলোকে প্রকাশিত করাতে স্বভাবতই আজ এদের আর কোনও ইনটরেস্ট্ নেই। যতদূর

www.pathagar.com

মনে পড়ে, একমাত্র ডাচ সরকারই বছর কয়েক পূর্বে এ-কর্ম করার জন্য ভারতীয়দের আমন্ত্রণ জানান এবং দুটি ভালো স্কলারশিপ দিতে চান। এর ফল কী হয়েছে জানিনে। অতএব এসব ভিন্ন ভিন্ন দেশের মহাফেজখানার অমূল্য দলিলদস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করার দায়িত্ব আমাদেরই— ভারতীয়দের। ... এছাড়া এদের আরকাইভে আছে ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ ইত্যাদি। সেগুলোও মহামূল্যবান। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'— না কী যেন নাম— অনেকেই জানেন।

দ্বিতীয় : এবং এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। নমস্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা তো অগাধ গবেষণা করেছেন, যথা মহাভারত রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন, করছেন এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদির জন্যও ওই পদ্ধতিতে তৎপর। এ কর্মের প্রশংসা অজ্ঞ বিজ্ঞ তাবজ্জন করবেন। কিন্তু প্রশ্ন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে প্রতিদিন ভারতীয়দের ইনটরেস্ট্ কমে যাচ্ছে, সেটা ঠেকানো যায় কী প্রকারে? অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তম উত্তম ধন মূল সংস্কৃতে যত না হোক, অনুবাদ মারফত কোন পদ্ধতিতে সাধারণজনের সামনে আকর্ষণীয়রূপে দিতে পারি? এক কথায় সংস্কৃত, অর্ধমাগধী, পালি, প্রাকৃত, সান্ধ্য ইত্যাদিতে লিখিত প্রকৃত হীরাজওহর পপুলারাইজ করি কী প্রকারে? তারা যে কলচরড পার্‌ল প্ল্যাসটিক চায়। এবং এটা না করতে পারলে যে প্রাচ্যবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্বজ্জনের মহতী বিনষ্টি হবে সে-বিষয়ে অন্তত আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, তুলনা দিয়ে বলি; জনগণ যেন দেশ-গাছের শিকড়, বিদ্বজ্জন ফুল। শিকড় যদি শুকিয়ে যায় তবে ফুলের, ফলের তো কথাই নেই, মরণ অনিবার্য।... যেমন আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নাভিশ্বাসের সময়ে আমাদের চৈতন্য হল এবং আমরা এখন সেটিকে পপুলারাইজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছি।

ইউরোপীয়দের ওই একই সমস্যা। আমরা যেমন সংস্কৃতাদি একাধিক সাহিত্যের ওপর এতকাল নির্ভর করে এসেছি, তারা করে দুটি সাহিত্যের ওপর— গ্রিক এবং লাতিন। এবং চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এ-ভাষাগুলোর পড়ুয়া দিন দিন কমে যাচ্ছে। বিলেতের কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিক-লাতিন শেখার জন্য প্রতি বছর পাঁচটি এমনই দিলদরাজ বৃত্তি দেয় যে, যে কোনও বৃত্তিধারী সে-অর্থে হস্টেলের খাইখরচা দিয়ে উত্তম বেশাদি পুস্তকাদি ক্রয় করার পর একাংশ দরিদ্র পিতামাতাকে পাঠাতে পারে। তথাপি, কাগজে পড়েছি, বছর তিনেক পূর্বে সেই পাঁচটি বৃত্তির জন্য মাত্র তিনটি ছাত্র দরখাস্ত পাঠায়!! বছর পঞ্চাশেক পূর্বে আসত দুশো!!

এবং এহ বাহ্য। জনসাধারণও গ্রিক-লাতিন সাহিত্যের অমূল্য অমূল্য সম্পদও ইংরেজি ফরাসি জর্মন অনুবাদে— যথা যার দেশ— পড়তে চায় না। এই ইউরোপের বিদ্বজ্জন এসব সম্পদের নবীন নবীন অনুবাদ করেছেন— দেশোপযোগী কালোপযোগী করে। এমনকি বাইবেলেরও।

আমাদের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা এ-বিষয়ে কী করছেন?

আমার মনে হয় কবি কালিদাস বাঙালি। প্রমাণ? একমাত্র বাঙালিই যে-ডালে বসে আছে সেটা কাটে। কালিদাসও তাই করতেন। অতঃ কালিদাস বাঙালি। প্রাচ্যজ্ঞরা ডালটা কাটছেন না বটে কিন্তু ডালটা যে শিকড়োত্থিত রসাভাবে শুষ্ক হয়ে ভেঙে পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই।

www.pathagar.com

সিলেটি সাগা

১

অ ডুরা! কুনার সাব্‌রে আরক্ কট্‌রা ছালন দেও।

অতিশয় বিশুদ্ধ সিলেটি উচ্চারণে বাক্যটি উচ্চারিত হল। আমি অবশ্য তার জন্য প্রস্তুত ছিলুম। যদ্যপিদেশ : লন্ডনের টিলবারি ডক; কাল : ১৯৩১; পাত্র : রেস্তোরাঁর মালিক। সে আমলে খাঁটি বিলিতি হোটেল-রেস্তোরাঁতে যে অখাদ্য নির্মিত হত সেটা হটেনটটীয় পর্যায়ের। কথায় বলে, ওট নামক বস্তুটি স্কটল্যান্ডে খায় মানুষ, ইংলন্ডে খায় ঘোড়া। কিন্তু ওই আমলে লন্ডনের পোশাকি খানাও স্কটল্যান্ডের ঘোড়া পর্যন্ত খেতে রাজি হত না— এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি লন্ডনের 'লাঞ্চকে' বলতুম 'লাঞ্ছনা' আর সাপারকে বলতুম 'Suffer'!

রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসেছেন শুনে তাকে প্রণাম জানিয়ে যখন রাস্তায় নেমেছি তখন হঠাৎ এক সিলেটি দোস্তের সঙ্গে মোলাকাত। আলিঙ্গন কুশলাদির পর দোস্ত শুধাল, 'অত রোগা কেন?' 'একে দুর্দান্ত শীত, তদুপরি লন্ডনের গুষ্টির-পিণ্ডি-চটকানো রান্না।' সংক্ষেপে বলল, 'চল'। এতদিন পরে সব ঘটনা আর মনে নেই— তবে বাসে করে যে অনেকখানি পথ যেতে হয়েছিল সেটা স্পষ্ট মনে আছে। মোকামে পৌঁছে ভালো করে বেয়ারিং পাবার পূর্বেই দেখি, একটি ছোটখাটো রেস্তোরাঁর মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে এবং কানে গেল পূর্বোক্ত 'অ ডুরা— ইত্যাদি', যার অর্থ, "ও ডোরা, কোণের সাহেবকে আরেক বাটি ঝোল দাও।'

হালে কাগজে পড়লুম, বিলেতে যেসব পাক-ভারতের রেস্তোরাঁ আছে তার শতকরা ৮০ ভাগ সিলেটিরা চালায়। অবশ্য ওই চল্লিশ বছর পূর্বে বিলেতে অত ঝাঁকে ঝাঁকে পাক-ভারতীয় রেস্তোরাঁ ছিল না; তবে সে-রাত্রেই জানতে পাই, যে-কয়টি আছে পনেরো আনা সিলেটিদের। এমনকি লন্ডনের নামকরা হতচ্ছাড়া তালু-পোড়া দামের এক ভারতীয় রেস্তোরাঁর শেফ্‌ও সিলেটি।

ইতোমধ্যে দোস্ত শশাঙ্কমোহন 'অটলালার' (হোটেলওয়ালার) সঙ্গে বে-এক্কেয়ার গালগল্প জুড়ে দিয়েছেন— আহা, যেন বহু যুগের ওপার হতে লণ্ড লসট্ ভ্রাতৃদ্বয়ের পুনর্মিলন। শশাঙ্ক আমাকে অটলালার পাশের একটা টেবিলের কাছে বসবার ইঙ্গিত দিয়ে আবার তার ভ্যাচর ভ্যাচরে ফিরে গেল। একটা দরজা খুলে যেতে দেখি বেরিয়ে এল একটি প্রাপ্তবয়স্কা মেম। হাতের ট্রের উপর রাইস, কারি, ডাল, ভাজাভুজি। আমাদের দিকে নজর যেতেই মৃদুহাস্য করে গুড ইভনিং বলে বয়সের তুলনায় অতি স্মার্ট পদক্ষেপে গট-গট করে প্রথম অন্যান্য খদ্দেরদের রাইসকার্য্যাদি দিয়ে সর্বশেষে 'কোণের সাহেবের' টেবিলের উপর তার 'ছালনের কট্রা' রাখল। ইনিই তা হলে ডোরা।... জনা আষ্টেক খালাসি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সশব্দে, ছুরি-কাঁটার তোয়াক্কা না করে খেয়ে চলেছে। আরও দু জন গোরা একান্তে বসে ওই খাদ্যই রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে। ডোরা ফিরে আসতে অটলালা তার ক্যাশ ছেড়ে এল। আমরা চারজন এক টেবিলে বসলুম। অটলালা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমরা তো বেশি পদ রাঁধি না— আমাদের গাহক তো সবই খালাসি, দু একজন গোরা মাঝেমধ্যে। কিন্তু আপনারা অতদূর থেকে মেহেরবানি করে এসেছেন। ভালোমন্দ কিছু করতে হয়।" আমাদের আপত্তি

www.pathagar.com

না শুনে দুজনা রান্নাঘরে চলে গেল। শশাঙ্ক বলল, "আশ্চর্য, কুড়ি বছর হয়ে গেল এই আম্বরউল্লা এ-দেশে আছে, তবু একবর্ণ ইংরেজি শিখতে পারেনি। ওদিকে ওর বউ ডোরা দিব্যি সিলেটি বলতে পারে। খালাসি গোরা সব খদ্দের ও-ই সামলায়। তবে ওর ইংরেজি বোঝাটাও চাট্টিখানি কথা নয়। একদম খাস খানদানি কক্‌নি।" আমি শুধালুম, "বিয়েটা— মানে সিলেটি খালাসি আর লন্ডনি মেমেতে হল কী প্রকারে?" "কেন হবে না? তুমি কি ভেবেছ ডোরা কোনও অক্সফর্‌ড ডন-এর মেয়ে এবং কেমব্রিজের রেঙলার? আর হক্ কথাই যদি কই, তবে বলি, সামাজিক পদমর্যাদায় আম্বর মিয়া তাঁর মাদামের চেয়ে ঢের ঢের সরেস। মিয়া চাষির ছেলে আর ডোরা মুচির মেয়ে। অবশ্য ডোরার মতো লক্ষ্মী মেয়ে শতেকে গোটেক। আমাদের যে কী আদর করে, পরে দেখতে পাবে। আর—" এমন সময় আম্বর মিয়া সহাস্য আস্যে প্রত্যাবর্তন করে বলল, "আমাদের সুখদুঃখের কথাতে মাঝে মাঝে বাধা পড়বে, স্যর। ডোরাই খদ্দেরদের কাছ থেকে হিসেবের কড়ি তোলে। এখন রাঁধছে। ওটা আমাকে সামলাতে হবে।" আমি ভয় পেয়ে মনে মনে বললুম, মেমের হাতের রান্নায় আবার সেই 'লাঞ্ছনা' আবার সেই 'সাফার'! আমরা তো গাঁটের রোক্কা সিক্কা ঝেড়ে হেথায় পৌঁছলুম, আর ওই হতভাগ্য লন্ডনি লাঞ্ছনা-সাফার কোত্থেকে বাস-ভাড়া জোগাড় করে আমাদের পিছনে ধাওয়া করল? প্রকাশ্যে "রোস্টোমোস্টো রাঁধবে নাকি?"

হেসে বলল, "তা-ও কি কখনও হয়, স্যর। রাঁধবে খাঁটি সিলেটি রান্না।"

"শিখল কার কাছ থেকে?"

"আমার কাছ থেকে সামান্যই, কিন্তু আমার গাহক খালাসি-ভাইদের ভিতর প্রায়ই বাড়িয়া বাড়িয়া বাবুর্চি থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে সিলেটের পোশাকি খানা থেকে মামুলি ঝোল-ভাত সবকিছু শিখে নিয়েছে—"। এমন সময় কোণের গোরা রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে সামান্য গলা চড়িয়ে বলল, "ও মিসিস উল্লা আজকের কারিটাতে একদম ঝাল নেই। দুটো গ্রিন চিলি— সরি— সে তো এই গড ড্যাম দেশে নেই। তা হলে একটু টাবাস্কো চিলি সস্ দাও না।" বলে কী ব্যাটা! ডোরা যখন রাইস-কারি নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে-কারির কটকটে লাল রঙ দেখে আঁতকে উঠে আমার মতো খাস সিলট্যাও মনস্থির করেছিল ওই বস্তু কম মেকদারে খেতে হবে— চাটনির মতো, আ লা চাটনি। আর এ-গোরা হট, হট, ডবল হট মাদ্রাজি আচার দিয়ে তার ঝোলের ঝাল বাড়াল। ... একে একে, দুয়ে তিনে সব খদ্দের কড়ি গুনে চলে গেল। আমার চোখে একটুখানি ধাঁধার ভাব দেখে বলল, "ঠিক ধরেছেন, স্যর। সক্কলের জেবে কি আর রেস্ত থাকে? ইনশাল্লা, দিয়ে দেবে কোনও এক খেপে। আর নাই বা দিলে।"

আমরা খেয়েছিলুম, বেগুন-ভাজা, মুড়িঘণ্ট, মটরপোলাও, মাছ ভাজা, মুরগি কারি— বাকি মনে নেই। অসম্ভব সুন্দর রান্না। কিন্তু আর শুধোবেন না। আহারাদির আলোচনা আরম্ভ হলে আমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। রাতও তখন অনেক। মোকা পেয়ে শশাঙ্ককে কানে কানে বললুম, 'বিল?'

"চোক্কোরো। ও-কথা তুললে আম্বর-উল্লা ভ্যাক করে কেঁদে ফেলবে।"

শুধু কি তাই! বিদায় নেবার সময় ডোরা দোস্ত শশাঙ্কের হাতে তুলে দিল একটা বাস্কেট। পথে নেমে সেটাকে প্রিয়ার গণ্ডদেশে হাত বুলোবার মতো আদর করতে করতে বলল, "তিন দিনের দু বেলার আহারাদি হে দোস্তো দু জনার— তিনজনারও হতে পারে।"

www.pathagar.com

২

ঠিক কোন সময়ে হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করেন ঠিক বলা যায় না। তবে এর ফল যে বিষময় হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই চট্টগ্রাম এবং সিলেটের (সিলেট সমুদ্রতীরবর্তী নয়, কিন্তু সিলেটে বিরাট বিরাট হাওর থাকায় মাঝিরা অন্ধকারে তারা দেখে নৌকা চালাতে পারে— লিন্ডসে সাহেব গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে কম্পাসের সাহায্যে একাধিক হাওর পেরিয়ে চাল-ভর্তি মহাজনি নৌকা মাদ্রাজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন— এবং সি-সিকনেস তাদের হয় না) লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী মাঝিমাল্লা অন্নহীন হয়ে যায়। এর পর আরব বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে ব্যবসা করতে এলে এরা প্রধানত পেটের দায়ে মুসলমান হয়ে গোড়ার দিকে আরব জাহাজে খালাসির চাকরি নিয়ে পূর্বে ইন্দোনেশিয়া ও পশ্চিমে জেদ্দা, সুয়েজ বন্দর অবধি পাড়ি দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের সদাগর সম্প্রদায় আপন আপন পালের জাহাজ নির্মাণ করে বর্মা মালয়ের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে থাকে এবং এ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ইংরেজের কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

প্রধানত সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির মাঝিমাল্লা চাষাভূষোই গোড়ার দিকে ইউরোপীয় জাহাজে কাজ নেয় এবং এদের খালাসি বলা হত (এ স্থলেই উল্লেখ করি সংখ্যায় প্রায় আশি হাজারের মতো যেসব সিলেটি বর্তমানে ইংলন্ডে কলকারখানায় কাজ করে— শুনেছি সিলেটিদের তুলনায় পুব পাকের অন্যান্য জেলার লোকসংখ্যা নগণ্য— দেশের সিলেটবাসীরা এদের নাম দিয়েছেন 'লন্ডনি', যদিও এদের বড় আড্ডা বোধহয় নটিংহামে)। বহু বছর ধরে খালাসিরা ডাঙায় বাসা বেঁধে কলকারখানায় ঢোকেনি। কিন্তু বেশ-কিছু সংখ্যক সিলেটি কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানায় ঢুকে প্রচুর পয়সা কামিয়ে দেশে ফিরত— ওখানে চিরতরে বাসভূমি নির্মাণ করত না।

খালাসিবৃত্তি থেকে কবে কী করে এরা দক্ষিণ ও মধ্য ইংলন্ডের কলকারখানায় ঢুকে পড়ে 'লন্ডনি' খেতাব পায় তার কোনও লিখিত বিবরণ আমি পড়িনি। তবে আমার মনে হয়, ১৯২৯-৩৩-এর পূর্বে নয়, কারণ এ সময়ে ইউরোপ-আমেরিকার কারখানাকর্মীদের ভিতর প্রচুরতম বেকারি। এর পরে প্রধানত যুদ্ধের সময় বিস্তর সস্তা লেবারের প্রয়োজন হল। আজ যে আপনি-আমি লন্ডন-নটিংহামের যে কোনও দ্বিতীয় শ্রেণির ইংরেজি রেস্তোরাঁতেও 'পাটনা রাইস এবং কারি' পাচ্ছি তার গোড়াপত্তন হয় ওই সময় ('পাটনা রাইস' বলে বটে, কিন্তু সেটা দেরাদুন, বাসমতি সবকিছুই হতে পারে। বহু গবেষণা করে সন্ধান পেলুম কোম্পানির আমলে এ-দেশ থেকে যে-চাল বিলেত যেত সেটা প্রধানত সংগ্রহ করা হত পাটনার আড়তে যে-হরেক প্রদেশের চাল জড়ো হয়েছে তার থেকে; তাই এর অমনিবাস নাম হয়ে যায় 'পাটনা রাইস') সৈন্যদের এবং 'লন্ডনিদের' ক্ষুধা নিবারণের জন্য। আজ এদেশ থেকে প্রতিদিন মণ মণ চাল, ডাল, শুঁটকি, মসলা ইত্যাদি তো যাচ্ছেই, তার ওপর হাজার হাজার বোতল আম, নেবু, জলপাইয়ের আচার। গত বছর সিলেটে এক বিরাট আচার ফ্যাকটরি দেখে আমি স্তম্ভিত। পরে সে কারখানার অমায়িক মালিকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'যা তৈরি হয় তার প্রায় বেবাক মাল চলে যায় লন্ডনিদের খেদমতে। চাহিদাও বেড়ে চলেছে। আমি পেরে উঠছি না।' অবশ্য আমি জানতুম, মালদার ম্যাংগো স্লাইজ এবং মিষ্টি-টক (সুইট-সাওয়ার) আমের আচারের এক বৃহৎ অংশ লন্ডনিদের তরেই যায়। কারণ সিলেটের আম জঘন্য। তার

www.pathagar.com

থেকে ভালো আচার হয় না— স্লাইস মাথায় থাকুন। অবশ্য সিলেট থেকে সর্বোৎকৃষ্ট আনারস-স্লাইস বিলেত যায়। মার্কিন হাইনৎস ফিফটি সেভনের (বা অন্য সংখ্যাও হতে পারে) মতো সিলেটি আচার কারখানা ৪৭ রকমের আচার, স্লাইস ইত্যাদি তৈরি করে। বুঝুন, যে সিলেটি দেশে ভাত, লাল লঙ্কা পেষা, আর কিস্মৎ নিতান্তই মেহেরবান হলে একটি কাঁচা প্যাঁজ খেত— তা-ও দুবেলা নয় এবং সে-ও পেট ভরে নয়— সে কি না আজ সিলেটের জমিদার-ছেলেরও যা জোটে না বিলেতে বসে তাই খায়। এস্তেক পান-তক। পান যায় প্লেনে। তাই নাকি একটা খিলির দাম সিক্স্ পেন্স্ থেকে এক শিলিং!

সিলেটিরা বিলেতে চাকরি পায় কেন? কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন, সাদা আর কালো মজুরে সেখানে নিত্য লড়াই। আমি এ-বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত-তাবাশ করিনি। যা শুনেছি, তাই বলছি : (১) কালোরা— বিশেষ করে সিলেটিরা— কম মাইনেতে কাজ করতে রাজি; নিগ্রোরা মদ খায়, জুয়া খেলে বলে তাদের খাঁই বেশি। (২) দুই শিফটে এবং রবিবারেও কাজ করতে রাজি— নিগ্রোরা খ্রিস্টান, রবিবারে সাবাৎ মানে। (৩) ইউনিয়ন এড়িয়ে চলে, স্ট্রাইক করতে চায় না। (৪) রাতভর মদ খেয়ে পরের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে না বলে কাজকর্মে কামাই দেয় কম।

এই সিলেটিরা অনেকেই মেম বিয়ে করে ওদের একটা দু আঁসলা সমাজ গড়ে তুলেছে এবং ঘটকালি করে এই মেমেরা নবাগত সিলেটিকে তাদের বোন-ভাগ্নী বিয়ে দেবার জন্য। বোন-ভাগ্নীও "লন্ডনি"র বউয়ের কাছ থেকে জেনে গিয়েছে (১) সিলেটি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বউকে ঠ্যাঙায় না, (২) ঘোড়ার রেস, কুকুরের রেস, এমনকি কড়ি খর্চা করে ফুটবল খেলা দেখতে যায় না, মদে পয়সা ওড়ায় না এবং কোনওপ্রকারের জুয়োও খেলে না বলে বউ স্বচ্ছন্দে সংসার চালাবার জন্য স্বামীর মাইনের একটা বড় হিস্যে পায়। বিয়ের পূর্বে বা পরে সে অন্য মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া করে না— সে তো ধলা মেম পেয়েই খুশ! এ দুটো সেকুরিটি পৃথিবীর সর্বত্রই রমণীমাত্রই খোঁজে। এবং কেউ কেউ তৃতীয় সেকুরিটিও দিতে পারে— আপন পয়সায় কোনও নিজস্ব কটেজ। আমার পরিচিত এক চৌধুরীর ছেলে তো নটিংহামে তিনখানা চেন্, হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক (আজকাল সিলেটি মুসলমানদের উচ্চশ্রেণির লোকও নানা ধান্দায় 'লন্ডনি' হচ্ছেন)। তিনি তো অনায়াসে তৃতীয় সেকুরিটি দিতে পারেন। এছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক আরাম-আয়েস আছে। বাচ্চা রাত্রে কেঁদে খাস-সায়েব মজুরের ঘুম ভাঙালে সে ধমক দিয়ে বউকে বাচ্চাসহ রান্নাঘরে খেদায়; 'লন্ডনি' গায়ে পড়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করে। দেশে ছেলেবেলা থেকেই সে কত ভাতিজা-ভাতিজি ঠাণ্ডা করেছে।... পাব-এ যায় না বলে প্রায়ই তার ফুরসত থাকে এবং বউকে প্রেম করে বলে প্র্যাম-এ করে বাচ্চাকে হাওয়াভি খাওয়ায়।

৩

"অ ভাই, জলদি আও, বেটিয়ে ডাকে।"

একদম ন সিকে খাঁটি সিলেটি উচ্চারণ। অবশ্য আমি খুব-একটা হকচকিয়ে উঠিনি, কারণ ঢাকার অ্যার-পর্‌টে হরহামেশাই সিলেটি উচ্চারণ শোনা যায়। কিন্তু যে প্রৌঢ় লোকটি এই

www.pathagar.com

মধুর আহ্বান শোনালেন, তাঁর পরনে দেখি উত্তম বিলিতি কাট্-এ অত্যুত্তম ১০০% বিলিতি উলের নেভি ব্লু স্যুট। ওদিকে গলকম্বল মানমুনিয়া চাপদাড়ি। যাকে ডাকছিলেন তারও ওই বেশ, তবে বয়সে যুবক। কিন্তু ওই 'বেটিয়ে ডাকে' অর্থাৎ 'মেয়েছেলে ডাকছে'— এর বিগলিতার্থটা কী? তখন অ্যার-পর্টের প্রধান লাউনজে ঢুকে দেখি একপাল লোক; প্রায় সক্কলেরই পরনে একই ধরনের নেভি ব্লু স্যুট। বুঝে গেলুম এরা 'লনডনি'। বাড়িতে এসে দাদাকে তাবৎ হালত বয়ান করলুম। দাদা বলল, লনডনিরা ঈদের পরবে প্লেন চার্টার করে দেশে যায়। সে ঢাউস প্লেন সিলেটে নামতে পারে না বলে ঢাকা অবধি এসে থেমে যায়। তার পর সাধারণ সারভিসে আপন আপন মোকামে যায়। শ্রীমঙ্গল, শমসের নগরের মতো ছোট ছোট জায়গায়ও প্রধানত এদেরই জন্য অ্যার স্ট্রিপ করা হয়েছে। আর ওই যে চাপদাড়ি-ওলা লোকটাকে দেখলি সে খুব সম্ভব লনডনিদের বিলেতের মসজিদের ইমাম। এ-ই এদের বিলেত থেকে আপন আপন মোকাম অবধি দেখ-ভাল করে পৌঁছিয়ে দেয়। এদেরই একজন বোধহয় ছিটকে পড়েছিল; ইতোমধ্যে তরুণী এনাউনসার মাইকে বলেছে সিলেটগামী প্লেন এখ্‌খুনি ছাড়বে। তাই ইমাম হাঁকছিল, 'বেটিয়ে ডাকে, জলদি আও'। সিলেটি মাত্রই জানেন, সে-ভাষায় 'বেটি' ঠিক 'দুহিতা' বা 'মেয়েছেলে' নয়। বরঞ্চ 'মেয়েমানুষ' এমনকি 'মাগি' অর্থেও ধরে। পশ্চিমবঙ্গে যখন কেউ বলে 'বেটির কাণ্ড দেখ!' তখন যে অর্থ ধরে। এখন পাঠক বুঝুন, সেই খাবসুরৎ তরুণীকে 'বেটি' বললে কোন রস সৃষ্ট হয়!

লনডনিরা প্রতি বছর সিলেটে কত টাকা পাঠায় তার হিসাব কেউ দিতে পারে না। কারণ এরা কালোবাজারে খুব ভালো রেট পায় বলে এদের পাঠানো টাকার খুব বড় একটা হিস্যের কোনও সন্ধানই কেউ জানে না। শুনেছি কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কালোবাজারে লন্ডনিদের কাছ থেকে পাউন্‌ড কিনে তাদের নারায়ণগঞ্জস্থ আপন পাট গুদাম জুট মিলকে কোড-এ হুকুম দেয়। অমুক সিলেটিকে অত টাকা পাঠাবে। আরও শুনেছি, তার পর ওই পাউন্‌ড দিয়ে বিলিতি জিনিস কিনে, কিছুটা আইনত, বেশিরভাগ কালোয় প্রাচ্যে পাচার করে।

কত টাকা লনডনিরা পাঠায় তার হিসাব না জানা থাকলেও সিলেট জেলাতে সে টাকার সুদূরপ্রসারী গভীর প্রভাব সর্ব সিলেটির চোখে যেন ঘুষি মেরে আপন মাহাত্ম্য অহরহ প্রচার করে। সস্তা সেকেনহ্যানড বিদেশি ট্র্যানজিসটার, পারকার কলম, ক্যামেরা ইত্যাদির কথা বাদ দিচ্ছি— একমাত্র সিলেট শহরেই নাকি গণ্ডা দুই সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে— কল্পনা করতে পারেন এ-জিনিস বর্ধমানে? মহকুমা শহরের কথা বাদ দিন, বড় বড় থানায়— বিশেষত যেসব পকেটে লনডনিদের আদি নিবাস— পর্যন্ত বড় বড় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আপিস খোলা হয়েছে। আর ডাকঘরের তো কথাই নেই। যে-ডাকঘরে দিনে তিনখানা চিঠিও আসে কি না, সেখানে আসে পাঁচশো-হাজার টাকার মনিঅরডার। কিন্তু এহ বাহ্য। যে-সিলেট শহরের বন্দর-বাজারে মাছের কখনও অভাব হয়নি সেই বাজারে দর আগুন এবং শৌখিন মাছ বিরল। আমার এক মুরুব্বি বললেন, "আসবে কোত্থেকে? লন্ডনির পাঠানো টাকাতে এখন গাঁয়ের লোক মাছ খায়। জেলে তকলিফ বরদাস্ত করে শহরে আসবে কেন। বললে প্রত্যয় যাবে কি, পাঁচখানা গাঁয়ের মাঝখানে যে-হাট, সেটা এই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বসত সপ্তাহে একদিন একবেলা। এখন বসে রোজ, প্রতিদিন, দু বেলা।"

www.pathagar.com

এটা আবার কনফারম করল আমার এক বোন। গাঁয়ের জমিদারবাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে এবং লন্ডনিরা যখন দেশে আসে তখন প্রায়ই ব্যাঙ্কের চিঠিপত্রাদি পড়াবার জন্য জমিদারবাড়িতে আসে। বোন বলল, "এক লন্ডনি দেশে এসেছে ঈদ করতে। মাছ কিনতে গেছে ভিন গাঁয়ের হাটে। একটা ভালো মাছ দেখে দাম শুধাল। জেলে বলল ওটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সেটা কিনেছে ওই গাঁয়েরই এক লন্ডনি, এবং দুই গাঁয়ে দারুণ আড়াআড়ি। ভিন গাঁয়ের লন্ডনির এক দোস্ত প্রথম লন্ডনিকে খোঁচা দিয়ে যা বলল তার অর্থ— তোমাদের গাঁয়ে এ-মাছ খাবার মতো রেস্ত আছে কার? প্রথম লন্ডনি বড় নিরীহ, কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু তার গাঁয়ের সঙ্গী-সাথীরা চটে গিয়ে তাকে বলল, "আল্লার কসম, এই, এই মাছটাই তোকে কিনতে হবে।" তখন মাছ চড়ল নিলামে। দশ, বিশ, শ, দু শো চড়চড় করে চড়ে গেল। কবিগুরুর ভাষা একটু বদলালে দাঁড়ায়,

"দশ মাষা দিব আমি"
কহিলা লনডন-ধামী,.
"বিশ মাষা" অন্য জনে কয়।
দোঁহে কহে "দেহো দেহো",
হার নাহি মানে কেহ—
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।

আমার বোনটি অতিরঞ্জনে অভ্যস্ত নয়। শেষটায় বলল, "আখেরে মাছটা বিক্রি হল এক হাজার এক টাকা মূল্যে। কিনল প্রথম লন্ডনি। এবং আশ্চর্য নগদ টাকা তার ওয়াস্‌কিটের পকেট থেকেই বের করল। তার পর বিজয়ী মাছটাকে নিয়ে প্রসেশন করে গ্রামে এসে আপন গাঁ প্রদক্ষিণ করল। বিস্তর জিন্দাবাদ জিগিরের পর মাছটাকে ব্লেড দিয়ে প্রায় ডাকটিকিটের সাইজে টুকরো টুকরো করে গাঁয়ের সব্বাইকে বিলোলো। এখন এরা হাটে গিয়ে দেমাক করে, 'আজার টেকি (হাজার টাকা দামের) মাছ খাই আমরা'।

কিন্তু এহ বাহ্য। সমাজবিদ্‌দের কান খাড়া হবে শেষ তত্ত্ব এবং তথ্যটি শুনে। লন্ডনি যত টাকা নিয়েই গ্রামে ফিরুক না কেন, জমিদার মিরাশদারের (যদ্যপি এখন আর জমিদারি নেই) বৈঠকখানায় শব্দার্থে এখনও তারা কলকে পায় না। অথচ তারা 'জাতে উঠতে' চায়। তাই তারা হন্যে হয়ে উঠেছে সদরে, মহকুমা টাউনে বাড়ি কিনতে। সেখানে কে কার খোঁজ নেয়? এক বা দু পুরুষে সবাই ভুলে যাবে তাদের উৎপত্তি, পেশা, জন্মস্থল। ফলে সিলেট শহরে যে-বাড়ির দাম পাঁচ বছর আগে ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, এখন লন্ডনি দেড় লাখ হাঁকছে। একাধিক পেনশনার ভাবছেন সিলেটের বাড়ি বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে ঢাকাতে ওইরকম বাড়িই যখন পাব (সিলেট জেলার বাইরে লন্ডনি বাড়ি চায় না) তখন ছেলে-নাতির পড়াশুনোর সুবিধের জন্য— ক্যাপিটালে বাস করার আরও সুবিধে— সেখানেই যাই না কেন? যিনি আমাকে এ-ব্যাপারটির কথা বললেন, তিনি প্রাগুক্ত ওই 'মছলী-কহানীও' জানতেন। শেষ করলেন এই বলে— "আগে প্রবাদ ছিল 'মাছ খাবি তো ইলিশ, লাং ধরবি তো পুলিশ', এখন হয়েছে 'মাছ খাবি ন মণী, লাং ধরবি লন্ডনি'। কিন্তু এটা চালু হবে না। লন্ডনিরা সচ্চরিত্র।"

www.pathagar.com

৪

এই পর্যায়ের কীর্তনকাহিনী (সাগা)-র কালি ভালো করে শুকোবার পূর্বেই দেখি হঠাৎ আমি সিলেটিদের মাঝখানে। তবে খাস সিলেটে নয়, লন্ডনে। এবং বিরাট লন্ডনের সব কটা সিলেটি রেস্তোরাঁ চষতে হলে পুরো পাক্কা ছটি মাস লাগার কথা।

প্রথম যেটিতে গেলুম, সেটা নিতান্তই যোগাযোগের ফলে। লন্ডনে যে অ্যারপর্টে নাবলুম সেখান থেকে খাস লন্ডন নিদেন ত্রিশ মাইল দূরে। তিনজন পরিচিতের ঠিকানা নোটবুকে টোকা ছিল। এক সহৃদয় ইংরেজকে সে-তিনটে দেখিয়ে শুধালুম, সবচেয়ে কাছে পড়ে কোনটা। এক ঝলক দৃষ্টি হেনেই বলল, 'গঙ্গা' রেস্তোরাঁ। তাই সই। গেল বছরে যখন ওর মালিক পঁচিশ বছর লন্ডনে কাটিয়ে বাপ-মাকে দেখতে দেশে আসে তখন আমাকে জোর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, তার রেস্তোরাঁ আছে, ফ্ল্যাট আছে; আমি যদি দয়া করে পদধূলি— হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কোথায় কী? আমি ভেবেছিলুম, সেই যে চল্লিশ বছর পূর্বেকার টিলবারি ডকের সিলেটি রেস্তোরাঁ— যার কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি— সেই ধরনের গরিবগুরবোর 'অটল'ই (হোটেলের সিলেটি উচ্চারণ; তবে সিলেটিতে এ্যাক্‌সেন্‌ট্‌ আছে বলে সেটা পড়বে 'অ'-র ওপর) হবে। তবে কি না, নিতান্ত মহারানির আপন নগরের মধ্যিখানে থানা গেড়েছে যখন, তবে হয়তো দেয়াল ছাদে দু এক পলস্তরা পাউডার-রুজ মাখিয়ে নিয়েছে।

কোথায় কী? পরিপাটি ছিমছাম পশ্‌, শিক্‌। বাদবাকি সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার পূর্বেই দূর থেকে মালিক ('অটলালা' = হোটেলওয়ালা) আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে। 'আউকা, আউকা; বউকা বউকা' (আসুন, আসুন; বসুন, বসুন)। তার পর দিল ছুট রেস্তোরাঁর গর্ভগৃহের দিকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বউকে নিয়ে আসতে।

টেবিল-ক্লথ, ন্যাপকিন মুরমুরে পয়লা নম্বরি আইরিশ লিনেনের, ফুলদানিতে যেন বাগান থেকে সদ্য তোলা, শিশির-ভেজা গোলাপ, ছুরি কাঁটা তথা যাবতীয় কাটলারি যেন মোগল আমলের খাঁটি রুপোর, আর গেলাস-বৌল এমনই স্বচ্ছ যে ভয় হল যে দুর্যোধনের মতো স্ফটিককে জল ভেবে, আমিও এগুলোর দু একটা দেখতে না পেয়ে ভেঙে ফেলি!

ডানদিকে কাচে ঘেরা একটি চৌকো কুঠরি। ভিতরে সারি সারি শেলফে সাজানো দুনিয়ার খাসা খাসা মদ্যাদি। বোতলের আকার-প্রকার রঙ-লেবেল দেখেই বোঝা যায়। কুঠরির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি খাপসুরৎ জোয়ান ছোকরা ন্যাপকিন দিয়ে ওয়াইন শ্যাম্‌পেন; বিয়ার-মাগ্‌ সাফসুতরো করছিল এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল। ছোকরার মুখের আদল, দেহের গঠন সিলেটির মতো। কিন্তু রঙটা? গোরাদের মতো ফর্সা নয়, আবার সিলেটির মতো শ্যাম-হলদেও নয়। সমাধান কিন্তু সহজ। গলা বাড়িয়ে সিলেটিতে শুধোলুম, "ভাই সাহেব, আপনার দেশ কোথায়?"

গোটা কয়েক গেলাস ভেঙে ফেলেছিল আর কি! গলার আওয়াজ হোঁচট খেতে খেতে, খাবি খেয়ে খেয়ে, পড়িমরি হয়ে বলল, "জি, জি, জি; আমি সিলেটের ফেচুগঞ্জের।... এখানে যারা কাজ-কাম করে সবাই সিলেটি।" (আমরা মারওয়াড়িদের দোষ দিই; তারা শুধু দেশের ভাইয়াদেরই চাকরি দেয়। সমস্যাটার সমাধান এখনও করতে পারিনি।)

ইতোমধ্যে মালিক এসে গেছেন। তাঁর গৃহিণীর— মেমসাহেবার— প্রথম কথা কটি শুনেই আমার মনে সন্দেহ হল, যদিও এঁর ইংরেজি উচ্চারণ উত্তম— অন্তত আমার চেয়ে ভালো—

www.pathagar.com

তবু ইনি বোধহয় কন্টিনেনটাল। ভারি মিষ্টি স্বভাবের, লাজুক, স্বল্পভাষী রমণী। মালিকের মাথায় হঠাৎ কী যেন আচমকা ভাবোদয় হল। বলল, "আপনি তো একদা জর্মনিতে পড়াশুনো করেছিলেন; এখনও নাকি ওই দেশের ভাষা বলতে পারেন। ইনি (বউয়ের দিকে তাকিয়ে) খাঁটি জর্মন।"

এ্যাতক্ষ্যাণ ব্যাললেই হত। মেমও সঙ্গে সঙ্গে জর্মন বলতে আরম্ভ করল। ওর উচ্চারণ থেকে মনে হল সে ভ্যুরটেম্‌বের্গ প্রদেশের মেয়ে।

সোমদেবের চরম কৃপাই বলতে হবে! যে প্লেনে জরমনি থেকে লন্ডন এসেছিলুম সেটাতে ওই ভ্যুর্‌টেম্‌বের্গ প্রদেশের মোলায়েম ওয়াইন সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। লন্ডনে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ডেরা পাব তা তো জানিনে। যদি-স্যাৎ কাজে লেগে যায়। তাই এক বোতল কিনে নিয়েছিলুম। আর যাবে কোথা! এক কোণে ডাঁই করে রাখা লাগেজ থেকে বোতলটি বের করে ম্যাডামের সামনে রেখে বললুম, "এই নিন। ৎসুম ভোল জাইন, আ ভৎর্‌ সাঁতেহিয়ার ইজ্‌ টু ইউ"— এসব তান্ত্রিক মন্ত্রের অর্থ আমি এখনও সঠিক জানিনে। তবে মোটামুটি দাঁড়ায় "ইটি পান করে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক, 'আপনার সর্বমঙ্গল হোক" ইত্যাদি। উভয় পক্ষ উভয়ের একই মঙ্গল কামনা করেন। মদ্যপান করে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় কি না জানিনে— গত যুদ্ধে ফ্রান্‌স্‌ হেরে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পেতাঁ যখন প্রথম বক্তৃতা দেন, তখন তিনি বলেন, 'অত্যধিক মদ্যপান হেতু ফরাসি সেপাই ঠিকমতো লড়তে পারেনি'— কিন্তু এটাই রেওয়াজ এবং ম্যাডামের চোখ ছল ছল করে উঠল। কোথাকার কোন ইন্ডিয়ান— তার দেশের জিনিস, এ স্থলে প্রতীক বলতে হবে, এনেছে। এটা কি কম কথা! ভাবুন, আপনি নিউজিল্যান্ড বা ওসলোতে। সেখানে কেউ নিয়ে এল আপনার জন্য পাটিসাপটা ক্ষীরের মালপো দেদো সন্দেশ! তদুপরি সে বাঙালি নয়।

ইতোমধ্যে দুটি একটি করে খদ্দের আসতে আরম্ভ করেছে। তার থেকে বুঝলুম, রাত হয়ে আসছে। আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয় যে আমরা সূর্যচন্দ্র দেখে সময়টা কী এবং তার চেয়েও বড় কথা মানুষের আচরণ তার কাজ-কারবার স্থির করি। যেমন সূর্য অস্ত যাচ্ছেন; অতএব এখন রাস্তার ভিড় কমতির দিকে। আর বিলেতে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলেন রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। নিশ্চয়ই লাঞ্চের সময়, অতএব দুপুর।

ক্রমে ক্রমে রেস্তোরাঁ ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! সব গোরার পাল। একটি মাত্র ইন্ডিয়ান নেই। চল্লিশ বছর পূর্বে টিলবারির রেস্তোরাঁয় দেখেছিলুম বেশিরভাগ সিলেটি খদ্দের; মাত্র দু একটি গোরা। এখানে দেখি "সব্‌ লাল হো গিয়া।"

মালিক ওয়ার্‌ল্‌ডু এট্‌লাসের মতো বিরাট একখানা মেনু এগিয়ে দিয়ে বলল, "কী খাবেন, হুকুম দিন।" আমি বললুম, "প্লেনে বিস্তর ঝাঁকুনি খেয়েছি আর কী খাব, কও। বমি করেছে বেশ কয়েকজন। তুমি-আমি নিতান্ত সিলেটের লোক। জন্ম থেকে হাওর-বিলে নৌকা ভিতরে-বাইরে নাগরদোলার দোল খেয়ে শিলঙ যাবার সময় আচমকা পাহাড়ি মোড়, হেয়ার-পিন টার্ন হজম করে করে সি সিক অ্যার সিক, ল্যান্ড সিক হইনে। কিন্তু এবারে আম্মো কাবু। গা গুলোচ্ছে, বমি না করলেই রক্ষে। প্লেনে ওঠার আগে যা-সব খেয়েছিলুম সেগুলো যেন রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল; এখন ফিরি ফিরি করছে। উপস্থিত থাক। বরঞ্চ খাটের পাশে দু খানা স্যানউইচ রেখে দিয়ো। ক্ষিদে পেলে খেয়ে নেব।"

www.pathagar.com

মেনুটার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম, খেয়াল না করে, মালিককে ভদ্রতা দেখাবার জন্য, আলতো আলতো ভাবে। বিরিয়ানি, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা, চিকেনকারি গয়রহ গয়রহ। এ তো ডালভাত কিন্তু শব্দার্থে বলছি না। আই মিন, এগুলো তো এরকম ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁতে থাকবেই। ইংরেজিতে যাকে বলে 'মাসুট্স্'। কিন্তু কী একটা মামুলি আইটেমের দাম দেখতে গিয়ে আমি যেন আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। বলে কী? দশ শিলিং! মানে? দশ টাকা। তখন মেনুর ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, সব মালেরই প্রায় ওই দাম। অর্থাৎ, দু পদী আহারাদির জন্য আপনার খসে যাবে পৌন্ড খানিক। পনরো, বিশ, পঁচিশ টাকা! ও! তাই ইন্ডিয়ানরা আসেনি। ওদের বেশিরভাগই তো ছাত্রসম্প্রদায়। ওদের জেবে অত রেস্ত কোথায়?... মনে পড়ল, চল্লিশ বছর পূর্বে ছ পেনিতে (পাঁচ আনাতে)। রাইসকারি পাওয়া যেত টিলবারি ডক্-এ।

পরে খবর নিয়ে শুনলুম, 'গঙ্গার' ভাও মোটেই আক্রা নয়। এটাই নর্মাল। এমনকি, ওই পাড়ার চীনা, হাঙ্গেরিয়ান, স্প্যানিশ রেস্তোরাঁতে আহারাদি আরও আক্রা। আর এর পর খাস বিলিতি ডাঙর ডাঙর রেস্তোরাঁতে কী ভাও, সেটা শুধোবার মতো হিম্মত আমার জিগর কলিজায় ছিল না, সেটা আমার হাফ-সিঙ্গল-চা, দুটো-ফল্স্ পিনেওলা বেরাদর পাঠক নিশ্চয়ই দিব্য-দৃষ্টিতে দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। কোন দেশে কোন বস্তুর কী দর, "বিভিন্ন দেশের রেস্তোরাঁর তুলনাত্মক দরদাম" সম্বন্ধে ডকটেরেট থিসিস লিখে ধৈর্যশীল পাঠককে, এ-অধম নিপীড়িত করতে সাতিশয় অনিচ্ছুক। তবে কেন?

সেটা পরে হবে।

নটিংহাম

আমাদের ছেলেবেলায় ঘটি-বাঙালে রেষারেষি ঠাট্টা-মশকরা ছিল ঢের ঢের বেশি। একটা মশকরা আমার মনে পড়ল নটিংহাম যাবার ট্রেনে বসে। বাঙালের সঙ্গে (বাঙাল 'সাথে' বলে এবং গদ্যেও লেখে 'সাথে'; রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে সেটা কিঞ্চিৎ অনিচ্ছায় স্বীকার করে নেন) লিলুয়া স্টেশনে দেখা এক ঘটির। বাঙাল শুধাল, 'কোথায় চললেন দাদা?' ঘটি বলল, 'চললুম, দাদা, পশ্চিমে। গায়ে এট্টুখানি গত্তি লাগিয়ে আসি।' বাঙাল আমেজ করল, দাদা বুঝি হিল্লি দিল্লি বিজয় করতে চললেন। কারণ সে যখন প্রথম দেশ ছেড়ে শেয়ালদায় নামে তখন গান রচেছিল।

"লাম্যা ইশ্টিশানে
গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী মিয়ার রঙ-মহলে
ঢাহা (ঢাকা) জেলায় বশ্যাল (বরিশাল) ছাড়ি ॥"

www.pathagar.com

তার তরে বরিশাল ছেড়ে ঢাকা যাওয়াটাই একটা মস্ত কসরত। এবং শেয়ালদা আসাটা তো রীতিমতো গামার সঙ্গে লড়াই দেওয়া!... অবশেষে ধরা পড়ল ঘটি দাদা যাচ্ছেন লিলুয়া।

সবই পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপার। লন্ডন থেকে নটিংহাম সোয়া শো মাইল হয় কি না হয়। আমাদের কাছে লস্যি। অথচ লন্ডনের ইংরেজ দোস্তেরা যেভাবে আমাকে ওখানে যেতে নিরুৎসাহ করেছিলেন তার থেকে মনে হল ওরা ও-মুল্লুককে প্রায় দুশ্‌মনের পুরী বলে ধরে নিয়েছেন। একাধিক জন বললেন, 'ওখানে— অপরাধ নিয়ো না এই এই, অর্থাৎ সেখানে ইন্ডিয়ানদের ঠ্যাঙানো হচ্ছে।' আমি বললুম, "যেতে যখন হবেই তখন অত ভেবে কী হবে। তদুপরি আমাদের পোয়েট টেগোর বলছেন—

মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে ॥"

ট্রেনে বসে চিন্তা করে দেখি, আমি নটিংহাম সম্বন্ধে যা জানি সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (১) আমার একজন আত্মীয় সেখানে আছেন। আমার আপন আত্মীয় হলে না গেলেও চলত কিন্তু তিনি আমার ছোট বোনের দেবর। তিনি আবার তালেবর লোক। আমি যখন হামবুর্গে তখন কী করে কোথায় থেকে খবর পেয়ে তিনি নটিংহাম থেকে আমাকে ট্রাঙ্ক-কল করে সাতিশয় অনুরোধ জানালেন আমি যদিস্যাৎ ইংলন্ডে যাই তবে অতি অবশ্য আমাকে নটিংহাম যেতেই হবে, যেতেই হবে— তিন সত্যি। (২) ছেলেবেলায় রবিনহুডের কেচ্ছা পড়েছিলুম। তাঁর কর্মস্থল ছিল নটিংহাম। পাশে ছিল শারউড বন। সেইটেই ছিল তাঁর স্থায়ী আস্তানা।... এদানির কলকাতার ছেলেছোকরারা আর রবিনহুডের কাহিনী তেমন একটা পড়ে না। কলকাতার গলিতে গলিতে এন্তের রবিনহুড। তবে অতি সামান্য একটা তফাৎ রয়েছে। রবিনহুড নাকি ডাকাতি করে যে-কড়ি কামাতো সেটা গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিত। অদ্যকার কলকাতার রবিনহুডরা চাঁদার নামে, হ্যানাত্যানার নামে যে-টাকা, প্রায়-ডাকাতি করে কামান, সেটা ঠিক ঠিক কোন জায়গায় যায়, এ-মূর্খ সে-বাবদে বিশেষজ্ঞ নয়। ঈশ্বর সুকুমার রায় তাঁর একটি কবিতাতে, 'উপবেশন' কী করে করতে হয়, সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন,

"তবে দেখো, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না পড়ে যেন কভু নিজ গালে।"

বাকিটা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। চালাক মাত্রই মূর্খকে কথা বলতে দেয়। আমি বিশ্বাস করি, 'যদল্পং তন্মিষ্টং'। (৩) আমাদের যেরকম বিদ্রোহী কবি শ্রীযুত নজরুল ইসলাম, ইংরেজের বিদ্রোহী কবি বায়রন। এবং তাঁর বাস্তুভিটে নটিংহামের অতি কাছে। ইংরেজ সরকার তাঁর মৃতদেহ বড় বড় মহৎ মহৎ কবির সঙ্গে লন্ডনে গোর দিতে চায়নি বলে তাঁকে গোর দেওয়া হয় তাঁর বাস্তুভিটের গোরস্তানে।

"নটিঙম্! নটিঙম্!! নটিঙম্!!!" কলরব চিৎকার।

আরেকটু হলেই পৌঁছে যেতুম নর্থ পোলে। প্রফেটরা বার বার বলেছেন, 'নিজেকে চিনতে শেখ। আত্মচিন্তা কর।' তা আপনারা যত খুশি আত্মচিন্তা করুন। কিন্তু রেলগাড়িতে না। কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে পৌঁছে, দু ডবল ভাড়া, জরিমানা দিয়ে মোকামে ফিরবেন বরঞ্চ সেইটেই চিন্তা করুন।

www.pathagar.com

২

তনু, দেহ, শরীর, বপু, কলেবর, কোনটা ঠিক মধ্যিখানে বলা ভার। আমার আত্মীয় যিনি আমাকে নটিঙাম স্টেশনে রিসিভ করতে এলেন তিনি ওই মধ্যিখানে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, তাঁর ঢাউস মোটরগাড়ি। বাড়ি যাবার সময় অলস-নয়নে এদিক-ওদিক তাকালুম। ইংরেজ বিদেশে যদি বিশেষ কোনও নতুন চিজ না দেখতে পায় তবে বলে 'নাথিং টু রাইট হোম এবাউট।' অর্থাৎ এমন কিছু দেখিনি যা চিঠিতে লিখে বাড়ির লোককে তাক লাগানো যায়। আমার হল তাই। এ জায়গায় লক্ষ করলুম, পর পর দুটো দোকানে যেন কিছু ভারতীয় সামান-আসবাব আছে। শুধোলুম, 'এ দোকানগুলো কাদের?' চৌধুরী বললেন, 'এক শিখ ভদ্রলোকের। বেশ দু পয়সা কামান। বড়লোক বলা যেতে পারে।' চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছে দেখি তিনিও কিছু কম যান না। তেতলা বাড়িতে বাস করেন। তিনটেই তাঁর। তার পর গেলুম তাঁর রেস্তোরাঁ দেখতে। সে-ও এলাহি ব্যাপার; উপরের তলা নিচের তলা দু তলা নিয়ে পেল্লাই কাণ্ড।

কিন্তু এসব কথা অন্য দিন হবে।.... খবরের কাগজে পাঠক হয়তো লক্ষ করে থাকবেন যে ইংলন্ডের বর্তমান সরকার আইন পাস করতে যাচ্ছেন, এখন থেকে ওঁদের দেশে চলে যেতে হলে কমনওয়েলথ নাগরিক— যেমন ভারতীয়-পাকিস্তানি— এবং পাক্কা বিদেশি— যেমন ফরাসি-জরমন— আর কোনও তফাৎ রইল না। বিগলিতার্থ : ভারত-পাকিস্তানির পক্ষে এখন ও-দেশে গিয়ে দু পয়সা কামানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আত্মাভিমানী পাঠক হয়তো ঈষৎ রাগত কণ্ঠে শুধোবেন, 'কী দরকার রে বাপু, বিদেশে গিয়ে এরকম হ্যাংলামো করার?' কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আজ ওই বাংলা দেশেই হাজার হাজার ছেলে— এবং মেয়েও আছে যারা বিলেত, বিলেত কেন হটেনটটের মুল্লুকেও যেতে রাজি আছে পেটের ভাতের তরে। এতে অভিমান করার কী আছে?...কিন্তু সেই কথায় ফিরে যাই। নটিঙামে গিয়েছিলুম গেল বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে গিয়ে শুনি, ওরা ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছে, নতুন কনজারভেটিভ সরকার কোন তালে আছেন। বিশেষ করে সিলেটিরা আমাকে তাদের দুশ্চিন্তার কথা শোনাতে গিয়ে বলল, "দেশ থেকে নতুন লোক যে আর আসতে পারবে না, শুধু তাই নয়, হুজুর। দেশে যাওয়া-আসা যে প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আমাদের বেশিরভাগেরই বউ-বাচ্চা তো ওখানে।" আমি বললুম, "আচ্ছা, এখানে তো ভারতের লোকও রয়েছে। তাদের সঙ্গে 'পরামিশ-সুপারিশ' করে দেখেছ? উভয় পক্ষের বিপদ তো একই।" উত্তরে যা বলল সেটা, পাঠক একটু মন দিয়ে শুনুন। বলল, "হুজুর ওদের সঙ্গে আমাদের ঠিক বনে না। ওদের বেশির ভাগই শিখ। ওরা হিন্দুস্থানি বলেই যে আমাদের সঙ্গে বনে না সেটা ঠিক না— বিশ্বাস করুন হুজুর। আপনিও তো হিন্দুস্থানি। আপনাকে তা হলে এসব দরদ জানাই কেন? ছুটিছাটায় যখন লন্ডন যাই, তখন পুব-পশ্চিম দুই বাংলার লোকের সঙ্গেই দেখ-ভাল মোলাকাত-মহব্বত হয়— হিন্দু-মুসলমান দুই-ই। তারার লগে কথা কইতে কুনু অসুবিস্তা অয় না, তারা আমরার দুশকো (দুঃখ) বুঝে, আমরাও তারার দুশকো বুঝি। আর এই শিখদের সঙ্গে আমাদের আরেকটা ডাঙর ফারাক আছে। এরা এদেশেই বসতি গাড়তে চায়, দেশে ফিরে যেতে চায় না। তাই তারা দেশের গাঁয়ে টাকাকড়ি পাঠায় না। আর আমাদের পনেরো আনা দেশে ফিরে যেতে চায়। তাই আমরা দেশে টাকা পাঠাই— যাতে করে দেশের ভাই-বেরাদর সুখে থাকে, পুরনো বাড়ি-

www.pathagar.com

ঘরদোর মেরামতিতে রাখে, নয়া উমদা বাড়ি বানায়। আর দেশে টাকা পাঠানোতেও বিস্তর মুশকিল। ব্যাংকের মারফতে পাঠালে দেশের লোক পাবে কম, কালোবাজারে—"

বাকিটা আমি শুনিনি।... আমি মনে মনে ভাবছিলুম (১) বাঙালি বাঙালিতে কী প্রণয়! (২) বাঙালি দেশকে বড্ডই ভালোবাসে। এই নটিঙামের বাঙালি মুসলমান তার প্রাণ-জিগর-কলিজা পড়ে আছে সিলেটে।

হাওর

বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস লেখেন জনৈক মোল্লা নাথন, নাথতু। বইখানার নাম বহার-ই-স্তানই-গায়েবি অর্থাৎ 'অজানা চিরবসন্ত ভূমি'— ফারসিতে লেখা। নাথু মিঞা দিল্লির লোক। ভাগীরথী পার না হওয়া পর্যন্ত তিনি এমন কোনও 'দ্যাশ' দেখেননি যেখানে ঘোরতর গ্রীষ্মকালেও ঘাস সবুজ থাকে। তাই কেতাবের নাম দিয়েছিলেন 'চির বসন্ত ভূমি'। মিঞা সাহেব এসেছিলেন 'বাংলা দেশে' জাহাঙ্গিরের রাজ সেনানীর সঙ্গে শেষ পাঠান রাজা ওসমানকে পরাজিত করার জন্যে। জাহাঙ্গিরের পিতা আকবর বাদশাহ্ পুরো বাংলা দেশ জয় করতে পারেননি। তার একমাত্র কারণ মোগলরা শুকনো দেশের লোক; নৌযুদ্ধ কারে কয় জানে না। জাহাঙ্গিরের প্রধান সেনাপতি বেশিরভাগ ভয় দেখিয়ে কিছুটা ঘুষ দিয়ে কয়েকটি মীরজাফর যোগাড় করে নৌযুদ্ধ খানিকটা শিখল। তার পর তারা ওসমানের পিছনে ধাওয়া করল। ওসমানের প্রধান দুর্বলতা ছিল যে তার কাছে যেসব কামান বন্দুক ছিল, সেগুলো মোগলদের তুলনায় নিকৃষ্টতর। তদুপরি জাহাঙ্গিরের সেনাপতি যে প্রচুর সৈন্যদল নিয়ে এসেছিলেন তার সামনে দাঁড়ানো ওসমানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

ওই সময়ে বাদশাহ্ জাহাঙ্গির চিঠি লিখলেন ওসমানকে : আত্মসমর্পণ করো। ওসমান অতি সংযত ভদ্র ভাষায় উত্তর দিলেন, যার মর্মার্থ, আপনি দিল্লীশ্বর, আপনার দেশ-দেশব্যাপী বিরাট রাজত্ব। আমি তো তার তুলনায় সামান্য একটি চিড়িয়া। কিন্তু সামান্যতম পাখিটিও স্বাধীনভাবে থাকতে চায়।.... ওসমান জানতেন মোগলরা এতদিনে বেশ কিছুটা নৌ-যুদ্ধ শিখে নিয়েছে। তদুপরি সেটা শীতকাল (ইয়াহিয়া খানের কপাল ভালো যে শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ঝগড়াটা চরমে পৌছায় মার্চ মাসে; বর্ষা নামলেই চিত্তির। তাই তিনি তিলব্যাজ না সয়ে মারলেন তাঁর হাতুড়ি ওই মোকাতেই)। তাই তিনি স্থির করলেন মোগলদের নিয়ে যেতে হবে সিলেটে। সেখানে যেসব হাওর আছে তার প্রধান ভাগ শীতকালে শুকোয় না। কারণ বৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধতম স্থল চেরাপুন্‌জি। তার কুল্লে পানি নেবে আসে সিলেট জেলায়, ডাউকি হয়ে জইন্তা হয়ে— অসংখ্য নদনদী খাল নালা দিয়ে। এই সব হাওরে সামান্যতম ঝড় উঠলে ওই দেশেরই বহু কিশোর তরুণ তক বমি করতে থাকে— অর্থাৎ বাংলা কথায় সি-সিক হয় (পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে 'ডিডে' ল্যান্ডিঙের সময় প্রচুর সৈন্য নরমান্ডির বেলাভূমিতে নেমে সেখানে শুয়ে পড়ে। বমি করতে করতে তাদের পেটে তখন আর কিছু ছিল না যে লড়াই করে করে জর্মনদের ঘাঁটি দখল করে।

www.pathagar.com

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, এন আর্মি মার্চেজ অন ইটস স্টমাক। অন্যার্থে। কিন্তু এস্থলে এটা প্রযোজ্য)। এবং ঢাকা থেকে সিলেটের হাওর অবধি এক্কেবারে ফ্ল্যাট। সিলেট পৌঁছলেই আরম্ভ হয় টিলা, কোনও কোনও টিলাকে পাহাড়ও বলা যেতে পারে। ঘন বন জঙ্গল এবং প্রচুর সুপুরিগাছ।... ওসমান তাই পৌঁছলেন সিলেটে। 'রিয়ার গার্ড একশন' করতে করতে। অর্থাৎ তিনটে সুপুরিগাছ জড়িয়ে বেঁধে তার সর্বোচ্চতম প্রান্তে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে সেখানে কামান তুলে নিয়ে দুশমনের উপর কামান দাগতে দাগতে। মিয়াদের তখন তাজ্জব নয়া অভিজ্ঞতা হল। করে করে ওসমান সিলেট জেলার প্রায় আধখানা পেরিয়ে মিয়াদের নিয়ে গেলেন, আজ ম্যাপে যেখানে মৌলবি বাজার, তার তিন মাইল দূরে দুল্লভমপুরে (অধুনা নাম দুর্লভপুর)। তারই পরে হাইল হাওর। ওসমান ও তাঁর সৈন্যদল হাওরের হাঁটুজলে পায়ে হেঁটে ওপারে চলে গেলেন। তিনি জানতেন, মোগলরা এ অঞ্চলে কখনও আসেনি। তারা জানে না কোন জায়গায় হাঁটুজল আর কোন কোন জায়গায় অথৈ জল। মোগলরা এপারে দাঁড়িয়ে। তার পর শুভলগ্নে ওসমান ওপার থেকে হাওর পেরিয়ে আক্রমণ করলেন— মোগল সৈন্যদের। তারা লড়েছিল প্রাণপণ। কিন্তু পরাজয় অনিবার্য বুঝতে পেরে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমন সময় হাতির-পিঠে-বসা অগ্রগামী ওসমানের চোখে এসে ঢুকলো একটা উটকো তীর। মাহুত ভয় পেয়ে হাতি ঘোরাল। ওসমান বুঝতে পেরে চেচাঁচ্ছেন, এগিয়ে চল চল। ওদিকে মোগল সৈন্যদের ভিতর বিজয়ধ্বনি আরম্ভ হয়েছে— 'ওসমান পালাচ্ছে, ওসমান পালাচ্ছে।' মোগলরাই জয়ী হল। সে এক করুণ কাহিনী। সুযোগ পেলে আরেকদিন সবিস্তর বলব।

কিন্তু আমি জালা জালা পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছি কেন? যারা বাংলা দেশ থেকে আসছেন, তাঁরাই বলছেন গেল সাড়ে-দুই মাস ধরে সবচেয়ে মোক্ষম লড়াই দিয়েছে— সিলেটের লোক। তাদের কী সুবিধে— টিলাবন হাওর— অর্থাৎ 'তেরাঁ'— পূর্বেই বলেছি।

ওসমান যুদ্ধে হারেন শীতকালে মার্চ মাসে। এবারে দেখি ঘন বরষায় তারা হাওরের কী সুযোগ নেয়।

এপিলোগ : আকবর বাদশাহ্ মারা যান আমাশাতে। বাংলা বিজয় অভিযানে বেহারে! সে আবার আমাশা! ঢাকার আমাশা অলিম্পিক। পিণ্ডির জাঁদরেল যে এই বর্ষায় ঢাকায় আসছেন, তাঁর যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায়! সম্পাদক মহাশয়, আপনি সহৃদয় লোক। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, পিণ্ডির খান সাহেবকে জানিয়ে দিতে, প্রতিদিন দুটো এনটেরো ভায়োফর্ম এবং এক বড়ি ত্রিফলাকস, তদভাবে ইসপগুল তিনি যেন সেবন করেন। যদি তিনি এ যাত্রায় নিস্তার পান তবে ইতিহাস হয়তো আপনার প্রতি কটুকাটব্য করবে! সাধু সাবধান।

মহাভারত

পয়লা ফেব্রুয়ারি দিবস, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে লাটসাহেব শ্রীযুত শান্তিস্বরূপ ধাওন যা বলেন তার বিগলিতার্থ— আমি তিনখানা খবরের কাগজের

www.pathagar.com

রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে আমার নিবেদন জানাচ্ছি— এতাবৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারতের তথা ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যা (ইন্টারপ্রিট) করেছেন তাঁদের পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিবিন্দু ('উয়েসটার্ন আইজ') দিয়ে। এখন আমাদের— ভারতীয়দের— উচিত, ভারতীয় সভ্যতা (শ্রীযুত ধাওন 'সভ্যতার'— সিভলিজেশন-এর সঙ্গে 'কালচার' বলেছিলেন কি না সেটা খবরের কাগজ উল্লেখ করেনি। এটা গুরুত্বব্যঞ্জক। কারণ যে কোন একটা জাতি, দেশ, নেশন অতিশয় সিভিলাইজড না হয়েও কালচার, বৈদগ্ধ্যের উচ্চাসন গ্রহণ করতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি শ্রীযুত ধাওন দুটোই বলতে চেয়েছেন) ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের অজানা নয় যে, যবে থেকে ইংরেজ আপন স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষে এসেছে সেই থেকেই এ দেশের নিন্দাবাদ করেছে। গোড়ার দিকে মৃদুকণ্ঠে, মোলায়েম মোলায়েম ভাবে। পরে যখন বণিকের মানদণ্ড পুরোপাক্কা রাজদণ্ডে পরিণত হল তখন ভারত বাবদে তার অন্যতম প্রধান 'কর্তব্য' হয়ে দাঁড়াল বিশ্বজনের সামনে সপ্রমাণ করা : ভারতবর্ষ অতিশয় অশিক্ষিত, অসভ্য, অনকলচরড দেশ এবং এ দেশকে সভ্য ভদ্র সত্যধর্মে — খ্রিস্টধর্মে-দীক্ষিত করার জন্য ইংরেজ নিতান্ত পরোপকারার্থে, প্রতি খ্রিস্টজনের যা কর্তব্য, অর্থাৎ বর্বরদের সভ্য করার জন্য এ দেশে এসেছে, এবং এই পাষণ্ড, নেমকহারাম দুশমনের কলকাতা শহরের জলাভূমির আমাশা, নানাবিধ জ্বর রোগে সাতিশয় ক্লেশ 'ভুঞ্জিয়া' সদ্যপ্রভুর পদপ্রান্তে আপন আত্মা নিবেদন করছে, সেক্রিফাইস করছে, এক কথায় মার্টার বা শহিদ হয়েছে। এই যে ইংরেজের দম্ভোলিদম্ভ— এরই ঘৃণ্য ভণ্ডনাম 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন'। তদর্থ, গড ধবলাঙ্গদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন শ্যামাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, রক্তাঙ্গ (রেড ইন্ডিয়ান), পীতাঙ্গ পৃথিবীর কুল্লে জাতকে 'শিক্ষিত সভ্য' করার গুরুভার (বার্ডেন) আপন স্কন্ধে তুলে নেয়। এ বার্ডেন বইতে গিয়ে ইংরেজাদি শ্বেতাঙ্গদের কী পরিমাণ মুনাফা হয়েছে সে তত্ত্ব আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। 'থ্রি মেন ইন এ বোট'-এর প্রখ্যাত রসাচার্য ভারতপ্রেমী লেখক জরৌম কে জরৌম এই বার্ডেন ভণ্ডামিকে তীব্রতর ভাষায় ব্যঙ্গ করে এই শতকের গোড়ায় একটি প্রবন্ধ লেখেন : 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন— হোয়াই শুড ইট বি সো হেভি?'— কিংবা ওই ধরনের। তিনি নানা প্রকারের ঠাট্টামশকরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ সারার পর বক্রোক্তি করেন, *হোয়াইট মেনস বার্ডেন* বইতে গিয়ে আমরা যে আত্মত্যাগ, পরার্থে প্রাণ দান করলুম তাতে করে আমাদের কী ফায়দা হয়েছে? এই নেমকহারাম ইন্ডিয়ানরা (বলা বাহুল্য, ইংরেজের 'আত্মত্যাগ', ভারতীয়ের 'নেমকহারামি' জরৌম আগাপাশতলা উল্টো বুঝলি রামার্থে নিয়েছেন) যদি আমাদের বার্ডেন বওয়ার মূল্য না বুঝে এখন নিজের বার্ডেন নিজেই বইতে চায় (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন জোরদার— জরৌম তার প্রতি অনুরাগী) তবে ফেলে দে না, বাবা, ওই মূর্খদের স্কন্ধে ওদের আপন বার্ডেন। চলে আয় না ওদেশ ছেড়ে। বয়ে গেছে আমাদের।

এ তো গেল। ওদিকে আরেক শিরঃপীড়া। ইংরেজের বাক্যরীতিতেই বলি, সে একাই তো বেলাভূমিতে একমাত্র উপলখণ্ড নয়। আরও মেলা চিড়িয়া রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

www.pathagar.com

"কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায়নি।"

এস্থলে দেখা ইতোমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য জাত ভারতের অনেক অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ— অবশ্য অধিকাংশ অনুবাদে— পড়ে ফেলেছে। দারাশিকুহকৃত উপনিষদের ফারসি অনুবাদ কিংবা তাঁর আদেশে কৃত অনুবাদ ('মুজমা-ই-বহরেন'— 'দ্বিসিন্ধু মিলন') লাতিনে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজ পড়ল বিপদে। উপনিষদ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। তার ফারসি অনুবাদ করল এক মুসলমান। তার লাতিন অনুবাদ করল এক খ্রিস্টান পাদ্রি এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাইল সেদিনকার— সর্বোত্তম বললেও অত্যুক্তি করা হয় না— সর্বসংস্কারমুক্ত, ধর্ম-নিরপেক্ষ দার্শনিক শোপেনহাওয়ার।

ইতোমধ্যে, শেক্‌সপিয়রের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নাম অনেকেই করে থাকেন সেই কবি গ্যোটে *শকুন্তলা* নাট্যকে প্রশংসা প্রশংসায় স্বর্গে তুলে দিয়েছেন— না, ভুল বললুম,— তিনি বললেন, এই নাট্যেই স্বর্গ এবং পৃথিবী সম্মিলিত হয়েছে।

ইংরেজ জাত ঘড়েলস্য ঘড়েল। সে সুর পালটাল। অবশ্য আমার বক্তব্য এ-নয়, যে নিরপেক্ষ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কোনও ইংরেজ কস্মিনকালেই ছিল না। কিন্তু কে পরোয়া করে তাদের?

তাই আজ যখন প্রশ্ন উঠেছে, *মহাভারত* কাল্পনিক না ঐতিহাসিক তখন ইংরেজ পণ্ডিতেরই বরাত দেওয়া প্রকৃষ্টতম পন্থা। উওশবর্ন হপকিনস তাঁর একাধিক প্রামাণিক গ্রন্থে বলেছেন (যে কারণে, অধমের জানা মতে, ধর্ম বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট এনসাইক্লোপিডিয়ায় তিনি *মহাভারত* সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ রচনা করার জন্য সম্মানিত আমন্ত্রণ পান), "নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে *মহাভারত* কাব্যে কোনও সত্যকার সংঘর্ষ প্রতিবিম্বিত হয়েছে— "ইট্ (*মহাভারত*) অনডাউটেডলি রিফলেক্‌ট্‌স সম্ রিয়েল কনটেসট"। পুনরপি তিনি বলেছেন, সত্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আমরা যদি পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশসমূহের তালিকা (লিস্‌টস্‌) *মহাভারতের* সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে পাই যে *মহাভারতের* নানা প্রকারের কিংবদন্তির পশ্চাতে সত্য ইতিহাস বিম্বিত হয়েছে। স্বর্গত গিরীন্দ্রশেখর ঠিক এই মতটিই তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেছেন; এ-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার উল্লেখ হয়েছে।

সব থাক্, সব যাক্। পাঠক, তোমার কমনসেনস কী বলে? কোনও কিছু ঘটেনি, কোনও কিছু হয়নি, এ যেন হাওয়ার-কোমরে দড়ি বাঁধা!

ঠিক তেমনি, খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু পাওয়া যায়নি বলে সব ঝুট হ্যায়? তবে একটি 'ছোটিসি চুটকিলা' পেশ করি। এক রেড ইন্ডিয়ান বলল তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বেরিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের টেলিগ্রাফের তার। অতএব সে-যুগেই তারা টেলিগ্রাফি জানত। উত্তরে এসকিমো বলল, তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ি করে কোনও প্রকারের তার পাওয়া যায়নি। অতএব তারা বেতার ওয়্যারলেস ব্যবহার করত।

কিন্তু আমার শিরঃপীড়া ভিন্ন। মহাভারতের মতো কোনও গ্রন্থই বার বার পুনর্বার আমি পড়িনি। অথচ প্রতিবার নব নব সমস্যা দেখা দেয়। সে কথা আর এক দিন হবে।

www.pathagar.com

৫৭০-১৯৭০/১৪০০ বছর

হজরত মুহম্মদ (দ.)-এর চতুর্দশ জন্মশতবার্ষিকী

হজরতের জন্মদিন নিয়ে বিস্তর আলোচনা, সবিস্তর তর্কাতর্কি মোটামুটি এই চোদ্দশো বছর ধরে চলছে, এবং চলবেও।

আজ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে, শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। আরবি চান্দ্রমাসের গণনায় আজ রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ। দ্বাদশ শব্দের ফারসি : দোওয়াজদহম। দো = দ্ব = দুই; দহম = দশম = দশ। অর্থাৎ দ্বিদশ। বলা হয়, হজরত মুহম্মদ এইদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই চান্দ্রমাস রবিউল আউয়াল-এর বারো তারিখকে বলা হয় ফৎহ্-ই-দোওয়াজ্দহম্। দোওয়াজ্দহম্ শব্দের অর্থ এইমাত্র নিবেদন করেছি। ফৎহ্ শব্দের অর্থ জয়। এই আরবি শব্দটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। শিখেরা "গুরুজিকি ফতেহ্" জয়ধ্বনি করেন; বাদশা আকবর নির্মিত ফতেহ্পুর সিক্রি অনেকেই দেখেছেন।

কবি মরহুম গোলাম মোস্তফা তাঁর 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন।

পক্ষান্তরে সুপণ্ডিত মরহুম মাওলানা মোহম্মদ আকরম খান তাঁর 'মোস্তফাচরিত' গ্রন্থে বিস্তর গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেছেন, হজরতের জন্ম হয়, ৯ রবিউল আউয়াল; ১২ নয়।

কিন্তু বাঙলা দেশের জনসাধারণ, তথা উভয় বাঙলার সরকার মেনে নিয়েছেন যে হজরতের জন্ম হয় ১২ তারিখে। কিন্তু সেটা চাঁদ দৃশ্যমান হবার ওপর নির্ভর করছে। কাজেই কেউ কেউ ১৮ মে, অন্যেরা ১৯ মে হজরতের জন্মদিবস (ঈদ-ইদ-মিলাদ-উন-নবি; ঈদ্ = আনন্দদিবস, মিলাদ = জন্মক্ষণ— ও-ল-দ ধাতুর অর্থ 'জন্ম দেওয়া', তার থেকে মওলিদ, মিলাদ, মওলুদ্ অনেক শব্দই প্রায় একই অর্থে এসেছে, এমনকি আরবের খ্রিস্টানরা বড়দিনকে বলে 'ঈদ, উল্ মিলাদ্' তাই পাঠক নির্ভয়ে আজকের পরবকে 'মিলাদ্ শরিফ'— শরিফ = উচ্চ, সম্মানিত, ভদ্র— 'মওলুদ শরিফ', 'ঈদ্-ই মিলাদ' যা খুশি বলতে পারেন। কিংবা পূর্বোল্লিখিত আরবি-ফার্সির সংমিশ্রণে ফৎহ্-ই-দোওয়াজ্দহম্ও বলতে পারেন।

নবী, পয়গম্বর, রসুল ইত্যাদি শব্দ একই ব্যক্তি, অর্থাৎ হজরতকে বোঝায়।

হজরতের জন্মদিন নিয়ে দেশের জনসাধারণ যা মেনে নিয়েছেন আমরাও তাই মেনে নিলুম। এখন প্রশ্ন তাঁর জন্ম কোন বৎসরে?

কেউ বলেন ৫৬০ খ্রিস্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ।

মোদ্দা কথা এই : যখন কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তখন তো মানুষ জানে না, তিনি একদিন মহাপুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। তদুপরি হজরত জন্মগ্রহণ করেন বিত্তহীন অনাথের গৃহে। সে-কালে মক্কা শহরে লেখাপড়ার খুব একটা চর্চা ছিল না (হজরতকে লেখাপড়া শেখাবার কোনও চেষ্টা তাঁর বাল্যবয়সে করা হয়নি; বস্তুত তিনি নিরক্ষর ছিলেন)— কে লিখে রাখবে তাঁর জন্মদিন?

এটা শুধু হজরতের বেলায়ই নয়। বুদ্ধদেব, মহাবীর, জরথুস্ত্র, খ্রিস্ট এঁদের সকলেরই জন্মদিবস এমনকি জন্মবছর নিয়েও পণ্ডিতেরা আদৌ একমত নন।

হজরতের পরলোকগমন দিবস সম্বন্ধে কোনও মতানৈক্য নেই। তিনি মরধাম ত্যাগ করেন ৭ জুন, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। এবং হিজরি তারিখ অনুযায়ী ১২ রবিউল আউয়াল। অর্থাৎ তাঁর

www.pathagar.com

জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই দিবসে। এতে ভক্ত মুসলমান মাত্রই আল্লাহতালার অদৃশ্য অঙ্গুলিসংকেত দেখতে পান।

পূর্বেই নিবেদন করেছি হজরতের জন্মবৎসর ৫৬০, ৫৬৯, ৫৭০ বলা হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকেই স্কুলে পড়েছি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। সেই জনমতই আমরা আবার মেনে নিলুম। এখন যাচ্ছে ১৯৭০। তা হলে এই বৎসর, এই মাসে, এই দিনে হজরতের ১৪০০ জন্মদিন। তাই বহু মুসলমান এদিনটিকে বিশেষ সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু এখানে কিঞ্চিৎ মতভেদের সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের বৎসর গণনা চন্দ্র নিয়ে। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে হ্রস্বতর। তদুপরি গণনাতে আরেকটা অসুবিধা আছে। মুসলমানদের বৎসর হিজরি, গণনা আরম্ভ হয় জুলাই ১৬, ৬২২ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু তার পূর্বে আরবরা বৎসর গণনা করত সৌর বৎসরে। হিসাব তাই কঠিনতর হয়ে যায়। এবং সর্বশেষ বিপদ, যে খ্রিস্টান ক্যালেন্ডার নিয়ে আমরা সন তারিখ গণনা করি তারও পরিবর্তন সংস্কার একাধিকবার হয়েছে।

অতএব এসব হিসাব আপনার-আমার মতো সাধারণ জনের কর্ম নয়। আমরা সরল বিশ্বাসী। স্কুলে পড়েছি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হজরত মুহম্মদের জন্ম হয়। আজ তাঁর জন্মদিন। এবং উপস্থিত ১৯৭০। অতএব আজ তাঁর ১৪০০ বৎসরের জন্মদিন। আজ আনন্দের দিন। ঈদের দিন। মুসলমান হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, (মারওয়াড়ি) সক্কলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হয়।*

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষের সর্বত্র যে রূপে প্রকাশ পায়, বাংলাদেশে সে রূপ গ্রহণ করে না। উত্তর ভারতের অন্যত্র হিন্দুরা হিন্দি বলেন পড়েন, মুসলমানরা উর্দুর সঙ্গে যুক্ত। তেজবাহাদুর সপ্রু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জাতীয় উর্দু ভাষাভাষী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এককালে বিহারে বহু মুসলমান হিন্দি শিখিতেন; শুনিতে পাই, তাঁহারাও নাকি হিন্দি বর্জন আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাসী— তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমান হউন বাংলা বলেন ও পড়েন। কাজেই ভাষার কল্যাণে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে চিনিবার সুযোগ পায়। মিশরে কপ্ট-রা ক্রিশ্চান ও বাদবাকি বাসিন্দা আরব মুসলমান। কিন্তু উভয়ের ভাষা এক বলিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিলনের সুবিধা হইয়াছে। প্যালেস্টাইনে নবাগত ইহুদিরা হয় ইউরোপীয় কোনও ভাষা বলে নতুবা মৃতপ্রায় ইয়েডিশ ভাষাতে। কলহ লাগিয়াই আছে।

বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুর কৃষ্টি-সভ্যতা সাধারণ বাঙালি হিন্দু যতটুকু (পরিতাপের বিষয় সে ধূলপরিমাণে) জানেন ইচ্ছা করিলেই ততটুকু অক্লেশে জানিতে পারেন ও অনেকেই

* এই সামান্য লেখনটি লেখার উদ্দেশ্য : বহু হিন্দু এবং অনেক মুসলমান হজরতের জন্মদিন, পরলোকদিবস সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল নন বলে মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করেন। পণ্ডিতরাই যে বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি, সে স্থলে আমাদের অযথা কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

www.pathagar.com

জানেন। সাধারণ বাঙালি হিন্দু যেটুকু বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-ভাগবত, ষড়দর্শন, কাব্য-নাটক পড়েন, তাহা বাঙলা অনুবাদে ও বাদবাকি বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব রামপ্রসাদী, পরমহংসদেবের রচনামৃত তো মূল বাঙলাতেই আছে। ফলিত-গলিত জ্যোতিষের জন্য বিরাট পঞ্জিকা আছে। বলিতে কি, গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা বেদ-উপনিষদ গীতাকে হার মানাইয়াছে। আশ্চর্য হইবারই বা কী আছে? ভবানীকে যখন মহাকাল এক বৎসরকালের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া শুধু ওই বৎসরেরই ফলাফল নিবেদন করেন, তখন তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে কোন নাস্তিক? আমরাও করি না। বস্তুত সরকারি আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা ক্ষণা দেবীর উপর অন্তত আমার বিশ্বাস ভরসা বেশি।

সে যাহাই হউক। আসল কথা এই যে, অনুবাদ সাহিত্যে বাঙলা এখন এতটা সমৃদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা সাধারণ বাঙালি নিজেকে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখিতে পারেন। বাঙালি মুসলমানও এই সাহিত্য হইতে অনেক কিছু পারেন। উপায় নাই। এইসব অনুবাদ, মূল বৈষ্ণব পদাবলি, মেঘনাদ বধ কাব্য, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদি বাদ দিলে প্রাক্ রবীন্দ্র-সাহিত্যে রইল কী?

এখন প্রশ্ন, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের অথবা হিন্দুর দ্বারা লিখিত মুসলমানি সাহিত্যের কতটা খবর রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন?

বাঙালি-হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা লিখিত পুস্তক যে পড়েন না বা কম পড়েন, তার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মুসলমানদের ভিতর শক্তিমান লেখক বড় কম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, আজ যদি কোনও মুসলমান শরৎবাবুর মতো সরল ভাষায় মুসলমান চাষি ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন, তবে কোন হিন্দু না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন? আরব্যোপন্যাসের বাঙলা তর্জমা এখনও হাজার হাজার বিক্রয় হয়— যদিও তর্জমাগুলো অতি জঘন্য ও মূল আরবি হইতে একখানাও এযাবৎ হয় নাই। আবু সঈদ আইয়ুবের লেখা কোন বিদগ্ধ বাঙালি অবহেলা করেন? কিন্তু তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন; মুসলমান জীবন অঙ্কিত করা বা মুসলমানি কৃষ্টি বা সভ্যতার আলোচনা তিনি করেন না। বাঙালি কবীরকে কে না চিনে?

মুসলমানদের উচিত কোরান, হদিস, ফিকাহ, মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনী (ইবনে হিশামের উপর প্রতিষ্ঠিত) মুসলিম স্থপতি শিল্পকলা ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ইবনে খলদুন), দর্শন কালাম ইত্যাদি ইত্যাদি কত বলিব— সম্বন্ধে প্রামাণিক, উৎকৃষ্ট সরল সস্তা কেতাব লেখা। লজ্জার বিষয় যে, ফারসিতে লিখা বাঙলার ভূগোল ইতিহাস বাহার-ই-স্তানে গাঈবীর বাঙলা তর্জমা এখনও কেহ করেন নাই।

শুনিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইসলামিক কালচর' বিভাগ আছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকেরা নানারকম পুস্তক প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিয়া 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম সার্থক করেন। মুসলমান অধ্যাপকেরা কি লেখেন? লিখিলে কি উজবেকিস্তানের ভাষায় লেখেন?

মুসলমানদের গাফিলি ও হিন্দুদের উপেক্ষা আমাদের সম্মিলিত সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। দুইজন একই ভাষায় বলেন; কিন্তু একই বই পড়েন না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম!

www.pathagar.com

গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি গিরিশবাবুর কোরানের তর্জমা এককালে নাকি বহু হিন্দু পড়িতেন এবং তখন নাকি সে তর্জমার কদর হিন্দুদের মধ্যেই বেশি ছিল; কারণ মুসলমানরা তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই যে, কোরানের বাংলা অনুবাদ করা শাস্ত্রসম্মত কি না।

পরবর্তী যুগে মীর মশারফ হুসেন সাহেবের *বিষাদসিন্ধু* বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন (পুস্তকখানা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নহে; অনেকটা পুরাণ জাতীয়, বিস্তর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ)। ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরবি-ফারসি শব্দযোগে তাঁহাদের লেখায় কিঞ্চিৎ মুসলমানি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। তার পর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালি হিন্দু তখন প্রথম জানিতে পারিলেন যে, মুসলমানরাও কবিতা লিখিতে পারেন; এমনকি উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন। কাজী সাহেবের কবিতার ব্যঞ্জন বুঝিবার জন্য প্রচুর হিন্দু তখন মুসলমান বন্ধুদের 'শহীদ' কথার অর্থ, 'ইউসুফ' কে, 'কানান' কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজী সাহেব তাঁহার *ধূমকেতু* কাগজে মুসলমান সমাজের পঙ্কিল দিকটা যত না আক্রমণ করিলেন, তাহার অপেক্ষা বহু কম করিলেন ইসলামের সুন্দর ও মঙ্গলের দিকের বর্ণনা। ইতোমধ্যে মৌলানা আকরম খান প্রমুখ মুসলমান লেখকেরা ইসলাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক লিখিতেন। খুব কম হিন্দুই সেগুলো পড়িয়াছেন। এখনও *মাসিক মোহাম্মদী*তে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সাধারণ হিন্দু *মোহাম্মদী* কিনেন না; বিশেষত পদ্মার এপারে। সুখের বিষয়, মৌলবি মনসুরউদ্দীনের 'হারামণিতে' সংগৃহীত মুসলমানি আউল-বাউল-মুরশিদিয়া গীত হিন্দু-মুসলমান গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া সঞ্চয়নখানি প্রকাশিত হয়।

২

সর্বজাতি-ধর্মবর্ণ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিবে ও সেই সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীর মধ্যে স্থায়ী আসন লইয়া সত্য ও ধর্মের পথে চলিবে, কংগ্রেসের ইহাই মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে কংগ্রেস কখনও বিশ্বাস হারাইবে না, ও আজ যদি কোনও বিশেষ বর্ণকে নির্যাতন করিয়া অথবা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বলি দিয়া কংগ্রেস স্বরাজ পাইবার সম্ভাবনা দেখিতে পান, তবুও তাহা গ্রহণীয় মনে করিবে না।

উপস্থিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। 'রাজনৈতিক চিন্তাধারায়' বলিতেছি, কারণ আপামর জনসাধারণ এই সমস্যা দ্বারা কতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহার পরিমাণ দ্বিধাহীনরূপে আমাদের কাছে এখনও প্রকাশ পায় নাই।

মুসলমানদের কোনও কোনও নেতা বলেন, 'আমাদের ধর্ম পৃথক, আমাদের আদর্শ পৃথক, আমাদের অনুভূতির জগৎ পৃথক, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই পৃথক, এক কথায় আমরা আলাদা জাতি বা নেশান।'

www.pathagar.com

কংগ্রেস ইহা স্বীকার করেন না; বহু মুসলমানও করেন না। প্রায় সকল বিদেশি মুসলমানও ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তুর্কি মুসলমানেরা। তাবৎ প্রাচ্যশক্তিরই বাসনা যে, ভারতবর্ষের সর্বজাতি মিলনের ফলে উপজাতি মহতী শক্তিই প্রাচ্য তথা বিশ্বের মঙ্গল আনয়ন করিবে।

হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক নেশন কি না তাহা দুই দৃষ্টিবিন্দু হইতে দেখা যাইতে পারে। এক, হিন্দু-মুসলমানের উপস্থিত চিন্তা অনুভূতি ও জীবনীধারার পার্থক্যের হিসাবনিকাশ করিয়া মীমাংসা করা, তাহারা দুই পৃথক নেশন কি না; অথবা (দুই) ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া সিংহাবলোকন করা,— অর্থাৎ ইতিহাস কি এই সাক্ষ্য দেয় যে অতীতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সাহায্য-বর্জিত স্বকীয় বিশেষ কৃষ্টি, ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া আপন নেশনত্ব উপভোগ করিতেছিলেন; আপন ভুবনে বাস করিতেছিলেন? ইংরেজ যেরকম আজ এই দেশে দুই শত বৎসর কাটাইয়াও আপন ভাষায় কথা বলে; আপন আহার করে ও করিবার সময় দেশের 'হ্যাম-বেকনের' স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; আপন সঙ্গীত দেশের লোকের কর্ণকুহর প্রপীড়িত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গায়, এদেশের প্রখর আলো উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার চিত্তে তাহার অন্ধকার দেশের মানানসই তীব্র বর্ণযুক্ত ওয়েলপেন্টিং দ্বারা এদেশের প্রাচীর প্রলেপন করে, অবকাশ পাইলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে কালবিলম্ব না করিয়া 'হোম' ছোটে, নয়াদিল্লিতে শিরঃপীড়া ও হৃদিত্রাস সঞ্চার স্থাপিত সৃষ্টি করে; নগরীর যত্রতত্র বেমক্কা মানুষকে ঘোড়ায় বসাইয়া 'প্রতিমূর্তি' নির্মাণ করে; যতদূর সম্ভব আপন 'কাস্ট ক্লব' করিয়া দেশের সামাজিক জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখে; ও বিশেষ প্রাত্যহিক নিত্যকর্ম এমনভাবে করে যে, তদ্দর্শনে তাবৎ ভারতবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সচকিত হয়। নিন্দা করিতেছি না— পার্থক্য দেখাইতেছি মাত্র।

স্বীয় উক্তিতে মুসলমানরা নিজেকে যত পৃথকই ভাবেন না কেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহারা সায়েবদের মতো 'পাণ্ডববর্জিত' পার্থক্য ধরেন না।

পার্থক্য আছে এবং অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সম্মিলিত সাহিত্য-কাব্য-ধর্ম প্রচেষ্টাও আছে। প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টি দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দুইটির বিচার করা কর্তব্য। তৎপর দ্রষ্টব্য, ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গীণ মিলনের জন্য কোন আনন্দলোকের দিকে দিঙনির্ণয় করে।

ধর্মে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য আছে— অনৈক্য আছে কি না, তাহা পরে বিচার্য। ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুর মতো উদার জাতি পৃথিবীতে আর নাই। হিন্দু বহু দেবতা মানিতে পারে, না-ও মানিতে পারে; উপনিষদের আত্মন ব্রহ্ম একাত্মানুভূমিতে তাহার মোক্ষের সাধন করিতে পারে, না-ও পারে, গীতার পরমপুরুষকে উপেক্ষা করিয়া বৃন্দাবনের রসরাজকে হৃদয়আসনে বসাইতে পারে, না-ও পারে, সর্বভূতে দেবীকে শান্তিরূপে দেখিতে পারে, না-ও পারে; পূর্বজন্ম পরজন্ম মানিতে পারে নতুবা স্বর্গনরককে বিশ্বাস করিতে পারে অথবা উভয়ের সম্মিলনও করিতে পারে। এক কথায় হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডিবদ্ধ নহে। কিন্তু তবু আমরা অনায়াসে দৈনন্দিন জীবনে জানি— কাহার ধর্মবিশ্বাস হিন্দুর ন্যায়, কাহার নহে।

মুসলমানরা ধর্মবিশ্বাসে কঠোর নিয়মের বশবর্তী। আল্লা এক কি বহু সে সম্বন্ধে কোনও মুসলমান আলোচনা করিতে সম্মত হইবেন না, মহাপুরুষ মুহম্মদ যে সর্বশেষ নবী

www.pathagar.com

(Prophet) সে বিষয়ে কোনও মুসলমানের সন্দেহ করিবার উপায় নাই। মৃত্যুর পর বিচার ও স্বর্গ অথবা নরক, এই তাহার নিঃসন্দেহ বিচার। ইহার যে কোনও একটি সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিলে সে ধর্মচ্যুত বা কাফির হইয়া যায়।

ফল এই দাঁড়ায় যে, ধর্মসিদ্ধান্ত লইয়া পণ্ডিত যখন জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে মৌলানার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহেন, তখন তিনি কবুল জবাব দেন। (মৌলানার ঔদার্য অন্য স্থলে— তাহার আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে হইবে।)

ইহাই একমাত্র কারণ, কেন মুসলমান আগমনের পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমান ধর্মদর্শনের প্রভাব, চিহ্ন-নিশানা কিঞ্চিৎ মাত্র নাই। প্রক্ষিপ্ত অল্লোপনিষদ শুধু সাধারণ নিয়মের দিকে রূঢ় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের পরিতাপ বাড়াইয়া দেয়। অন্যদিকে মুসলমানদের ধর্মদর্শন আলোচনা এই ষড়দর্শনের দেশে এই— মধুর ধর্মের দেশে নির্বিকার চিত্তে আপনার ঐতিহ্যানুসরণ করিল, অবহেলা করিয়া কী বিত্ত হারাইল বুঝিল না।

দুনিয়ার এই দুই বিরাট ধর্ম সাতশো বৎসর পাশাপাশি কালযাপন করিল অথচ একে অন্যকে সমৃদ্ধ করিল না— এ যেন জলের মধ্যে মীন তৃষ্ণায় কাতর রহিল!

কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্য আছে। খ্রিস্টধর্ম তাহার নাম দিয়াই খ্রিস্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ইসলাম তাহার অত্যন্ত সরল অর্থের দিকে পুনঃপুন অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সে অর্থ সকলেই জানেন। তাঁহাকে স্বীকার করিয়া স্পেন হইতে জাভা পর্যন্ত বহুমানব যুগে যুগে আত্মার শান্তি পাইয়াছে— ইসলাম অর্থাৎ শান্তির ধর্ম।

হিন্দুরাও সর্ব তর্ক, সর্ব আলোচনা, সর্ব পূজা, সর্ব উপাসনার পর বলেন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। নতমস্তকে বলেন, পৃথিবীতে শান্তি হউক, অন্তরীক্ষে শান্তি হউক; মুসলমানেরা বলেন ইহলোকে (দুনিয়া) শান্তি হউক, পরলোকে (আখিরা) শান্তি হউক।

তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল এই হিংস্র নিন্দা ভারতবর্ষে প্রচার করে একদল দুষ্ট স্বার্থান্বেষী। সে আলোচনা অবান্তর বলিয়াই বারান্তরে।

হিন্দু-মুসলমানে সম্পূর্ণ, অখণ্ড মিলন হইয়াছিল অন্যান্য বহু প্রচেষ্টায়; সেগুলি ধর্ম ও দর্শন অপেক্ষা হীন তো নহে। বরঞ্চ কেহ কেহ বলেন, মানবসমাজে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিশেষত অদ্যকার যুগে। ভাষা নির্মাণ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থপতি, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র রাজনীতি অর্থনীতি বসনভূষণ, উদ্যাননির্মাণ, আমোদ-আহ্লাদ কত বলিব। এই সব প্রচেষ্টার পুণ্য, পূর্ণ ইতিহাস কেন, আংশিক ইতিবৃত্তও হয় নাই। যেদিন হইবে সেদিন সেই সুদর্শন পূর্ণাঙ্গ দেবশিশুকে হিন্দু-মুসলমান কর্তন করিতে চাহিবে এ বিশ্বাস আমাদের কিছুতেই হয় না।

আসল কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। সেটি এই : হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সংজ্ঞাবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডিবদ্ধ নহে বলিয়া তিনি সে বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত। মুসলমানের দ্বিধাহীন একমত বলিয়া তিনি অসম্মত। ফলে উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সংমিশ্রণ হয় নাই।

তবুও হয়তো কিঞ্চিৎ হইত যদি সামাজিক ক্ষেত্রে উভয়ে মিলিত হইতে পারিতেন। সামাজিক ব্যাপারে মুসলমান উদার। হিন্দুর সঙ্গে এক গৃহে বসবাস করিতে মুসলমানের কোনও আপত্তি নাই, একই পাকের ভাত, ডাল, মাছ, কাসুন্দি সকাল-সন্ধ্যা পরমানন্দে খায়— প্রশ্ন করে না কে রন্ধন করিয়াছে— একই সরোবরে স্নান করে, একই যানে ভ্রমণ করে এবং

www.pathagar.com

রুগ্ণ হইলে বৈদ্যরাজকে ডাকা সম্পর্কে তাহার সম্পূর্ণ স্বরাজ। মৃত্যুর পর তাহাকে শ্মশানে গোর দিলেও তাহার ধর্মচ্যুতি হয় না।

অর্থাৎ মুসলমান বলে, 'শাস্ত্রচর্চা করিতে অসম্মত বটি, কিন্তু আইস একসঙ্গে বসবাস করি।' হিন্দু বলে, 'বসবাস করিতে পারিব না, কিন্তু শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রস্তুত।' এক কথায় হিন্দু যেখানে উদার মুসলমান সেখানে সংকীর্ণ ও মুসলমান যেখানে উদার হিন্দু সেখানে সংকীর্ণ। অর্থাৎ উভয়ের জন্য বারোয়ারি চাঁদোয়া অথবা সর্বজনীন চন্দ্রাতপ নাই।

(দোষাদুষির কথা হইতেছে না। আমরা ইতিহাসের যে শিখরে দাঁড়াইয়া দিকনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এমনি বিজড়িত যে, একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করিলে উভয়েরই পতন ও অস্থিভঙ্গের সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।)

উপরোল্লিখিত রোগনির্ণয় সাধারণ মোটামুটিভাবে করা হইল। কিন্তু ইহার ব্যত্যয়ও আছে ও সেই সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য যে, উপরোল্লিখিত রোগ মৌলানা ও শাস্ত্রীমণ্ডলীর। দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ শাস্ত্র লইয়া অত্যধিক শিরঃপীড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয় না; পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া একে অন্যের সঙ্গে মিলিতে ও এমনকি বসবাস করিতেও বাধ্য হয়— কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখনও উত্থাপিত করিবার সময় হয় নাই। দ্বিতীয় এই যে, শাস্ত্রালোচনা করিবার ঔদার্য শাস্ত্রীর আছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতবর্ষে ট্রেড সিক্রেট জাতীয় একটি নিন্দনীয় ঐতিহ্য অর্ধ-পণ্ডিতদের ভিতরে আছে। যোগ ও তন্ত্র শিক্ষা করিতে যাঁহারাই চেষ্টা করিয়াছেন— হিন্দু-মুসলমান যিনিই হউন— তাঁহারাই জানেন যে, গুণীরা জ্ঞানদানে কী পরিমাণ পরাঙ্মুখ। ফলিত-জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, প্রতিমা-নির্মাণ, সঙ্গীত জাতীয় অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও প্রয়োজনীয় বিদ্যার কথা বাদই দিলাম। অবশ্য একটি কারণও আছে, তাহাকে শাস্ত্রাধিকার বলে। অপক্ক পাত্রে যোগের ন্যায় অত্যুষ্ণ ঘৃত রাখিলে যে সে সহ্য করিতে পারিবে না তাহাতে আর কী সন্দেহ? কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রই অকপটচিত্তে স্বীকার করিবেন যে এই শাস্ত্রাধিকার লইয়া অর্ধদগ্ধ পণ্ডিতেরা— সত্যকার বিদগ্ধেরা নহেন— অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন ও যোগ্য ব্যক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

গজনির বিখ্যাত মহমুদের সভাপণ্ডিত গুণীজন দ্বারা মহমুদ অপেক্ষা অধিক সমাদৃত অল-বিরুনি তাঁহার *ভারতবর্ষ* পুস্তকে এই লইয়া পুনঃপুন পরিতাপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য ও জ্ঞানতৃষ্ণার প্রশংসা করিতে হয় ও যেসব পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হইয়াছিল, তাঁহাদের কয়েকজনকে তসলিম করিতে হয় যে, তাঁহারা অকৃপণভাবে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। না হইলে অল-বিরুনি ষড়দর্শন, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিতেন কী প্রকারে? (এই প্রসঙ্গ হয়তো পুনর্বার উত্থাপিত হইবে না, তাই একটি জিনিসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; অল-বিরুনি তাঁহার পুস্তকে *মহাভারতের* যে পর্ববিভাগ ও তাহাদের শিরোনামা দিয়াছেন, সেগুলির সঙ্গে অদ্যকার প্রচলিত *মহাভারতের* বিস্তর অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এ বিষয় লইয়া কোনও গবেষণা এযাবৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বলিয়া গুণীজনের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। Sachau-এর *India* নামক ইংরেজি অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

www.pathagar.com

দুই ধর্মের চরম নিষ্পত্তি সম্মিলিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে উচ্চাঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে মিলিত করিবার আর একটি প্রক্ষিপ্ত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সে উদাহরণটি এমনি ছন্নছাড়া, যূথভ্রষ্ট যে, বিশ্বাস হয় না এমন সাধনা সে-যুগে কী করিয়া সম্ভব হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় রাজকুমার দারাশিকুহ'র কথা স্মরণ করিতেছি। কী অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ উপলব্ধির সম্মেলনে তাঁহার 'মুজম-ই বহরেন' বা দ্বিসিন্ধুমিলন সৃষ্ট হইল। ১৮২০-৩০-এর সময় রাজা রামমোহন উপনিষদকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া ভারতে প্রখ্যাত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান— কার্যটি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার প্রায় দুইশো বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সর্বাধিক বিলাসব্যসান মোগল রাজপরিবারের ফারসি-ভাষাভাষী সুকুমার রাজকুমার যৌবনের প্রারম্ভে কী করিয়া সংস্কৃতের বিরাট ভাণ্ডার হইতে এই অক্ষয়, অনাদৃত খনিটি কোন যোগবলে আবিষ্কার করিলেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাখিয়া তাহার অনুবাদ ফারসিতে করাইলেন— পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি মূল পাণ্ডুলিপিতে নাকি দারার স্বহস্তে কৃত শুদ্ধি সম্মার্জন মার্জিনে আছে। সেই ফারসি তর্জমা জেসুইয়ট দ্য পেরোঁ লাতিনে অনুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ জানি না কী করিয়া জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কান্টের দেশের লোক, প্লেটোর ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত, হেগেলের সমসাময়িক এই দর্শনার্ণনের জর্মন কর্ণধার বলিলেন, 'উপনিষদ আমার জীবনে শান্তি আনয়ন করিয়াছে।' তার পর জর্মনি ও পরে ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উপনিষেদের খেই ধরিয়া নানা পণ্ডিত নানা সংস্কৃত জর্মনে তর্জমা করিলেন— সর্বত্র ভারতীয় বিদ্যা ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সেকথা আজ থাক। অনুসন্ধিৎসু এই লোমহর্ষক লুপ্তগৌরব প্রত্যর্পণকারিণী কাহিনী জর্মন পণ্ডিত বিন্টারনিৎস (Winternitz) ও শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণের 'ঈস্টার্ন আইডিয়ালিজম্ ও বেস্টার্ন থট' পুস্তকে পাইবেন।

দারাশিকুহ'র *দ্বিসিন্ধুমিলনে* তিনি ইসলামের সাধনামণি সুফিতত্ত্ব ও হিন্দু দর্শনের চিন্তামণি বেদান্ত তাঁহার জ্ঞানকাঞ্চনাঙ্গুরীয়তে একাসনে বসিয়া যে রশ্মিধারার সম্মেলন করিলেন, হায়, তাহা দেশের তমসান্ধকারকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।

কিয়ৎকাল পরেই 'প্রলয় প্রদোষে মোগলের উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিত' হইতে লাগিল, শবলুব্ধ গৃধ্রীদের বীভৎস চিৎকারের মধ্যে যোগাঙ্গুরীয় কোন অন্ধকারে বিস্মৃত বিলুপ্ত হইল।

পুনর্বার ক্ষীণচেষ্টা দেখা গেল— সুভাষচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে সে প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তখন বিদেশি আসিয়াছে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম।

তার পর? তার পর লজ্জা ঘৃণা পাপ
অপমান; প্রকাশিল অন্তহীন শাপ

হিন্দু-মুসলমান ক্ষত্রিয়েরা যখন ১৮৫৭ সালে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া সফল হইলেন না তখন তাঁহাই উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলাম।

যুগ্ম ক্ষাত্রতেজে তার পাপ প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদমন্ত্র ছিদ্রান্বেষী পরম্পরাঘাত
হইল বিজয়টিকা সে অভিসম্পাত ॥

www.pathagar.com

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
না
ভাই ভাই এক ঠাঁই?

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা সর্বপ্রথম করেন অল-বিরুনি ও পরবর্তী যুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সাধনার যে চরম উৎকর্ষ বেদান্ত ও সুফি মতবাদে বিদ্যমান, তাহাদের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করেন রাজকুমার দারাশিকুহ। আমরা বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছি সেখানে প্রশ্ন ওঠে, আর কি 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' বলা চলে, না এখন বরঞ্চ বলিব 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'?

এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিবেদন করি।

খ্রিস্টানরা যেরকম এদেশে সিরিয়ন ক্যাথলিকবাদ, রোমান ক্যাথলিকবাদ এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নানা চার্চ বা মতবাদ স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, মুসলমানরাও সেইরূপ সুন্নি, শিয়া ও অন্যান্য নানারকম মজহব (Seeds) প্রচলন করার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে পাঠান রাজত্ব সর্বত্র পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে মুসলিম অবৈতনিক মিশনারিরা এদেশে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করিবার প্রয়াস করেন ও বেশিরভাগ সমুদ্রযোগে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, অর্থাৎ সিন্ধু দেশ হইতে কেপ কমরিণ পর্যন্ত কর্মস্থল বিস্তৃত করেন।

যাঁহারা ফিটজিরাল্ড কৃত ওমর খৈয়ামের ইংরেজি অনুবাদের উপক্রমণিকাটি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে যে, ওমর খৈয়ামের বন্ধু হিসাবে আরেকটি লোকের নাম তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে— সে নাম হাসন বিন্ সব্বার। এই হাসন সব্বা স্বধর্ম ও স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে পারস্যে এক ভয়ঙ্কর গুপ্তঘাতকদের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন; সেই ঘাতকদের নাম হশিশিয়ুন এবং হশিশিয়ুনরা ক্রুসেডের নাইটদের মধ্যে এমনই আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে, সেই হশিশিয়ুন শব্দ ল্যাটিনের ভিতর দিয়া ইতালির assassino হইয়া, ফরাসি assassin-এ রূপান্তরিত হইয়া ইংরেজিতে সেই বানানেই প্রচলিত আছে। হানন সব্বা পারস্যে আপন কর্মভূমি সীমাবদ্ধ করেন নাই। বিদেশে স্বমত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায় গুজরাটে তিনি মিশনারি প্রেরণ করেন। তাঁহাদেরই একজন লোহানা রাজপুতদিগের মধ্যে অ্যাসাসিনদের শিয়া ধর্ম প্রচার করেন। ইঁহারা বর্তমানে পশ্চিম ভারতে 'খোজা' সম্প্রদায় নামে সুপরিচিত। কলিকাতার রাধাবাজারে ইঁহাদের কাহারও কাহারও কাপড়ের দোকান আছে।

এস্থলে শিয়া-সুন্নি মতবাদ লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ততোধিক নিষ্প্রয়োজন শিয়াদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের পার্থক্য লইয়া বাক্যব্যয় করা। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, হাসন সব্বার মতবাদী খোজা মুসলমানরা উত্তর ভারতের শিয়া হইতে ভিন্ন; উত্তর ভারতের শিয়ারা ইসনা আশারি অর্থাৎ বারোজন গুরুতে বিশ্বাস করেন, 'খোজারা' ইসমাইলি অর্থাৎ ইসমাইলকে শেষ প্রধান গুরু হিসাবে বিশ্বাস করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই সব বিভিন্ন মতবাদের আংশিক ইতিহাস *এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকস* এবং পূর্ব ইতিহাস *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে* পাইবেন।

www.pathagar.com

লোহানা রাজপুতরা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করিতেন ও সম্ভবত পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (Schrader-এর আজিয়ার হইতে প্রকাশিত *পাঞ্চরাত্র সিস্টেম* দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বৈষ্ণব যে ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই— কারণ তাঁহারা বিষ্ণুর দশ অবতারে বিশ্বাস করিতেন।

অদ্যকার খোজাদের মধ্যে কুরান শরিফের প্রচলন নাই। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি আংশিক কচ্ছের উপভাষায় ও আংশিক গুজরাতিতে লেখা। সেগুলি 'গিনান'। (সংস্কৃত 'জ্ঞান') নামে প্রচলিত ও তাহাদের মধ্যে 'দশাবতার' পুস্তক বা 'গিনান' সর্বাধিক সম্মান পায়। লোহানা রাজপুতদিগকে যে মিশনারি ইসমাইলি শিয়া মতবাদে দীক্ষিত করেন সেই নুর-সৎ-গুর ('নুর' আরবি শব্দ 'রশ্মি' অর্থে ও 'সৎগুর' 'সৎগুরু' হইতে) দশাবতারের প্রণেতা। খোজারা সাধারণ মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁহাদের স্বতন্ত্র 'জমাতখানা' বা 'সম্মেলন গৃহে' জমায়েত হন। বিশেষ পর্ব উপলক্ষে 'দশাবতার' পঠন হয়, প্রথম নয় অবতার মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করেন; কিন্তু দশমাবতারের কাহিনী আরম্ভ হইলে তাঁহারা দণ্ডায়মান হন।

এই দশমাবতার লইয়া বৈষ্ণব ও খোজার পার্থক্য। বৈষ্ণবমতে দশমাবতার কল্কি, খোজামতে দশমাবতার বহুকাল হইল মক্কায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন— তিনি মহাপুরুষ মুহম্মদের জামাতা হজরত আলি। (পাঠককে এইস্থলে স্মরণ করাইয়া দেই যে, গোঁড়া শিয়ারা আলিকে মহাপুরুষ মুহম্মদ অপেক্ষা সম্মান প্রদর্শন করে ও আদালুসের ইবনে হাজমের মতে এমন শিয়াও আছেন যাঁহারা বলেন, "দেবদূত = ফিরিস্তা জিবরাইল = Gabriel 'ভ্রমবশত' কুরান শরিফ হজরত আলিকে না দিয়া হজরত মুহম্মদকে দিয়া ফেলেন"!!! এবং আরও বিশ্বাস করেন যে, হজরত আলির মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসন তৎপর তাঁহার ভ্রাতা হুসেন, তৎপর জয়ন উল-আবেদিন তৎপর তাঁহার পুত্র হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে চলিতে বর্তমান জীবিত ইমাম বা গুরুতে বিরাজমান— বর্তমান গুরুর নাম পরে উল্লেখ করিব।

খোজারা অর্ধ-কচ্ছী-উপভাষা ও অর্ধ-গুজরাতিতে উপাসনা করেন— তাহাকে 'নামাজ' বলিলে ভুল বোঝানো হইবে। রমজান মাসে খোজারা উপবাস করেন না। হজ করিতে মক্কায় যান না— বর্তমান ইমাম বা গুরু দর্শনে হজের পুণ্যসঞ্চয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। গরিব দুঃখীকে 'জকাত' বা ধর্মাদেশানুযায়ী 'ভিক্ষা' দেন না, সে অর্থ গুরু দ্বারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে দেন। খোজারা পাঁচবারের পরিবর্তে তিনবার উপাসনা করেন এবং সুন্নি ও শিয়া মত হইতে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসে অন্যান্য বহু অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

খোজাদের 'গিনান' বা ধর্মগ্রন্থগুলি পড়িলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অ্যাসাসিন মিশনারিরা হিন্দু এবং শিয়া মতবাদের সম্মেলনে এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তাবৎ ভারতীয়দিগকে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ উল্লেখ করিলাম কারণ ইহা শিয়াদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। ইহার পর ভাষা নির্মাণে কাব্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন রসবস্তু সম্মেলনে যেসব প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ সুন্নিদের দ্বারা।

গুজরাতে 'মতিয়া' সম্প্রদায়ও বিবাহের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু মৃত্যুর পর শব কবরস্থ করিবার জন্য মোল্লার কাছে আরজি পেশ করেন। পশ্চিম উপকূলে এইরূপ নানা সংমিশ্রণের চিহ্ন সর্বত্র পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

এইসব চেষ্টার ফলেই ১৭৫০ সালে লিখিত গুজরাতের ফারসি ইতিহাস *মিরাত-ই অহমদিতে* দেখা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক কলহ তখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লেখক আলি মুহম্মদ খান তাঁহার হাজার পাতার (মুদ্রিত) পুস্তকে যে দুই একটি কলহের উদাহরণ দিয়াছেন সেগুলি তিনি সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় রূপেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খোজাদের বর্তমান গুরু হিজ হাইনেস দি আগা খান।

ভাই ভাই এক ঠাঁই

১

বারান্তরে হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রীয় মিলনের ফলে উপজাত 'খোজা' মতবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে যেস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার সম্মুখে মিলনের সুধা-শ্যামলিমদিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত— তাহার পুণ্য পরিক্রমা আরম্ভ করিব, এমন সময় একটি অতি আধুনিক ঘটনার দিকে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। কালানুপূর্বের ধারাবাহিকতার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা প্রদর্শন না করিয়া অসময়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা করিব, কারণ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিবিন্দু হইতে অসাময়িক হইলেও অবান্তর নহে।

গত মঙ্গল-শুক্রবারে* যখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ ও বহু বাঙালি-অবাঙালি স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদ করিয়া আন্তরিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তখন অনেকেই হয়তো আশা করিবার সাহস রাখেন নাই যে, মুসলমানেরা, বিশেষত মুসলমান ছাত্রসমাজ ইহাতে যোগদান করিবেন। আমরা নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি পাঠকের গোচর করিতেছি।

A large number of Muslim students participated in the recent disorders in Calcutta. One of them lost his life, and many received injuries, serious and light. The student of the Islamia College went on strike in sympathy with their Hindu fellow students and in protest against the firing and lathi charge by the police. The vice-president of the College Union presided over a huge meeting which passed appropriate resolutions. Large numbers of Muslims, other than students, also took part in the demonstrations. Many non-Muslims wonder why these Muslims have taken this attitude. The answer is not difficult to find. It is the Muslim way, the result of over 13 centuries of teaching expressed in the practice of the precepts laid down in the holy Qur'an and the traditions of the prophet Muhammad : Love your neighbours, side with him that is weak,

---

* ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ

www.pathagar.com

oppressed or ill-used, serve Allah by serving his creatures; the true Muslim is represented in his two little things, his heart and his tongue.

এতদিন ধরিয়া আমরা ঠিক এই কথাটিই বলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সর্বধর্মের মূলতত্ত্ব সমান, আমরা সকলে একথা স্বীকার করি; কিন্তু আচার-ব্যবহারে অশন-বসনে সেই তত্ত্বগুলি যখন প্রকাশ পায়, তখন অনেক সময় এমন বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া পীড়াদায়ক হইয়া উঠে যে, তখন মানুষ শুধু সেই মানুষগুলির আচরণের নহে তাঁহাদের ধর্মের উপরও দোষারোপ করিতে থাকে। সবিস্তর নিবেদন করি :

ইংরেজরা এদেশে খ্রিস্টধর্ম আনয়ন করেন। খ্রিস্টধর্ম মৈত্রী ও ক্ষমার ধর্ম। কিন্তু দেড়শত বৎসর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পরও এদেশে দেখি, দিশি খ্রিস্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, শ্বেত খ্রিস্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, আহার-বিহার সামাজিক গণ্ডি স্বতন্ত্র, এমনকি মৃত্যুর পাণ্ডুহস্ত স্পর্শেও কৃষ্ণ-খ্রিস্ট ধবল হয় না; তাহার জন্য স্বতন্ত্র গোরস্তান। ইংরেজ শাসকের স্বৈরতন্ত্র মুসলমান শাসকের 'এখতেয়ারি' অপেক্ষা সর্বাংশে অধিক, চর্মদাহে মর্মদাহে তাহা বার বার অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্মের ন্যায় উদার ধর্ম, এদেশে সসম্মানে বরিত ও নন্দিত হইল না। ধর্মপিপাসু মন বার বার শুধায়, ত্রুটি কোনখানে? হয়তো যাঁহারা বাহকরূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্মের সত্য সেবক ছিলেন না।

তাই বলি এদেশের মুসলমান ধার্মিক। ব্যাপক অর্থে ধার্মিক। তিনি আরব-তুর্ক-মোগল বিজেতাদের জন্য স্বতন্ত্র ধর্মাগার, ভোজনাগার, অনন্ত-শয্যাগার নির্মাণ করেন নাই। তিনি স্বধর্ম পালন করিয়া হিন্দুর প্রতিবাসী হইয়াছেন। বিদেশি-শকট-যুগ্ম যখন হিন্দু-মুসলিমের যুগ্ম-স্কন্ধকে চরম মর্দনে প্রপীড়িত করিল, তখন বর্ণ-ধর্ম ভুলিয়া দুই নিরীহ বলীবর্দ যুগ্ম-পদাঘাতে শকটারোহীকে সচেতন করিয়া দিল।

উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখক ইসলামের মূলনীতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন, সজোর লেখনী সঞ্চালনে প্রকাশ করিয়াছেন।

"We do not blame the action of the students, for that matter, the action of the other Muslims who took part in the demonstrations; but it is the students in particular whom we are addressing. We commend their action and admire it, Furthermore, we thoroughly understand the noble motives which have actuated them."

এ সত্য মুসলমানদের কথা! এ সত্য মানুষের কথা! ধর্মের কথা ন্যায়ের কথা! এই ভাই কোন ভিন্ন ঠাঁই যাইবে?

কিন্তু,

The Muslim students know fully well that their life and future are in jeopardy in a country where though a hundred million, the Muslim are in a minority. They realise the designs against them as Muslims.

মুসলমানদের ভীত হইবার কারণ আছে কি না সে প্রশ্ন আমরা কেন জিজ্ঞাসা করিব? কারণ লেখক নিজেই ভীত হন নাই— ভীত হইয়া স্বধর্মীয়দিগকে গণঅভিযান হইতে পশ্চাৎপদ হইতে বলেন নাই; নিজেই বলিতেছেন :

www.pathagar.com

Still they have not hesitated to plunge into the fury, why? It is the Muslim way. Their hearts told them the I. N. A. trial was unjust. The lathi charges were brutal, the firing absolutely unjustified. It was their bounden duty to sympathise. Their hearts, brimful with the sublime teachings of Islam made them translate their sympathy into action. Some of them fell, side by side, with those who, perhaps not in person, represented the terrible menace to Islam and Muslim in India.

It was the Muslim way, most nobly expressed.

আমেন। তথাস্তু!

আমাদের তো বলিবার আর কিছুই নাই। সাহস পাইলাম, ভরসা পাইলাম, যে দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের শঙ্খধ্বনি ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিবে, সেদিন তাহার রুদ্রদমন-চেষ্টা পুনর্বার ক্রূর বুধ-শুক্র রূপ ধারণ করিবে, সেই শুভদিনে প্রতিবাসী যখন প্রতিবাসীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে সেদিন তরুণ মুসলিম, প্রবীণ মুসলিম 'মুসলিম-ওয়ে' মুসলিম-পন্থায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে— তাহার বিরুদ্ধে কি 'design' কি 'menace' ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিবে না।

২

এতদিন যাবৎ হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির যেসব স্থলে যোগ হয় নাই তাহারই উল্লেখ করিতেছিলাম। দেখিলাম সাতশত বৎসর ধরিয়া ভট্টাচার্য টোলে সংস্কৃত ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন, কিন্তু ইসলামের নিকট হইতে কোনও ঋণ গ্রহণ করিলেন না; মৌলানা আরবি-ফারসি জ্ঞানচর্চা করিলেন, কিন্তু ভট্টাচার্যের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, হিন্দু দর্শন, মুসলমান দর্শন একে অন্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া জীবিত রহিল।

কিন্তু ইহাই কি শেষ কথা? ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান চাষা মজুর শতকরা কয়জন ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জীবনযাপন করিয়াছে, তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আদর্শ একে অন্যের সাহায্য লইয়া তাহারা কি পণ্ডিত-মৌলবিকে উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ করে নাই? ভট্টাচার্য তাঁহার দেবোত্তর জমি ও মৌলানা ওয়াকফদত্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতেন, উভয়ের উপর এমন কোনও অর্থনৈতিক চাপ ছিল না যে বাধ্য হইয়া একে অন্যের দ্বারস্থ হন। কিন্তু মুসলমান চাষা তো দম্ভ করিতে পারে নাই যে হিন্দু জেলেকে সে ধান বেচিবে না, হিন্দু জোলা তো এ অহংকার করিতে পারে নাই যে মুসলমানকে কাপড় না বেচিয়াও তাহার দিন গুজরান হইবে।

শাস্ত্রী ও মৌলানা যেসব কারণবশত সর্বজনীন চন্দ্রাতপতলে একত্র হইতে পারিলেন না, সেসব কারণ তো চাষামজুরের জীবনে প্রযোজ্য নহে। ব্রহ্ম এক কি বহু, সগুণ কি নির্গুণ— তাহা লইয়া সে হয়তো অবসর সময়ে কিছু কিছু চিন্তা করে, কিন্তু এসব তো তাহার কাছে জীবনমরণ সমস্যা নহে— এমন নহে যে, ওই সম্পর্কে কলহ করিয়া একে অন্যের সঙ্গে

www.pathagar.com

যোগাযোগ রাখিবে না। তাহার উপর অর্থনৈতিক চাপ নির্মম চাপ, যাহাকে বলে অন্নচিন্তা চমৎকারা। তাই দেখিতে পাই মোল্লা-মৌলবির বারণ সত্ত্বেও মুসলমান চাষা জানিয়া-শুনিয়া হিন্দুকে বলির জন্য পাঁঠা বিক্রয় করে, পয়সা রোজগারের জন্য বিসর্জনে ঢোল বাজায়; হিন্দু গয়লা মুসলমান কসাইকে এঁড়ে বাছুর বিক্রয় করে। এই কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান শব্দার্থে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগ লইয়াছে। আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাইয়াছে। সেসব কি তাহারা ধর্মে, লোকসাহিত্যে, গানে, ছবিতে প্রকাশ করে নাই? যদি করিয়া থাকে তবে তাহা পুস্তকাবদ্ধ নস্যসিক্ত শাস্ত্রালোচনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম ও দর্শনালোচনা অপেক্ষা অনেক সত্য, অনেক জীবন্ত। লক্ষ কণ্ঠে গীত কবীরের ধর্মসঙ্গীত, ষড়দর্শন ও ইলমুলকালাম হইতে লক্ষগুণে নমস্য।

হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের যুগ্ম চেষ্টায় ভারতবর্ষে গত সাতশত-আটশত বৎসর ধরিয়া যে-কৃষ্টি যে-সভ্যতা নির্মিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব। কি ধর্মে, কি ভাষা নির্মাণে, কি সাহিত্য-সৃষ্টিতে, কি সঙ্গীতে, কি নৃত্যে, কি বিলাস-সামগ্রী নির্মাণে, তৈজসপত্রে— কত বলিব? ইহারা যে প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে, দানে-গ্রহণে যে অকৃপণতা দেখাইয়াছে তাহা— আবার বিশেষ জোর দিয়া বলি— সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব, সমগ্র জগতের কল্পনার অতীত। ভারতের হিন্দু-মুসলমান যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কোনও দুই ধর্ম কস্মিনকালেও করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা তোলা অনুচিত, কিন্তু যে-বিষয়ে অধম গত পঁচিশ বৎসর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে তাহার সম্যক মূল্য বুঝিবার জন্য সে দেশে-বিদেশে সর্বত্র— সর্বপ্রকার লোকসঙ্গীত ও অন্যান্য জনপদকলা আকণ্ঠ পান করিয়াছে, আকর্ণ-বিস্ফারিত চক্ষে দেখিয়াছে। সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন, কিন্তু অধমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজনিত দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকসঙ্গীতের কাছে ইউরোপের তথা অন্যান্য প্রাচ্যদেশের (চীনের কথা বলিতে পারি না) কোনও লোকসঙ্গীত দাঁড়াইতে পারে না, না, না।

অতএব আমাদের কর্তব্য এই আটশত বৎসরের সর্বপ্রকারের জনপদ-প্রচেষ্টা খুঁটিয়া খুঁটিয়া চিরিয়া চিরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা, লিপিবদ্ধ করা, কলের গানে রেকর্ড করা, ইতিহাস লেখা ও সর্বশেষে তাহাকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া স্কুলে-কলেজে পড়ানো।

আবার বলিতেছি স্কুল-কলেজে পড়ানো। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থপতি যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে ইহাই হইবে তাহার সুদৃঢ়, অচল-অটল ভিত্তি। শিখর, মিনার কে নির্মাণ করিবেন, কোন দর্শন, কোন শাস্ত্রীয় ধর্ম দিয়া— সে আলোচনা পরে হইবে।

কিন্তু যে কর্মটির প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম তাহা তো একজন, শতজন, হাজারজনের অক্লান্ত পরিশ্রমেরও বাহিরে। এত লোকসঙ্গীত, স্থপতি, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য ভারতের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সর্বত্র হৃতজ্যোতি হইয়া মৃতপ্রায়, তাহাকে সংগ্রহ করিবার জন্য নেতৃত্ব করিবেন কে?

আমাদের পরম সৌভাগ্য, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বের সর্বত্র রাজাধিরাজের সম্মান পাইয়াও এই কবি লালন ফকিরকে উপেক্ষা করেন নাই, হাসন রাজার গান গাহিয়া বিদগ্ধ দার্শনিকমণ্ডলীর সম্মুখে অবতরণ করিলেন।

www.pathagar.com

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানি দীন
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়।

(কাশীতে প্রদত্ত দার্শনিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের দৃষ্টি এদিকে পূর্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় উৎসাহে তিনি এই কর্মে আরও মনোযোগ করিলেন, বহু অমূল্য লুপ্তধন সঞ্চয় করিলেন। দেশের লোক তাহা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

ভারতবর্ষের লোকসংগীত লইয়া চর্চা করিতে হইলে উত্তর-ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা-উপভাষার পণ্ডিত হইতে হয় ও এইসব সঙ্গীতের পশ্চাতে যে সংস্কৃত ও ফারসিতে লিখিত ও গীত ভক্তি-সুফি-বেদান্ত-যোগবাদ রহিয়াছে তাহার সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন।

অধমের নাই। বাহির হইতে যেটুকু সামান্য দেখিয়াছি তাহাই নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠককে সাবধান করিয়া দিতেছি, আলোচনা অতি অসম্পূর্ণ ও দোষত্রুটিতে কণ্টকিত থাকিবে। এবং ইতোমধ্যে অন্য কেহ যদি আলোচনাটি আরম্ভ করেন তবে অধম তাঁহাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়া পরমানন্দে শ্রোতার আসনে গিয়া বসিবে।

৩

পূর্বের প্রবন্ধে সামান্য আভাস দিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষীয় লোকসঙ্গীতের মূল্য ও তাৎপর্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেদান্ত, যোগ, ভক্তিবাদ ও সুফিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন।

সুফিবাদ (ভক্তি, যোগ ও mysticism-এর সমন্বয়) ভারতবর্ষে আসে পারস্য হইতে ও এদেশের দর্শন ও ভক্তিরস ইহাকে পরিপুষ্ট করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আরেকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য আকর্ষণ করিব।

১৯১৮-র যুদ্ধে যখন ফ্রান্স ও জর্মনি ক্লান্ত, তখন পণ্ডিত-মহলে দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধ সুফিবাদ লইয়া। একদিকে ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত মাসিন্নো, অন্যদিকে জর্মনির তদপেক্ষা বিখ্যাত পণ্ডিত গল্‌ড্‌ৎসিহার ও তস্য শিষ্য হর্তেন। মাসিন্নো পক্ষ বলিলেন, ইরানের সুফিবাদের উপর ভারতবর্ষীয় কোনও প্রভাব পড়ে নাই, যেটুকু পড়িয়াছে তাহা সুফিবাদ ভারতবর্ষে আসিবার পর। অন্যপক্ষ নানা প্রকার যুক্তিতর্ক দলিলদস্তাবেজ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই অর্থাৎ ইরানের বর্ধিষ্ণু সুফিবাদ বেদান্ত ও যোগরস পুনঃপুন পান করিয়াছে।

তর্কটি পাত্রাধার তৈলজাতীয় আপেক্ষিক, নিরর্থক নহে। সুফিবাদ অনুসন্ধান করিলে যদি সপ্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষীয় দর্শনের লাঞ্ছন তাহার উপর রহিয়াছে তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি গম্ভীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সপ্রমাণ হয়, সেটি এই যে, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন এককালে ইরান পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।

www.pathagar.com

এ সন্দেহ বহু পূর্বেই কোনও কোনও পণ্ডিত করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন যে ইরান নহে, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে সন্দেহ প্রথম জাগে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে, যখন তাঁহারা বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন মাঙ্গলিকের (Old and New Testaments) তুলনাত্মক আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহুদিদের প্রাচীন মাঙ্গলিকের যে হিংস্র নীতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে পীড়া দেয়, সেইরূপ খ্রিস্টের ক্ষমা ও দয়ার নীতি নবীন মাঙ্গলিকে আমাদিগকে পুনঃপুন আনন্দ ও সাহস দেয় (একদিকে An eye for an eye, and a tooth for a tooth ও অন্যদিকে Love the neighbour, offer the left cheek ইত্যাদি তুলনা করুন)। পণ্ডিতমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন খ্রিস্ট কী করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী এ হিংস্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন ও প্রচার করিবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিলেন? তবে কি কোনও বৌদ্ধশ্রমণের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হইয়াছিল? বিশেষত তাঁহার যৌবন কোথায় কী প্রকারে যাপিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বাইবেল যখন নীরব।

এ প্রশ্নের সমাধান অদ্যাপি হয় নাই, কখনও হইবে এ আশাও আমার নাই। কিন্তু সে সমস্যা উপস্থিত তুলিবার প্রয়োজন আমার নাই— সে বড় জটিল ও এস্থলে অবান্তর।

তবে একথা আমরা জানি যে, বৌদ্ধশ্রমণেরা ইরান, আরব পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন ও সেই তত্ত্ব জানি বলিয়া যখন সুফিবাদে মাঝে মাঝে এমন চিন্তাধারার সন্ধান পাই, যাহা অবিমিশ্র সনাতন ইসলামে নাই, অথচ শূন্যবাদের অত্যন্ত পাশ দিয়া বহিতেছে, তখন মন স্বতঃই প্রশ্ন করে, তবে কি উভয়ের কোথাও যোগ আছে?

মাসিন্নো ও হর্তেনে এই তর্ক চলিয়াছিল বহু বৎসর ধরিয়া। পৃথিবীর বিদগ্ধজন সে তর্ক অনুসরণ করিয়া যে কী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। হর্তেন স্বীয় মত সমর্থন করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত একখানা পূর্ণাঙ্গ অভিধান লিখিলেন, তাহাতে সুফিবাদের সঙ্গে বেদান্ত শব্দে শব্দে মিলাইয়া বলিলেন, এরকম সাদৃশ্য যেস্থলে বর্তমান, সেখানে প্রভাব মানিতেই হইবে।

এ তর্কও কখনও শেষ হইবে না। কারণ একথা ভুলিলে চলিবে না, মানবাত্মা যখন কর্ম ও জ্ঞানযোগে তাহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারে না, তখন সে ভক্তির সন্ধান করে। মানব যখন দুঃখ-যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তখন অকস্মাৎ তাহারই গভীর অন্তস্তল হইতে এবং জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহাকে রহস্যময় ইঙ্গিত করেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মানুষ তখন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষে সর্বচৈতন্য সংযোগ করে। তাহাই যোগ।

বহু ক্যাথলিক সাধু যোগী ছিলেন অথচ তাঁহারা ভারতের যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র উপযুক্ত সোপান আরোহণ দৃষ্ট হয়। কর্ম জ্ঞান ও তৎপর ভক্তি। আর যোগ তো অহরহ রহিয়াছে। ঘোর সংসারীও যখন অর্থশোক ভুলিবার চেষ্টা করে, তখন সে যোগের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। শুধু দ্বিতীয় সোপানে সে যাইবার চেষ্টা করে না— হিরণ্ময় পাত্র দেখিয়াই সে সন্তুষ্ট— তাহাকে উন্মোচন করিয়া চরম সত্য দর্শন করিবার প্রয়াস তাহার নাই।

যোগ পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল ও এখনও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যোগকে বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ সর্বজনগম্য করা হইয়াছে, তাহাকে যুক্তিতর্ক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ দর্শন করা হইয়াছে, সেরকম আর কোথাও করা হয় নাই— একমাত্র ইরান ছাড়া। সুফিরা ভারতবর্ষীয়

www.pathagar.com

যোগীর ন্যায় অন্তর্লোকে সোপানের পর সোপান অধিরোহণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এক সুফি অন্য সুফির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

ফলে কখনও নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধে বিলীন হইয়াছেন (ফানা), কখনও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সেই একাত্মবোধ রসস্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :

"মন্ তু শুদম, তু মন্ শুদি,
মন তন্ শুদম, তু জাঁ শুদি।
তা কমি ন গোয়েদ বাদ আজ ইন
মন জিগরম তু দিগরী ॥"

"আমি তুমি হইলাম, তুমি আমি হইলে,
আমি দেহ হইলাম, তুমি প্রাণ,
ইহার পর আর যেন কেহ না বলে,
আমি ভিন্ন এবং তুমি ভিন্ন।"

ইহাই তো সত্য ধর্ম। এ মন্ত্র ব্রহ্মে বিলুপ্তির মন্ত্র এবং এ মন্ত্র বিবাহের মন্ত্র। খ্রিস্টসাধু যিশুকে বিবাহ করে, চার্চকে বিবাহ করে, শ্রমণ সঙ্ঘকে বিবাহ করে আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ প্রিয়াকে এই মন্ত্রে বরণ করিয়া সংসারপথে চলিবার শক্তি পায়।

৪

মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ এদেশে সুফি বা ইরানি ভক্তিমার্গ প্রচার করিলে পর হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে যেসব সাধক মধুরকণ্ঠে আত্মার রহস্য-লোকের অভিজ্ঞতার গান গাহিলেন তাহার সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্পাধিক পরিচয় আছে। কবীরের নাম শোনেন নাই এমন লোক কম ও যাঁহারাই ভারতীয় কৃষ্টির সত্য, বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সিংহাবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই অন্যান্য নানা সাধকের ভজন-দোহার সঙ্গে সুপরিচিত।

উত্তর ভারতে যেসব সাধক জনগণের হৃদয়মন ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের আংশিক পরিচয় মাত্র দিতে হইলেও বহু বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন। সংবাদপত্রের বিক্ষিপ্ত স্তম্ভের উপর সে বিপুল সৌধনির্মাণ করা সম্ভবপর নহে। অনুসন্ধিৎসু ও রসজ্ঞ পাঠক সে সৌধের সন্ধান পাইবেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদু' পুস্তকের ভূমিকায়, পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার 'স্টেফানস নির্মলেন্দু' বক্তৃতায়।

উত্তর ভারতে এই সাধনার দ্বারা পূর্ব ভারতে সপ্রকাশ হয় আউল, বাউল, মুর্শিদিয়া, সাঁই, জারিগানের ভিতর দিয়া। সেসব গীতের সঙ্কলন এযাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা হয় নাই। দুইজন গুণী এই কর্মে লিপ্ত আছেন ও রসিকজনের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক মৌলবি মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও শ্রীহট্টের মৌলবি আশরাফ হোসেন বহু পরিশ্রম করিয়া নানা সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। (এই মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ

www.pathagar.com

করিয়া দ্বিতীয়োক্ত মহাশয় কয়েক মাস পূর্বে আসাম সরকারের নিকট হইতে যে কী উৎকট প্রতিদান পাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আরেকদিন আলোচনা করিবার বাসনা রহিল)।

লালন ফকির, শীতালং শাহ্, রাধারমণ, গোলাম হুসেন শাহ্, হাসন রাজা, ভেলা শাহ্, সৈয়দ জহরুল হোসেন, সৈয়দ শাহ্ নূর প্রভৃতি সাধক-মণ্ডলীর পরিচয় এইসব সঙ্কলনে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে ইঁহাদের অধিকার, দৈনন্দিন জীবনের নিম্নতম কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে আত্মার উচ্চতম রহস্যলোকের প্রতি ইঁহাদের অভিযান যে কী পরম বিস্ময়জনক, লোমহর্ষক তাহা বর্ণনা করিবার মতো অভিজ্ঞতা তো আমার নাই। গ্রহচন্দ্রে, তারায় তারায় অনন্তের যে সুগম্ভীর বীণাধ্বনি প্লাবন মন্ত্রে মুখরিত, রুদ্রের ত্রিকাল ত্রিকোলস্পর্শী দক্ষিণ হস্তে যে রুদ্রাক্ষ জন্মমৃত্যু সৃষ্টিপ্রলয়ের অন্তহীন চক্রে ঘূর্ণায়মান তাহারই স্পন্দন নমস্য সাধকেরা অনাবিল চৈতন্যগোষ্পদে শতরাগে বিম্বিত করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। পুনরাবৃত্তি করি, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, উপনিষদের ঋষি যে প্রকারে দর্শন করিয়াছিলেন, মু'তালিজা সুফি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যোগে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সে রহস্যলোকের ব্যঞ্জনা সাধকেরা দিয়াছেন মধুর কণ্ঠে, ছন্দগানে। রসিকজন শ্রবণমাত্র ভাবরসে আপ্লুত হইয়াছেন। নীরস গদ্যে অরসিকজন তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেন বিড়ম্বিত হইবে?

আমাদের পক্ষে শুধু সম্ভব সাধকগণের রসস্রোতধারার ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থলের অনুসন্ধান করা। কোন পর্বত-কন্দরে তাহার উৎপত্তি, কোন দেশে-প্রদেশের উপর দিয়া তাহার গতি, কোন মহাসমুদ্রে তাহার নিবৃত্তি সে অনুসন্ধান ভূগোল আলোচনার ন্যায়; তাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, রসাস্বাদনের প্রত্যক্ষ আনন্দ তাহাতে হয় না। গঙ্গার উৎপত্তি-নিলয় জানিয়া তাপিত দেহে গঙ্গাবগাহনজনিত স্নেহসিক্ত শান্তিলাভ হয় না, পুণ্যলাভ তো সুদূরপরাহত।

রসিকজন এই অন্ধের হস্তীদর্শনের ন্যায় বিড়ম্বনাকে লক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি, আ মরি।

স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তৎসত্ত্বেও মনে পড়িতেছে, পরমহংসদেবও বলিয়াছেন, মদ শুঁকিলেই নেশা হয় না, চাখিলে নেশা হয় না, এমনকি সর্বাঙ্গে মাখিলেও নেশা হয় না, নেশা করিতে হইলে মদ খাইতে হয়। অর্থাৎ সে রসসায়রে নিমজ্জিত হইতে হয়, পারে দাঁড়াইয়া সে অমৃতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম। তাই বাউল বলিয়াছেন,

যে জন ডুবল, সখী, তার কী আছে বাকি গো?

তখন তো তাহার আর দুঃখ-যন্ত্রণা নাই, সে তো জন্ম-মৃত্যুর অতীত। রাজসিক কবি শ্রীমধুসূদন পর্যন্ত বলিয়াছেন :

মক্ষিকাও গলে না গো সে অমৃত হ্রদে

সৈয়দ শাহনূর গাহিয়াছেন :

রসিক দেখে প্রেম করিয়ো যার দিলেতে ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।

www.pathagar.com

ওজুদে মজুদ করি লীলার কারখানা,
সৈয়দ শাহনূর কইন দেখলে তনু ফানা ॥

যিনি ব্রহ্মানন্দে আত্মনিলয় (ফানা) করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র সে-ই রসিকের সঙ্গে প্রেম করিবে। তদভাবে তুমি চক্ষুষ্মান অন্ধ। এই দেহেই (ওজুদ) লীলার কারখানা মজুত। তাহা যদি দেখিতে পারো তবেই তুমি দেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ (ফানা) করিবে।

(শব্দতাত্ত্বিক লক্ষ করিবেন ভাষার দিক দিয়াও এই চৌপদী 'রুবাইয়াৎ'টি হিন্দু-মুসলিম আধ্যাত্মিক সাধনার কী অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত— রসিক, প্রেম, লীলা শুদ্ধ সংস্কৃত, চোখ কানা বাঙলা; ফানা ওজুদ মজুদ শুদ্ধ আরবি; কারখানা ফারসি কইন বাঙাল।)

অরসিক, অপ্রেমিককে এইসব সাধক কখনও করজোড়ে নিবেদন করিয়াছেন যেন ভৌগোলিক শব্দতাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক করিয়া রসভঙ্গ না করেন, কখনও নিরুপায় হইয়া কাতরকণ্ঠে দিব্যিদিলাসা দিয়াছেন। তাই ক্ষমাভিক্ষা করিয়া অদ্যকার সভার 'রসভঙ্গ' করি, কবিগুরু কর্তৃক নন্দিত সেই হাসন রাজার গীতি সংকলন 'হাসন-উদাসের' সর্বপ্রথম গীতিটি উদ্ধৃত করিয়া এবং তৎপূর্বে এইমাত্র নিবেদন করি যে, সাধারণত বাউলরা পরমাত্মা মহাপুরুষ ও গুরুর বন্দনা সমাপ্ত করিয়া রস সৃষ্টি আরম্ভ করেন। কিন্তু হাসন রাজা অপ্রেমিক, রবাহূতের আগমন ভয়ে আল্লা-রসুল বন্দনার পূর্বেই বলিতেছেন,

"আমি করিয়ে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না।
কিরা দেই, কসম দেই, আমার বই হাতে নিবে না ॥
বারে বারে করি মানা বই আমার পড়বে না।
প্রেমের প্রেমিক যে জনা এ সংসারে হবে না ॥
অপ্রেমিকে গান শুনলে কিছুমাত্র বুঝবে না।
কানার হাতে সোনা দিলে লাল-ধলা চিনবে না।
হাসনরাজায় কসম দেয়, আর দেয় মানা।
আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই জানা ॥

সাক্ষরকে নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিবার পন্থা

১

জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তার সমস্যা লইয়া যাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে শতকরা দশজন লিখিতে পড়িতে পারিত ও আজ নাকি দশের পরিবর্তে বারোয় দাঁড়াইয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, শিক্ষাবিস্তারের কর্মটি সদাশয় সরকার সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। স্বরাজপ্রাপ্তি আমরা যেমন সদাশয় সরকারের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেই নাই, ঠিক সেইরূপে শিক্ষাবিস্তার সমস্যায় আমাদেরও ভাবিবার ও করিবার আছে। শিক্ষানবিশরাও

www.pathagar.com

বলেন যে, আমাদের মতো অর্ধশিক্ষিত লোকের সাহায্য পাইলেও নাকি নিরক্ষর দেশকে সাক্ষর করার পথ সুগম হইবে।

সমস্যার জটিল গ্রন্থি এই যে যদিও প্রতি বৎসর বহু বালক পাঠশালা-পাস করিয়া বাহির হয়, অর্থাৎ সাক্ষর হইয়া সামান্য লেখা-পড়া করিতে শিখে, তবুও কয়েক বৎসর পরেই দেখা যায় যে, ইহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইয়া গিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পাঠশালা-পাসের পর পড়িবার মতো কোনওই পুস্তক তাহারা পায় না। আমার এক স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কৈবর্ত, নমঃশূদ্র ও মুসলমান জেলেদের ছেলেরা যত শীঘ্র পুনরায় নিরক্ষর হয়, অপেক্ষাকৃত ভদ্রশ্রেণিতে ততটা নয়। তাঁহার মতে কারণ বোধহয় এই যে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণির হিন্দুর বাড়িতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রচলন কম ও মুসলমানদের জন্য বাঙলায় সরল কোনও ধর্মপুস্তক নাই।

মধ্য ইউরোপের তুলনায় বল্কান শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া আমিও ঠিক এই তত্ত্বই আবিষ্কার করি। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে যোগ তাহাদের 'উপাসনা পুস্তিকা'র মধ্যবর্তিকায়। পাঠকের অবগতির জন্য নিবেদন করি যে, ক্যাথলিক ক্রিশ্চানরা শাস্ত্রাধিকারে বিশ্বাস করেন। গ্রামের পাদ্রি সাহেবের অনুমতি বিনা যে কেহ বাইবেল পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য বরাদ্দ 'উপাসনা পুস্তিকা' বা 'প্রেয়ার বুক', যেমন শূদ্র স্ত্রীলোককে বেদাভ্যাস করিতে আমাদের দেশেও নিষেধ ছিল। তাহাদের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পদাবলি।

প্রত্যেক ক্যাথলিকের একখানা উপাসনা পুস্তিকা অতি অবশ্য থাকে। গ্রামের বুড়ি উপন্যাস পড়ে না, খবরের কাগজ পড়ে না, এমনকি চিঠিপত্র লিখিবার প্রয়োজনও তাহার হয় না। কিন্তু প্রতিদিন সে উপাসনা পুস্তিকা হইতে কিছু না কিছু পড়ে ও রোববারে গির্জায় বেশ খানিকটা অধ্যয়ন করে।

প্রোটেসট্যান্ট দেশগুলোতে বাইবেল পড়া হয়। এই উপাসনা পুস্তিকা ও বাইবেল ইউরোপের কোটি কোটি লোককে পুনরায় নিরক্ষর হইবার পথে জোড়াকাঁটা।

আমাদের উচিত রামায়ণ-মহাভারতের আরও সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করা ও সম্ভব হইলে পাঠশালা পাস-করার সঙ্গে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির প্রত্যেক বালককে একখণ্ড রামায়ণ অথবা মহাভারত বিনামূল্যে দেওয়া। আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছি।

কিন্তু প্রশ্ন, তাহাতে লাভ কী? ধর্মচর্চা (?) তো আমরা বিস্তর করিয়াছি, আর না হয় নাই করিলাম। তবে কি দেশের লোককে নিরক্ষরতা হইতে আটকাইবার অন্য কোনও উপায় নাই, অথবা ধর্মপুস্তকের উপর আরও কিছু দেওয়া যায় না।

যায়। এবং সেই উদ্দেশ্যেই খবরের কাগজের শরণাপন্ন হইয়াছি। এই খবরের কাগজই তাহার উপায়।

রামায়ণ-মহাভারত সস্তায় অথবা বিনামূল্যে বিতরণ করিবার মতো অর্থ কোনও গৌরী সেনই দিতে রাজি হইবেন না। কিন্তু তিন দিনের বাসি খবরের কাগজ বিলাইয়া দিতে অনেকেই সম্মত হইবেন। আমাদের কল্পনাটি এইরূপ— প্রথমত বড় ও ছোট শহরে যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক সাপ্তাহিক (ও পরে মাসিক) কাগজ

www.pathagar.com

জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যেসব ছেলেরা পাঠশালা-পাস করিয়াছে, বিশেষ তাহাদেরই নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাকখরচা লাগিবে। উপস্থিত সে পয়সা তুলিতে হইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্ধরা যেরকম বিনা ডাকখরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেইরকম যথারীতি আন্দোলন করিলে ও বিশেষত যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনা বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে, তাহা হইলে ডাকখরচও লাগিবে না।

রোজই যে কাগজ পাঠাইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। প্রথম দিকে সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার পাঠাইলেই চলিবে।

কিন্তু সংবাদপত্র ইহারা পড়িবে কি? এইখানেই আসল মুশকিল। কাজেই— দ্বিতীয়ত, পাঠশালার শেষ শ্রেণিতে ছেলেদের পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যেসব লেখা বাহির হয়, তাহা পড়াইবেন। পরে নানারকম দেশি খবর, খেলার বর্ণনা, জিনিসপত্রের বাজার দর, আইন-আদালতের চাঞ্চল্যকর মামলা, সাহিত্যিক প্রবন্ধ, যুদ্ধের খবর, সম্পাদকীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাঁহারা নৈশ স্কুল চালান প্রথম দিকে তাঁহারা এই প্রচেষ্টা করিলে ভালো হয়— পরে—

তৃতীয়ত, গুরু ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকদের শিখাইতে হইবে কী করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে ও পড়াইতে হয়। ইহার জন্যও আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে।

আমি অতি সংক্ষেপে খসড়াটি নিবেদন করিলাম। আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজ পড়িবার শখ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ নহে। আর কিছুটা সুখ পাইলেই বালক সপ্তাহে দুইবার দুইখানা কাগজ স্বনামে পাইবার গর্বে নিশ্চয় পড়িবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ হইবে যে, গণআন্দোলনের জন্য আমরা গ্রামবাসীকে প্রস্তুত করিতে পারিব।

পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তিতর্ক আমরা অনেকদিন যাবৎ ভাবিয়াছি ও আমি নিজে বাড়ির চাকরদের কাগজ পড়িতে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছি। পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিলে পরিকল্পনাটি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে পারিব।

২

বিপদ এই যে, চতুর্দিক হইতে রাশি রাশি খবর রোজ খবরের কাগজের অফিসে উপস্থিত হইতেছে, অথচ কাগজের অনটন। অর্থাৎ খবর আছে, কাগজ নাই। কাজেই খবর-কাগজ সমাসটি সিদ্ধ হয় কী প্রকারে? এদিকে আবার দেশহিতৈষীরা নিরক্ষরতা দূর করিবার অন্যান্য উপায় জানিতে চাহিতেছেন। বিষয়টি গভীর-আলোচনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ত্রৈমাসিকের উপযুক্ত; অথচ খবরের কাগজের ভিতর দিয়া হাজার হাজার লোককে সমস্যাটি না জানাইলে প্রতিকারের সম্ভাবনাও নাই।

পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, চীন যে জনসাধারণের শিক্ষা-প্রসার ব্যাপারে এত পশ্চাৎপদ তাহার প্রধান কারণ চীনভাষার কাঠিন্য। সে ভাষার বর্ণমালা নাই। প্রত্যেকটি শব্দ একটি বর্ণ। শব্দটি যদি না জানা থাকে তবে উচ্চারণ পর্যন্ত করিবার উপায় নাই; কারণ

www.pathagar.com

উচ্চারণ তো করি বর্ণে বর্ণ জুড়িয়া। প্রত্যেকটি শব্দই যখন বর্ণ তখন হাজার হাজার বর্ণ না শিখিয়া চীনা পড়িবার বা লিখিবার উপায় নাই। ৪৭টি স্বরব্যঞ্জন শিখিতে ও শিখাইতে গিয়া আমরা হিমসিম খাইয়া যাই। চীনা সাক্ষররা কী করিয়া হাজার হাজার ও পণ্ডিতেরা কী করিয়া লক্ষ লক্ষ বর্ণ শিখেন সে এক সমস্যার বিষয়। শুনিয়াছি চৌদ্দ বছরের বাঙালি ছেলে যে পরিমাণ বাঙলা জানে ততটুকু চীনা শিখিতে গিয়া নাকি সাধারণ চৈনিকের বয়স ত্রিশে গিয়া দাঁড়ায়। শুধু একটি কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। পুনা ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত বাসুদেব গোখলে (বিখ্যাত গোখলের আত্মীয়) শান্তিনিকেতনে ১৯২৪ সালে চীনা শিখিতে আরম্ভ করেন; পরে জর্মনিতে ডক্টরেট পান। ভদ্রলোক এখনও চীনা ভাষার অক্টোপাস-পাস হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। ইতোমধ্যে তাঁহার সতীর্থরা ফরাসি, জর্মন, ইতালিয়ন নানা ভাষা শিখিয়া বসিয়াছেন। শ্রীযুত গোখলের পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করিবার কারণ অবশ্য নাই; চীনা ছাত্র এদেশে আসিয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট চীনা বৌদ্ধশাস্ত্র পালিশাস্ত্রের সঙ্গে মিশাইয়া পড়িতে শিখে।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, নতুন বর্ণমালা না চালাইলে চীনের জনসাধারণ কখনও সাক্ষর হইতে পারিবে না। জাপানিদের বর্ণমালা আছে।

বাঙলা বর্ণমালা সংস্কৃত নিয়মে চলে বলিয়া তাহার শ্রেণিবিভাগ সরল ও যুক্তিযুক্ত। ইংরেজি ও অন্যান্য সেমিটিক বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করিলে তথ্যটি স্পষ্ট হইবে। কিন্তু, এইখানেই সমস্যার জগদ্দল 'কিন্তু' উপস্থিত— লেখা ও পড়ার সময় বাঙলা বর্ণমালা যে কী অপূর্ব কাঠিন্য সৃষ্টি করে তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না। দুইটি 'ই'কার কেন, দুইটি 'উ'কার কেন— উচ্চারণে যখন কোনও প্রভেদ নাই তখন মনে রাখি কী করিয়া, 'কই' যখন লেখা যায় তখন 'কৈ'র কী প্রয়োজন? 'বউ' যখন লেখা যায় তখন 'বৌ'কে বরণ করিবার কী দরকার? 'গিআ', 'গিএ'র পরিবর্তে কেন 'গিয়া' 'গিয়ে'? এইসব প্রশ্ন শিশুমনকে বিক্ষুব্ধ করে ও সে সমস্ত ব্যাপারটার কোনও হদিস পায় না— কারণ সংস্কৃতে তার হদিস আছে, বাঙলা লিখন-পঠনে নাই। দ্বিতীয়ত অযৌক্তিকতা; 'কা' লিখিতে 'আ'কার জুড়ি পশ্চাতে, কিন্তু 'ই'কার জুড়ি অগ্রভাগে, আর 'ঈ'কার জুড়ি পশ্চাতে, দুটি 'উ'কার জুড়ি নিচে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক 'ও'কার ও 'ঔ'কার। প্রথম 'ে' লাগাই, তার পর লাগই 'া'। ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই পড়িতে শুনিয়াছেন 'ঘ' একারে ঘে; উহুঁ ঘ আকারে আ, উহুঁ ঘে? ঘা? তখন তাহার মনে পড়ে 'ও'কারের কথা; বলে 'ঘো'— 'ঘোড়া'। 'ঔ'কার তো আরও চমৎকার। 'আ'কার 'ই'কার 'উ'-কার, 'ঋ'কার সব কয়টি হয় আগে, নয় পশ্চাতে লাগাইলে যে কী আপত্তি ছিল, তাহা আমি বহু গবেষণা করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। শিশুর পক্ষে সরল হইত, বয়স্ককে পুনর্নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিত। ইংরেজিতে ব্যাপারটা কানুনমাফিক ও সরল।

তবুও শিশুরা সাধারণত সামলাইয়া লয়, কিন্তু যুক্তাক্ষরে আসিয়া তাহাদের বানচাল হয়।

আমার সব-ইনসপেকটর বন্ধুটি বলিয়াছেন যে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কৈবর্ত জেলের ছেলে বেশিরভাগ পাঠশালা পালায় যুক্তাক্ষরের যুগে, দ্বিতীয় ভাগ পড়িবার সময়। যুক্তাক্ষর হইয়াছিল সংস্কৃত বানানের অনুসরণে। নিয়ম এই, কোনও ব্যঞ্জন যদি একা দাঁড়ায় তবে ধরিয়া লইতে হইবে তাহার সঙ্গে 'অ' স্বর যুক্ত আছে। তাহা 'কর-ভ'তে তিনটি 'অ' যোগ দিয়া পড়ি। কিন্তু যদি কোনও ব্যঞ্জন স্বরের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াইতে চাহে,

www.pathagar.com

তবে তাহাকে পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে— অন্যথায় পূর্ব নিয়মানুসারে 'অ'কার লাগিয়া যাইবে। তাই 'সন্তপ্ত' বলিতে তাহার 'ন' আধা অর্থাৎ হসন্ত, 'প' আধা অর্থাৎ হসন্ত। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু বিপদ এই যে, যুক্তাক্ষর হওয়া মাত্রই অনেকেই এমন চেহারা বদলায় যে, তাহাদিগকে চিনে তখন কার সাধ্য— লাইনো টাইপের অর্থাৎ 'আনন্দবাজারে'র ছাপার কথা হইতেছে না, প্রচলিত ছাপা ও লেখার কথাই বলিতেছি। দ্বিতীয় বিপদ, এই আইন সংস্কৃতে অতি প্রাঞ্জলভাবে চলে বটে, বাঙলায় চলে না। লিখিতেছি 'রামকে' অর্থাৎ রা+ম+অ+কে অর্থাৎ 'রামোকে' (কারণ ব্যঞ্জন একা দাঁড়াইলে 'অ' বর্ণ যুক্ত হইবে— 'অ' ছাপায় আলাদা বুঝাইবার উপায় নাই বলিয়া ও'কার ব্যবহার করিয়াছি), অথচ পড়িতেছি এমনভাবে যে 'ম' ও 'ক' যুক্তাক্ষরে লেখা উচিত; যথা 'রাম্‌কে'। 'সরব না'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে তো লেখা উচিত 'সর্ব না'; 'যাক সে'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে লেখা উচিত 'যাক্ষে' অথবা 'যাক্সে'। 'কখন জাগলি'=কখন জাগ্লি'; 'কাঁপলেই'='কাঁপ্লেই' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই যে, লিখিতেছি 'সূক্ষ্ম', বলিতেছি 'শুকখঁ'; লিখিতেছি 'আত্মা' বলিতেছি 'আত্তাঁ; লিখিতেছি 'ঊর্ধ্ব', বলিতেছি ঊর্দো' বা 'ঊর্ধো'— 'দ' 'ব' অথবা 'ধ' 'ব' বৃথাই লেখা হইতেছে। শিশু যখন পড়ে স+উ-ক+ষ+ম, সে উচ্চারণ করিতে চাহে— শুদ্ধ সংস্কৃতে যেরকম করা হয়— সূকষম। কিন্তু বেচারাকে চোখের জলে নাকের জলে 'শুদ্ধ' উচ্চারণ লিখিতে হয়। সংস্কৃতে যাহা যুক্তিযুক্ত, বাঙলাতে তাহা খামখেয়ালি।

তাই দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে বেশিরভাগ ছেলে যুক্তাক্ষরের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া অক্কা পায়। তাই দেখা গিয়াছে, বয়স্ক সাক্ষর বহুদিন লেখাপড়া চর্চা না করিয়া পুনরায় পড়িতে বা লিখিতে যায়, তখন সেই এককালীন সাক্ষর টক্কর খায় যুক্তাক্ষরে।

আমাদের লিখন ও উচ্চারণের বৈষম্য এত বিকট যে, ইহাই নিরক্ষরতা ও সাক্ষরের নিরক্ষরতায় পুনরায় ফিরিয়া যাওয়ার দ্বিতীয় প্রধান কারণ।

কিন্তু উপায় কী?

অদ্যকার লেখা শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা না বলিয়া শান্তি পাইতেছি না। যখন গড়িমসি করিতেছিলাম, এ বিষয় লইয়া আর আলোচনা করিব কি না, তখন হঠাৎ দেখি সোমবারের 'আনন্দমেলা'য় একটি বালক— বালক মাত্র— বলিতেছে যে, সে 'নিরক্ষরকে সাক্ষর করা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ, আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে। বালকটিকে আমার আশীর্বাদ, সে আমাকে মনের জোর দিয়াছে।

৩

গত আগস্ট* মাসে উপর্যুক্ত শিরোনামায় দুইটি রচনা নিবেদন করিয়াছিলাম। সত্যপীরের বয়স যখন অতি অল্প, তাহার বালসুলভ চপলতা কেহই লক্ষ করিবে না, এই ভরসায় উপযুক্ত

* ১৯৪৬-এর আগস্ট মাস।

www.pathagar.com

বিষয় লইয়া তখন অত্যধিক বাক্যাড়ম্বর করি নাই। কিন্তু বাঙলা দেশে সহৃদয় পাঠকের অভাব নাই। তাঁহারা লেখা দুইটি পড়িয়া এযাবৎ অধমকে বহু পত্রাঘাত করিয়াছেন। তুলসীদাসের চৌপদীটি মনে পড়িল :

জো বালক কহে তোতরী বাতা
সুনত মুদিত নেন পিতু অরু মাতা
হসিহহি কূর কুটিল কুবিচারী
জো পরদোষভূষণধারী

"বালক যখন আধ আধ কথা বলে, তখন পিতা এবং মাতা মুদ্রিত নয়নে (সন্তোষ সহকারে) সে বাক্য শ্রবণ করেন, কিন্তু ক্রূরকুটিল কুবিচারীরা শুনিয়া হাসে— তাহারা তো পরদোষ ভূষণধারী"।

(তুলসীজীর রামায়ণখানা হাতের কাছে নাই; সদাশয় সরকারের ন্যায় দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চিত পচা চাউল অর্থাৎ আমার ক্ষীণ স্মৃতিভাণ্ডার হইতে চৌপদীটি ছাড়িলাম— হাজরা লেনের শ্রীমতী— ঘোষের সহযোগের উপর নির্ভর করিয়া)।

সহৃদয় পাঠকেরা 'মুদিত নেন' শুনিয়া এখন মুক্তকণ্ঠে আমাকে বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছিলাম —

প্রথমত বড় ও ছোট শহরের যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক, সাপ্তাহিক (ও পরে) মাসিক কাগজ জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যেসব ছেলেরা পাঠশালা পাস করিয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহাদের নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাক-খরচা লাগিবে। উপস্থিত সে পয়সা তুলিতে হইবে কিন্তু আমার বিশ্বাস, অন্ধেরা যেরকম বিনা ডাক-খরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেই রকমই— যথারীতি আন্দোলন করিলে, ও বিশেষত যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনাটি বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে— ডাক-খরচাও লাগিবে না।

দ্বিতীয়ত, পাঠশালার শেষ শ্রেণিতে ছেলেদিগকে পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যেসব লেখা বাহির হয় ('আনন্দমেলা' জাতীয়) তাহা পড়াইবেন। পরে নানারকম দেশি খবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবরের কাগজের মাধুকরী করা ও তৎপর বণ্টনকর্ম সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা কেহ কেহ চাহিয়াছেন।

প্রথমেই নিবেদন করি যে, এইপ্রকার সম্পূর্ণ নবীন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার পূর্বে আটঘাট বাঁধিয়া ফুলপ্রুফে কোনও স্কিম বা প্ল্যান করা ঠিক হইবে না। শহর ও গ্রামের বাতাবরণ বিভিন্ন, কাজেই একই প্ল্যান দুই জায়গায় বলবৎ হইবে না। দ্বিতীয়ত, প্রথম প্রচেষ্টা ডিনেমিক, চলিষ্ণু বা প্রাণবন্ত হইবে অর্থাৎ কাজ করিতে করিতে ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, উনিশ-বিশ ফেরফার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সহৃদয় পাঠক যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলি যে, আমাদের দেশে সর্বপ্রচেষ্টায় আমরা বিলাতি ফিটফাট তৈয়ারি মডেল খুঁজিয়া তাহার অনুকরণ চেষ্টা করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের

www.pathagar.com

ট্রেন-জাহাজ, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আমাদের নৃত্যগীতের পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা ইস্তেক জাতীয় সঙ্গীত শুনিবার সময় দণ্ডায়মান হওয়া সর্বত্রই অনুকরণ-প্রচেষ্টা, মডেল খোঁজা— বাতাবরণের সঙ্গে মিলাইয়া দেশের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া চলিষ্ণু ক্রমবর্ধমান শিশু-প্রচেষ্টাকে বলিষ্ণু করিতে শিখি না। আমাকে দোষ দিবেন না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের কীরকম অন্ধানুকরণ করে তাহা দর্শাইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে অনেকগুলি মর্মন্তুদ সত্য বলিয়াছিলেন।

আমার মনে হয়, উপর্যুক্ত বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করা প্রশস্ত।

প্রথমত, কর্মী যুবকগণ মিলিত হইবেন ও কে কে বাসি কাগজ দিতে সম্মত হইবেন তাহার ফর্দ প্রস্তুত করিয়া যে খবরের কাগজ সরবরাহ করে তাহারই দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া কাগজ জমায়েত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, স্কুল সব-ইন্সপেক্টর মহোদয়কে আক্রমণ করা। অতি সবিনয়ে তাঁহার সম্মুখে প্ল্যানটি উপস্থিত করিতে হইবে— অতি সবিনয় অতি সভয়। তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে অর্ধেক কেল্লা ফতেহ। তাঁহার সহযোগিতায় যে যে পাঠশালায় প্রধানশিক্ষক শুধু বেতন কমাইয়াই (সে কত অল্প আমি জানি, কাজেই ব্যঙ্গ করিতেছি না) সন্তুষ্ট নহেন তাহার ফর্দ করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শহরে একটি সভা করিয়া বিষয়টি আলোচনা করিতে হইবে।

তখন যে কর্মপদ্ধতি স্থির করা হইবে তাহাতে যত ভুলচুকই থাকুক তাহাই ঠিক। অধমের পদ্ধতির প্রতি তখন যেন কোনও অহেতুক করুণা না দেখানো হয়।

সন্তর্পণে 'ঝোপ দেখিয়া কোপ' মারিতে হইবে, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ট্যাক্ট সহযোগে মাস্টার মহাশয়ের সদয় সহযোগ না পাইলে সব গুড় মাটি হইয়া যাইবে।

যদি সব-ইন্‌স্‌পেক্টর মহোদয়ের সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে বোর্ডের চেয়ার-ভাইস-চেয়ারম্যান তদভাবে কোনও মুরুব্বি মেম্বরের সাহায্য লইয়া কাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি নিজে সব-ইন্‌স্‌পেক্টর মহোদয়গণের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা রাখি। যে সব-ইন্‌স্‌পেক্টর মহোদয়কে স্মরণ করিয়া প্রথম প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এ বিষয়ে আপ্রাণ সাহায্য করিবেন ও আমার অন্ধ বিশ্বাস, তাঁহার মতো জীবন্ত কর্মী বাঙলা দেশে আরও আছেন।

কাহারও সাহায্য না পাইলেও কাজ আরম্ভ করা যায় শুদ্ধ গুরুমহাশয়কে যদি দলে টানা সম্ভবপর হয়। তিনি রাজি হইলে বাকি সবকিছুই সরল।

যাঁহারা নৈশ বিদ্যালয় চালান তাঁহাদের পক্ষে কর্মটি তো সরলই।

এতটা কাজ আগাইলে পর কর্মীরা যদি আমাকে পত্র লিখিয়া সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান, তবে আমি তাঁহাদিগকে সোজা উত্তর দিব ও সম্ভব হইলে দুর্বল শরীর সত্ত্বেও সরেজমিন উপস্থিত হইয়া যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভব তাহা নিবেদন করিব।

কী পড়াইতে হইবে, কোন কায়দা পড়াইতে হইবে, সে আলোচনা বারান্তরে করিব। ইতোমধ্যে এই শীতকালই কাজ আরম্ভ করার পক্ষে প্রশস্ত।

www.pathagar.com

সর্বশেষে আমাদের কাগজের 'আনন্দমেলা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য (১৪৪১৬) দর্শনা মণিমেলা, নদীয়া— গত ১৭ আগস্টের আনন্দবাজারে 'সত্যপীরে'র লেখা নিরক্ষরদের অক্ষর পরিচয় করানোর যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল— তা তুমি পড়েছ জেনে খুশি হলাম। 'মণিমেলা'র অন্যান্য বন্ধুরা ওই লেখাটি পড়ে এদেশের নিরক্ষরতা দূর করবার সহজ কতকগুলি পন্থা ধরে কাজ করার চেষ্টা করবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি।"

বালক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে আমরা অতশত দুর্ভাবনা করি কেন।

উচ্চারণ

প্রবাদ আছে, বঙ্গদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ এককালে এমনই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহারাজা আদিশূর কানাকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ (কেহ কেহ বলেন ক্ষিতীশ, মেধাতিথি) ইত্যাদি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহারা এদেশের লোককে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কতটা শিখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আমাদের জানামতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এদেশে আবার সেই চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

ইতোমধ্যে শত শত বছর ধরিয়া বহু বাঙালি বিদ্যার্থী কাশীতে সংস্কৃত শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উচ্চারণও এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এমনকি কাশী-প্রত্যাবৃত্ত কোনও কোনও বাঙালি পণ্ডিতকে আমরা খাঁটি বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত পড়িতে শুনিয়াছি। সন্দেহ হইতেছে খাস কাশীতেও বাঙালি চালিত টোলে বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ শিখানো হয়।

বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক তাহা একটি সামান্য উদাহরণ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে ইতালির খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক তুচ্চি কলকাতার তৎকালীন এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। কথায় কথায় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম উচ্চারণ করেন। বাঙালি যে কায়দায় করে, সেই কায়দায়ই করিলেন, অনেকটা 'জাগেগাঁবোল্কোর' ন্যায়। তুচ্চি তো কিছুতেই বুঝিতে পারেন না কাহার কথা হইতেছে। পণ্ডিতের চক্ষুস্থির যে তুচ্চির মতো লোক যাজ্ঞবল্ক্যের নাম শোনেন নাই। তুচ্চি প্রত্যাশা করিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ অনেকটা Yajnyavalkya-র ন্যায়, শুনিতেছেন Jaggonbolkol. বুঝিবেন কী প্রকারে যে একই ব্যক্তি!

বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ এতই কর্ণপীড়াদায়ক যে, আমাদের পরিচিত দুইটি পশ্চিম ভারতীয় ছাত্রকে বাধ্য হইয়া কলকাতা কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইল। 'পরশুরামে'র 'গণ্ডেরীজী' *মেঘনাদবধকাব্য* উচ্চারণ করিলে আমাদের কর্ণে যে পীড়ার সঞ্চার হইবে, আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয়দের সেই রকমই পীড়া দেয়।

www.pathagar.com

বাঙালি সংস্কৃত ব্যঞ্জনের ঞ, ণ, য, অন্তস্থ ব, ষ, স উচ্চারণ করিতে পারে না ও যুক্তাক্ষরের (আত্মা, যক্ষ ইত্যাদি) উচ্চারণে অনেকগুলি ভুল করে। স্বরবর্ণের অ, ঐ, ঔ ভুল উচ্চারণ করে ও সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এই যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘস্বরের প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করে না। তাহাতে বিশেষ করিয়া 'মন্দাক্রান্তা' পড়িলে মনে হয় ভগবানের অপার করুণা যে, কালিদাস জীবিত নাই।

বাঙালি যখন আরবি উচ্চারণ করে, তখন এই মারাত্মক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়। বাঙালি (কি হিন্দু কি মুসলমান) আরবি বর্ণমালার সে, হে, জাল, স্বাদ, দ্বাদ, ত্বয়, জ্বয়, আইন, গাইন, কাফ, হামজা, অর্থাৎ বর্ণমালার ৪, ৬, ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১ ও ২৯ ভুল উচ্চারণ করে ও সংস্কৃতে হ্রস্ব-দীর্ঘ যেমন অবহেলা করিত, সেইরকমই আরবিতেও স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘের কোনও পার্থক্য করে না। কিন্তু শুধু কোরান পাঠের জন্য এক শ্রেণির বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁহাদিগকে 'কারী' বলে; দ্রাবিড়ে যেমন সামবেদ গাহিবার জন্য এক শ্রেণির বিশেষ আইয়ার— আয়ঙ্গার ব্রাহ্মণ আছেন। বাঙালি কারীরা দীর্ঘ-হ্রস্ব মানেন ও ব্যঞ্জনে শুধু ৪, ৯, ১৫-তে ভুল করেন।

আমরা সংস্কৃত উচ্চারণে ভুল করি তাহার প্রধান কারণ, আমরা আর্য-সভ্যতার শেষ সীমা-প্রান্তে বাস করি। (আর্য-সভ্যতা বাঙলা ছাড়াইয়া বর্মায় যাইতে পারে নাই ও বালি-জাভায় বিকশিত হইল বটে, কিন্তু প্রাণধারণ করিতে পারিল না)। আমাদের ধমনিতে আর্য-রক্ত অতি কম বলিয়াই আর্য উচ্চারণ করিতে অক্ষম হই। আমরা যে আরবি উচ্চারণ করিতে পারি না, তাহাও ঠিক সেই কারণেই। আরবি সেমিতি ভাষা, তাহার যেসব কঠিন উচ্চারণ মুখের নানা গোপন কোণ হইতে বহির্গত হয়, তাহা বাল্যকাল হইতে না শুনিলে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব।

গত শুক্রবারে রেডিয়োতে কোরান পাঠ ও শনিবারে সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ ও উভয়ের বাঙলা অনুবাদ ও টিপ্পনী শুনিয়া উপরোল্লিখিত চিন্তাধারা মনের ভিতর তরঙ্গ খেলিয়া গেল। রেডিয়োর কোরান পাঠ মুসলমানদের কাছে আদর পাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু তাঁহারা যে কান দিয়া শুনেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক বৃহৎ মুসলমান পরিবারে লক্ষ করিয়াছি, বুড়া কর্তারা রেডিয়োটা দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, দুই কানে শুনিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস ইসলামে সঙ্গীত অসিদ্ধ ও ওই যন্ত্রটি সেইসব শয়তানি জিনিস লইয়া কারবার করে, ছোকরাদের বিগড়াইয়া দেয়। অথচ শুক্রবার সকালবেলা দেখি গুড়িগুড়ি রেডিওঘরের দিকে চলিয়াছেন তাবৎ বুড়াবুড়িরা। আধ ঘণ্টা পূর্ব হইতে কলকাতা ছাড়া অন্য কোনও বেতারকেন্দ্রে রেডিয়ো জুড়িবার উপায় নাই। তার পর মুদ্রিত চক্ষে ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হৃদয়ে অতি নীরবে কোরান পাঠ শ্রবণ করেন। অনুবাদ ও টিপ্পনী কেহ শোনেন, কেহ শোনেন না।

এই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রতি কলকাতা কেন্দ্রের কর্তব্য আছে।

যে কারী সাহেব কোরান পাঠ করিলেন, তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালি কারী অপেক্ষা ভালো সন্দেহ নাই। তাঁহার দীর্ঘ-হ্রস্ব দুরস্ত, তাঁহার 'আইন কাফ হে' ঠিক, কিন্তু তাঁর 'সে' 'জাল' ও 'দ্বাদ' (৪, ৯, ১৫) বারে বারে দুঃখ দেয়, বিশেষ করিয়া 'সে' ও 'জাল', কারণ 'ইজা' (যখন) ও 'সুম্মা' (তৎপর) দুইটি কথা আরবিতে এবং সর্বভাষাতেই ঘন ঘন আসে।

কারী সাহেবের বাঙলা উচ্চারণে আরবির গন্ধ পাওয়া যায়— পাদ্রি সাহেবের বাঙলাতে যেরকম ইংরেজি গন্ধ আমাদিগকে পীড়িত করে আমরা বাঙলায় বলি 'যখন' (যখোন), কারী সাহেব বলেন, 'য্যখ্যন' যেন 'য' ও 'খ'-র ভিতরে আরবি আকার বা জবর রহিয়াছে।

www.pathagar.com

শাস্ত্র যিনি পাঠ করিলেন তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালি অপেক্ষা শতগুণে ভালো সন্দেহ নাই কিন্তু কোনও মারাঠি বা যুক্তপ্রদেশীয় পণ্ডিত সে উচ্চারণের প্রশংসা করিবেন না। তাহার প্রধান কারণ যে শাস্ত্র-পাঠকের হ্রস্ব-দীর্ঘ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রস্ব ও যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ নহে। হ্রস্ব-দীর্ঘে তিনি এত সামান্য পৃথক করেন যে, বানান জানা সত্ত্বেও কানে ঠিক ঠিক বাজে না। তাঁহার বাঙলা উচ্চারণও পণ্ডিতি অনেকটা কথক-ঠাকুরদের মতো।

দুইজনেরই অনুবাদ ও টীকা নৈরাশ্যজনক। প্রভু ইসা (খ্রিস্ট) ও হাওয়ারিগণের বর্ণনা বাঙলার মুসলমান কী প্রকারে বুঝিবে, তাহাতে যদি বেশ কিছুদিন ধরিয়া প্যালেস্টাইনের ইতিহাস ও ভূগোল না শোনানো হয়। সকলেই তো শূন্যে ঝুলিতে থাকিবেন ও শাস্ত্র শোনা হইবে বটে, কিন্তু বোঝা বা আলোচনা তো হইবে না।

শাস্ত্র-পাঠক যে ঊর্ধ্বশ্বাসে অনুবাদ ও টীকা করিয়া গেলেন তাহাতে আমার মতো মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারিল না। টোলে কৃতবিদ্য ছাত্রকে যে ধরনে দ্রুতগতিতে টীকা শোনানো হয়, ইহার অনেকটা তাই। সাধারণ বাঙালি ধর্মতৃষিতকে আরও সরল, আরও সহজ করিয়া না বুঝাইলে টীকাদান পণ্ডশ্রম হইবে।

কারী সাহেব ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা জানি তাঁহারা যে কোনও মসজিদ-মাদ্রাসা, যে কোনও টোল-চতুষ্পাঠীতে সম্মান ও আদর পাইবেন— আমরাও দিব। কিন্তু অল ইন্ডিয়া রেডিও'র উচিত আরও ভালো আরও উত্তম, এক কথায় সর্বোত্তম কারী সর্বোত্তম শাস্ত্রপাঠক আনয়ন করা। ইংরেজিতে বলে, 'সর্বোত্তম উত্তমের শত্রু'।

তাবৎ বাঙলা ও কিছু কিছু বিহার উড়িষ্যা আসামকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে উচ্চারণ পরিবেশন করা হয় তাহার জন্য রেডিওকর্তার দায়িত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি অনেক বেশি হওয়া উচিত ও তাঁহাদিগকে অনেক পরিশ্রম করিয়া সর্বোত্তম কারী-শাস্ত্রী সন্ধান করা উচিত। অথবা অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করা উচিত।

শুনিয়াছি মিশরের কারী রেফাৎ রমজান মাসে কোরান পাঠের জন্য ১৩০০ টাকা পারিশ্রমিক পান; কাইরো কলকাতা অপেক্ষা ধর্মপ্রাণ একথা কে বলিবে?

সর্বশেষে বক্তব্য, পাঠক যেন না ভাবেন, মন্দ উচ্চারণে আমরাই একা। আর্যসভ্যতার অন্য প্রান্ত অর্থাৎ ইংলন্ডের অবস্থাও তাই। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতদের লাতিন উচ্চারণ শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। তবে ইংলন্ডে উচ্চারণ শুদ্ধ করিবার জন্য জোর আন্দোলন চলিতেছে, এদেশে— থাক সে কথা।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়াছেন শ্রীযুত— মুখোপাধ্যায়, কাব্য ব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, এহেন পণ্ডিতের সঙ্গে উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু তর্ক করিবার মতো যুগ্ম মস্তক স্কন্ধে নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ বাক্য

www.pathagar.com

আমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া তর্কাতর্কির বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার শেষ বাক্য "সকল কথার পর তবুও স্বীকার্য যে, বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ", কিন্তু তাহার পূর্বে 'সকল কথার' মাঝখানে শাস্ত্রী মহাশয় এমন কথাও তুলিয়াছেন যেখানে অধম কিঞ্চিৎ প্রগলভতা প্রকাশ করিবে। শাস্ত্রী মহাশয় এবং অন্যান্য সহৃদয় পত্রপ্রেরকও দর্শাইয়াছেন যে, অবাঙালি সংস্কৃত পণ্ডিত 'ষ' ও 'খ'তে পার্থক্য রাখেন না। কিন্তু তাহা হইতে কী সপ্রমাণ হয় ঠিক পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া বলেন নাই। ব্যঞ্জনায় বুঝিতেছি শাস্ত্রী মহাশয়ের বলার উদ্দেশ্য যে, যেহেতুক অবাঙালি পণ্ডিতও ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না, তবে বাঙালিরই-বা দোষ কী?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মারাঠি, দ্রাবিড় ও কাশীর পণ্ডিত যখন সংস্কৃত উচ্চারণ করেন, তখন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যবশত কিছু কিছু পার্থক্য তাঁহাদের উচ্চারণের মধ্যে থাকে। ওইসব পণ্ডিতের একে অন্যের উচ্চারণে যে পার্থক্য তাহা যেন একইরঙের পৃথক পৃথক ফিকা ভাব অথবা গাঢ়। বাঙালির উচ্চারণ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙ। দক্ষিণের আইয়ার হয়তো যতটা দীর্ঘ করিলেন, উত্তরে কাশীবাসী হয়তো ততটা করিলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙালি যে অত্যন্ত পৃথক কিছু উচ্চারণ করে তাহা এই তথ্য হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আইয়ার, নম্বুদ্রী, চিতপাবন, দেশস্থ, করাঢ় (এমনকি মহারাষ্ট্রের 'দেশস্থ' ও ঔপনিবেশিক 'দ্রাবিড়স্থ'), উদীচী, ভার্গব, নাগর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গণ ও তাঁহাদের শিষ্য অব্রাহ্মণগণও একে অন্যের উচ্চারণের পার্থক্য লইয়া ঈষৎ আলোচনা করিয়া একটি সাধারণ রূপ বা নর্ম (norm) স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙালির উচ্চারণ যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং পরস্পর-বিরোধিতায় কণ্টকাকীর্ণ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

(ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণের পার্থক্য হয় প্রধানত দীর্ঘস্বরের দৈর্ঘ্য, হ্রস্বস্বরের হ্রস্বতা, 'ঋ', '৯', ও 'ষ' লইয়া। সব কয়টির আলোচনা এক কলমে ধরাইবার মতো কলমের জোর অধমের নাই। উপস্থিত 'ষ' লইয়া আলোচনা করিব, পরে প্রয়োজন হইলে অন্যান্যগুলির হইবে। 'ষ' যে 'খ' নয় সে বিষয়ে তর্ক করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু 'ষ'-এর উচ্চারণ কেন 'খ' হইল তাহার আলোচনা করিলে মূল 'ষ'-এর কিঞ্চিৎ নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রথম দ্রষ্টব্য 'ষ' স্থলে বিদেশি পণ্ডিত যখন 'খ' বলেন, তখন তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত; কেহ কেহ উচ্চারণ করেন পরিষ্কার 'খ' অর্থাৎ 'ক' বর্গের মহাপ্রাণ 'খ' এবং কেহ কেহ উচ্চারণ করেন ঘর্ষণজাত আরবির 'খ'— কাবুলিরা যেরকম 'খবর' বলে, স্কচরা যেরকম 'লখ' 'LOCH' বলে, জর্মনরা যেরকম 'BACH' বলে। এই দ্বিতীয় 'খ' উচ্চারিত হয় পণ্ডিত যখন 'ষ'-কে 'শ' হইতে পৃথক করিবার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া জিহ্বা মূর্ধা হইতে সরাইয়া আরও পশ্চাৎ দিকে ঠেলেন। এই কারণেই আর্যভাষা পশতুতেও তাহা দেখা যায়— কেহ বলে 'পশুতু', কেহ বলে 'পখতু', কেহ বলে 'পেশাওয়ার', কেহ বলে 'পেখাওয়ার'। এই কারণে জর্মনে Becher-এর 'ch' 'ষ'-এর মতো, অথচ Bach-এর 'ch' আরবি 'খ'-এর ন্যায়। 'ষ'-কে এইজাতীয় 'খ' করা অবশ্য ভুল, আমি মাত্র কারণটি ও নজিরগুলো দেখাইলাম। কিন্তু 'ষ'-এর আসল শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়া অনুচিত। অত্যধিক উৎকণ্ঠিত (উভয়ার্থে) না হইয়া মুখগহ্বরের যে স্থল অর্থাৎ মূর্ধা হইতে ট, ঠ, ড, ঢ ও পরে ওই স্থলে 'ষ' বলিলে মূর্ধণ্য 'ষ' বাহির হইবে।)

www.pathagar.com

বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন হিন্দুস্থান পার্ক হইতে শ্রীআচার্য। তাঁহার বক্তব্য "কোনও ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে তার সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং ধ্বনিতত্ত্বে পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই"। আমাদের মতের সঙ্গে আচার্য মহাশয়ের মতে মিলিল কিন্তু তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের প্রতিকূলতা নিবন্ধন যদি সেই ভাষার উচ্চারণে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহাতে কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।"

আচার্য মহাশয় তাঁহার চিঠিতে নিজের কোনও উপাধির উল্লেখ করেন নাই, অথচ পত্রখানি গভীর, পাণ্ডিত্যে পূর্ণ। তাই প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছি না, অথচ উপরের নীতিটি এতই বিপজ্জনক যে, নিতান্ত অনিচ্ছায় করিতেছি। কারণ যদি এই নীতিই অনুসরণ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যেহেতু আমরা বাঙালি, আমাদের জাতীয় অভ্যাসের 'প্রতিকূল' হয় তাই আমরা F ও 'ফ'য়ের তফাৎ করিব না, th-এর শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিব না, কুরান বঙ্গীয় ইসলামি কায়দায় পড়িব, মন্দাক্রান্তার হ্রস্বদীর্ঘ না মানিয়া উদয়াস্ত কালিদাসকে জবাই করিব। এই নীতি আরও অনুসরণ করিয়া বলিব, আমরা বাঙালি, বাঙলা ভাষার লিঙ্গ নাই, সংস্কৃত লিখিবার সময় লিঙ্গভেদ করিব না। দ্বিবচন মানিব না; হিন্দি বলিবার সময় 'একঠো', 'দুইঠো' করিব, 'গাড়ি আতা হৈ' বলিব— এক কথায় 'জাতীয় অভ্যাসের' দোহাই দিয়া বিজাতীয় কোনও ভাষাই তাহার স্বরূপে গ্রহণ করিব না; সুকুমার রায়ের— হ য ব র ল-য়ের দর্জির ৩২ ইঞ্চি ফিতা দিয়া মাপিলে যেমন সবকিছু ৩২ ইঞ্চি হইয়া যাইত। আমাদের 'জাতীয় অভ্যাসের' বকযন্ত্রে চোলাই করা সর্ব উচ্চারণ শুদ্ধ এল্‌কহল হইয়া বাহির হইবে তাহার বর্ণগন্ধ থাকিবে না।

'লজ্জা' বা শ্লাঘার কথা হইতেছে না; অভ্যাসটি বাঞ্ছনীয়। বেদমন্ত্র ঠিক কী প্রকারে উচ্চারিত হইত জানি না, কিন্তু চেষ্টা তো করিতে হইবে জানিবার জন্য। সেই চেষ্টাতেই তো পণ্ডিতে ও আমাদের মতো সাধারণ লোকের তফাৎ। যুক্তপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মদ্র, গুর্জর পার্থক্য সত্ত্বেও একটি (norm) মানিয়া লইয়াছেন, নিরপেক্ষ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও সেটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন— তবে আমাদের কর্তব্য কী?

আচার্য মহাশয় ভুল উচ্চারণ চাহেন না, কিন্তু তাঁহার মতো পণ্ডিত যদি সে উচ্চারণের সপক্ষে এককাঁড়ি অজুহাত দেন, তবে আমাদের মতো সরল লোক 'জাতীয় অভ্যাসের' তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া আরামে নিদ্রা যাইব— এই আমার ভয়।

এস্থলে বলিয়া রাখা ভালো যে, যদিচ জাভার মুসলমান ও মক্কার মুসলমান এক রকম উচ্চারণে কোরান পড়েন না, তবু জাভার মুসলমান হামেহাল চেষ্টা করেন নর্মের (norm) দিকে অগ্রসর হইবার। পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের আরবি উচ্চারণ খারাপ, কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে জেহাদ হামেসা চালু রাখেন বলিয়া তাহাদের আরবি উচ্চারণ বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষা নর্মের (norm-এর) অনেক কাছে।

আচার্য মহাশয় দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাজাত অন্যান্য মনোরম তথ্যও বলিয়াছেন। সেগুলি পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেরই জানা উচিত। সুবিধামতো সেগুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

অন্যান্য চিঠিও পাইয়াছি, লেখকদের ধন্যবাদ। এ মূর্খকে জ্ঞানদান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার স্বীকার করি।

www.pathagar.com

পরাজিত জর্মনি

জর্মনি হারিয়া গিয়াছে। দুঃস্বপ্ন কাটিয়াছে। সমর-নেতারা যুদ্ধের দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া আবার কুচকাওয়াজের সত্যযুগে ফিরিয়া যাইবার তালে পা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তার অবসান হইল না। বরঞ্চ এতদিন যে মাথাব্যথা শুদ্ধ সামরিক মাথাকে গরম করিয়া রাখিয়াছিল সে আজ রাজনৈতিকদের আহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। সমস্যাটা এই, পরাজিত জর্মনিকে লইয়া কী করা যায়।

১৯১৮ সালে এ সমস্যা ছিল না। নিবীর্য রুশ তখন নিজের গৃহসমস্যা লইয়া ব্যস্ত। জর্মনি সম্বন্ধে সে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৯৪৫ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুশ জর্মনিকে লইয়া কী ভেল্কিবাজি খেলিবে, তাহা মিত্রশক্তির কর্তারা ঠিক আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অথচ দাবা খেলায় অন্য পক্ষের চালের জন্য যেরকম অবিচলিত চিত্তে বসিয়া থাকা যায় এস্থলে তাহা সম্ভবপর নয়।

জর্মনিকে মিত্রপক্ষের কোন চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বলি দিবেন আর রুশরা কোন দর্গায় সিন্নি চড়াইবেন সে বিষয়ে আমাদের দুর্ভাবনা নাই। কারণ প্রসাদ আমরা পাইব না, পাইবার ইচ্ছাও রাখি না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত অশোভনীয় হইবে না। জর্মনি সম্বন্ধেই এযাবৎ যে কেতাবপত্র বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, খবরের কাগজে যে বত্রিশভাজার পরিবেশন হইতেছে তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়— সকলেরই কিছু-না-কিছু স্বার্থ আছে। আমরা নিঃস্বার্থ, আমাদের মতামতে তাই কিঞ্চিৎ নিরপেক্ষতা থাকিবে, আর কিছু না থাকুক।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভালো যে, জর্মনি বিশেষ করিয়া পরাজিত জর্মনি আমাদের শত্রু নয়, মিত্রও নয়। তবে নাৎসিদের আমরা চিরকালই অপছন্দ করিয়াছি। তাহার অন্যতম কারণ নাৎসিরা গায়ে পড়িয়া বহুবার ভারতবর্ষ ও তাহার সভ্যতার প্রতি কটূক্তি করিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রজেনবের্গ সাহেবের 'বিংশ শতাব্দীর মিথ' নামক কেতাবে বিস্তর পাওয়া যায়। রজেনবের্গ সাহেবের পরিচয় বিশদভাবে দিবার প্রয়োজন নাই। হিটলার তাঁহাকে জর্মনির 'আধ্যাত্মিক গুরু' (গাইসটস ফ্যুরার) বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

রজেনবের্গ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সভ্যতা ও কৃষ্টিতে বৃহত্তম দান করিয়াছে, (ক) আর্যরা, (খ) আর্যদের মধ্যে আর্যতম আর্য হইলেন নীল চোখওয়ালা, সোনালি চুলওয়ালা নর্দিক জর্মনরা।

প্রথম তথ্য সম্বন্ধে রজেনবের্গ সাহেবের মনে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ রজেনবের্গের বহু পূর্বে ভিয়েনার খ্যাতনামা পণ্ডিত লেওপল্ড ফন শ্রোডার বহু যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রায় সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আর্যরা সেমাইট (ইহুদি ও আরব) ও মঙ্গলীয়দের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু নর্দিক জর্মনরাই যে সর্বোৎকৃষ্ট আর্য এ বিষয়ে রজেনবের্গের মনে ধোঁকা ছিল। কারণ আর্যসভ্যতা লইয়া যাঁহারা লম্ফঝম্ফ করেন তাঁহাদের প্রথমেই খবর লইতে হয় আর্যের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়। আর সে অনুসন্ধান করিতে গেলেই স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ভারতবর্ষের আর্যদের দ্বারস্থ হইতে হয়। কারণ ইউরোপীয় আর্যদের মাথার মণি গ্রিক

www.pathagar.com

সভ্যতার গোড়াপত্তনের পূর্বেই অন্তত তিনখানা বেদের মন্ত্র রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, উপনিষদের ঋষি সক্রেটিসের পরম বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় বয়সে ও জ্ঞানে। কাজেই ভারতবর্ষীয় আর্যরা যদি আর্য জাতির ঠিকুজিকুষ্ঠি লইয়া বসিয়া থাকে তবে নর্দিকদের কী গতি হয়। রজেনবের্গ বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্যদের এই বিষয়ে কৌলীন্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অদ্যকার ভারতবর্ষীয়রা সে আর্য নয়। "ইহারা জারজ, এখনও গঙ্গাস্নান করিয়া ইহারা নিজেদের বর্ণসংকর পাপের ক্ষালন করিবার চেষ্টায় সর্বদাই রত।" গঙ্গাস্নানের কী অপূর্ব অর্থ নিরূপণ ও সঙ্গে সঙ্গে নর্দিক কৌলীন্যের কী আশ্চর্য কুতুবমিনার নির্মাণ!

একথা আমরা আজ আর তুলিব না যে নর্দিক আর্যে বর্ণসংকর আছে কি না ও থাকিলে কী পরিমাণ। আমাদের বক্তব্য যে, রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসিরা যে আর্যামির বন্যায় জর্মন জাতকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজানা নহে। এ বন্যা আমাদের দেশেও এককালে বহিয়াছিল ও পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনীতিকে গণ্ডিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এ বিষয়ে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৭ সনে কী বলিয়াছিলেন উদ্ধৃত করিতেছি। রজেনবের্গের তখনও জন্ম হয় নাই।

"ম্যাকসমুলার ভট্টের অভ্যুদয়ের পূর্বে আর্য বলিয়া যে একটি শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা (অর্থাৎ আর্যামির পাণ্ডারা) জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর ম্যাকসমুলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্যমন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন তখন তাহার দুই-এক রত্তি ছিটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে আর্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। বিলাত হইতে আর্যমন্ত্রের আমদানি হইল— আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য আর্য বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠে উদ্‌গীত আর্য নামের চিৎকার-ধ্বনিতে ইয়ং বেঙ্গলের গাত্রে থর থর কম্প উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণদেব দানোয়া-পাওয়া শবদেহের ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে বসিয়া গেলেন এবং ফিরে-ফির্তি কোমর বাঁধিয়া সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

আমরা যেরূপ একদিন পৈতা মাজিতে ও সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে বসিয়া গিয়াছিলাম, রজেনবের্গ সাহেবও সেইরকম নর্দিক নীল চোখকে নীলতর ও সোনালি চুলকে সোনালিতর করার চেষ্টায় মশগুল হইলেন। আমরা যেরকম ভুলিয়াছিলাম যে—

কর্তব্যমাচরন্ কার্যমকর্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য ইতি স্মৃতঃ।

অর্থাৎ কর্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে দৃঢ়নিষ্ঠ হন তিনি আর্য শব্দের বাচ্য।

রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসিরাও এই মহাবাক্য ভুলিলেন।

আমরা একদিন ভুলিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের রাজনীতি সেদিন সম্প্রদায়মুক্ত হইতে পারে নাই। পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন 'আর্যামির' হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। এই আবহাওয়ায় আমাদের নাভিশ্বাস উঠে বলিয়াই জিন্না সাহেব যখন বলেন, 'কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান', তখন আমরা আপত্তি জানাই। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব 'আর্যামি'

www.pathagar.com

লইয়া থাকুন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত নাৎসি আন্দোলনের ভাগ্যচক্রগতি দেখিয়া যেন পদক্ষেপ করেন।

নাৎসিদের এই দম্ভের চরম প্রকাশ হইল পৃথিবী জয়ের বাসনায়। তাহার পূর্বে জর্মনি জয়ের কার্যে তাহারা নিযুক্ত হইলেন। ইহুদিদের নির্যাতন; নাৎসি সাম্প্রদায়িকতায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের উৎপীড়ন, এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্দির হইতে হাইনে, আইনস্টাইন, মানি প্রভৃতি মৃত জীবিত মনস্বীদের বহিষ্করণ।

বিচক্ষণ জর্মনরা যে ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই এমন নহে। শুধু বিচক্ষণেরাই যে নাৎসি-দর্শনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা নহে, জর্মনির জনসাধারণও তাহাদের ব্যঙ্গোক্তি আড়ালে অন্তরালে অনেকখানি প্রকাশ করিয়াছিল। একটি ধাঁধাঁর ভিতর দিয়া সে ব্যঙ্গোক্তি, তাহারা বিদেশিদের কাছে প্রকাশ করিত ও তাহাদের নাৎসি তন্ত্রজ্ঞানের পরীক্ষা লইত।

ধাঁধাঁটি এই—

প্রশ্ন : আদর্শ আর্য কে?

উত্তর : তাহার জন্ম হইবে ফ্যুরারের দেশে, সে বীর প্রস্থে হইবেন গ্যোরিঙের ন্যায়, দৈর্ঘ্যে গ্যোবেলসের ন্যায়, নামে রজেনবের্গের ন্যায়, কার্যক্ষেত্রে ফন রিবেনট্রপের ন্যায়। (সকলেই জানেন হিটলারের জন্মভূমি জর্মনি নয়, গ্যোরিঙ ও গ্যোবেলসের একজন মোটা একজন বেঁটে; রজেনবের্গের নামে আছে ইহুদি নামের বোটকা গন্ধ ও রিবেনট্রপ শৌণ্ডিক।)

তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যামি জর্মনিতে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; পরে সে আর্যামির দম্ভ চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি বিজিত দেশে, এমনকি ইতালির ন্যায় মিত্ররাজ্যে (কাউন্ট চানোর অধুনাপ্রকাশিত রোজনামচা দ্রষ্টব্য) তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজ যে রুশেরা বল্কানে অনেকটা সুবিধা পাইতেছে, তাহার কারণ এই নহে যে বল্কানরা সকলেই ভাবে যে, রুশ তাহাদের পরম মিত্র, বরঞ্চ যুক্তিধারা অনেকটা এইরকম : শত্রুর শত্রু মিত্র না-ও হইতে পারে, কিন্তু মিত্রবৎ।

জর্মনির নাৎসি কর্তারা কী রাজরাজেশ্বরের হালে দিন কাটাইতেন, সে সকলেই জানেন। গাঁজার নেশাটা করিলেন কর্তারা, মাথাধরাটা পাইল জনসাধারণ। তাহারা প্রাণ দিল রুশিয়ার দুস্তর প্রান্তরে ক্ষুধায় শীতকষ্টে অথবা রুশনগরদ্বারে, রাস্তায় গলিতে গুলিতে বিস্ফোটকে; অথবা নরমাঁদিতে সামনে মিত্রশক্তির ট্যাঙ্ক, কামান, উপরে বোমারু, পিছনে ফরাসি গেরিল্লা— মাতা বসুন্ধরা তাহাদের আবেদন শুনিবার পূর্বেই বোমারু জাহাজ মাতার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল, কিন্তু হায়রে, সেখানেও আশ্রয় কোথায়?

দেশের কথায় বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবর্ধন'। আজ সমস্ত জর্মনি জুড়িয়া যে বিকার ও ভবিষ্যতে যে কী সান্নিপাতিক জ্বর হইবে, তাহার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে শক্ত। ইংরেজ, আমেরিকান, রুশ ত্রিদোষ হইয়া জর্মনির 'গোবর্ধন'গুলিকে কোন শ্মশানযাত্রায় লইয়া যাইতেছেন, তাহার খবর কে রাখে।

এতদিন খবর পাইতেছিলাম যে, রমাকান্তগুলিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা হইতেছে ও তাহারা যে বিকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এমন নহে। তাহাদের জন্য বিশেষ গারদ, বিশেষ বিচার, এমনকি বিশেষ হাড়িকাঠও নির্মিত হইতেছে। ফাঁসি অথবা গুলির কর্ম নয়, খাস জর্মন কায়দায় তাহাদিগকে গিলোটিনে গলা দিতে হইবে। আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি না,

www.pathagar.com

আনন্দিতও হইতেছি না। আমরা ভারতবাসী; কর্মফলে বিশ্বাস করি। দই খাইলে বিকার হইবেই। কিন্তু ইতোমধ্যে হঠাৎ একটি খবর পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। খবরটি এই— শ্লেজবিক-হলস্টাইনে নাকি প্রায় সোয়ালক্ষ জর্মন সৈন্য ও অফিসারকে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের নিরস্ত্র করা হয় নাই। পাছে বিশ্বসুদ্ধ লোক খবর পাইয়া আঁতকাইয়া উঠে, তাই অত্যন্ত সান্ত্বনাপূর্ণ এই খবরটিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের রসদ মাত্র দশ রোঁদ চালাইবার মতো। যে অঞ্চলে এই নোনা ইলিশরা বিরাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহারা সর্বময় কর্তা, এমনকি সে অঞ্চলে যদি তাঁহাদের খানাপিনার অসুবিধা হয়, তবে পার্শ্ববর্তী জর্মনিও সম্ভবত ডেনমার্ক হইতে আহারাদি যোগাড় করিতে পারিবেন। হেমলেটি ভাষায় বলি, 'ইহারা যে পাঁড় নাৎসি, সেকথা জানাইবার জন্য দৈববাণীর প্রয়োজন নাই।'

সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও পাইলাম যে, প্রায় ৪৫ মিলিয়ন পাউন্ড খরচা করিয়া (প্রতি বৎসরে না প্রতি তিন বৎসর এ কথাটা রয়টার কাজের হিড়িকে ঘুলাইয়া ফেলিয়াছেন) একটি পাকাপোক্ত পোলিশ বাহিনী ইংলন্ডে মজুদ রাখা হইয়াছে। ইহারাও জনবুল মার্কা ষাঁড় লাল রঙের কট্টর দুশমন।

এই যে ইংলন্ডের হাঁড়িতে জিয়ানো যশোরে কই, শ্লেজবিক-হলস্টাইনে জমানো পদ্মার নোনা ইলিশ, ইঁহারা লাগিবেন কোন কর্মে কোন পরবে? নতুন রাজনীতির জন্মদিনের দাওয়াতে, না ইউরোপের দ্বিতীয় কাপালিক শ্রাদ্ধবাসরের ভোজে?

২

পেটুক ছেলেকে যা কিছু করিতে বলা হউক না কেন, সে আহারাদির আলোচনায় ঠিক পৌঁছিবে। এমনকি একং দশঙের মতো রসকসহীন জিনিস মুখস্থ করিতে বলিলেও সে ঠিক লুচি-মণ্ডায় পৌঁছিবে। কায়দাটা দেখার মতো : একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত; লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাগ (মাঘ) ছেলেপিলে, জ্বর, সর্দি, কাশি; গয়া, বৃন্দাবন, পুরী, রসগোল্লা, সন্দেশ, মিহিদানা, লেডিকিনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে নড়ায় কাহার সাধ্য।

ইংরেজ, ফরাসির দৃঢ় বিশ্বাস যে জর্মনি পেটুক ছেলের মতো। তাহাকে যে কোনও কায়দার সরকার দাও না কেন, সে রাজতন্ত্রই হউক আর গণতন্ত্রই হউক, জর্মনরা ঠিক স্বৈরতন্ত্র ও কুচকাওয়াজতন্ত্রে পৌঁছিবেই। য়ুঙকার ও রূঢ়ের ধনপতিরা মিলিয়া পৃথিবী জয়ের প্ল্যান আঁটিবেই। ফন পাপেন ও ট্যুসেনে বন্ধুত্ব হইবেই ও পৃথিবী জয়ের জন্য বিদেশি, টুথব্রাশ-গোঁপওয়ালা, নিরক্ষর উজবুকেরও যদি প্রয়োজন হয় তাহাও সই— যদি সে উজবুক ঠিক ঠিক বক্তৃতা ঝাড়িয়া টেবিল ফাটাইতে পারে ও শান্তিপ্রিয় দেশি-বিদেশির মাথাও এলোপাতাড়ি ফাটাইতে পারে। ইংরেজ-ফরাসি বলে, "দেখ না, ১৯১৮-১৯ সালে আমরা জর্মনিকে কীরকম সরেস একখানা বাইমার রিপাবলিক দিয়াছিলাম; কিন্তু সেই একং দশং পড়িতে গিয়া তাহারা ঠিক নাৎসি গুণ্ডামিতে পৌঁছিল। ইহাদের বিশ্বাস নাই, ইহাদের 'রোম রোম মে বদমায়েশি"।

www.pathagar.com

পরাজিত জর্মনিকে লইয়া সমস্যাটা তাহা হইলে এই, তাহাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় কি না। যদি না দেওয়া যায় তবে পিটুনি পুলিশ দিয়া তাহাকে আদবকায়দা শিখাইতে হইবে।

১৯৩৯ সালে আমার এক জর্মন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন : 'লড়াই শীঘ্রই লাগিবে। আমরা যদি জিতি, তবে দুনিয়ার রাজত্ব আমাদের হাতে আসিবে আর যদি হারি তাহা হইলেও। কারণ আমাদের পরাজয় অর্থই রাশিয়ার জয়। আমরা তখন লাল হইয়া যাইব। আমাদের প্রতিনিধিরা মস্কোতে যাইবে, সেখানে ভোঁতা রাশিয়ানদের তিন দিনে কাবু করিয়া তামাম ইউএসএসআর আমাদের প্রতিনিধিরাই চালাইবে। রাশিয়ানরা বর্ণবিচার করেন না, তাহাদের বীজমন্ত্র "সর্বোত্তম ব্যক্তি বড়কর্তা হইবে, হউক না সে জর্জিয়ন"। যেরকম মুসলমানরা একদিন বলিত, "সর্বোত্তম ব্যক্তি খলিফা হইবে, হউক না সে হাবসি"। কাজেই কিছুদিনের ভিতরই দেখিতে পাইবে এক জর্মন ক্রেমলিনে বসিয়া দুনিয়া চালাইতেছে। হ্যাঁ, তামাম দুনিয়াটা, কারণ জর্মনি ইউএসএসআরের গুষ্টিতে যদি ঢোকে, তবে বাদবাকি ইউরোপ তিন দিনেই তার খপ্পরে পড়িবে। ইংরেজ, মার্কিন কেউ ঠেকাইতে পারিবে না। তার পর পটপট করিয়া চীন, ভারতবর্ষ, ইরান, ইরাক, মিশর। তার পর? তার পর আর কী? এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এক অখণ্ড রাজ্য হইলে আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়াকে একঘরে করিয়া তিন দিনের ভিতর সমাজের সামনে নাকে খত দেওয়াইব। দেখিবে 'সব লাল হো জায়েগা', তবে রঞ্জিতি মর্মে নহে।'

শুনিয়া বলিয়াছিলাম, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার কথাই যদি ফলে, তবে আমরা ভারতবাসীরাই দুনিয়ার রাজত্ব করিব। ভারতবাসীও না, আমরা বাঙালিরাই ক্রেমলিনে বসিয়া নিয়েভা নদীর ইলিশ মাছ খাইব ও দুনিয়ার রাজত্ব করিব।'

বন্ধু বলিলেন, 'সে কী কথা? তোমরা বাঙালিরা এমন কী গুণে গুণবান?'

আমি বলিলাম, 'বিলক্ষণ, আমরা লড়াই করিয়া দেশের স্বাধীনতা জিতিতে না পারি, কিন্তু মস্কোর কৌন্সিল-ঘরে আমাদের বক্তৃতা জলতরঙ্গ রুধিবে কে, হরে মুরারে।'

কিন্তু সেকথা উপস্থিত ধামাচাপা থাকুক; গোঁফে তেল দিবার সময় এখনও হয় নাই।

আমার জর্মন বন্ধুর যুক্তিতে মার্কিনিংরাজ বিশ্বাস করে। তাহাদের মাথায় ঢুকিয়াছে যে, জর্মন জিঙ্গো যেরকম পাগলা হিটলারকে কার্য উদ্ধারের জন্য দলে নিয়াছিল, জাতধর্ম, কৌলীন্য আভিজাত্য বিসর্জন দিয়া, ঠিক সেইরকম তাহারা লাল হইয়া স্টালিনকে হিটলারের তখতে বসাইয়া দুনিয়ার বাদশাহি করিবে অর্থাৎ নাৎসি গুণ্ডামির বদলে স্টালিনি গুণ্ডামি চালাইবে। দুই গুণ্ডামিই মার্কিনিংরাজের পক্ষে মারাত্মক, মহতী বিনষ্টি। সেই মহাপ্রলয় হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় জর্মন জিঙ্গোকে বোঝানো যে, তাহারা লাল হইয়া কেন মস্কো দরবারে কুর্নিশ দিতে যাইবে। মার্কিনিংরাজ সাহায্য করিতে প্রস্তুত, জিঙ্গোরা লাল রক্তস্রোতের উপর ভরাপালে মস্কো পৌঁছিবে রাজবেশে। উপস্থিত কোনওগতিকে রুশকে ঠেকাইয়া রাখ; জর্মনি যেন মনের দুঃখে লাল গেরুয়া পরিয়া বিবাগী হইয়া মস্কো তপোবনে চলিয়া না যায়। অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীন চেম্বেরলিন নীতি "যতক্ষণ রুশে-জর্মনে লড়াই চলে আমাদের পৌষ মাস, দুই দুশমনে মিলিলেই আমাদের সর্বনাশ"।

www.pathagar.com

যদি বলা হয়, এক কাজ করো না কেন, নাৎসিদের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া রাজ্যশাসন দেশের জনগণের হাতে ছাড়িয়া দাও। তাহারা যে লাল হইয়া যাইবেই, এ স্বতঃসিদ্ধ পাইলে কোথায়?

মার্কিনিংরাজ বিজ্ঞের ন্যায় মৃদুহাস্য করিয়া বলে, 'ইতিহাস পড়ো। বাইমার রিপাবলিক যখন জর্মন জনগণকে ভেট দেওয়া হইল তখন তাহারা করিল কী? কোথায় না বাদশাহি মসলন্দে বসিয়া শাহেনশাহিগিরি করিবে তাহা নয়, সেই কাইজারকে তাহার জমিদারির আমদানি কিস্তি খিলাপ না করিয়া হামেহাল পাঠাইল— এদিকে নিজে খাইতে পায় না। মুচি-মেথরকে বলা হইল, রাজা তো হইতে পারিবে না, সিংহাসন নাই, প্রেসিডেন্ট হ', তা নয়, ডাকিয়া আনিল সেই য়ুঙ্কার পালের গোদা হিন্ডেনবুর্গটিকে। তার পর সেই পাগলা জগাইকে। সে ব্যাটা কালাপাহাড় জাতে অস্ট্রিয়ান হইল জার্মান। মোদ্দা কথা এই, জর্মন আপামর জনসাধারণ যা, য়ুঙ্কারও তা, নাৎসিও তা। সব শিয়ালের এক রা। বরঞ্চ কট্টর নাৎসিরা ভালো। শক্তির উপাসক। জাতবর্ণহীন স্টালিনি নেড়া-নেড়িদের বিরুদ্ধে ইহাদের কোনও না কোনও দিন শভিনিজম-কারণ খাওয়াইয়া লড়ানো যাইবে। আপামর জনসাধারণ তো কাছাখোলা, লাল গেরুয়া পরিয়া ধেই ধেই করিয়া স্টালিনি সংকীর্তন নাচিবার গাইবার জন্য তৈয়ার হইয়া আছে। তাই শ্লেজবিক-হল্স্টাইনে নাৎসি জিয়াও আর গোরাদের কড়া বারণ করিয়া দাও যেন জর্মন জনগণের সঙ্গে রাখি না বাঁধে (নন-ফ্রেটারনাইজেশন)। গোরাদেরই-বা বিশ্বাস কী? দুষ্টলোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদেরও নাকি গোলাপি আমেজ লাগিয়াছে।

ঠিক এইখানটায় মার্কিনিংরাজের সঙ্গে আমার মত মিলে না। আমার বিশ্বাস, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া পাইতে চায়। স্টালিন-দত্ত গুরুমন্ত্র জপিয়া নয়। আমার মনে আছে ১৯৩২ সালে যখন জর্মনিতে নাৎসি-কম্যুনিস্টে জোর ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল তখন নাৎসিরা পথেঘাটে একে অন্যকে অভিবাদন করিত 'হাইল হিট্লার' বলিয়া, কম্যুনিস্টরা 'হাইল মস্কো' বলিয়া। গুণীদের বলিতে শুনিয়াছি এই মস্কো-মার্কা বিদেশি ভদকা জর্মন বিয়ার ঐতিহ্য-গর্বিত জনসাধারণ আদপেই পছন্দ করিত না। কে জানে হয়তো এই কথা স্মরণ করিয়াই রুশরা আজ বার্লিনাঞ্চলে জোর করিয়া জর্মনদের 'হাইল মস্কো' বলাইতেছে না। অবান্তর হইলেও একটি কথা বলিবার লোভ হইতেছে। আমাদের দেশি কম্যুনিস্টরা কিন্তু মস্কোবাগে না তাকাইয়া কোনও কর্মই করেন না, কোনও বাক্যই বলেন না। স্টালিন যদি জর্মনির সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তা-ও ভালো, যদি লড়েন তা-ও ভালো, যদি ফিনল্যান্ডের কান মলেন তা-ও ভালো, যদি ফিন্ কম্যুনিস্টদের তত্ত্বতাবাশ না করিয়া পাসিকিভির সঙ্গে দোস্তি করেন তাও ভালো, ইরান তেল দিল না বলিয়া যদি তাকে ধমক দেন তবে তা-ও ভালো, গ্রিক দেশসেবীদের গাছে চড়াইয়া যদি মই কাড়িয়া লন তবে তা-ও ভালো। কারণ বাতুশ্কা (ছোট বাপা) স্টালিন সর্ব-বিশারদ, ভগবানের (রাম রাম!) ন্যায় সর্বজ্ঞ। বিরিঞ্চিবাবার ন্যায় তিনি চন্দ্রসূর্য ওয়েল না করিলে আকাশ পাতালের বন্দোবস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা। অতএব 'হাইল মস্কো'। আমাদের এ ধর্ম পছন্দ হয় না। আতাতুর্ক পছন্দ করিতেন না বলিয়াই নব্যতুর্কের স্কন্ধ মক্কাবাগ হইতে ফিরাইয়া আঙ্কারাবাগে স্ক্রু টাইট করিয়া দিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

কথা হইতেছিল যে, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া লইতে চায়। তাই যদি হয় তবে বাইমার রিপাবলিকের বানচাল হইল কী করিয়া?

৩

সোশ্যাল ডিমোক্রেটদের হাতে রাজ্যচালনার ভার সমর্পণ করাই যে প্রশস্ত ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। বাইমার রিপাবলিককে সাফল্যমণ্ডিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সোশ্যাল ডিমোক্রেটরা। জর্মনির খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক, গুণীজ্ঞানী— এক কথায় যাঁহারা জর্মনির গর্বস্বরূপ, তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন বাইমারের পিছনে, সোশ্যাল ডিমোক্রেটরূপে। আমরা বিশেষ করিয়া ইঁহাদের চিনিতাম, কারণ ইঁহাদের ভিতর আর্যামি গোঁড়ামি ভণ্ডামি ছিল না।

জর্মনির দুর্দিনে সোশ্যাল ডিমোক্রেটরা আপামর জনসাধারণকে এক পতাকার নিচে সম্মেলিত করিয়া ইন্‌ফ্লেশন, বেকারি, নাস্তিক্য, উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথিবী জয় করার উদ্দেশ্যে নতুন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার স্বপ্ন তাঁহারা দেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, “মানবসংসারে ভালো লোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে, প্রত্যেক জাতি আপন প্রদীপ উঁচু করিয়া তুলিলে তবে সে উৎসব সমাধা হইবে”। পৃথিবীর শান্তি ও মঙ্গল তাঁহারা কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঠিক ওই সময়ে (১৯২০) রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা বিপুল সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। জর্মন জনসাধারণ তখন রবীন্দ্রনাথের বাণীতে নিজের মূক আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিল। কে না জানে ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমের কবি, শান্তির প্রতীক, পদদলিতের পরিত্রাণ।

তথাপি ইংরেজ-ফরাসির ভয় ছিল যে সময়কালে সোশ্যাল ডিমোক্রেটরা বলশিদের সঙ্গে যোগদান করিবে। তাই যখন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য সোশ্যাল ডিমোক্রেটরা ইংরেজ-ফরাসি ধনপতিদের সাহায্য চাহিল তাহারা সাফ জবাব দিল। ফলে বেকারি বাড়িল, ব্রনিভ হাল সামলাইতে পারিলেন না। তার পর ফন পাপেন; শ্লাইশার গর্ভাঙ্কের ভিতর দিয়া নাৎসি যবনিকা পতন। ইংরেজের কথা ফলিল না, সোশ্যাল ডিমোক্রেটরা কম্যুনিস্টদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নাৎসি অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিতে রাজি হইলেন না।

* * *

সোশ্যাল ডিমোক্রেটরাই যে দেশের মেরুদণ্ড তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, রুশেরা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে ইঁহাদেরই প্রধান শক্তি স্বীকার করিয়া নিয়াছে। ইঁহাদেরই সঙ্গে আছেন ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও লিবারেল ডিমোক্রেটিক পার্টি। কম্যুনিস্টরাও আছেন, ও বেশ জোর আছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং ভিতরে ভিতরে রুশ সরকার যে তাহাদেরই সবচেয়ে বেশি সাহায্য করিবে তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশরা জানে যে, সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা যদি বাঁকিয়া বসিয়া থাকে, তবে কম্যুনিস্টরা শুধু গায়ের জোরে তাহাদের প্রোগ্রাম চালু করিতে পারিবে না। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, রুশের চাল হইল

www.pathagar.com

সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের নটমঞ্চের সম্মুখে রাখিয়া দেশের প্রথম দুর্দিনের ধাক্কা তাহাদের দিয়া সহানো। রুশদের যথেষ্ট সাহায্য না পাইয়া যখন ব্যনিভ সরকারের মতো তাহাদের পার্টি-নৌকা বানচাল হইবে তখন কম্যুনিস্টরা আসরে নামিয়া 'দেশোদ্ধার' করিবেন, অর্থাৎ গোটা রুশাধিকৃত অঞ্চলকে ইউএসএস আরের অঙ্গীভূত করিবেন। সে বিপদকালে সোশ্যাল ডিমোক্রেটরা যে কোনও কট্টর লাল-বিরোধী দর্গায় ধরনা দিবে তাহার উপায় নেই, কারণ রুশরা কট্টরদের নির্মমভাবে বিলোপ করিয়াছে ও করিতেছে। রুশরা জানে যে, উপস্থিত সোশাল ডিমোক্রেটদের লোকচক্ষে অপমানিত করার প্রয়োজন তাই তাহাদের সভামঞ্চে আনিবার পূর্বে বেশ করিয়া মুসোলিনি-কায়দায় জোলাপ দেওয়া হইতেছে।

অস্ট্রিয়ায় রুশরা যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহাতেও ওই চাল। বিস্তর সোশ্যাল ডিমোক্রেটদের হরেক রঙের পোর্টফোলিও দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ, অর্থ, প্রোপাগান্ডা অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর হাতে ও তিনি কম্যুনিস্ট। অর্থনৈতিক দিক দিয়াও রুশের বালাই কম। যে অঞ্চল দখল করিয়া বসিয়াছে সেখানে খানা-পিনা আছে, তাহার উপর উক্রাইন আছে। সে অঞ্চলের সমস্ত কলকারখানা সরাইয়া রাশিয়ায় লইয়া গেলেও ইহাদের অন্তত অস্থিচর্মসার করিয়া রাখিতে কোনও বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

* * *

মার্কিন-ইংরেজ কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। কর্তাদের বুদ্ধির বহর কতটুকু তাহা নিম্ন খবরটুকু হইতে বিলক্ষণ বোঝা গেল।

"জর্মনির কলকব্জা যদি কাড়িয়া লই (অর্থাৎ ডিসইনডাসট্রিয়ালাইজ) তবে তাহারা না খাইয়া মরিবে, আর যদি না কাড়ি তবে চর্বচোষ্য লালিত হইয়া পুনর্বার মস্তকোত্তোলন করিয়া আমাদিগকে প্রহার করিবে।"

এই তথ্যটুকু কি বিজ্ঞের ন্যায় প্রচার করা হইল! ঘোড়াকে দানাপানি না দিলে সে মরিবে, তাহাতে আর নতুন কথা কী? আর দিলে সে গাড়ি টানিতে পারিবে (অর্থাৎ গায়ের জোরে রুশকে ঠেকাইতে পারিবে), কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে লাথিও মারিবে। গাড়ি যদি চালাইতে চাও, তবে তেজি ঘোড়া কিঞ্চিৎ দুরন্তপনা তো করিবেই। তুমি ভালো লাগাম কেনো না কেন?

দ্বিতীয় উদাহরণ পণ্য!

"কাঠের অভাব হইয়াছে বলিয়া বার্লিনের যেসব অঞ্চলে ইংরেজ-মার্কিন প্রবেশ করিয়াছে, সেখান হইতে স্টালিনি সাইনবোর্ড সরানো হইয়াছে।" খদ্দের যখন অশ্ব-বিক্রেতাকে বলিল, "বাড়ি গিয়া দেখিলাম, তোমার ঘোড়া খোঁড়া", তখন সে বলিল, "আপনার বাড়ি তো বাজারের উত্তর দিকে, ওদিকে চলিলে আমার ঘোড়া খোঁড়া হয়ই!" খদ্দের বলিল, "তোমার যুক্তিটা তোমার ঘোড়ার মতোই খোঁড়া।"

তৃতীয় উদাহরণ,

'কোনও কোনও জর্মন মেয়ে ইংরেজ সিপাহিদের নিকট হইতে চকলেট লইয়া চম্পট দেয়।' আশ্চর্য! কিন্তু আমাদের এতদিন বিশ্বাস ছিল যে, সবদেশের মেয়েরাই এরকম করে। আর মেয়েদেরই-বা দোষ দেই কেন? তোমাদের সন্তুষ্টিকরণ (এপিজমেন্ট) অস্ট্রিয়া-চেকোশ্লোভাকিয়া চকলেট পকেটস্থ করিয়া হিটলার তো এই সেদিন তোমাদের বিশেষ অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজনৈতিক স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়, কিন্তু এতটা ক্ষীণ!

www.pathagar.com

অধিকৃত জর্মনি চালনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবর হইতে বোঝা যায়, বরঞ্চ বলা উচিত বোঝা যায় না ইংরেজ-মার্কিনের নীতি কী।

'কম্যুনিস্টরা রাজ্যশাসনে কোথাও নাই। বেভেরিয়া ও নিম্নরাইনে দক্ষিণপন্থি ক্যাথলিকরা সর্বময় কর্তা। হামবুর্গ ও হানোফারে পার্টিমতামতহীন বণিক ও দক্ষিণপন্থি আমলারা গুছাইয়া লইতেছেন, যদিও অন্য কেউ কেউ বখরা পাইতেছেন। হেস্সে ও মধ্য রাইনে সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা রাজ্য-চালনার পুরোভাগে ও উত্তরপন্থি ক্যাথলিকদের আওতায় বেস্টফালিয়েন ও ওল্ডেনবুর্গে কিছুটা রাজত্ব করিতেছেন। তদুপরি বড় বড় নগরে ইঁহারাই মেয়র হইয়া বসিয়াছেন।

উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। এ রকম পঁচিশ জায়গায় বত্রিশভাজা করিবার কী প্রয়োজন? এরকম দো-আঁসলা, তিন-আঁসলা জানোয়ার পয়দা করিবার এক্সপেরিমেন্ট কেন? ইংলন্ডে একবার টার্কি ও হেন্ (মুরগি) পক্ষীতে সংমিশ্রণ করাইয়া যখন টার্কিন পাখি পয়দা করা হয়, তখন ফ্রান্স বলিয়াছিল, "আমেরিকার এক আস্তাবলে গাধা ও একখানা ভাঙা বাইসিক্ল একসঙ্গে রাখার ফলে ফোর্ড গাড়ির জন্ম হয়েছিল। সাধু সাবধান!"

তাই বলিতেছি যে, প্রকৃষ্টতম পন্থা, সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের শুধু রাজ্য সমর্পণ করাই নয়, তাঁহাদের সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন সাহায্যদান। রুশরা যেমন তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের বোকা বানাইতে চাহে, তোমরা তেমনি তাঁহাদের সফলতার পথে লইয়া চল। জর্মন বড় জাত্যাভিমানী, পারতপক্ষে সে কখনও তাহার জাতীয়তাবোধ ত্যাগ করিতে চাহে না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মুক্তির পথ তাহারই ঐতিহ্যের তাহারই বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়া। সে বলশির ধামাধরা হইতে চাহে না, তোমাদের গোলাম হইতে চাহে না। তাহাদের যদি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে দাও তবে সে সকল শত্রুকে রোধ করিয়া শান্ত জীবনযাপন করিবেই। সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা শান্তি চায়।

আর শেষ কথা তো এই যে, স্বায়ত্তশাসনে সর্বজাতির অধিকার। সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা জর্মনজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা বরণীয় তাহারই প্রতীক।

প্যালেস্টাইন

গোড়ার দিকে ইহুদি-আরবে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তর্ক উপস্থিত হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই উঠিত, সে দেশটা কাহার। ইহুদিরা বলিত, 'এই পবিত্র দেশ আমাদের পিতৃভূমি, মুসা (মোজেস) আমাদিগকে এই দেশে পথ দেখাইয়া আনেন; আমাদের গর্বস্থল রাজা সুলেমন (সলমন), দায়ুদ (ডেভিড) এই দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, আমাদের প্রপিতামহ ইব্রাহীমের (আব্রাহামের) কবর এই মাটিতে। এই দেশ আমাদের পুণ্যভূমি, এখন এ দেশকে আমাদের কর্মভূমিতে পরিণত করিতে চাহি।' (সত্যেন দত্তের 'তীর্থসলিলে' রাজা সুলেমন ও দায়ুদের গীতি দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

উত্তরে আরব বলে, 'তোমাদের মতো আমরাও সেমিটি, যেসব মহাপুরুষদের নাম করিলে তাঁহারা আমাদেরও পূর্বপুরুষ। তাঁহাদের গোর আমাদের তীর্থস্থল-দরগাহ। ইঁহাদের মহৎ কার্যকলাপ কোরানে বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু জেরুজালেম (বয়ত উল-মুকদ্দস পবিত্রালয়) আমাদিগের কাছে মক্কার পরেই সম্মানিত। কিন্তু এসব ধর্ম-সম্বন্ধীয় হার্দিক আলোচনা উপস্থিত স্থগিত রাখো। আসল কথাটা এই, তোমাদের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (খ্রিস্টের বহুপূর্বে) তোমরা এ দেশ ত্যাগ করিতে আরম্ভ কর; খ্রিস্টের পর তোমাদের অধিকাংশ জাতভাই খ্রিস্টান হইয়া যায়— তাহারা আজ আমাদের দলে, পরবর্তী যুগে তাহাদিগের অধিকাংশ আবার মুসলমান হইয়া যায়— এবং সর্বশেষে ক্রুসেডের আমলে যখন যুদ্ধ, অরাজকতা, ও অনাসৃষ্টির ফলে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, তখন তোমরা সকলেই 'পোড়া' দেশকে ছাড়িয়া কারবারে পয়সা করিবার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে। আমরা এই দেশের মাটিকে ভালোবাসিতাম— সেই মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আটশত বৎসর কাটাইলাম, এখন পয়সার জোর হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে ভিটা-ছাড়া করিতে চাও? তোমাদের বেশভূষা বিজাতীয়, তোমাদের আচার-ব্যবহার এদেশের প্রাচীন ইহুদি পন্থানুযায়ী নহে (অর্থাৎ যে কয়টি ইহুদি দুর্দিনে এদেশ ত্যাগ করিয়া যান নাই, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের আজ মিলে বেশি), তোমরা বার্লিন-প্যারিসের নৈতিক চরিত্র ও দুষ্ট রোগ সঙ্গে আনিয়াছ, আর সর্বশেষ কথা, আমাদের দুশমন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তোমরা বন্ধুত্ব করিয়াছ।'

এই তর্কাতর্কি আমি ছয় মাসকাল উদয়াস্ত শুনিয়াছি— লিখিতে গেলে একখানা ছোটখাটো বই লেখা যায়। কিন্তু এসব তর্ক আজকাল কম হয়।

১৪-১৮ যুদ্ধের সময় ইংরেজ প্যালেস্টাইনের আরবকে কথা দেয়— তখন যেখানে ইহুদির সংখ্যা নগণ্য— যে, তোমরা যদি তুর্কির হইয়া না লড়ো তবে যুদ্ধের পর তোমাদিগকে স্বরাজ (সেলফ ডিটারমিনেশন) দিব। সঙ্গে সঙ্গে আরবদের অজানাতে, প্রধানত মার্কিন ইহুদিদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে, তাহারা যদি কাইজারকে অর্থসাহায্য করা বন্ধ করিয়া সেই অর্থ ইংরেজকে দেয় ও বিশ্ব-ইহুদি (ওয়ার্লড জিউয়ারি) অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে, তবে যুদ্ধের পর ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে 'ন্যাশনাল হোম' নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে। ('ন্যাশনাল হোম' কথাটার বাঙলা আর করিলাম না, ইংরেজিতেই তাহার অর্থ কী, সে লইয়া বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই। নিরক্ষর আরব ইংরেজির এক বর্ণ বোঝে না, কিন্তু 'ন্যাশনাল হোম' যে 'ন্যাশনাল *স্টেট*' নয় সে কথা বুঝাইতে তাহার তৎপরতার অন্ত নাই। বারে বারে আরবি কথাতে শুধু চারিটি ইংরেজি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, 'ন্যাশনাল হোম' আর 'ন্যাশনাল *স্টেট*'। আমি যদি 'ন্যাশনাল হোমের' অনুবাদ 'জাতীয় ভবন' বা 'জাতীয় সদন' দিয়া করি, তবে ইহুদিরা আমাকে খুন করবে, আরবরা আমাকে খয়রাতি দিবে।)

যুদ্ধের পর যখন 'ন্যাশনাল হোমের' খবরটা বাহির হইল, তখন আরবরা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। অতিকষ্টে তাহাদিগকে বুঝান হইল যে, এ বস্তুটি অত্যন্ত নিরীহ ঢোঁড়া সাপ। জনকয়েক ইহুদি প্যালেস্টাইনে বসবাস করিবার জন্য আসিতেছে, বিস্তর পয়সা সঙ্গে আনিবে, নিজের খাইবে পরিবে, ধর্মচর্চা করিবে, 'কলচর' করিবে, আরবের আপত্তি করিবার কী আছে! ২৬ সেপ্টেম্বরে (৪৫) প্রকাশিত বাইৎসমান সাহেবের এই মর্মে বুলি যে, ইহুদিরা

www.pathagar.com

প্যালেস্টাইনে 'জুইশ মেজরিটি' ও 'জুইশ স্টেট' চায়। সেকথা তখনকার দিনের ইংরেজ সরকার মানেন নাই— লেবার পার্টি লাস্‌কি প্রভৃতি ইহুদিদের প্রতাপে আজ মানেন।

সে যাহাই হউক, যুদ্ধাবসানে যখন এইসব আলোচনা হইতেছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে, যেসব ইংরেজ সৈন্য আরবদের সহায়তায়, লরেন্সের ধূর্তামিতে, জেরুজালেমে একটি বুলেটমাত্র খরচ না করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সেখানে থাকিবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ও অভিনব বস্তু। ১৯১৪ সালের পূর্বে কোনও রাজা গায়ের জোরে বা অন্য কোনও কায়দায় কোনও দেশ জয় করিলে সে-রাজা দুনিয়ার লোককে ডাকিয়া বলিতেন না যে, তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া রাজ্যটি সোনার থালাতে করিয়া তুলিয়া দাও, আমি গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করিব। এ কায়দাটা আবিষ্কার করিলেন ইংরেজ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা। লিগ অব নেশনস গড়িয়া তামাম দুনিয়ার দেশপতিদের ডাকিয়া বলা হইল যে, তাহারা যেন ইংরেজকে রাজনৈতিক পূতজলে বাপ্তিস্ম করিয়া প্যালেস্টাইন, ইরাক, মিশরের 'মেনডেটরি' প্রভু বা 'অছি' নিযুক্ত করে। বিশ্বজন যেন স্বস্তিবচন ঝাড়িয়া বলে, তুমি ন্যায়ত ধর্মত আইনত দেশটা পাইলে। পৃথিবীর নৈতিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশ লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা যেন এই পর্যায়ে নতুন পরিচ্ছেদ পাড়েন।

'অছি' কথাটি শুনিলে আমাদের মতো প্রাচীনপন্থিদের 'ধর্মপিতা' সমাসটি মনে পড়ে। তুর্কি ভাষায় 'অছি' অর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতা। নাবালক শিশুর জন্য যখন অছি নিযুক্ত করা হয় তখন এই কথা অছিকে মানিয়া লইতে হয় যে, সে নিঃস্বার্থভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান করিবে। আইনকানুন ভালো জানি না, তবে শুনিয়াছি যে, অছি নিয়োগের পূর্বে দেখিতে হয় যে, ওই শিশুর স্বার্থে যেন অছির লোভ না থাকে— থাকিলে অছিত্ব রদ-বাতিল। 'লিগে'র কর্তারা স্বকায়দায় এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইলেন। ইংরেজ তখন বলেন নাই। কিন্তু হালে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্যালেস্টাইন আইসাক্ পাক আর রহিম নিক, সেখানে ইংরেজ স্বার্থ বরাবর অচল-অটুট থাকিবে— সেখানে বিমানঘাঁটি, পল্টন-গোয়াল থাকিবেই। লিগ-কর্তারা শুধু তম্বি করিয়া অছিদের বলিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর শাসিত দেশের কার্য-প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। সে ব্যঙ্গ-নাট্যের কথা আরেক দিন স্মরণ করাইয়া দিবেন। আসল কথা, বিশেষ লম্ফমান প্রাণীকে ষোড়শোপচারে কদলীবৃক্ষের অছি নিযুক্ত করা হইল।

সেই অছিত্বের আওতায় তার পর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি বুলবুলির পাল আসিয়া আরবের গমক্ষেতে পড়িল। কিন্তু ছেলে ঘুমাইল না, পাড়া জুড়াইল না। আরবরা এক হাতে ঠেকায় ইংরেজকে, আরেক হাতে মারে ইহুদিকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন ঠেকাইতে পারিল না। 'খাজনা দেব কিসে?' শ্মশান হইতে মশান হইতে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করিয়া তখন উত্তর আসিল, 'আব্রু দিয়া, ইজ্জত দিয়া, ইমান দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া।' (কর্তার ভূত, *লিপিকা*, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু সে সমস্যা অর্থনৈতিক। বুলবুলিরা কি সঙ্গে কিছুই আনে নাই? তাহার আলোচনা আরেকদিন হইবে।

www.pathagar.com

২

ইহুদিদের পক্ষে যাঁহারা যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহাদের প্রধান সাফাই এই যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে আসিবার সময় প্রচুর অর্থ সঙ্গে আনিয়াছে ও এখনও মাসে মাসে সমস্ত পৃথিবীর ইহুদি ধনপতিরা সে দেশে টাকা-পয়সা ও অন্যান্য নানা তৈজসপত্র পাঠাইতেছেন।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তলাইয়া দেখিবার মতো। উপনিষদের ঋষি বলেন, 'হিরন্ময় পাত্র মধ্যে সত্য লুক্কায়িত আছেন'। অধিকাংশ লোক সেই পাত্র দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হয়, বলে না, 'হে পূষণ, পাত্রটি উন্মোচন করিয়া দেখাও ভিতরে কী আছে।'

শ্রীহট্ট বা উত্তর আসামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দেখিবেন, দুই দিকে ঘন সবুজ টিলার গায়ে গায়ে সারি সারি, কাটাছাঁটা, সযত্নে বর্ধিত চায়ের গাছ। মাঝে মাঝে সরস সতেজ গোলমোহরের গাছ, শ্যামাঙ্গী কুলি মেয়েরা কাজ করিতেছে, দূরে ছবির মতো সুন্দর কলকারখানা, ঝকঝকে তকতকে সায়েবদের বাঙলো, ক্লব হৌস, গলফ লিনকস্। এমনকি দূর হইতে কুলিদের ব্যারাকগুলি পর্যন্ত সুন্দর দেখায়।

ইংরেজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়া বলে, 'দেখ, দেশের ধনদৌলত কীরকম বাড়াইয়াছি।'

ইহুদিরা যে অর্থ আনিল, তাহা দিয়া চাষের অনুপযুক্ত কোনও কোনও জলাভূমির জলকর্দম নিকাশ করিয়া সোনা ফলাইয়াছে। কিন্তু আসামের চা-বাগিচায় ও এইসব 'স্বর্ণভূমি'তে পার্থক্য এই যে, যদিবা আসামের চা-বাগানে কুলিরা এক বেলা খাইবার মতো পয়সা রোজগার করিতে পারে, প্যালেস্টাইনের 'স্বর্ণভূমি'তে আরব চাষা-মজুরকে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ট্রাক্টর পাঠাইয়াছে মার্কিন ইহুদিরা, চালাইতেছে জর্মন ইহুদিরা, ফসল কাটিতেছে পোল ইহুদিরা, বাজারে লইয়া যাইতেছে অস্ট্রিয়ান ইহুদিরা। আরব অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু তাহারা আপত্তি-ওজর জানায় না, বলে, 'নিষ্কর্মা জমি যদি কাজে লাগাইতে পারো, তাহালে আমার আপত্তি কী?'

কিন্তু মার খায় যখন ইহুদি সেই ফসল, সেই জাফা কমলালেবু বাজারে ছাড়ে। ইহুদি ক্ষেতখামার করিয়াছে, জাতভাই মার্কিন ধনপতিদের অফুরন্ত পয়সায়। জায়োনিস্টদের চাপে ও কিছুটা স্বেচ্ছায় তাহারা আরও পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পুঁজি ঢালিতে প্রস্তুত। সে টাকার প্রতি প্যালেস্টাইনি ইহুদির বিশেষ দয়ামায়া নাই— টাকাটা তো দিতেছেন গৌরী সেন। কাজেই ফসল নেবু বিক্রয় করিয়া যাহাই উঠে তাহাই তাহার লাভ। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যে জমি প্রস্তুত করা হইয়াছে, ফ্যাশেনবল ইহুদি মজুরকে বিস্তর অর্থ দিয়া যে ফসল ফলানো হইয়াছে, তাহা দিয়া লাভ করিতে হইলে বাজারের দর অপেক্ষা তাহার দর হইবে চারিগুণ, ছয়গুণ বেশি। সে দর তো ইহুদি কখনও পাইবে না, কাজেই বাজার দর অপেক্ষা আরও দুই পয়সা সস্তা করিয়া আরব চাষিকে ঘায়েল করিতে ক্ষতি কী?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে অর্থের অপব্যয়, কিন্তু দূরদৃষ্টি দ্বারা জায়োনিস্ট দল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, ইহাই প্রশস্ততম পন্থা। বাজারে যদি আরব চাষিকে ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর ফসল কম দরে বেচিয়া কাবু করা যায় তবে সে আর জমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে কয়দিন? পেট ভরিতে হইবে তো? বাবু যখন মনস্থির করিয়াছেন জমিটা লইবেনই, তখন উপেন ঘ্যান ঘ্যান করিয়া বাবুর পয়সা নষ্ট করেন ক্যান!

www.pathagar.com

নিরুপায় হইয়া আরব জলের দরে ইহুদিকে জমি বেচিয়া আণ্ডাবাচ্চাসহ জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হয়— দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নরনারী যেমন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিল— ভাবে সেখানে গেলে রোজগারের ধান্দা জুটিবে। সেখানেও সেই অবস্থা। মার্কিন পুঁজির জোরে ইহুদি দোকানিরা আরব ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করিতেছে আরও অল্পায়াসে, আরও কম খরচায়।

ইহুদিরা বলে, আরব চাষিরা জমি বেচে স্বেচ্ছায়, আপন খুশিতে, জমির বাজারদর কী তাহার তত্ত্ব-তাবাশ, তদ্বির-তদন্ত করিয়া। সত্যই তো আমরাও পাট বেচি স্বেচ্ছায় বাজারদর জানিয়া শুনিয়া, আমরাও ৩২-৩৩ সালে অধিকাংশ স্থলে ধান বেচিয়াছিলাম বহাল তবিয়তে, খুশমর্জিতে। দুনিয়ার তাবৎ পাট আমাদের, তবু পাটের চাষি না খাইয়া মরে! ৩২-৩৩ সালে আঠারো আনা ফসল ফলাইয়াও চাষি না খাইয়া মরিল!

আরেক বিপদ, প্যালেস্টাইনে প্রজাস্বত্ব আইন নাই। আরব, তথা তুর্কি জমিদার মহাপ্রভুরা কাইরো, প্যারিসের বিলাস-বাসরের সর্দার। তালুকের পর তালুক বিক্রয় করিতেছেন পরমানন্দে, দুই পয়সা বেশি পাইয়া। যে জমিদার দেশে থাকে না, গরিব চাষার বেদনা সে বুঝিবে কী করিয়া, দরদ আসিবে কোথা হইতে? তার পর আরবদিগকে পুলিশের জোরে ভিটাজমি-ছাড়া করা হয়, যে মাটি তাহারা চাষ করিয়াছে বারো শত বৎসর ধরিয়া।

এতদ্দেশীয় সদাশয় সরকারও ব্যাপকভাবে এমন কর্মটি করেন নাই। তবু সাঁওতাল প্রজা-বিদ্রোহের করুণ কাহিনী যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে অবস্থাটা সরলই প্রতীয়মান হইবে।

তাই আরব লিগ, পিপলস্ পার্টি সকলেই একবাক্যে কাতর ক্রন্দন অনুনয়-বিনয় করিতেছে, আইন করা হউক ইহুদি যেন আরবের জমি কিনিতে না পারে। সর্বশেষে ভয় দেখাইয়াছে।

ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এক অদ্ভুত অভিনব অর্থনৈতিক করদোঁ সানিতের (আরব ঠেকাইয়া রাখিবার বেড়া) সৃষ্টি করিয়াছে। আরব মজুরকে ডাকে নিতান্ত কালেভদ্রে অত্যন্ত মুশকিলে পড়িলে, জিনিসপত্র কিনে ছয়গুণ মূল্যে জাতিভাইয়ের কাছ থেকে, বেচে আরবকে, আরবের হোটেলে যায় না, আরব কোম্পানির বাসে চড়ে না, সমস্ত টেল আভিভ শহরে (প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শহর) দশটি আরব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ বিদেশ হইতে যে লক্ষ লক্ষ পৌন্ড ডলার মাসে মাসে অকৃপণভাবে প্যালেস্টাইনে ঢুকিতেছে, সে অর্থ ইহুদিদিগের ভিতরই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। যেটুকু বাহিরে যায়, সে আরবের জমি কিনিতে ও গলা-কাটা কারবারে আরবের ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করিতে। সেই টাকাটাও সুচ হইয়া ঢোকে, মুষল হইয়া বাহির হয়। আরবরা প্রায়ই ইহুদিদিগকে বলে, "বিদেশের পুঁজি না লইয়া আসো না একবার পাল্লা দিতে। আমরা যেরকম গরিব অবস্থায় সস্তায় কমলালেবু ফলাইতে পারি, তোমরা বাবুরা পারিবে? শুধু রুটি আর পেঁয়াজ খাইয়া কতদিন বাঁচিবে?"

অথচ যে অজস্র অর্থ আসিতেছে তাহা দিয়া ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিবার উপায় নাই— কাঁচামালের অভাবে। ভারতবর্ষে কাঁচামাল আছে, তাহার বহু পুঁজি লন্ডন, নিউইয়র্কে পড়িয়া আছে, তবুও দুর্বোধ্য কারণে আমরা কারখানা-কারবার করিতে পারিতেছি না। ঠিক সেই দুর্বোধ্য কারণেই ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে ব্যাপকভাবে কলকারখানা করিতে যাহারা দিতে চায় না, মধ্যপ্রাচ্যে আজ তাহাদেরই প্রতাপ।

প্যালেস্টাইনে ধন বাড়িয়াছে, কিন্তু সে-ধন আরবের শ্যাম নহে, তাহার শূল।

বারান্তরে অদ্যকার পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিব।

www.pathagar.com

নেটিভ স্টেট

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে 'নেটিভ' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি, 'লেটিব' বলিলে আরও ভালো হইত। কারণ 'নেটিভ' বলিতে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু বীভৎস, যাহা কিছু পাশবিক ইঙ্গ-বঙ্গে বোঝায় ও বোঝানো উচিত তাহা বেশিরভাগ নেটিভ স্টেটে বর্তমান।

বাঙালির উপর বিধাতার বহু অভিসম্পাত বর্ষিয়াছে; একমাত্র নেটিভ স্টেটরূপী গোদের উপর বিষফোঁড়া হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। যে দুইটি স্টেট আমরা চিনি তাহাদের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধার প্রীতির বন্ধন আছে। কবিগুরুকে যখন বাঙলা দেশও চিনিত না, তখন ত্রিপুরার মহারাজ বিশেষ দূত পাঠাইয়া কিশোর কবিকে জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন ও পরবর্তী যুগে তিনি ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ শান্তিনিকেতন— ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীকে বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, রাজপুত্র রাজপরিজন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর পদপ্রান্তে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও দেশে-বিদেশে কবিকে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কুচবিহারও প্রাতঃস্মরণীয় কেশবচন্দ্রের আত্মীয়তা লাভ করিয়া কৌলীন্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইদানীং কুচবিহারে যে গুণ্ডামি হইয়া গেল তাহা লইয়া দেশে আন্দোলন হইয়াছে ও হওয়া উচিত কিন্তু পশ্চিম ভারতে নিত্য নিত্য যে কাণ্ড হয় তাহা শুনিলে বাঙালির চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে।

প্রথমত কোনও নেটিভ স্টেটে কোনওপ্রকার স্বায়ত্তশাসন নাই। কোনও কোনও অত্যন্ত 'প্রগতিশীল' রাজ্যে 'ধারা' সভা থাকে। সে সভার প্রধান কর্ম রাজাকে সদুপদেশ দেওয়া। সে 'ধারাসভার' সভাপতি স্টেটের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী। রাজা সাধারণত স্টেটের বাহিরে দেশের কোনও বড় শহরে বা ইউরোপের বিলাস-ব্যসনে মগ্ন— আমাদের জমিদাররা যেরূপ কলিকাতায় নানা 'সৎ' কর্মে লিপ্ত থাকেন— প্রধানমন্ত্রী সর্বেসর্বা। তিনি সভাপতি। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই নিন্দা করিবার বুকের পাটা থাকে কয়জনের? রসিক-জনেরা তাই 'ধারাসভা'র নাম দিয়াছেন 'রাধা' সভা। রাধা যেরকম শাশুড়ি-ননদির ভয়ে চোখের জল ফেলিতেও সাহস করিতেন না, ইঁহাদের সেই অবস্থা।

আমাদের জমিদারেরা যেরকম নায়েব-ডাকিনীর হাতে প্রজাপুত্র সমর্পণ করিয়া আরামে দূরে থাকেন, নেটিভ স্টেটেও তাই। শুধু নায়েবের অত্যাচারের সীমা আছে, কারণ হাজার হউক পুলিশ আছে, ম্যাজিস্ট্রেট আছে। তাহাদিগকে সবসময় রীতিমতো 'ওয়েলিং' না করার ফলে মাঝে মাঝে কল বিগড়াইয়া যায়। নেটিভ স্টেটে সে ভয় নাই। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ানের অতিভক্ত বাহন।

দেওয়ান যত বেশি টাকা তুলিতে পারেন, মহারাজ তত খুশি। তিনি দেশে-বিদেশে যে ভূতের খর্পরে তেল ঢালিতেছেন সে ভূতের তৃষ্ণার শেষ নাই। দরিদ্র প্রজার রক্ত চুষিয়া, হাড় পিষিয়া, মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া তৈল বাহির করিতেছেন দেওয়ান। আত্মীয়-স্বজন ইয়ার-বক্সি হুঙ্কার দিয়া বিদ্রোহীকে কাবু করিতেছেন; কন্ট্রাক্টে, একচেটিয়া কারবারে অন্যান্য শত উপায়ে উদরপূর্তি করিতেছেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজা সিংহের অংশ পাইতেছেন। যে দেওয়ান যত বেশি শোষণ করিতে পারে সেই তত 'কর্মদক্ষ'।

www.pathagar.com

প্রজার নৈতিক চরিত্র যে তাহাতে কী পরিমাণ অধঃপাতে যায় বুঝানো অসম্ভব। যেখানে প্রভু স্বৈরাচারী, স্বাধিকারপ্রমত্ত সেখানে মানুষের বাঁচিবার উপায় কী থাকিতে পারে? একমাত্র পদলেহন ছাড়া তাহার অন্য কোনও পন্থা তো জানা নাই। বোম্বাই শহরে যদি দেখেন কেহ অতিরিক্ত বিনয় ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিতেছে তবে প্রশ্ন করিলে খুব সম্ভব জানিবেন যে, ভদ্রলোক নেটিভ স্টেটের লোক।

ধর্মসাক্ষী, আমরা কাহারও মনে আঘাত দিতে চাহি না কিন্তু সত্য নিরূপণে অপ্রিয় কথাও বলিতে হয়— আমরা নাচার।

আর যদি মহারাজা দেশে থাকেন তবে ব্যাপার আরও পেল্লাই। দেশি-বিদেশি সায়েবসুবোতে সরকারি অতিথিশালা গম্‌গম করিতেছে। নর্তকী আসিয়াছে, বাঈজী আসিয়াছে, গণিকা আসিয়াছে। হাজার মুরগি— বাড়াইয়া বলিতেছি না— হাজার মুরগি কাটিয়া তাহারই নির্যাস দিয়া বিশেষ জুস তৈয়ারি হইতেছে— বহুতর ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ডাকা হইয়াছে, তাহার বহুতর ইনজেকশন-টনিক, অরিষ্ট-আসব-প্রাণ-মোদক, হালুয়াতরওগণ লইয়া উপস্থিত। বর্দোবার্গেন্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাঙ্গির-বাদশাহি ডবল ডেস্টিলড আরক, আফিঙ সবকিছু প্রস্তুত। সে কী বীভৎস শিবহীন দক্ষযক্ষ! দেশের অন্যান্য সরকারি কাজকর্ম বন্ধ। 'উদয়াস্ত' বলিব না, 'অস্তোদয়' দেওয়ান সাহেব প্রাসাদে চর্কিবাজির মতো তুর্কিনাচ নাচিতেছেন।

কোনও কোনও মহারাজা স্বরাজ্যে ফিরিলেই অরাজকতা আরম্ভ হয়। কলির কী বিচিত্র গতি! যেসব কাণ্ড তখন হয় তাহার বিবরণ খবরের কাগজে ছাপানো অসম্ভব। শুধু ডাক্তারি পুস্তকে তাহার বর্ণনা দেওয়া চলে। লজ্জাহীন উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব নৃত্য তখন যে কী চরমে উঠিতে পারে তাহার বর্ণনা 'সত্যপীর' যতই সত্যপ্রিয় হউন না কেন, দিতে অক্ষম। সদাশয় সরকার বাহাদুরের কাছে এসব কীর্তি অজানা নহে।

এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোনও কোনও স্টেটে সর্ব-সাকুল্য আয়ের অর্ধাপেক্ষা বেশি ব্যয় হয় 'মেহমানদারি খাতায়' অর্থাৎ এইসব ভূতের যজ্ঞে।

আমার একটি রাজপুত শিষ্যের বিবাহ উৎসবে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়।

দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে অবশ্য এইসব অশ্লীলতার যোগ বিশেষ নাই। কিন্তু আরেকটি জিনিস লক্ষ করিয়া আমি সর্বদা মর্মাহত হইয়াছি। নেটিভ স্টেটের বালক-বালিকা ছাত্রছাত্রীদের দাস্যভাব।

এক অতি সম্ভ্রান্ত স্টেটে দেওয়ানের নাতি স্কুলের ছাত্র-মাস্টারের উপর ঠাকুরদাদার অপেক্ষাও কঠিন ডাণ্ডা চালাইত। মাস্টারদের ঘরের পাশে তাহার জন্য বিশেষ বসিবার জায়গা, সেইখানে সেই শাখামৃগ তাহার ইয়ার-বক্সীদের লইয়া অঙ্গদের রায়বার বসাইত। আর কী দাপট! হেডমাস্টারকে শাসায় ঠাকুরদাদাকে বলিয়া তাহাকে আন্দামান অর্থাৎ রাজধানী হইতে দূরে গণ্ডগ্রামে বদলি করাইবে। মাস্টার বৃদ্ধ— পেনশন-পেয়ালায় চুম্বন দিব-দিব করিতেছেন, ফস্কাইলেই সর্বনাশ। সবকিছু নীরবে সহিয়া যাইতেন।

স্কুল হইতে ছেলেমেয়ে বাছাই করিয়া রাজবাড়িতে রাজপুত্র রাজকন্যাগণের সঙ্গে পড়িবার জন্য লইয়া যাওয়ার রীতি কোনও কোনও স্টেটে আছে।

www.pathagar.com

রাজা বিদেশে, কাজেই সে স্কুলের বড়া শয়তান যুবরাজের সেখানে সপত্নহীন রাজত্ব। কারণ রাজা ছাড়া যুবরাজকে তম্বি কে করিতে পারে? আর সকলেই দিন গুনিতেছেন, যুবরাজ কবে রাজা হইয়া তাহাদিগকে বড় বড় তঙ্কার নোকরি দিবেন। কাজেই যুবরাজের শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না, অন্য ছেলেমেয়েদের কী সাহস যে-পাঠ যুবরাজ পড়িতে পারেন না তাহা তাহারা পড়িতে পারার দম্ভ করিবে! বাপ-মা ছেলেদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন যেন তাহারা ওই সব লেখাপড়ার মতো অবান্তর বাহ্যবস্তুর প্রতি মনোযোগ না করে— সারবস্তু, যেন যুবরাজকে খুশি রাখা হয়। তিনি বড় হইয়া তাহাদের প্রতি নেকনজর দিলে তাহাদের তখন ভূগোল-ইতিহাসের কী প্রয়োজন? আর লেখাপড়ার ফপরদালালি করিয়া যদি এখন তাঁহাকে চটায় তবে পরে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে কোন জ্যামিতি, কোন ব্যাকরণ? স্মরণ তো রাখিতে হইবে এযুগে চাণক্য প্রবচনের প্রথমার্ধ 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' খাটে কিন্তু 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' আর খাটে না।

যুবরাজ বড় হইলে এইসব অকাল-কুষ্মাণ্ডেরা উজির নাজির কোটাল হয়। তাহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে শীল। কুলীনের যে নবধা কুললক্ষণ, সেসব তাবৎ কয়টির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যদি কোনও ব্যক্তিতে পান তবে বুঝিবেন, তিনি 'নেটিভ' স্টেটের রাজার বাঁদর-নাচের পুচ্ছহীন মর্কট, অর্থাৎ সেখানকার হোমরা-চোমরা অথবা বড় কর্মচারী।

কোনও কোনও খবরের কাগজে দেখিলাম, নেটিভ স্টেটগুলিকে মধ্যযুগের সামন্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। তাহাতে মধ্যযুগের সামন্ত রাজ্যের প্রজাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। আমি পশ্চিম ভারতের যেটুকু ইতিহাস পড়িয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে, মধ্যযুগে কোনও রাজা কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত হইলে প্রজা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে তাড়াইয়াছে, অথবা অন্য সামন্ত রাজা প্রজাদের অসন্তোষের খবর পাইয়া সে রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন অথবা দিগ্বিজয়ী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। এখন প্রজাবিদ্রোহেরও উপায় নাই। নানারকম ট্রিটির জোরে মহারাজ বহিঃশক্তি আহ্বান করিয়া দুই মিনিটেই সব বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। প্রজারা কর্মে মগ্ন বলদের মতো একদিকে খায় রাজার মার, অন্যদিকে খায় 'ট্রিটি'র মার।

তবু মাঝে মাঝে যখন অত্যাচার অসহ্য হয় তখন অনেক সুবিধাবাদী মকুবির জয়জয়কার আরম্ভ হয়। তাহারই একজনের সঙ্গে আমার বোম্বায়ে আলাপ হয়। তাঁহার পেশা নাকি জর্নালিজম। শুধাইলাম, 'মহাশয় কোন কাগজে লেখেন?' বলিলেন, 'আজ্ঞে, কোনও কাগজেই লিখি না, না লিখিয়া পয়সা কামাই।' আমি বলিলাম, 'সে কী মহাশয়, কালিদাসের "নাই তাই খাচ্ছ" ব্যাপার নাকি?' বলিলেন, 'অনেকটা তাই; নেটিভ স্টেটে ফ্রেশ কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে উপস্থিত হইয়া নানা তদ্বির-তদন্ত করিয়া রাজা বা দেওয়ানের বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করি। তার পর দেওয়ানকে বলি, "কত ওগরাবে কও।" দেওয়ান বেশ টু পাইস দেয়— অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। তাই আর কেচ্ছাটা লেখার প্রয়োজন হয় না। আর লিখিয়াই-বা হইবে কী? ফি কলম কুড়ি টাকা তো? তাহাতে আমার এক সন্ধ্যার ইয়ের খরচটাই উঠিবে না।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু যাহাদের নানা ভরসা দিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন, সে প্রমাণ দেওয়ানকে যে সমঝাইয়া দিলেন, তাহাদের কী?' পাষণ্ড কী বলিল জানেন? 'আণ্ডা না ভাঙিয়া কি আর মামলেট হয়!'

www.pathagar.com

কোনও কোনও নেটিভ স্টেটে প্রজামণ্ডল আছে— শুনিলাম কুচবিহারে নাই। প্রজামণ্ডল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্টেটের প্রজাবর্গের উন্নতির চেষ্টা করেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, 'ধারা সভায়' প্রবেশ করেন ও ব্রিটিশ ভারতে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইলে যোগদান করেন। লক্ষ করিয়াছি, যে স্টেটে অবিচার কম সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেওয়া আন্দোলনে জোর কম থাকে। ব্রিটিশ ভারতে আমরা বিদেশি রাজের বিরুদ্ধে যে জোর পাই, ভালো স্টেটে প্রজারা সে জোর পাইবে কোথা হইতে? মন্দ স্টেটে আন্দোলন ভালো চলে, কারণ রাজা বা দেওয়ান তখন বিদেশি শাসনের প্রতীক হইয়া দাঁড়ান।

পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস কর্মীরা প্রজামণ্ডলগুলির সঙ্গে সর্বদা যোগসূত্র রক্ষা করেন। পূর্ব ভারতে আমাদের অন্তত খবর রাখা উচিত— না হইলে অখণ্ড সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের প্রতি রাজনৈতিক সিংহাবলোকন চক্রবালে পরিব্যাপ্ত হয় না।

কোনও কোনও স্টেটে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠানও আছেন; কর্মীরা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। খুব দরকার হয় না, কারণ দেশি স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের দলাদলি কম।

এই একটিমাত্র গুণ দেশি রাজ্যে আছে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সেখানে হয় না। কারণ হিন্দু-মুসলমানকে লড়াইয়া সেখানে রাজার কোনও ফায়দা নাই। কোনও কোনও স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের হৃদ্যতা দেখিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ লইয়া মনে মনে সুখস্বর্গ গড়িয়াছি।

উত্তম রাজা যে দেশি রাজ্যে কুত্রাচ নাই, এমন নহে। বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজ স্বর্গীয় সয়াজি রাওয়ের মতো প্রজাপালক দেশে-বিদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তো বাল্যকাল কাটাইয়াছিলেন রাখাল ছেলেদের সঙ্গে। তিনি রাজা ছিলেন, কিন্তু কখনও যুবরাজ ছিলেন না— দত্তক পুত্ররূপে রাজা হন। দুই-একটি জনপ্রিয় রাজা যদি-বা স্টেটে জন্মান তবু তাঁহাদের জন্য নেটিভ স্টেট রূপ জঞ্জাল রাখিবার প্রয়োজন নাই।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতে দেশি রাজ্যের স্থান নাই।

ধবলদম্ভ

'জর্জিক' জাহাজে সেদিন ভারতীয়দের প্রতি যে অদ্ভুত ব্যবহার করা হইল তাহা ধবলদম্ভের, স্বাধিকার প্রমত্ততার বিকৃত রূপ। এই সম্পর্কে আমার আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে অনেক দিনের কথা; কিন্তু বহু ভারতীয় বিদেশে যান, ঘটনাটি মনে রাখিলে তাহারা উপকৃত হইবেন।

১৯২৮ সালে প্রচণ্ড শীত কাবুলে প্রচণ্ডতর হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় আমানউল্লা বাচ্চা-ই-সকাও'র হস্তে পরাজিত হইয়া রাতারাতি কাবুল ত্যাগ করিয়া কান্দাহার চলিয়া যান। বাচ্চা তখনও শহরে প্রবেশ করেন নাই। সেখানে তখন নির্মম বীভৎস অরাজকতা চলিয়াছে। রাজা নাই; পুলিশ, মিলিটারি প্রাণরক্ষার্থে উর্দি ছাড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছে। শহরে রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্য লুটতরাজ, খুন-খারাবি চলিয়াছে। বাচ্চার অগ্রগামী সৈন্যরাই প্রধান দস্যু,

www.pathagar.com

তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচার রুদ্ধ করিবার মতো কোনও প্রতিষ্ঠান তখন কাবুলে ছিল না।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। ওভারকোটের লোভে যে কোনও দস্যু আপনাকে গুলি করিতে প্রস্তুত। চাহিলে পর দিলে গুলি করার রেওয়াজ আফগান দস্যুদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

খাস কাবুলিরা এরকম বিদ্রোহ ও লুটতরাজ ব্যাপারে অভ্যস্ত। বিশৃঙ্খলতার গন্ধ পাইবা মাত্রই তাহারা বছর দুইয়ের খোরাক বাড়িতে যোগাড় করিয়া রাখে। বিপদে পড়িলেন বিদেশি অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা। ইঁহারা সকলেই কাবুলে নবাগত— কাবুলি কায়দা জানেন না। আহারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই তাঁহাদের নিরম্বু একাদশী আরম্ভ হইল— কারণ কলের জল পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাচ্চা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথম 'সৎকর্ম' করিলেন— অধ্যাপক শিক্ষকদের বরখাস্ত করিয়া। প্রাপ্য বেতনও তাঁহাদিগে দেওয়া হইল না। সে-যুগে কাবুলে কোনও ব্যাংক ছিল না বলিয়া অধ্যাপক-শিক্ষকেরা সঞ্চিত অর্থ পেশাওয়ার বা লাহোরের ব্যাংকে রাখিতেন। তাঁহারা তখন কপর্দকহীন; সে দুর্দিনে ধারই-বা দিবে কে? কাবুলের সঙ্গে তখন বহির্জগতের কোনও যোগাযোগ নাই।

পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্য ফরাসি, জর্মন ও ভারতীয় শিক্ষকেরা একত্র হইয়া জিরগা করিলেন। তখন প্রথম অসুবিধা হইল ভাষা লইয়া। সকলে জানেন এমন কোনও ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সে সভায় মাত্র একজন বাঙালি ছিলেন। তিনি ফারসি ফরাসি জর্মন তিনটি ভাষাই জানিতেন বলিয়া তাঁহাকেই সভাপতি করা হইল। সভায় স্থির হইল যে, যেহেতু অধ্যাপকেরাই সর্বাধিক বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য যদি সদাশয় ব্রিটিশ লিগেশন কোনও উপায় অনুসন্ধান করিয়া দেন, তবে তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইবেন। এই মর্মে ডেপুটেশন পাঠানো স্থির হইল।

লিগেশন হইতে উত্তর আসিল ফরাসি-জর্মনরা যেন স্ব স্ব লিগেশনের দৌত্যে নিজ নিজ অসুবিধা পেশ করেন। ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করিতে লিগেশনকর্তা হিজ এক্সেলেন্সি লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল শ্রীযুক্ত সর ফ্রান্সিস হমফ্রিস রাজি আছেন।

ইতোমধ্যে সর ফ্রান্সিস বাচ্চার সঙ্গে আলাপ করিয়া পেশাওয়ার হইতে কাবুলে রোজ একখানা, দুইখানা হাওয়াই জাহাজ আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফরাসি জর্মন ইতালীয়দের সেই জাহাজগুলিতে করিয়া ভারতে পাঠানো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ডেপুটেশন নিবেদন করিল যে, ভারতীয় শিক্ষকেরা উপবাসে প্রায় মরিবার উপক্রম। ভারতে যাইবার অন্য সব পন্থা যখন রুদ্ধ তখন সায়েব যদি তাহাদিগকে হিন্দুস্থান পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সায়েব বলিলেন, "দেখুন কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশন লন্ডনস্থ ব্রিটিশ সরকারের সিন জেমস (অথবা ওই জাতীয় অন্য কিছু বিজাতীয়) কোর্টের মুখপাত্র (Representative)। ভারতীয়েরা হক্কের জোরে (as a matter of right) আমাদিগের নিকট হইতে কোনও সাহায্য দাবি করিতে পারেন না। মেহেরবানি-রূপে (as a matter of favour) চাহিতে পারেন।"

ডেপুটেশনের বাঙালি মুখপাত্রটি বলিলেন, "সে কী কথা সায়েব, এই যে হাওয়াই জাহাজ আসিতেছে সেগুলি তো ইন্ডিয়ান আর্মির পয়সায় কেনা, পাইলট মেকানিক ভারতীয় তনখা

www.pathagar.com

খায়, যে জায়গায় গিয়া জাহাজ খানা লইবে সে-ও তো ভারতের জমি।" "তুমি আবার পরের ধনে পোদ্দারি না হউক, পরের জাহাজে কাপ্তেনি কেন করিতেছ!" অবশ্য একথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

চোর বরঞ্চ ধর্মের কাহিনী শোনে— না হইলে বাল্মীকি উদ্ধার পাইতেন না— কিন্তু ধবলদন্ত হম্বড়াঈর দ্বিরদরদস্তম্ভে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বাঙালিটি তখন লক্ষ করিলেন যে, ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "সাহেব, এই যে হক্ আর মেহেরবানি লইয়া কথা বলিলাম, তাহা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামত। এখন জীবনমরণ সমস্যা। ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করুন।" সদস্যগণ একবাক্যে সায় দিলেন যে, হক্ মেহেরবানি লইয়া কথা-কাটাকাটি করা বাতুলতা। আত্মানাং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি।

বাঙালিটি বলিলেন, "বিলক্ষণ, কিন্তু সায়েব, আমি ভারতে, স্বদেশে মেহেরবানিরূপে যাইব না, যদি যাই, যাইব হক্কের জোরে। বন্ধুগণ, নমস্কার, সায়েব, সেলাম।"

সন্ধ্যাকালেই ভদ্রলোক খবর পাইলেন যে, তাঁহার নাম ভারত প্রত্যাগমনকামীদের নির্ঘণ্ট হইতে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খবরটি দিলেন ভদ্রলোকটির বন্ধু, ব্রিটিশ লিগেশনের অরিয়েন্টাল সেক্রেটারি, খান বাহাদুর শেখ মহবুব আলী খান, বন্ধুভাবে, সরকারি খবর হিসাবে নয়। তার পর সেইসব জাহাজে করিয়া ফরাসি গেল, জর্মন গেল, ইতালি গেল, তুর্ক গেল, ইরানি গেল, ব্রিটিশ লিগেশনের মেয়েরা গেলেন। তার পর সর্বশেষে ভারতীয় মেয়েদের খোঁজ পড়িল। তাঁহাদের অনেকেই পুরুষ অভিভাবক ছাড়া হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া পেশোয়ার যাইবার হিম্মত পান না— কেহ কেহ গেলেন, কেহ কেহ রহিলেন। ভদ্রলোকটি রীতিমতো জোর-জবরদস্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, (পরে) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক স্বর্গীয় মৌলানা জিয়াউদ্দিনের স্ত্রীকে হাওয়াই জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। তার পর অতি সর্বশেষে ভারতীয় পুরুষদের পালা আসিল। কিন্তু ভদ্রলোকটির নামে তো ঢেরা পড়িয়াছে; তিনি পেটে কিল মারিয়া কাবুলের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে ভারতবর্ষে ভদ্রলোকের পিতা-পুত্রের কোনও খবর না পাইয়া আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন ও টেলিগ্রাফ অফিসে থানা বাঁধিয়াছেন। দিল্লি-সিমলা যেখানে যাহাকে চিনিতেন, অহরহ তার করিতেছেন, আমার পুত্রের কী খবর! আসামের বর্তমান রাজস্বসচিব (?) মৌলবি আবদুল মতীন চৌধুরীও একখানা তার পাইলেন। সেইদিনই সর ডেনিস ব্রে'র সঙ্গে তাঁহার দেখা। ভোট সংক্রান্ত কী একটা ব্যাপারে সর ডেনিস মতীন সাহেবের কাছে যান। তিনি বলিলেন, "তোমরা যে কাগজে ছাপাইতেছ ভারতীয়দের আনা হইতেছে, অমুকের খবর কী?"

সর ডেনিস কাবুলে বেতার পাঠাইলেন সর ফ্রান্সিসকে, "অমুককে তার-পাঠ পাঠাও।" সাইমন কমিশন তখন আসিব-আসিব করিতেছে অথবা আসিয়াছে। সর ডেনিস সেন্ট্রাল এসেমব্লির সদস্যকে সস্তায় খুশ করিতে কেন নারাজ হইবেন। কোনও ভারতীয়কে বাঁচাইবার জন্য ওই একটিমাত্র বেতার সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে কাবুল যায়! পেশাওয়ার সরকার ও কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশনে বেতার চলিত, বলা বাহুল্য যে, সে-বেতারের সুবিধা ভারতীয়দের দেওয়া হয় নাই। কাবুলে বসিয়া ভদ্রলোক অবশ্য এসব খবর পান নাই।

www.pathagar.com

সে-বেতার লিগেশনে কী অলৌকিক কাণ্ড বা তিলিসমাত করিল তাহা স্থানাভাবে বাদ দিলাম। পরদিন ভদ্রলোক খবর পাইলেন, তাঁহার জন্য আগামীকল্যের হাওয়াই জাহাজে একটি স্থান রিজার্ভ করা হইয়াছে। 'ফেবার' না 'রাইট' তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আর হইল না।

সর্বস্ব কাবুলদস্যুদের জিম্মায় ফেলিয়া মাত্র দশ সের (অথবা পৌন্ড) লগেজ লইয়া ভদ্রলোক হাওয়াই জাহাজে করিয়া পেশাওয়ার ফিরিলেন। বিমানঘাঁটিতে সর ফ্রান্সিস করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমরা ভারতীয়দের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি, আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া সব কথা বলিবেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "নিশ্চয়ই সব কথাই বলিব।" দেশে ফিরিয়া তিনি জমিয়ত-উল-উলেমার নেতা মৌলানা হুসেন আহমদ মদনীকে আদ্যোপান্ত বলেন। আন্দোলনও হইয়াছিল কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। লিগেশন-কর্তা প্রমোশন পাইয়া ইরাক না কোথায় চলিয়া গেলেন।

বর্ণনা শেষ করিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, কিন্তু আমার চরম শিক্ষা হইয়া গেল। কাবুল গিয়াছিলাম টাকা রোজগার করিয়া ইউরোপে পড়িতে যাইবার জন্য। কোন দেশে যাইব বহুদিন মনস্থির করিতে পারি নাই। এই ঘটনার পর নির্দ্বন্দ্ব মনে ইংলন্ড বর্জন করিলাম। পড়িতে গেলাম অন্য দেশে— ও ফরাসি জাহাজে।

চতুরঙ্গ

পুব বাংলা যখন পাকিস্তানের অংশরূপে 'স্বাধীন' হল তখন ওই অঞ্চলের লোক সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেননি, তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি কৃষ্টি গবেষণা কোন পথে চলবে। "অখণ্ড পাকিস্তান" নির্মাণের সহায়তা করার জন্য তাঁরা উর্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, না, যে বাংলা ঐতিহ্য উভয় বাংলা অনুকরণ করছে সেই পন্থা অবলম্বন করবেন? একটু সময় লাগল।

(১) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার 'বর্ধমান হাউসে'— 'বাংলা অ্যাকাডেমি'। কিছুদিন পরেই তাঁদের প্রথম ত্রৈমাসিক বেরুল। দুই বাংলাতে তখনও পুস্তকাদি অনায়াসে গমনাগমন করত। প্রথম সংখ্যা এ-বাংলায় পৌঁছনোমাত্রই তার আলোচনা 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয়। এ-বাংলা তাকে সানন্দ অভিনন্দন জানায়। আজ যদি দুষ্টজন বলে, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিকরা 'বাংলা দেশের' লোকজনকে অখণ্ড পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় কারসাজি করছে, তবে অকুণ্ঠ ভাষায় বলব, যখন আমরা 'দেশ' মারফত ওই ত্রৈমাসিককে স্বাগত জানাই তখন আমাদের ভিতর কেউই রাজনৈতিক ছিলেন না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তাঁদের পেটুয়া কিছু কিছু বাঙালি মোল্লা মুন্‌সিকে অ্যাকাডেমিতে ছলে-বলে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইসলামের উত্তম উত্তম আরবি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ নেই। অতএব আমাদের প্রথম কর্ম কুরান-শরিফের বাংলা অনুবাদ করা।" সভাপতি বললেন, "সে কী? আমারই জানা-মতে অন্তত পাঁচখানা বাংলা অনুবাদ রয়েছে।" মোল্লারা : "তা হলে হদিসের (কুরান-শরিফের পরেই হদিস আসে) অনুবাদ করা যাক।"

www.pathagar.com

আসলে মোল্লারা চান ওই মোকায় বেশ দু পয়সা কামাতে। আর এদিকে বেচারি অ্যাকাডেমি সবে জন্ম নিয়েছে। অজাতশত্রু হতে চায়। স্বীকার করে নিল। সে কর্ম এখনও সমাপ্ত হয়নি। কারণ সমাপ্ত হলেই তো কড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। (এ টেক্‌নিক আমাদের এ দেশের ডাঙর ডাঙর আপিসাররাও জানেন।) বাঙলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান আমাকে বললেন, "এ যাবৎ তেনারা আশি হাজার টাকা গ্যাঁটস্থ করেছেন।" এই মোল্লাদের অনেকেই এখন খানকে সাহায্য করছেন— মীরজাফররূপে।

(২) কেন্দ্র বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।

আপনারা বাঙালদের যত মূর্খ ভাবেন তারা অতখানি মূর্খ নয়। তারা তখন অন্য প্যাঁচ কষল। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাল, "আমাদের পাঠশালা স্কুলে যেসব টেকস্‌ট বই পড়ানো হচ্ছে সেগুলো বড়ই 'অনৈসলামিক ভাবাপন্ন'। অতএব সেগুলো নাকচ করে দিয়ে নয়া নয়া কেতাব লেখা হোক।" গাড়োল রাওলপিণ্ডি সে ফাঁদে পা দিল। তখন সৃষ্ট হল 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।' কিন্তু ইয়া আল্লা ইয়া রাসুল! কোথায় না তারা প্রস্তাবিত কর্মে লিপ্ত হবে, না তারা লেগে গেল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পরিপূর্ণ পদ্য-গদ্য রচনা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করতে। আমার মনে হয়, তখনই তারা ভিতরে ভিতরে আপন অজান্তে জেনে গেছে, ঝঞ্ঝা আসন্ন, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটা দফারফা করতেই হবে। অতএব বিদ্রোহী কবি কাজীই আমাদের ভরসা। কী সুন্দর তিন ভল্যুম এযাবৎ বেরিয়েছে। যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁর নাম বলব না। পাছে না টিক্কা খানের লোক তাঁকে গুলি করে মারে। (টিক্কা অর্থ 'টুকরো'— ফারসিতে বলে "টিক্কা টিক্কা মি কুনস্‌"— "তোকে টুকরো টুকরো করব।" আমরা যেরকম 'তিনকড়ি', 'এককড়ি', 'ফকির' 'নফর' নাম দিই যাতে করে যম তাকে না নেয়।)

(৩) এশিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ ইস্‌ট্‌ পাকিস্তান স্থাপিত হল। (ঠিক কী নাম বলতে পারছিনে।) এতেও পশ্চিম পাকের খানরা চটে গেলেন। কারণ বাঙালরা তখন বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই (এই ময়নামতি অঞ্চলেই এখন লড়াই চলছে)— যেসব স্থলে বৌদ্ধবিহার স্থাপিত ছিল, যে সবের বর্ণনা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং দিয়েছেন, সেই নিয়ে তারা লেকচর দিচ্ছে, সেমিনার করছে। 'তোবা, তোবা'।

(৪) এবং এসবের বহু পূর্বেই আবদুল হাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃতের প্রধানতম অধ্যাপক, তাঁর সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক বের করে যাচ্ছেন। এবং তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর ওই পত্রিকায় আমাদের পশ্চিম বাংলার হরেন পাল মহাশয়ের অভিধান।

এই চতুরঙ্গে বাঙাল দেশ তার আপন পথে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজনীতিকে উপেক্ষা করে। এমন সময় ইয়াহিয়া খান মারলেন ওই প্রগতির উপর থাপ্পড়। এর উত্তরে আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি।

"বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো,
একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে
সে এক-গরাসে গেলে।

www.pathagar.com

নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে
মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও
রয় না কোনও ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন বাহু ভাবে
তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী
ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন
ক্ষণিক অপচয়ে।”

হ-য-ব-র-ল

১

তথাকথিত পণ্ডিতেরা বলেন, “আসাম দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।” অথচ আদি বাসিন্দাদের নাম ‘অহম’। ইহাদের নামেই দেশের নাম হওয়া উচিত ‘অহম’ দেশ। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, ‘আসাম’ হইতে ‘অহম’ হয় নাই, ‘অহম’ হইতে ‘আসাম’ হইয়াছে। ফোক্ ফিললজিস্ট অর্থাৎ গাঁওবুড়ো শব্দতাত্ত্বিক মনে মনে তর্ক করিয়াছেন যে, যেহেতু শুদ্ধ বাঙলার ‘সেপার’ পূর্ব বঙ্গে ‘হেপার’, ‘সাগর’ ‘হাওর’, ‘সরিষা’ ‘হইরা’ হয়, অতএব উল্টা হিসাবও চলে— অর্থাৎ ‘স’ যখন ‘হ’ হইতে পারে তখন ‘হ’-ও ‘স’ হইতে পারে। এই নীতি চালাইলে যে ‘হাসানো’ আর ‘শাসানো’ একই ক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়, গাঁওবুড়ারা তাহা খেয়াল করিলেন না। স্থির করিলেন ‘অহম’ই ‘অসম’; তার পর ‘অসম’ হইতে ‘আসাম’ হইল। তখন তথাকথিত পণ্ডিতেরা আসিয়া সমাধান করিলেন, “এই দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।”

গাঁওবুড়াদের মূর্খ বলিলে আমাদের অন্যায় হইবে। ‘উল্টাপুরাণ’ যে সর্বত্র চলে না— এ জ্ঞান এখনও বহু নাগরিকের হয় নাই। ‘সায়েবরা হ্যাটকোট পরেন’ অতএব ‘হ্যাটকোট পরিলেই সায়েব হইয়া যাইব’ ‘গায়িকা সুন্দরী কাননবালা লম্বা হাতা জামা পরেন’ অতএব ‘লম্বা হাতা জামা পরিলে গায়িকা ও সুন্দরী হওয়া যায়’ এই ভুল যুক্তিজনিত আচার তো হাটে-ঘাটে ট্রামে-বাসে সর্বত্র দেখা যায়।

*   *   *

এই আসাম হইতে প্রত্যাগত এক বন্ধু বলিলেন যে, এতদিন আসামে যে তিন দলে রাজনৈতিক রেষারেষি চলিত তাহার সঙ্গে এখন চতুর্থ দল আসিয়া জুটিয়াছে। এই তিন

www.pathagar.com

দলের প্রথম দল 'আসামি' বা 'অসমিয়া' (উচ্চারণ 'অহমিয়া'); ইঁহারা আসামি ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আসামি ভাষা ও বাংলায় পার্থক্য ওড়িয়া বাঙলা অপেক্ষাও কম; আসামিদের গায়ে আর্য ও অহম রক্তের সংমিশ্রণ, যেরকম বাঙালির ধমনিতে আর্য ও মঙ্গোল-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ। দ্বিতীয় দল শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়ার অধিবাসী বাঙালি। ইঁহারা মূলত বাঙলা দেশেরই লোক, ইঁহাদের বাসভূমি বাঙলা দেশ হইতে কর্তন করিয়া আসামে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইঁহাদের অনেকেই চাহেন যে, ওইসব জিলাগুলো যেন পুনর্বার বাঙলা দেশে ফিরাইয়া লওয়া হয়। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ 'অহম'। ইঁহারা আসামের আদিম বাসিন্দা, ইঁহাদের অনেকেই আর্যরক্ত দ্বারা 'অশুদ্ধ' বা 'শুদ্ধ'— যাহাই বলুন— না হইয়া আপন আভিজাত্য রক্ষা করিয়াছেন। চতুর্থ দল নতুন আসিয়া জায়গা চাহিতেছেন, ইঁহারা গারো, লুসাই, কুকি, নাগা, আবর, মিশমি ইত্যাদি পার্বত্য জাতি। ইঁহারা আসামের আদিমতম বাসিন্দা এবং আসামের রাজনৈতিক যজ্ঞশালায় ইঁহারা এতদিন অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন।

*   *   *

যতদূর মনে পড়িতেছে ১৯৩২ সালে কাছাড় লর্ড বেনটিঙ্কের সময় ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। তাহার পর একশত বৎসর কাটিয়াছে। ধীরে ধীরে ইংরেজ গারো, লুসাই, নাগা অঞ্চলে আপন ডেরা ফেলিয়া ফেলিয়া দখল বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইঁহাদের জন্য ইংরেজ সরকার কী উপকার করিয়াছেন তাহার ইতিহাস লিখিবার সময় আজও হয় নাই। মোগল-পাঠানরা ইঁহাদের রাজত্ব দখল করেন নাই, ইঁহাদের প্রতি কোনও দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজ সরকারকে একদিন উভয়ার্থে 'আসামি' ঐতিহাসিক গবেষণার কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে।

মধ্য অফ্রিকার বনেজঙ্গলে হস্তীদন্ত-ব্যবসায়ী মুসলমান ইসলাম প্রচার করেন, বেতনভোগী ইউরোপীয় মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। নিগ্রো মুসলমানদের কথা আজ থাক, কিন্তু খ্রিস্টান নিগ্রোদের কী অবস্থা হইয়াছে তাহা বার্নার্ড শ'র 'কৃষ্ণার ব্রহ্মান্বেষণ' পুস্তকে পাইবেন। অসভ্য সুরা-অনভ্যস্ত জনগণের ভিতর মদ্য চালাইলে কী নিদারুণ কুফল হয় ও সেই সুযোগ লইয়া বিবেকধর্মহীন পুঁজিপতিরা তাহাদের কী অনিষ্ট না করে, তাহা আঁদ্রে জিদের 'বেলজিয়ম কঙ্গো' পুস্তকে পাঠক পাইবেন। ও অন্যান্য নিরপেক্ষ লেখকের অধুনা-খ্যাতিপ্রাপ্ত ফরাসি ডাকার অঞ্চলের বর্ণনায় পাইবেন।

*   *   *

খ্রিস্টান মিশনারিরা লুসাই, গারো, খাসিয়া ও নাগা অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সরকারের কতটা সাহায্য পান ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান করি ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যত্র মিশনারিরা সচরাচর যে সাহায্য লাভ করেন, তাহাই পাইয়াছিলেন। অধুনা মুসলমানরা খাসিয়া পাহাড়ে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন ও ব্রাহ্মরা কিয়ৎকাল ওইস্থলে ধর্মপ্রচারের পর কয়েকটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বারান্তরে হইবে; উপস্থিত শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, যে কোনও মানুষ যে কোনও ধর্ম গ্রহণ করুক আপত্তি নাই, কিন্তু যে ধর্মান্তর গ্রহণে সাহায্য করে সে যেন ঠিক এইটুকু বোঝে যে, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বেশভূষা, আহার-বিহার সংক্রান্ত, দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ না খাওয়া, ছন্নছাড়া কোনও নতুন ক্ষতিকর পরিবেষ্টনীতে যেন টানিয়া লইয়া না যায়।

www.pathagar.com

বাঙালি মুসলমান আরব বেদুইনের ন্যায় কাবাব-গোস্ত খায় না, রাইফেল লইয়া দল বাঁধিয়া হানাহানি করে না, কিন্তু এক জর্মন নৃতত্ত্ববিদ খ্রিস্টান নাগাদের নতুন সামাজিক জীবনের সঙ্গে বসবাস করিয়া তাহাদের প্রচুর নিন্দা করিয়াছেন। কোনও কোনও পার্বত্য অঞ্চলে স্বচক্ষে কড়া মদের মাতলামি দেখিয়াছি ও বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি কোনও কোনও অঞ্চলে গোপন বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভয়, এইসব খ্রিস্টানরা যেন আসামের চা-বাগিচার খ্রিস্টান ম্যানেজারদের সঙ্গে জুটিয়া এক নতুন ক্রিশ্চান লিগ নির্মাণ না করে। ট্রাইবেল লিগ হউক, আমরা তাহার মঙ্গল কামনা করিব, কিন্তু ক্রিশ্চান লিগ করিলে পার্বত্য জাতিরা আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আর বাক্যবিনাস করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু তৎপূর্বে শেষবারের মতো একখানি চিঠি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। হাজরা লেন হইতে শ্রীমতি ঘোষ লিখিতেছেন :

'আমার ধারণা, অল্প একটু চেষ্টা করলেই বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধতায় যে কোনও ভারতীয় পণ্ডিতের সমকক্ষ হতে পারবে। প্রমাণস্বরূপ একটা উদাহরণ দিতে পারি— যদিও সেটি এত তুচ্ছ যে বলতে সংকুচিত হচ্ছি। পাঞ্জাবি অধ্যাপকটির ক্লাসে আমরা যে কয়টি ছাত্রী ছিলাম, তাহাদের মধ্যে তিনি বাঙালির উচ্চারণে কখনও কোনও ভুল তো ধরেনইনি; এমনকি সময়ে সময়ে একটু বেশি প্রশংসা করতেন।' (লেখিকা দিল্লি কলেজে পড়িতেন।)

সর্বশেষ লেখিকার বক্তব্য—

"যদি কলকাতার স্কুলগুলোর সংস্কৃত শিক্ষকেরা এ বিষয়ে একটু অবহিত হন, তা হলে বোধহয় কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে।"

সবিস্তার মন্তব্য অনাবশ্যক। শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা যদি সত্যই কঠিন না হয়, তাহা হইলে এই স্থলে উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে।

* * *

"আমরা যখন সংস্কৃত শিখি, আরবি-ফারসি শিখি, তখন আমাদের উদ্দেশ্য এই নহে যে, সংস্কৃত অথবা আরবিতে সাহিত্যসৃষ্টি করিব। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়িয়া হৃদয়মনকে সংস্কৃত ও ধনবন্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ওইসব সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, উহাদের পরশমণি দ্বারা যাচাই করিয়া করিয়া মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করা। উদাহরণরূপে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত না জানিলে 'যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতাটি লিখিতে পারিতেন না, প্রমথ চৌধুরী উত্তম ফরাসি ও বিশেষত আনাতোল ফ্রাঁস না পড়িলে কখনও বাংলাতে নতুন শৈলী প্রবর্তন করিতে পারিতেন না।

ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন সাহিত্য আজ এত সমৃদ্ধ যে গ্রিক-লাতিনের জ্ঞান না থাকিলেও ইহাদের যে কোনও ভাষাভাষী মাতৃভাষার সাতজন ভালো লেখকের শৈলী মিশ্রণ করিয়া নতুন

www.pathagar.com

সৃষ্টি করিতে পারে; বিষয়বস্তু অনুসারে গড়িয়া পিটিয়া নতুন ঢং তৈয়ারি করিতে পারে। কিন্তু বাঙলাভাষা এখনও অত্যন্ত অপক্ব, সাহিত্য বড়ই দরিদ্র।

সংস্কৃতই যে জানিতে হইবে এমন কোনও কথা নহে। ইংরেজি ফরাসি বা আরবি যে কোনও সাহিত্যের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেই ভাষা ও সাহিত্যের মাপকাঠি পাওয়া যায়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য না পড়িলে মনে হয় অধিকাংশ লেখকেরা যেন শুধু বাঙলার পুঁজিই ভাঙাইয়া খাইতেছেন। কিন্তু এককালে তো এরকম ছিল না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই যে শুধু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সকলেই ইংরেজি বেশ ভালো করিয়া জানিতেন।

ভারতচন্দ্র ফারসি ও সংস্কৃত দুই ভাষাই জানিতেন, এবং কী প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ যে তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল ও মোগল বিলাসের যে কী সন্ধান তিনি রাখিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ১৭/১৮ পৃষ্ঠা পশ্য।

(এস্থলে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ বাঙালি পাঠক এই দুই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তাবৎ আরবি শব্দ বুঝেন? না ইহাদের অর্থ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে— আমার কাছে দ্বিতীয় খণ্ড নাই।)

যে কবি অত্যন্ত সহজ সরল অনুভূতি গীতিকাব্যে প্রকাশ করিতে চাহেন তাঁহার জন্য হয়তো সংস্কৃতের প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাসের সংস্কৃত জানিবার প্রয়োজন নাই; জসীম উদ্‌দীন চসার শেক্সপিয়র পড়িয়াছেন কি না সে প্রশ্ন অবান্তর।

যাঁহারা জটিল নভেল লেখেন ও উপন্যাস রচনা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই উপরের মন্তব্যগুলি করিলাম।

৩

আমরা সাধারণত যখন ইউরোপে বা ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি, তখন প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে ইউরোপ সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকল জ্ঞান ইংরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত এবং ইংরেজিতে যেসব ফরাসি-জর্মন ইত্যাদি গ্রন্থ অনূদিত হয়, সেগুলি প্রায়শ ইংরেজ মনকে দোলা দিয়াছে বলিয়াই ওই ভাষাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্থাৎ বহুস্থলে সেগুলি খাস ফরাসি-জর্মন নহে, ইংরেজকে খুশি করিতে পারিয়াছে, ঈষৎ ইংরেজ-ভাবাপন্ন বলিয়া।

অথচ ইংরেজ ও ফরাসি যে কী ভীষণ দুই পৃথক জাত সে সম্বন্ধে অন্তহীন আলোচনা চলিতে পারে। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে নির্ভয়ে বলা যায় ফরাসি সাহিত্য ইংরেজি হইতে বিশেষ কিছু গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ইংরেজি পদে পদে ফরাসির হাত ধরিয়া চলিয়াছে। তামাম ফরাসি ভাষাতে একশতটি ইংরেজি শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; ইংরেজিতে শুধু ফরাসি শব্দ নহে, গোটা বাক্য বিস্তরে বিস্তরে আছে। ইংরেজের পোশাকি রান্না বলিয়া কোনও বস্তু নাই— ভদ্র খাবারের 'মেনু' মাত্রই আগাগোড়া ফরাসিতে লেখা। এমনকি ভিয়েনার 'ভিনার স্নিৎসেল' পর্যন্ত ইংরেজি 'মেনু'তে ফরাসির মধ্যস্থতায় 'এস্‌কেলপ দ্য ভ্য আ লা ভিয়েনেয়াজ' রূপে পৌঁছিয়াছে।

www.pathagar.com

ইংরেজি সঙ্গীত বলিয়া কোনও বস্তু নাই— যাহা কিছু তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ জর্মন-ফরাসি-ইতালীয়-রুশ। তামাম বৎসর চালু থাকে এরকম অপেরাগৃহ একটিও লন্ডনে নাই; উত্তম অপেরা শুনিতে হইলে ড্রেসডেন যাও, ম্যুনিক যাও, বন্ যাও, ভিয়েনা যাও, প্যারিস যাও।

ইংরেজ মেয়ে ফ্রক ব্লাউজ কিনিতে প্যারিস যায়, ছবি আঁকা শিখিতে প্যারিস যায়, ভাষা শিখিতে প্যারিস যায়, উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্য আস্বাদ করিতে প্যারিস যায়, বোতল বোতল বর্দো-বার্গন্ডি-শ্যাম্পেন খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া ইংলন্ডে লইয়া যায়— ফরাসি স্কচ-হুইস্কি খাইতেছে আর মারোয়াড়ি পাঁঠার কালিয়া খাইতেছে— একই কথা।

ফরাসি ইংরেজকে বলে 'চরুয়া' অর্থাৎ চরের বাসিন্দা অর্থাৎ খানদানহীন ঔপনিবেশিক। পদ্মার পারের জমিদার পদ্মার চর-বাসিন্দাকে যেরকম অবহেলা করে, ভাবে— চর আজ আছে কাল নাই— খানদানের বনিয়াদ গড়িবে কী প্রকারে, ফরাসি ইংরেজ সম্বন্ধে সেইরকম ভাবে। চ্যানেল পার হইয়া তাহাকে লন্ডন যাইতে হইলে, তাহার মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত হয়।

উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলি করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন ইউরোপের তাবৎ কর্মকীর্তি ইংরেজের জমার খাতায় লিখিয়া তাহাকে অহেতুক ভক্তি না দেখাই। দ্বিতীয়ত, ফরাসি ও জর্মন পড়াইবার ব্যাপক ব্যবস্থা যেন এদেশের স্কুল-কলেজে করা হয়। আমাদের মনে হয় কলকাতার ছেলেরা এককালে যেটুকু ফরাসি-জর্মন শিখিত এখন যেন সেইটুকুও শিখিতেছে না।

আমাদের স্কুল-কলেজে কী বিকট আনাড়ি কায়দায় ভাষা শিখানো হয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আরেকদিন করিবার বাসনা রহিল। উপস্থিত শুধু বলি চারি বৎসর স্কুলে ও চারি বৎসর কলেজে সংস্কৃত অথবা ফারসি পড়ার পরও ছাত্র ওইসব ভাষাতে সড়গড় হয় না এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কোনও সভ্য দেশে দেখি নাই— শুনি নাই।

৪

এক প্রসিদ্ধ আরব লেখকের 'স্বগত' পড়িতেছিলাম।

'ধনীরা বলে, "অর্থোপার্জন করা কঠিন, জ্ঞানার্জনের অপেক্ষাও কঠিন।" পণ্ডিতেরা বলেন, 'জ্ঞানার্জন অর্থোপার্জনের অপেক্ষা কঠিন; অতএব জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান ও মহৎ।" আমি বিস্তর বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, "আমরা— অর্থাৎ জ্ঞানীরা— যদি কখনও অর্থ পাই, তবে সে অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম এবং অনেক সময় ধনীদের চেয়েও সৎপথে অর্থ ব্যয় করি, কিন্তু ধনীরা যখন আমাদের সম্পদ অর্থাৎ পুস্তকরাজি পায়, তখন সেগুলির ব্যবহার বিলকুল করিতে পারে না। অতএব সপ্রমাণ হইল জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান।'

বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আরব লেখকের কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গত শনি, রবি, সোমবারে বোম্বাই বাজারে যে তুমুল কাণ্ড দেখিলাম, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ আর রহিল না।

www.pathagar.com

একশত হইতে উপরের নোট আর যত্রযত্র ভাঙানো যাইবে না খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র কালোবাজারিদের হৃদকম্প উপস্থিত হইল। ফালতু ট্যাক্স হইতে আত্মত্রাণ করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা বিস্তরে বিস্তরে একশত, এক হাজার টাকার নোট গৃহে লোহার সিন্দুকে জমায়েত করিয়া রাখিয়াছিল, সে টাকা লইয়া তাহারা করিবে কী?

তখন কালোবাজারিরা ছুটিল ব্যাংকারদের কাছে। 'দয়া করিয়া, ঘুষ লইয়া নোটগুলি লও, হিসাবে দেখাও যে বহুদিন ধরিয়া এই নোটগুলি তোমাদের ব্যাংকে জমা ছিল। আমরা বাঁচি।' ব্যাংকারদের জেলের ভয় আছে; কাজেই পন্থা বন্ধ।

কেহ ছুটিল সোনার বাজারে। সে বাজারে এমনি হিড়িক লাগিল যে, দাম হুশ হুশ করিয়া গগনস্পর্শী হইতে লাগিল। কর্তারা সোনার বাজার বন্ধ করিয়া দিলেন।

কেহ ছুটিল তাড়া তাড়া নোট পকেটে করিয়া শরাবের দোকানে। এক টাকার মদ খাইয়া একশত টাকার নোট ভাঙাইবার চেষ্টা করে। আমি গিয়াছিলাম এক বোতল সোডা খাইতে, দোকানি সোডা দিবার পূর্বে সন্তর্পণে কানে কানে প্রশ্নবাণে প্রাণ হানে, 'একশত টাকার নোট নয় তো স্যার? ভাঙানি নাই।'

বিস্ময় মানিলাম। প্রায় ছয় মাস হইল আমার মতো কারবারি-বুদ্ধি-বিবর্জিত মূর্খও বিলাতি মাসিকে পড়িয়াছিল যে, ইংলন্ডে কালোবাজারের ফাঁপানো পয়সাকে কাবুতে আনিবার জন্য দশ পৌন্ড নোটের উপর কড়া আইন চালানো হইয়াছে। সেই মাসিক কি এদেশের কারবারিরা পড়ে নাই। পড়িয়া থাকিলে ছোট নোটে ভাঙাইয়া রাখিলেই পারিত।

আরব ঠিকই বলিয়াছিলেন, ধনীরা পুস্তক (এমনকি মাসিক কাগজও) পড়িতে জানে না।

৫

বাঙলা ভাষায় একখানা অতি উপাদেয়, গ্রন্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কথা স্মরণ করিতেছি। কী অসাধারণ পরিশ্রম, কী অপূর্ব বিশ্লেষণ, অবিমিশ্র যুক্তিতর্কের কী অদ্ভুত ক্রমবিকাশ এই পুস্তকে আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভাষা ও শৈলী সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুক্তিতর্কপূর্ণ রচনায় এই ভাষাকেই আজ পর্যন্ত কেহই পরাজিত করিতে পারেন নাই। অনেকের মতে বাংলা গদ্য রচনায় 'কৃষ্ণচরিত্রে'র পর উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নতি হয় নাই।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। বঙ্কিম কয়েক জর্মন পণ্ডিতের নাম এই পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই যুগে প্রত্যেকের নামের শুদ্ধ উচ্চারণ জর্মনে কী সে খবর লইয়া বাঙলায় বানান করিয়াছেন। আমরা নির্বিকার চিত্তে নিত্য নিত্য 'জওহরলাল', 'প্যাটেল', 'মালব্য' লিখি, 'পটোডি'র নওয়াব ও 'ভিনু মনকদে'র কথা আর তুলিলাম না।

সে কথা থাকুক। কিন্তু বঙ্কিমের পুস্তকখানা বাঙলায় লেখা, বাঙলা লিপিতে। যদি পুস্তকখানা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইত, তবে বহু অবাঙালি অনায়াসে ইহা পড়িয়া উপকৃত হইতে পারিতেন।

পাঠক পত্রপাঠ শুধাইবেন বাঙলা, হিন্দি, গুজরাতি; মারাঠিতে কি এতই সাদৃশ্য যে শুধু ভিন্ন লিপি বলিয়া, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের রচনা পড়িতে পারে না?

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত রচনাটি পাঠ করুন।

'ব্যায়ামচর্চা ভারতত অতি পুরনি কালরে পরা প্রচলিত; অসমতো নতুন নহয়। অহোম রাজা সকলর দিনত অসমত ব্যায়ামর খুব আদর আছিল। বিশেষকৈ মহারাজ রুদ্রসিংহর দিনত ইয়ার প্রসার বেচী হয়। তেঁও অসমর জাতীয় উৎসব আদিত ব্যায়ামর দৃশ্য দেখুবার নিয়ম করিছিল।'

একখানা আসামি পুস্তিকা হইতে এই কয়টি পঙ্‌ক্তি তুলিয়া দিলাম; ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়া সহৃদয় সরল পাঠককে অপমানিত করিতে চাহি না। যে লিপিতে লেখা হইয়াছে অক্ষরে অক্ষরে সেইরকম তুলিয়া দিলাম; কেবলমাত্র বক্তব্য যে 'র' অক্ষর আসামিতে 'ক' অক্ষরের পেট কাটিয়া করা হয় এবং 'ওয়া' উচ্চারণ প্রকাশ করিতে হইলে 'ব' অক্ষরের উপরে একটি হসন্ত জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

এই কয়টি পঙ্‌ক্তিই যদি কোনও বিজাতীয় লিপিতে লেখা হইত, তবে এ ভাষা যে না শিখিয়াও পড়া যায়, সে তত্ত্বটুকু শিখিতে আমাদের মতো অনভিজ্ঞের এক যুগ কাটিয়া যাইত।

পুনরায় দেখুন :

'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে' বাক্যটি হিন্দিতে 'ভারতবর্ষকী অর্থ-নৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করতি হৈ', এবং গুজরাতিতে 'ভারতবর্ষনী অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করে ছে' বলিলে বিশেষ ভুল হয় না কিন্তু যেহেতু গুজরাতি ও হিন্দি ভিন্ন লিপিতে লেখা হয়, আমরা এইসব ভাষা দূরে রাখি; ওইসব ভাষা-ভাষীরাও একে অন্যের মধ্যে তাহাই করেন।

এই বাক্যটিই ফরাসিতে বলি :

Ie progres economique de I' Indedepend sur son Independance politique.

লিপি একই, অর্থাৎ ইংরেজি; কাজেই ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে অতি অথর্ব ইংরেজও তাড়াতাড়িতে ফরাসি শিখিতে পারে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন, তাবৎ ভারতবর্ষে একই লিপি প্রচলিত হইলে ভালো হয় কি না?

তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন— শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীযুত— সেন মহোদয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাবৎ পৃথিবীর জন্য একই লিপি হইলে ভালো হয় কি না? অর্থাৎ লাতিন লিপি— যে লিপিতে লাতিন, ইংরেজি, ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, পর্তুগিজ, তুর্কি ও অধিকাংশ জর্মন পুস্তক লেখা হয়।

* * *

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়িল। প্রথম যৌবনে এক গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করার চেষ্টা করি। সেই প্রাতঃস্মরণীয় গুরু অন্তত পক্ষে একশতটি ভাষা জানিতেন ও খুব সম্ভব একশত হইতে দুই শতের মধ্যেই ঠিক হিসাব পড়ে। এবং প্রত্যেকটি ভাষাই সাধারণ গ্র্যাডুয়েট যতটা সংস্কৃত বা ফারসি জানে তাহা অপেক্ষা বেশি জানিতেন। সাধারণ গ্র্যাডুয়েট আট বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। সেই হিসাবে গুরুর বয়স অন্ততপক্ষে ১৫০ X ৮ = ১২০০ বৎসর হওয়া উচিত ছিল; যদি তিন-তিনটি ভাষা একসঙ্গে শিখিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স ৪০০ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গুরু 'বিরিঞ্চি বাবা' নহেন ও ৬০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ

www.pathagar.com

করেন। এবং শেষের দশ বৎসর খুব সম্ভব কোনও নতুন ভাষা শিখেন নাই।

তবেই প্রশ্ন এই অলৌকিক কাণ্ড কী প্রকারে সম্ভবপর হইল?

স্বীকার করি গুরু ভাষার জহুরি ছিলেন ও ভাষা শিখিতে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ভালো গুরু পাইলে, অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি উত্তম হইলে অল্পায়াসে এক ডজন ভাষা দশ বৎসরে শিখা যায়। শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন, তাহা নিষ্ঠা। এবং তৃতীয়ত কণ্ঠস্থ করা অপ্রয়োজনীয়— এই অদ্ভুত বিজাতীয় অনৈসর্গিক পাণ্ডববর্জিত ধারণা মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষণ করা।

* * *

আরেকটি প্রশ্ন। 'প্যারিস' লিখিব, না 'পারি'? 'ফরাসিস' লিখিব, না 'ফরাসি', না 'ফ্রেঞ্চ'; 'বের্লিন' না 'বার্লিন'; 'এ্যাক্সেলা শাপেল' না 'আখেন' (প্রথমটি ফরাসি উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ভাষায় ইহাই চলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি জর্মন ও শহরটি জর্মনিতে অবস্থিত)? 'মস্কভা', না 'মস্কৌ', না 'মস্কো'; 'শ্যাম' না 'সিরিয়া' 'যিশু', না 'য়েশু', না 'জীসস'? ১৮৭০-৮০ খ্রিস্টাব্দে এইসব সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কলকাতায় একটি কমিটি নির্মিত হয়, তাহার রিপোর্ট এযাবৎ দেখি নাই। কোনও পাঠক দেখিয়াছেন কী?

৬

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, প্রিয়ভাষীজনকে ধনহীন মনে করা দুর্জনের লক্ষণ। কিন্তু প্রিয়ভাষণেরও তো একটি সীমা থাকার প্রয়োজন। আমরা স্থির করিয়াছি বিলাতি কমিশন না আসা পর্যন্ত টু শব্দটি পর্যন্ত করিয়া রাজনৈতিক আবহাওয়া অহেতুক উষ্ণ করিব না, বিলাতি কর্তাদের গরমে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই সুযোগে অ্যাটলি সাহেবের প্রিয়ভাষণ যে অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার পরিধান করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে— বধূটি খুব সম্ভব কুরূপা। তবু গুরুজনেরা বলিতেছেন, বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলয়। হইতে পারে; কিন্তু কন্যাকর্তাকে বিশ্বাস করিয়া সুরূপা বধূলাভের আশা নগণ্য বলিয়াই 'কনে দেখার' প্রথা এদেশে প্রচলিত।

সে যাহাই হউক, সর্বশেষ উপমা শুনিলাম নিউইয়র্কের কোনও এক খবরের কাগজের লন্ডনস্থ সংবাদদাতার নিকট হইতে। তিনি মনে মনে এক নদীর ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার একপারে অ্যাটলি সাহেব, হাতে নাকি বহুমূল্য স্বরাজ; অন্য পারে তাবৎ ভারতীয়। সংবাদদাতা বলিতেছেন, শুধু কংগ্রেস, শুধু লীগ, শুধু রাজসংঘ, শুধু হরিজন সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেই হইবে না; সকলকে একযোগে একসঙ্গে সে বৈতরণী পার হইতে হইবে।

বাল্যবয়সে বিস্তর ভারতীয় বিস্তর নদী সাঁতরাইয়া পার হয়, এবারেও চেষ্টা করিবে; কিন্তু প্রশ্ন— কে কে জলে নামিবেন? কংগ্রেস তো নামিবেনই, সায়েবের হাতে যখন স্বরাজ রহিয়াছে, লীগ নামিবেন কি? কারণ সংবাদদাতা বলিয়াছেন, সায়েবের হাতে স্বরাজ, পাকিস্তান আছে কি না বলেন নাই। না হয় লীগও নামিলেন; কিন্তু রাজারা তো কখনও সাঁতার কাটেন না। প্রজাদের পৃষ্ঠে বসিয়া যে যাইবেন তাহারও কোনও উপায় নাই; কারণ প্রথমত প্রজাদের সে-সন্তরণে যোগ দিবার কোনও প্রস্তাবই হয় নাই, দ্বিতীয়ত তাহারা সরেজমিন

www.pathagar.com

উপস্থিত থাকিলে মণিটির হিস্যা পাইবার জন্য চেল্লাচেল্লি করিবে, হয়তো-বা সাকুল্য মণিলাভের তালে থাকিবে। কাজেই মনে হইতেছে রাজারা দুইশত বৎসরের প্রাচীন খানদানি বাতরোগের অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে কৃত সনাতন সন্ধিশর্তের দোহাই দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিবেন অথবা শূন্যে হাত-পা ছুড়িয়া সাঁতারের ভান করিবেন। হরিজন নামিতে পারেন, কারণ কূপ অপবিত্র হইতে পারে, মা-গঙ্গার সে ভয় নাই।

কিন্তু একযোগে সাঁতার কাটিতে হইবে। বয়নাক্কাটা বিবেচনা করুন। রুশ বাদ দিলে তামাম ইউরোপ ভারতের চেয়ে ক্ষুদ্র, তবু তথাকার কর্তারা সাঁতার কাটিবার সময় একে অন্যের গলা এমনি টিপিয়া ধরেন, যাহাকে বলে মহাযুদ্ধ। আর শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর আপামর জনসাধারণকে সেই নদীতে নামানো চাই, কি অস্ট্রেলিয়া, কি আমেরিকা, কি ভারত— কাহারও রেহাই নাই। এই এক জন্যেই দুইটি দক্ষযজ্ঞ দেখিলাম। তাহারই এক ছাগ-মুণ্ড তম্বি করিয়া বলিতেছেন, একযোগে সাঁতরাও।

না হয় সাঁতরাইলাম, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ক্রিপস-নদীতে যে হাঙর-কুমির আমাদের পা কামড়াইয়া সবকিছু ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা ইতোমধ্যে বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন কি?

সর্বশেষ প্রশ্ন, সায়েবের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। এ যেন 'ফোকা' 'ধোকা' খেলা। আমরা সকলে একযোগে হাঙ্গর-কুমির এড়াইয়া নদী পার হইয়া একবাক্যে চিৎকার করিয়া বলিব, 'আমরা ফোকা চাই' অথবা 'ধোকা চাই', তখন সায়েব হস্তোন্মোচন করিবেন।

তখন আমাকে দোষ দিবেন না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিবিধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১

যাঁরা ভালো করে পৃথিবীর ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা খাঁটি খবর দিতে পারবেন; আমি সামান্য যেটুকু পড়েছি তার থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে মহাত্মাজির মতো মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মাননি।

বুদ্ধদেবকে কোনও ব্যাপক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়নি; খ্রিস্টের সামনে যে রাজনৈতিক সমস্যা এসে পড়েছিল (ইহুদিদের পরাধীনতা) তিনি তার সম্পূর্ণ সমাধান করেননি; শ্রীকৃষ্ণ এবং মুহম্মদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করার আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই চার মহাপুরুষকেই কোটি কোটি লোক শত শত বছর ধরে স্বীকার করে নিয়ে জীবনযাত্রার পথ খুঁজে পেয়েছে; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মহাত্মাজি যে বুদ্ধ এবং খ্রিস্টের অহিংস পন্থা নিয়ে কৃষ্ণ এবং মুহম্মদের মতো রাজনৈতিক সফলতা লাভ করেছিলেন এ জিনিস পৃথিবীতে পূর্বে কখনও হয়নি। প্রেম দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে হিংসার ওপর জয়ী হওয়া যায় এ-কথা পৃথিবী বহু পূর্বেই মেনে নিয়েছিল, কিন্তু অস্ত্রধারণ না করে রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে জয়ী হওয়া যায় সেই অবিশ্বাস্য সত্য প্রমাণ করে গিয়েছেন মহাত্মাজি। আমার ভয় হয়, একদিন হয়তো পৃথিবী বিশ্বাস করতেই রাজি হবে না যে, মহাত্মাজির প্রেম ইংরেজের বর্বর সৈন্যবলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। অবিশ্বাসী মানুষ আজ স্বীকার করে না যিশু মৃতকে প্রাণ দিয়েছিলেন; পাঁচশো বছর পরের অবিশ্বাসী দুটোকেই হয়তো এক পর্যায়ে ফেলবে।

* * *

পাঠক হয়তো জিগ্যেস করবেন, মহাত্মাজি রাজনৈতিক ছিলেন; তিনি কোনও নবীন ধর্ম প্রচার করে যাননি, তবে কেন তাঁকে ধর্মগুরুদের সঙ্গে তুলনা করি।

নবীন ধর্ম কেন সৃষ্ট হয় তার সব কটা কারণ বের করা শক্ত কিন্তু একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। কি বুদ্ধ কি খ্রিস্ট সকলকেই তাঁদের আপন আপন যুগের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করে নিতে হয়েছিল। এ বিষয়ে পিথৌরার চর্চা বড়ই অগভীর— সে কথা পাঠককে আবার জানিয়ে রাখছি।

বুদ্ধদেবের সময় উত্তর ভারতবর্ষের বনবাদাড় প্রায় সাফ হয়ে গিয়েছে এবং ফলে আশ্রমবাসীগণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলেন। সংঘ নির্মাণ করে তাঁদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা বুদ্ধদেবকে করে নিতে হয়েছিল। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে'— অর্থাৎ যৌথ পদ্ধতিতে বিরাট প্রতিষ্ঠান (সংঘ) নির্মাণ ভারতে এই প্রথম। দ্বিতীয়ত, তখন প্রদেশে প্রদেশে এত মারামারি হানাহানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো করে প্রসার পাচ্ছিল না। শ্রমণগণ এসব

www.pathagar.com

উপেক্ষা করে শান্তির বাণী নিয়ে সর্বত্র গমনাগমন করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অন্তরায় দূর হয়। তাই শ্রেষ্ঠীরা সবসময়ই সংঘের সাহায্যের জন্য অকাতরে অর্থ দিয়েছেন।

খ্রিস্ট ইহুদিদের স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর পন্থা ছিল ইহুদিদের নৈতিক বলে এতখানি বলীয়ান করে দেওয়া যাতে করে পরাধীনতার নাগপাশ নিজের থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। অরবিন্দ ঘোষও পণ্ডিচেরিতে এই মার্গেরই অনুসন্ধান করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু কুরু-পাণ্ডবের যোগসূত্র স্থাপনা করার জন্য কূটনৈতিক দূত তাই নন, শেষ পর্যন্ত তিনি পাণ্ডববাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদও গ্রহণ করেছিলেন।

মুহম্মদের প্রধান কর্ম ছিল আরবের যুযুধান, ছিন্নবিচ্ছিন্ন বেদুইন উপজাতিগুলোকে এক করে শক্তিশালী জাতি গঠন করা।

মহাত্মাজিকে সবাই রাজনৈতিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু পৃথিবীর মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে ধর্মগুরু বলে স্বীকার করে নিলেই ঠিক হবে।

* * *

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই যদি হয়, তবে মহাত্মাজি কোনও নবীন ধর্ম প্রবর্তন করে গেলেন না কেন?

সে তো খ্রিস্টও করে যাননি। খ্রিস্ট-তিরোধানের বহু বছর পর পর্যন্তও তাঁর অনুচরগণ বুঝতে পারেননি যে তাঁরা এক নবীন ধর্মের প্রদীপ হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। রামমোহন, নানকও দেখা দিয়েছিলেন ধর্ম-সংস্কারকরূপে, তাঁরা বীজ রোপণ করে গিয়েছিলেন— শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হল নবীন ধর্ম পরবর্তী যুগে।

মহাত্মাজির নবীন— অথচ সনাতন— ধর্ম প্রবর্তিত হতে সময় লাগবে।

সেই 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি!'

* * *

গল্প শুনেছি এক গুরু যখন বুঝতে পারলেন তাঁর এক নতুন শিষ্য একদম গবেট, তখন তাকে উপদেশ দিলেন বিদ্যাচর্চা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করতে। শিষ্য প্রণাম করে বিদায় নিল।

বহু বছর পরে গুরু যাচ্ছিলেন ভিন গাঁয়ের ভিতর। একটি আধাচেনা লোক এসে নিজের পরিচয় দিয়ে গুরুকে আপন বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই গবেট শিষ্য। গুরু তার যত্ন-পরিচর্যায় খুশি হয়ে শুধালেন, 'তা বাবাজি আজকাল কী করো?'

শিষ্য সবিনয়ে বলল, 'টোল খুলেছি।'

গুরুর মস্তকে এটম বোমাঘাত। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে শুধালেন, 'তা কী পড়াও?'

শিষ্য বলল, 'আজ্ঞে সব কিছুই; তবে ব্যাকরণটা পড়াইনে।'

গুরু আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কী কথা? আমার যতদূর মনে পড়ছে তুমি তো ব্যাকরণটাই একটুখানি বুঝতে।'

শিষ্য বললে, 'আজ্ঞে, তাই ওটা পড়াতে একটুখানি বাধো-বাধো ঠেকে।'

* * *

রায় পিথৌরা যে সর্ববাবদে এই শিষ্যটির মতো, সে কথা আর লুকিয়ে রেখে লাভ কী? এই দেখুন না, দিনের পর দিন সে সম্ভব-অসম্ভব কত বিষয়ে কত 'তত্ত্ব কথাই' না বেহায়া বেশরমের মতো লিখে যাচ্ছে। কারণ? কারণ আর কী? সর্ববিষয়ে যার চৌকশ অজ্ঞতা তার আর ভাবনা কি?

www.pathagar.com

কিন্তু প্রশ্ন, গবেট শিষ্য কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জানত বলে ওই বিষয়ে পড়াতে তার বাধো-বাধো ঠেকত। পিথৌরার কি সেরকম কোনওকিছু আছে?

সেই তো বেদনা, সুশীল পাঠক, সেই তো ব্যথা।

মা সরস্বতী সম্বন্ধে কোনও কিছু লিখতে বড় বাধো-বাধো ঠেকে। চতুর্দিকে গণ্ডা গণ্ডা সরস্বতী পূজা হয়ে গেল। আমি গা-ঢাকা দিয়ে, কিংবা পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

আর কোনও দেবতার সেবা করার মতো সুবুদ্ধি আমার হয়নি— প্রথমজীবনে মা সরস্বতীই আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন, আর আমি হতভাগা তাঁর সেবাটা কায়মনোবাক্যে করিনি বলে আজ আমার সবকিছু ভণ্ডুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। এখন মা সরস্বতীর দিকে মুখ তুলে তাকাতেও ভয় করে। হায়, দেবীর দয়া পিথৌরার প্রতি হয়েছিল, কিন্তু মূর্খ তাঁকে অবহেলা করে আজ এই নিদারুণ অবস্থায় পড়েছে।

— রায় পিথৌরা

২

দিল্লির বিখ্যাত সাধু নিজামউদ্দীন আওলিয়ার প্রখ্যাত সখা এবং শিষ্য কবি আমির খুসরৌর জন্মোৎসব কয়েক দিন হল আরম্ভ হয়েছে। আমির খুসরৌর কবর নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতরেই— এবং সে দরগা হুমায়ুনের কবরের ঠিক সামনেই। (এ দর্গায় আরও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির কবর আছে।)

খুসরৌর পিতা ইরানের বল্‌খ (সংস্কৃত বল্‌হীকম— ভারতীয় কোনও কোনও নৃপতি বল্‌খ্ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে) থেকে ভারতবর্ষে আসেন। পুত্র খুসরৌ কবিরূপে দিল্লির বাদশাহদের কাছে প্রচুর সম্মান পান।

ফারসি তখন বহুদেশের রাষ্ট্রভাষা। উত্তর ভারতবর্ষ (ফার্সি এদেশের ভাষা নয়), আফগানিস্তান (সে দেশেরও দেশজ ভাষা পশতু), তুর্কিস্তান (তারও ভাষা চুগতাই) এবং খাস ইরানে তখন ফার্সির জয়-জয়কার। এমনকি বাঙলা দেশের এক স্বাধীন নৃপতি কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

খুসরৌ ফার্সিতে অত্যুত্তম কাব্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। ভারতের বাইরে, বিশেষ করে কাবুল-কান্দাহার এবং সমরকন্দ-বোখারা খুসরৌকে এখনও মাথার মণি করে রেখেছে।

আলাউদ্দীন খিলজী, তাঁর ছেলে খিজর খান; বাদশা গিয়াসউদ্দীন তুগলুক, তাঁর ছেলে বাদশা মুহম্মদ তুগলুক (ইংরেজ ঐতিহাসিকদের 'পাগলা রাজা') এঁরা সবাই খুসরৌকে খিলাত ইনাম দিয়ে বিস্তর সম্মান দেখিয়েছেন।

গুজরাতের রাজা কর্ণের মেয়ে যখন দিল্লি এলেন তখন তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমার খিজর খান তাঁকে বিয়ে করেন। ইংরেজের মুখে শুনেছি, বিয়ে নাকি প্রেমের গোরস্তান, অর্থাৎ বিয়ে হওয়ার পরই নাকি সর্বপ্রকারের রোমানস্ হাওয়া হয়ে যায়। এখানে হল ঠিক তার উল্টো। এঁদের ভিতর যে প্রেম হল সে প্রেম পাঠান-মোগল হারেমের গতানুগতিক বস্তু নয়— তাই অনুপ্রাণিত হয়ে খুসরৌ তাঁদের প্রেমকাহিনী কাব্যে অজর অমর করে দিলেন। সেই

www.pathagar.com

কাব্যের নাম 'ইশকিয়া'— বাঙলা ভ্রমণের সময় সম্রাট আকবর সেই কাব্য শুনে বার বার প্রশংসা করেছিলেন। কর্ণের মেয়ের নাম দেবলাদেবী। শুনেছি, বাঙলায় নাকি 'দেবলাদেবী' নাটক বহুদিন ধরে অভিনীত হয়েছে।

গিয়াসউদ্দীন তুগলুক নিজামউদ্দীনকে দু চোখে দেখতে পারতেন না। সে কাহিনী 'দৃষ্টিপাতে' সালঙ্কার বর্ণিত হয়েছে— 'দিল্লি দূর অস্ত্'! কিন্তু গিয়াস নিজামের মিত্র খুসরৌকে রাজসম্মান দিয়েছিলেন। খুসরৌ বড় বিপদে পড়েছিলেন,— একদিকে সখার ওপর বাদশাহি জুলুম, অন্যদিকে তিনি পাচ্ছেন রাজসম্মান।

মুহম্মদ তুগলুক রাজা হওয়ার পর তাবৎ মুশকিল আসান হয়ে গেল। ঠিক মনে নেই (পোড়ার শহর দিল্লি— একখানা বই পাইনে যে অর্ধবিস্মৃত সামান্য জ্ঞানটুকু ঝালিয়ে নেব), বোধহয় খুসরৌ বাদশা মুহম্মদের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

সে এক অপূর্ব যুগ গেছে। সাধক নিজামউদ্দীন, সুপণ্ডিত বাদশা মুহম্মদ তুগলুক, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী এবং সভাকবি আমির খুসরৌ।

প্রথম দেহত্যাগ করলেন শেখ-উল-মশাইখ নিজামউদ্দীন আওলিয়া, তার পর তাঁর প্রিয়সখা আমির খুসরৌ, তার পর বাদশা মুহম্মদ শাহ তুগলুক এবং সর্বশেষে জিয়া বরনী।

ইংরেজ আমাদের কত ভুল শিখিয়েছে। তার-ই একটা, এসব গুণীরা ফার্সিতে লিখতেন বলে এঁরা এদেশকে ভালোবাসতেন না। বটে? সরোজিনী নাইডু ইংরেজিতে লিখতেন, তাই তিনি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন না!

খুসরৌ মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ভালোবাসতেন এবং সে ভূমির অশেষ গুণকীর্তন করে গিয়েছেন।

এবং দূরদৃষ্টি ছিল বলে তিনি যেটুকু দেশজ হিন্দি জানতেন (হিন্দিরও তখন শৈশবাবস্থা) তাই দিয়ে হিন্দিতে কবিতা লিখে গিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, ফার্সি এবং হিন্দি মিলিয়ে তিনি উর্দুর গোড়াপত্তন করে গিয়েছেন— জানতেন একদিন সে ভাষা রূপ নেবেই নেবে।

আবার বিপদে পড়লুম; হাতের কাছে বই নেই, তাই 'চেক আপ' করতে পারছিনে— পণ্ডিত পাঠক অপরাধ নেবেন না— যেটুকু মনে আছে, নিবেদন করছি—

'হিন্দু বাচ্চেরা ব নিগর্ আজব্ হুস্ন্ ধরত হৈ
দর্ ওক্তে সুখ্ন্ জদন্ মুহ্ ফুল্ ঝরত হৈ
গুফ্তম "কে বি আ আজ লবেৎ বোসে বিগরিম—"
গুফ্ত "আরে রাম! ধরম নষ্ট করত হৈ"!'
'হিন্দু বামা কী অপূর্ব সৌন্দর্যই না ধারণ করে,
কথা বলার সময় মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে।
বললুম, "আয় তোর ঠোঁটে চুমো খাব— "
বললে, "আরে রাম! ধর্ম নষ্ট করত হৈ"!'

— রায় পিথৌরা

www.pathagar.com

৩

দিল্লির দুর্গাপূজা দেখবার মতো জিনিস। আমরা বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করবার মতো বয়স, সময় এবং উৎসাহ যাঁদের আছে তাঁরা যদি এখানে পূজার সময় গোটা তিনেক রোঁদ মেরে যান তবে 'নব হুতোম' লিখে পৌরজনকে বিস্তর মধু পান করাতে পারবেন।

সবকিছু দেখিনি, যা দেখলুম তাতে খুশিই হয়েছি। রুচিবাগীশরা বলেন, এরকম টাকার শ্রাদ্ধ, বাজে থিয়েটার এবং থিয়েটারকে টেক্কা দেবার জন্য কলকাতা থেকে বাঙলা ফিল্‌ম্‌ আনানো; এরা যদি ট্যাক্সি করে মীরাট থেকে কলাগাছ আনালো তবে ওরা প্লেনে করে কলকাতা থেকে মাঙ্গুল্য যোগাড় করালে; এসব অপব্যয় আড়াআড়ি নিতান্ত অর্থহীন, মূল্যহীন এবং এদের চাপে পড়ে দেবীপূজার মাহাত্ম্য গাম্ভীর্য সমস্তই নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়।

বহু স্থানে রুচিবাগীশদের সঙ্গে আমি একমত— একথা অস্বীকার করে মহানবমীর দিনে আমি মহাপাতক হতে চাইনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে, যাঁদের রুচি আছে, যাঁরা দেবী-পূজার প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কী কী করতে হয় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ধরেন, তাঁরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, তবে দিল্লি শহরের ঐতিহ্য-বিস্মৃত যুবক-যুবতীরা এমন কী অলৌকিক কর্ম সমাধান করতে পারবে? এদের অনেকেই পুব, পশ্চিম কোনও বাঙলায় কখনও যায়নি, বাঙলায় দুর্গাপূজার রূপ এরা কখনও দেখেনি— এদের দেখাবে কে, শেখাবে কে?

কিন্তু এদের উৎসাহ-উদ্দীপনা খাঁটি বাঙালির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। হাঁসকে যেমন জলে ছেড়ে দিলে সে তৎক্ষণাৎ সাঁতার কাটতে আরম্ভ করে, বাঙালিকে তেমনি পৃথিবীর যে কোনওখানেই ছেড়ে দাও না কেন, বাঁশ, খড়, মাটি, রঙ যোগাড় করে ভালো-মন্দ একটি প্রতিমা বানিয়ে বসবেই বসবে, ঢাক-ঢোল সানাইয়ের অভাবে ট্যাম্বুরিন ক্লারিনেট দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবেই নেবে।

আমার চোখে পড়ে এই উৎসাহটাই। তার বর্তমান গতি বা রূপ দেখে আমি নিরাশ হইনে। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ নিরাশ হবার কোনও কারণই আমি দেখতে পাইনে।

* * *

দিল্লির যেসব ছেলে-ছোকরারা 'দেহলি প্রান্তে' পড়ে এবং আমাকে যারা ব্যক্তিগত জীবনে কিছুটা মানে, তাদের উদ্দেশে আমি দু একটি কথা বলতে চাই।

দুর্গাপূজার প্রধান উদ্দেশ্য শক্তির সন্ধান, শক্তির সাধনা। এ শক্তি শারীরিক মানসিক নৈতিক সর্বপ্রকারের পার্থিব আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়িয়ে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তির আধার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যেসব শক্তি আছে— যাদের সন্ধান করতে গিয়ে আমাদের বাক্ এবং চিত্ত বার বার ফিরে আসে— সেগুলোও ওই মূল শক্তির ভিতর সমাহিত। মানুষ যখন ধ্যানলোকে তার শারীরিক মানসিক সর্বপ্রকারের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হয় তখন সে শক্তি পায় সেই মূল শক্তি থেকে, আবার ক্ষুদ্রতম কীটাণুকীট যখন তার সামান্যতম প্রয়াসে নিযুক্ত হয় তখনও এই বিশ্বশক্তি তাকে অনুপ্রাণিত করে। এ শক্তির বাইরে কোনও কিছু নেই— সবকিছুই এরই ভিতরে।

www.pathagar.com

শান্তির সাধনা করো আর সংগ্রামের সাধনাই করো, এই শক্তি ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জড়জগতের সৃষ্টিশক্তির অনেক সন্ধান পেয়েছি এবং শক্তির দ্বারাই আমাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছি। শক্তিকে কেউ অস্বীকার করে না, এ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালে যে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পেষিত হতে হয় সে তত্ত্ব সকলেরই জানা। ঠিক তেমনি আমাদের মনের ভিতরে-বাইরে নানা ধরনের শক্তি আছে যার সন্ধান কেউ অল্পবিস্তর পেয়েছে, কেউ সাধনার জোরে বেশি পেয়েছে।

এঞ্জিনের শক্তির সামনে আমি দাঁড়াইনে, কিন্তু নৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও যে তদ্দণ্ডেই আমার বৃহত্তর মৃত্যু সে কথা আমরা ভেবে দেখিনে। তার প্রধান কারণ আমরা সে শক্তির স্বরূপ চিনিনে— সে শক্তি তো চোখ দিয়ে দেখা যায় না, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। এই নৈতিক শক্তির স্বরূপ মহাত্মা গাঁধী তাঁর সর্বসত্তা দিয়ে চিনতে পেরেছিলেন এবং সেই শক্তি-অশ্ব যখন তিনি তাঁর স্বরাজরথে পার্থসারথির মতো সংযোজনা করলেন তখন ইংরেজকে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

এ শক্তি সকলেই কাজে খাটাতে পারবে সে আশা দুরাশা। পার্থসারথি হওয়া মহামানবের কর্ম কিন্তু এ শক্তিকে চিনতে পারা ততখানি কঠিন নয়। সামান্যতম পদাতিকও কৃষ্ণের রথ দেখে চিনতে পারে এবং পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। এ তত্ত্ব নেতিবাচক কিন্তু এর কমে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাই এর সন্ধান আমাদের অহরহ করতে হবে। নৈতিক ভুবনে শক্তিশালী হই আর না-ই হই, শক্তিমানকে যেন অন্তত চিনতে পারি।

* * *

এসব শক্তি ছাড়িয়ে যে বিশ্বশক্তি, যে বিশ্ব-ভাণ্ডার থেকে সর্বশক্তি উচ্ছ্বসিত হয় তার সন্ধানে মানুষ এখনও খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। কী করলে সেই শক্তি-স্রোতে আমি শরীর ভাসিয়ে দিয়ে সুধাপারাবারে পৌঁছব তার সন্ধান পেয়েছেন অতি অল্প পুরুষই। এ-যুগে তাই শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে স্বর্ণসিংহাসনে বিরাজ করছেন। সকলেই জানেন, তিনি কতবার বলেছেন, শক্তিরূপা মাতাকে আরাধনা না করে আধ্যাত্মিক জগতে গত্যন্তর নেই।

* * *

দুর্গাপূজার দিনে বাঙালি এ সত্য সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে। কিন্তু বাদবাকি ৩৬৪ দিন? তখন বাঙালি আবার সেই নির্জীব 'শক্তিহীন' বাঙালি?

তাই শক্তিপূজা শুধু কয়েকটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়— বছরের প্রতিদিন শক্তিকে স্মরণ করতে হয়, তাঁর সাধনা করতে হয়।

— রায় পিথৌরা

৪

প্রভাত মুখুয্যের 'রত্নদীপ' যখন মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরোয়— আজ পিছন পানে তাকিয়ে মনে হয় সে যেন বহু যুগের কথা— তখন কী উৎসাহে বাঙালি জনসাধারণ এবং রুচিসম্পন্ন পাঠকেরাও সে-বই পড়েছিলেন! মফঃস্বলের শহরের ডাকঘরে যখন সে মাসিক আসত তখন তার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। আমাদের শহরে তো নিয়ম ছিল, পোস্ট-

www.pathagar.com

মাস্টার মহাশয়ের মাসিকখানা পোস্টাপিসের সম্মুখের কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাউকে দিয়ে চেঁচিয়ে পড়ানো— আমরা সবাই কুণ্ডুলি পাকিয়ে সেই 'শাস্ত্র-পাঠ' শুনতুম।

খ্যাতনামা, সুরুচিবান এবং শক্তিশালী বাঙালি লেখক কর্তৃক এই প্রথম এবং বলতে গেলে শেষ রগরগে বা সেনশনাল নভেল।

এখনও বহু লোকের বিশ্বাস রগরগে উপন্যাস লেখা অতিশয় অপকর্ম— পাঁচকড়ি দে নরাধম এবং দীনেন্দ্রকুমার রায় কুলোক। আমি এ দলে নেই কিন্তু সে আলোচনা আরেক দিন হবে।

কোনান্ ডয়েল্ সত্যকার পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং তাঁর একটি অসাধারণ গুণের কথা বহু লোকের অজানা যে তিনি ইংলন্ডের মৃত কি জীবিত যে কোনও সাহিত্যাচার্যের রচনাভঙ্গি, শৈলী এবং ভাষা অনায়াসে অনুকরণ করতে পারতেন। এডগার ওয়ালেসও সুসাহিত্যিক ছিলেন— ইংলন্ডের যে কোনও সাহিত্যসভা তাঁর আশীর্বাদ কিংবা উপস্থিতি পেলে কৃতার্থম্মন্য হতেন।

সাহিত্যে রগরগে উপন্যাসেরও বিশেষ স্থান আছে। তবে একথা ভুললে চলবে না, শুষ্ক ইতিহাসকে সরস, সজীব, সার্থক সাহিত্য করতে হলে যে রকম সুসাহিত্যিকের প্রয়োজন, রগরগে উপন্যাসের বেলাতেও তাই। 'গুপ্তধন' রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ লিখতে পারতেন না,— 'গোস্ট্ অব ক্যান্টারভিল' লেখা অস্কার ওয়াইল্ডেই সম্ভবে।

প্রভাত মুখুয্যে যখন 'রত্নদীপ' লেখেন তখন তিনি খ্যাতনামা লেখক। শুধু যে তিনি তখন রবীন্দ্রনাথ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী, সত্যেন দত্তের শ্রদ্ধা এবং সাহচর্য পেয়েছিলেন তা-ই নয়, ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁর একটি গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে আপন দর্শন-দ্বিরদ-রদ-স্তম্ভ থেকে নেমে এসে সেই গল্প নিয়ে একটি চমৎকার আলোচনা করেন। সে আলোচনা পড়লে বাঙালি এখনও উপকৃত হবে।

সেই প্রভাত মুখোপাধ্যায় সুসাহিত্যিক-খ্যাতির শিখরে বসে লিখলেন, 'রত্নদীপ'— রগরগে উপন্যাস!

কিন্তু হলে কী হয়— উপন্যাসখানা পড়বার সময় ক্ষণে ক্ষণে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ এবং শিহরণ হলেও পরিষ্কার ধরা পড়ে মুখোপাধ্যায়ের আসল কৃতিত্ব কোথায়? প্রবঞ্চক যেদিন বউরাণীকে ভালোবেসে এক নতুন মানুষ হয়ে জন্ম নিল, তখন তার নবজন্মের কাহিনী, তার ভিতরকার ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব এবং সর্বশেষে তার নির্ভয়, পরিপূর্ণ স্বার্থত্যাগ-আত্মবিসর্জন প্রভাত মুখোপাধ্যায় বিশ্লেষণ এবং বর্ণন করেছেন এদেশে মনস্তাত্ত্বিক নভেল প্রচলিত হওয়ার বহু পূর্বে— শক্তিশালী সাহিত্যিকের জোরদার কলম দিয়ে। আমার মনে হয় সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ ওরকম অপরের হৃদয়মনের গভীর অতলে ঢুকে এরকম রত্নদীপ তুলে আনতে পারতেন না।

তাই 'রত্নদীপ' নিছক রগরগে উপন্যাস নয় (তা হলেও আমার মত অনেকের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আপত্তি নেই), রত্নদীপ সুসাহিত্য।

* * *

সেই 'রত্নদীপ' তার আলো-ছায়া ফেলেছে দেহলি-প্রান্তের রুপালি পর্দায়। তবে সে দীপ হিন্দি ভাষার 'ঘিউ' দিয়ে জ্বালানো— হেথাকার বাঙালির এই যা আফসোস।

www.pathagar.com

বয়স হয়েছে; বায়স্কোপ— সিনেমা-মুভি-পিকচার-টকি কথাগুলো এখনও রপ্ত হল না— যেতে দেখলে নাতি-নাতনিরা হাসাহাসি করবে তাই যেতে হয় গা-ঢাকা দিয়ে টাপে-টোপে। দিল্লিতে আমাকে অন্য কেউ বড় একটা চেনে না— অখ্যাত হওয়ার এই একটা মস্ত সুবিধে।

গিয়ে ভালোই করেছিলুম। ছবিখানা অত্যুত্তম না হলেও উত্তম হয়েছে। বেশিরভাগ ছবি আজকাল এতই খারাপ যে, বায়স্কোপে বসে অনেক জোয়ানরাই ঘুমোয়— প্রাপ্তবয়স্কদের তো কথাই নেই; এ ছবি ঘুমের দাওয়াইরূপে সেবন করা যায় না। বেশ খাড়া হয়ে বসে দেখতে হয়।

আর ছবির নায়ক অভিনয়ে পাউল ম্যুনির পর্যায়ে উঠেছেন— অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি ম্যুনির মতো বিভিন্ন চরিত্রে একই কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন কি না, সে কথা এখনও বলা যায় না বলেই আমার মনে হল। জমিদারবাড়িতে ঢোকার পর নায়ক সবসুদ্ধ হয়তো এক ডজন কথাও বলেছেন কি না সন্দেহ, অথচ এই কথা না-বলার টেকনিকেই তাঁর অভিনয় চরম খোলতাই পেয়েছে। সিনেমা-মৌতাতিরা এ লোকটির ওপর নজর রাখবেন।

বউরাণীও ভালো অভিনয় করেছেন, তবে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তাঁর বস্তুতান্ত্রিক অভিনয়ে যতখানি দখল, ব্যঞ্জনার ভিতরে গোপন থেকেও আত্মপ্রকাশ করার পদ্ধতি তিনি ততটা ভালো করে আয়ত্ত করতে পারেননি। সেদিক দিয়ে তাঁর সহচরী সুচতুরা। তবে একথাও বলব, বউরাণী দর্শকের চিত্তজয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

যতদূর মনে পড়ছে, মূল পুস্তকে বউরাণী লাজুক এবং অতিশয় স্বল্পভাষী। নায়ক কথা বলে না, নায়িকাও স্বল্পভাষী। উপন্যাসে এ জিনিস চলে, ফিল্‌মে চালানো মুশকিল— সায়লেন্ট ফিল্‌মে এই একটা মস্ত সুবিধে ছিল— তাই বোধহয় বউরাণীকে কিঞ্চিৎ এগ্রেসিভ করে গড়া হয়েছে।

আমার ভালো লাগেনি প্রধান পরিচারিকা আর জমিদার-মাতার অভিনয়। বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হল; তবে শুনেছি এ দেশের অধিকাংশ দর্শকই নাকি বাড়াবাড়ি (ইংরেজিতে যাকে বলে 'হ্যাম্‌ অ্যাকটিং') পছন্দ করেন।

আগাগোড়া নাটকেই বিস্তর 'ফাইন টাচেস' আছে। তার জন্য প্রডুসার ডিরেক্টর কাকে প্রশংসা করতে হবে জানিনে। বাঙলা ছবি এ বাবদে এখন ভারতীয় অন্যান্য ছবির চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে আছে।

গোঁফ পরচুলা কিন্তু এখন খারাপ। ক্লোজ-আপের সময় চোখে পীড়া দেয়। শুনেছি, কোনও এক ফিল্‌মে ক্রাইস্টের দাড়ি-গোঁফের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে গঁদ দিয়ে সাঁটা হয়েছিল— অতখানি না করেও দাড়িগোঁফ আরও অনেক স্বাভাবিক করা যায়।

কিন্তু এসব খুঁটিনাটি। রবিবাবু বলেছেন,

'দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা
যায় বিন্দুকে;
মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই না
বলুক নিন্দুকে।'

এ ছবি 'মোটের উপর' নয়, খণ্ডেও ভালো। প্রিমিয়ের-রাত্রে দেবকীবাবু রিগেলে উপস্থিত ছিলেন।

— রায় পিথৌরা

www.pathagar.com

সপ্তপর্ণী

কয়েক দিন হল 'আনন্দবাজার' পত্রিকার দোল সংখ্যা বেরিয়েছে। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন এ কাগজে 'বাংলা সাহিত্যের অতীত ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত এবং বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। হিন্দি-ইংরেজি বনাম বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের সকলকে আমি এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি— তাঁরা লাভবান হবেন।

আমার আলোচনায় জানা-অজানাতে প্রবোধচন্দ্রের অনেক যুক্তি এসে গিয়েছে এবং আসবে। প্রবোধচন্দ্র না হয়ে অন্য কোনও কাঁচা লেখক হলে আমি আমার লেখাতে পদে পদে তাঁর উদ্ধৃতির ঋণস্বীকার করতুম— কিন্তু এঁর বেলা সেটার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রবোধবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাঙলা ভাষা যেন তার ন্যায্য হক্ক পায় এবং সেই হক্ক সপ্রমাণ করার জন্য কে তাঁর লেখা থেকে কতখানি সাহায্য পেল, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং আমার বিশ্বাস, দরকার হলে তিনিও অন্য লেখকের রচনা থেকে যুক্তি-তর্ক আহরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার লেখা তাঁকে সাহায্য না-ই করল।

প্রাচ্যে যেসব বড় আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, সেসব আন্দোলন শুধু যে তার জন্মভূমিতেই সফল হয়েছে তাই নয়, তার ঢেউ পশ্চিমকেও তার সুপ্তিতে জাগরণ এনে দিয়েছে, সেসব আন্দোলনকে আমরা সচরাচর ধর্মের পর্যায়ে ফেলে নবধর্মের অভ্যুদয় নাম দিয়ে থাকি। ভারতবর্ষে তাই বৌদ্ধ ও জৈনদের দুই বৃহৎ আন্দোলনকে আমরা ধর্মের আখ্যা দিয়েছি; সেমিতি ভূমিতে ঠিক ওইরকমই দুই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি জোরালো আন্দোলন সৃষ্ট হয়— সেগুলোর নাম খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম।

আজকের দিনে ধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুঝি,— মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। পূজা-অর্চনা কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন-ধ্যানাদি করে কী করে ভগবানকে পাওয়া যায়, ধর্ম সেই পন্থা দেখিয়ে দেয়, এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একটুখানি ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ধর্ম যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি চেষ্টা করেছে মানুষে মানুষের সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধআতুরের আশ্রয় নির্মাণ করাতে— এককথায় এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে মানুষ মাৎস্যন্যায় বর্জন করে, একে অন্যের সহযোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম এইসব কাজেই মনোযোগ করেছে বেশি— ভগবানের সান্নিধ্য এবং তাঁর সাহায্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে।

বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের সংখ্যা সংসারে সবসময়েই কম ছিল বলে বড় আন্দোলনকারী মাত্রই এদের উপেক্ষা করে জনগণকে কাছে আনতে— এমনকি ক্ষেপিয়ে তুলতে— চেষ্টা করেছেন আপ্রাণ। এবং তাই তাঁরা বিত্তশালী এবং পণ্ডিতের ভাষা উপেক্ষা করে যে ভাষায় কথা বলেছেন, সেটা জনগণের ভাষা। তথাগতের ভাষা তৎকালীন গ্রাম্য ভাষা পালি এবং মহাবীরের ভাষা অর্ধ-মাগধী। খ্রিস্টের ভাষা হিব্রুর গ্রাম্য সংস্করণ আরামেয়িক এবং মুহম্মদের ভাষা আরবি। আরবি সে যুগে এতই অনাদৃত ছিল যে আরবেরাই আশ্চর্য হল, এ ভাষায় আল্লা তাঁর কুরান প্রকাশ (অবতরণ = নাজিল) করলেন কেন? তার-ই উত্তর কুরানে রয়েছে :—

www.pathagar.com

আল্লা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবি ভাষায় কুরান অবতরণের আধার হবেন সেই তো স্বাভাবিক এবং অন্য যে কোনও ভাষায় (এবং সে যুগে হিব্রু ছিল পণ্ডিতের ভাষা— রায় পিথৌরা) সে কুরান পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা তো এর অর্থ বুঝতে পারছিনে।'

গণ-আন্দোলনে সবচেয়ে বড় কথা— আপামর জনসাধারণ যেন বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারে।

তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চতুর্দিকে যে আন্দোলন গড়ে উঠল, তার ভাষা বাঙলা, তুকারামের ভাষা মারাঠি (তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, সংস্কৃতই কেবল সাধুভাষা?— তবে কি মারাঠি চোরের ভাষা), কবীরের ভাষা সে সময়ে প্রচলিত বৈধ হিন্দি এবং তিনিও বলেছেন, সংস্কৃত কূপজল (তার জন্য ব্যাকরণের দড়িলোটার প্রয়োজন), কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ চলতি ভাষা) 'বহুৎ' নীর— যখন খুশি ঝাঁপ দাও, শান্ত হবে শরীর।' রামমোহন, দয়ানন্দ আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাঙলা ব্যবহার করে গিয়েছেন, তার চেয়ে সোজা সরল বাঙলা আজ পর্যন্ত কে বলতে পেরেছেন? এমনকি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর বিপক্ষ দলকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংস্কৃতে না লিখে বাঙলায় উত্তর দিতে। তিনি নিজেও সংস্কৃতে লেখেননি, যদিও তিনি সংস্কৃত জানতেন আর সকলের চেয়ে বেশি।

আমার মনে হয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতনের অন্যতম কারণ সেদিনই জন্ম নিল, যেদিন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন। দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, ওদিকে সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা করাতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য ঢের ঢের বেশি— বৌদ্ধ জৈনদের হার মানতে হল।

পৃথিবীজুড়ে আরও বহু বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে— পণ্ডিতি ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মাতৃভাষার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে।

এইবারে নিবেদন, ইতিহাস আলোচনা করে দেখান তো, পৃথিবীর কোথায় কোন্ মহান এবং বিরাট আন্দোলন হয়েছে জনগণের কথা এবং বোধ্য ভাষা বর্জন করে?

এ তত্ত্ব এতই সরল যে, এটাকে প্রমাণ করা কঠিন। স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ কণ্ঠাগত হন।

আটঘাট বেঁধে পূর্বেই প্রমাণ করেছি এসব আন্দোলন নিছক ধর্মান্দোলন (অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মাজনিত) নয়— এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অংশ অনেক বেশি গুরুত্বব্যঞ্জক।

তাই ভারতবর্ষ এখন যে নবীন রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে এইসব আন্দোলনের পার্থক্য অতি সামান্য এবং তুচ্ছ। এই যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার সাফল্যের বৃহদংশ নির্ভর করবে জনগণের সহযোগিতার ওপর— এ কথা পরিকল্পনার কর্তাব্যক্তিরা বহুবার স্বীকার করেছেন এবং ক্রমেই বুঝতে পারছেন, উপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে কোনও দেশকে উন্নত করা যায় না— যদি না নিচের থেকে, জনগণের হৃদয়মন থেকে সাড়া না আসে, সহযোগিতা জেগে না ওঠে।

আমাদের সর্বপ্রচেষ্টা, সর্বঅর্থব্যয়, সর্বকৃচ্ছ্রসাধন, সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি আমরা আমাদের সর্বপরিকল্পনা সর্বপ্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের সম্মুখে প্রকাশ না করি। এ বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

আমি জানি, ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু যাঁরা অন্তহীনকাল ধরে ইংরেজির সেবা করতে চান, তাঁরা ভারতের অগ্রগামী গতিবেগ মন্থর করে দেবেন মাত্র।

এ বিশ্বাস না থাকলে আমি বার বার নানা কথা এবং একাধিকবার একই কথা বলে বলে আপনাদের বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতুম না।

— রায় পিথৌরা

তোমার আসন পাতব কোথায়?

মিশরের লোক নিশ্চয়ই বাঙলা পড়তে পারে, অন্তত মিশরস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত এ. এ. এ. ফৈজি সাহেব পারেন, এবং 'সত্যযুগ' কাগজখানারও কিছুটা কাটতি কাইরোতে আছে। তা না হলে এ অলৌকিক ঘটনা ঘটল কী প্রকারে?

মিশর থেকে খবর এসেছে, ফৈজি সাহেবের উদ্যোগে কাইরোতে একটি মিশর-ভারত সংস্কৃতি-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। এই জাতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধম কোনও প্রকারের প্রস্তাব করেননি বটে কিন্তু স্মৃতি-বিলাস পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধম 'রুদ্ধ-বাতায়ন' এবং 'খোলা-জানালায়' লিখনে কিছুটা ওকালতি করেছিল।

ভুবন-ব্যাপী রাজনৈতিক অরাজকতার মাঝখানে আমার নস্য-প্রমাণ লিখন দুটি এরকম ঝটপট ফল দেবে সে আশা আমি কস্মিনকালেও করিনি। তার শতাংশের একাংশও মনে মনে পোষণ করলে আমি আজই 'চিনির অনটন' সম্বন্ধে গণ্ডাদশেক প্রবন্ধ লিখতুম। তাই আমার এ কেরামতিটা কাকতালীয় বলে স্বীকার করে নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করলুম।

ফৈজি সাহেবকে পূর্ব-ভারতের লোক চেনে না। ইনি বোম্বাইবাসী এবং বোম্বাইয়ের ইসলামিক রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। উৎকৃষ্ট আরবি জানেন এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি-বিভাগ এঁরই আদেশ-উপদেশ অনুসারে চলে। শিয়াদের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে ইনি সুপণ্ডিত। চিন্তা-জগতে ইনি প্রগতিশীল, এবং চোস্ত আদব-কায়দা জানেন বলে ইনি রাষ্ট্রদূত বা ইলচি হওয়ার উপযুক্ত।

কেউ যদি 'সঙ্কীর্ণমনা, প্রাদেশিক বাঙালি' বলে আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ না করেন তবে অবশ্য নিবেদন করব, আমাদের খুদাবখ্‌শ্ অথবা আব্দুল্লা সুহ্রাওয়ার্দীর তুলনায় ইনি এমন কিছু ভয়ঙ্কর গুণী নন। আজ আব্দুল্লা বেঁচে থাকলে তিনিই যে এ কর্মের সর্বোত্তম অধিকারী হতেন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু থাক্ এসব কথা, বাঙালি হিন্দুই যখন আজ বাঙলার বাইরে কোথাও কল্কে পায় না তখন আর মুসলমানের জন্য কোন্ কারবালায় কান্না জুড়ব? আব্দুল্লা অবশ্য কোনও অবস্থাতেই ফিরে আসবেন না, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য সুধীও আছেন।

সংস্কৃতিকেন্দ্রের পত্তন উপলক্ষে মিশরের পক্ষ থেকে দু জন পণ্ডিত বক্তৃতা দেন। তার একজন অল-অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গুরু বা শেখ।

www.pathagar.com

সিদনা (সম্মানিত) শেখ যে অজহরের পক্ষ থেকে এ-উৎসবে যোগদান করেছেন সে বড় আনন্দের বিষয়। অজহর পৃথিবীর সবচেয়ে বুড়া বিশ্ববিদ্যালয়— তার বয়স এক হাজার সাতের কাছাকাছি। ইয়োরোপের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়— তা সে অক্সফোর্ডই হোক আর প্যারিসই হোক— অজহরের হাঁটুর বয়সী এবং গোড়ার দিকে এদের সকলেই অজহরের নকল করত। ইবনে রুশদের (দার্শনিক আভেরেস) যেসব বই অজহরে পড়ানো হত তারই লাতিন তর্জমা নিয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়ানো আরম্ভ হয়। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ছেলেরা যে গাউন পরে সেটি প্রথম থেকেই চালু করা হয় অজহরের অনুকরণে।

মক্কা যেরকম মুসলিম-জাহানের ধর্মকেন্দ্র, অজহর ঠিক সেইরকম মুসলিম-জাহানের শিক্ষাকেন্দ্র। অজহরের সিদনা শেখ যে বাণী বলেন, যে ফতোয়া দেন (এ-স্থলে 'ফতোয়া' আমি শব্দার্থে অর্থাৎ 'বিধান' 'অনুশাসন' অর্থে ব্যবহার করছি) তামাম পৃথিবীর মুসলমান সে ফতোয়া পালন করার চেষ্টা করে। মিশরের প্রধানমন্ত্রীর তো কথাই নেই, স্বয়ং রাজা পর্যন্ত এঁকে সমঝে চলেন।

সিদনা শেখ কেন্দ্রের উন্নতিকল্পে নানা প্রস্তাব পেশ করে কামনা জানিয়েছেন, মিশর-ভারতে যেন ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময় হয়। ভারত সম্বন্ধে মিশরের কৌতূহল প্রচুর তাই তিনি ভরসা রাখেন এইসব শিক্ষক ও ছাত্র ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে আরবি ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কেতাব লিখে মিশরবাসীর জ্ঞান বাড়াতে সমর্থ হবেন।

উত্তম প্রস্তাব, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। বরঞ্চ আমরা কিঞ্চিৎ আরবি জানি বলে মিশর সম্বন্ধে আপন মুখে ঝাল খেতে পারি, কিন্তু মিশরের লোক না জানে ইংরেজি, না জানে ভারতীয় কোনও ভাষা। তাই ভারত সম্বন্ধে মিশরের জ্ঞান এতদিন পর্যন্ত ইংরেজের কুৎসা নিন্দার ওপর নির্ভর করেছে। আজ যদি সিদনা শেখের প্রস্তাব হাড়-মাংস নিয়ে শরীর ধারণ করে তবে আমি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করব।

কিন্তু প্রশ্ন, যেসব ছাত্র-শিক্ষক এদেশে আসবেন তাঁরা অধ্যয়ন করবেন কোথায়?

কলকাতা, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে? কাশী, ভট্টপল্লির চতুষ্পাঠীতে? দেওবন্দ, রামপুরের মাদ্রাসায়? এঁরাই তো আমাদের ত্রিশরণ।

দেওবন্দ, রামপুর গিয়ে যে এদের মোক্ষলাভ হবে না সে-কথা বিনাবাক্য ব্যয়েই স্বীকার করে নিতে পারি। তার কারণ দেওবন্দ রামপুর পড়ায় অজহরেরই 'নিসাব' বা পঠনবস্তু বেশ কিছুটা জল ঢেলে, মিশ্রির শরবৎ বানিয়ে। তাতে যে ভেজাল নেই সে কথাও হলপ করে বলা যায় না। তুলনা দিয়ে কথাটা বললে আমার বক্তব্য ঈষৎ খোলসা হবে। আজ যদি অক্সফোর্ডের ইংরেজ ছেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য, ইংলন্ডের ইতিহাস পড়তে আসে তবে যে পরিস্থিতিটা হবে তার সঙ্গেই মিশরের বিদ্যার্থীর দেওবন্দ গমনের তুলনা হতে পারে।

তবে কি তাঁরা ভট্টপল্লিতে যাবেন?

মুশকিল! ভট্টপল্লির জীবন ও মিশরীয় মুসলমানের চলা-বসাতেই এত পার্থক্য রয়েছে যে একে অন্যকে বরদাস্ত করতে করতেই তাঁদের উভয়পক্ষের বেশ কয়েক বছর কেটে যাবে— বহিরাগতের শাস্ত্রাধিকার আছে কি নেই, সে প্রশ্ন না-ই বা তুললুম।

অথচ ভট্টপল্লি-দেওবন্দই তো ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্তান। তা তাঁরা আজ যত নির্জীবই হোন না কেন, যত অনাদৃত অবহেলিতই হোন না কেন।

www.pathagar.com

তবে কি তাঁরা কলকাতা, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল হবেন। ত্রাহি মধুসূদন, তওবা, তওবা। ভারতীয় ঐতিহ্যের কোন মণি-মাণিক্য সঞ্চিত আছেন এইসব দো-আঁসলা, অকালপক্ব, কেরানি-প্রসবিনী বিদ্যায়তনের শ্বেত-সমাধির মাঝখানে? ভারতীয় সাহিত্য এখানে সপত্নী-পুত্রের সম্মান পায়, ভারতীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্র, নাট্য এখানে বন্ধ্যা পাণ্ডিত্যের কচকচানির বিষয়বস্তু, শেক্সপিয়ার-মিল্টনের ভূত এ গোরে প্রেতের মতন নাকিসুরে কথা কয়, অর্থশাস্ত্রের মিসিং লিঙ্ক মার্শাল টাউসিগ এখানকার শাখা-প্রশাখার শাখা-মৃগ, এখানকার ইতিহাসদেবী স্মিথের অতিবৃদ্ধা, লোলচর্মা রক্ষিতা এবং এখানকার দর্শন অধ্যয়ন সত্যই অমাযামিনীর অন্ধকার গৃহে অন্ধ কর্তৃক অনুপস্থিত অসিত মার্জারের অনুসন্ধান— এবং মার্জারটি সে-গৃহে কস্মিনকালে প্রবেশও করেনি!

তবে কি অতিথিকে চাল-চিনি বাড়ন্ত বলে ফিরতি নৌকার সন্ধান করতে বলব? তা-ও তো পারিনে।

তাই বলি 'স্বাগতম্, স্বাগতম্'— যে সামান্য আরবি জানি তাই দিয়ে বলি 'অহ্‌লান্ ওয়া সহ্‌লান'।

— ওমর খৈয়াম

গণভাষা

রাষ্ট্রভাষার স্বরূপ কী হবে এবং তার সম্প্রসারণ কতদূর, সে-কথা আলোচনা করার পূর্বে স্বাধীনতা লাভের ফলে ভারতবর্ষে যে নতুন বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে সেটা ভালো করে বুঝতে হবে।

ইংরেজ জাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তার কেন্দ্র ইংলন্ডে। ইংরেজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, বৈদগ্ধ্যের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে জগৎ-জোড়া ইংরেজের ওপর; তাই ইংরেজের প্রয়োজন তার রাজত্বের সর্বদূর ভূখণ্ড এবং তার শাসকের সঙ্গে যেন ইংলন্ডের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই যোগসূত্রের নাম ইংরেজি ভাষা এবং এটাকে ইংরেজ কিছুতেই ছিঁড়তে দেয় না। তাতে করে যে ভূখণ্ডে সে রাজত্ব করছে তার আপন ভাষার সর্বনাশ হোক, সে দেশের বৈদগ্ধ্য উচ্ছন্নে যাক ইংরেজের কোনও আপত্তি নেই।

এ তত্ত্বটা আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি, কারণ, ইংরেজ যখন এদেশে আসে তখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি। সে ভাষা সমূলে উৎপাটন করে ইংরেজ এদেশে ইংরেজি চালায়। কিন্তু তাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি, কারণ ফার্সি এদেশের আপন ভাষা নয়, ইংরেজির মতো সে-ও বিদেশি। এমনকি আর কিছুদিন গেলে ফার্সি হয়তো নিজের থেকেই হিন্দুস্তানির জন্য রাষ্ট্রভাষার আসন ছেড়ে দিত।

ইংরেজি ভাষার সাহায্য ছাড়া ইংরেজ এ দেশটাকে ব্যাপকভাবে শোষণ করতে পারবে না বলেই সে এদেশে ইংরেজি চালিয়েছিল এবং গোড়ার দিকে এদেশে প্রাদেশিক ভাষাগুলো ইংরেজি থেকে বিস্তর মাল-মশলা আহরণ করে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। তার পর একটা জায়গায় এসে সবকটা প্রাদেশিক ভাষা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। এই বাঙলা ভাষার

www.pathagar.com

কথাই ধরুন। আমরা এখনও নভেল, ছোটগল্প, আর দু চারখানা মামুলি প্রবন্ধ নিয়েই মাতামাতি করি। বিজ্ঞান, দর্শন, অলঙ্কার, অর্থশাস্ত্র, ফলিতবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৃচিৎ কখনও একখানা বই লেখা হয় এবং তার প্রথম সংস্করণ ফুরোতে দশ মাস লাগে, হয়তো-বা কখনও একদম ফুরোয়ই না।

তার কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে ইংরেজিতে এবং ইংরেজির ভূত ঘাড় থেকে না নামা পর্যন্ত রোগী আর কোনও ভাষায় কথা কইবে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা আরও খোলসা করি। লাতিন ভাষা যতদিন ইউরোপীয় গুণীজ্ঞানীর বিদ্যা-চর্চার ভাষা ছিল, ততদিন ফরাসি-জর্মন কোনও ভাষাই ব্যাপকার্থে সমৃদ্ধিশালী হতে পারেনি। তার পর লুথারের প্রটেস্টান্ট সর্ষের ঠেলায় যখন লাতিন ভূত ইউরোপের ঘাড় থেকে নামল তখন ফরাসি এসে চাপল জর্মন এবং রুশের স্কন্ধে— স্বয়ং ফ্রেডরিক দি গ্রেট জর্মনে না লিখে কাব্য রচনা করেছিলেন ফরাসি ভাষায় (এবং সে কাব্য এমন ওঁচা যে বিখ্যাত জর্মন কবি হাইনরিশ হাইনে বলেছেন, জর্মন সাহিত্যে ফ্রেডরিকের সবচেয়ে বড় অবদান— তিনি জর্মন ভাষায় কিছু রচনা করেননি)।

এই ফরাসিকে না খেদানো পর্যন্ত জর্মন ও রুশ সাহিত্য কোনও প্রকারের উন্নতি করতে পারেনি।

এইবার গোড়ার কথায় ফিরে যাই। ইংরেজের মতো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কোনও কু-মতলব নেই যে কেন্দ্র তাবত ভারত শোষণ করে খাবেন। যুক্তপ্রদেশের দোবেজি পাঁড়েজি হিন্দি ভাষার জোরে ভারতময় দাবড়ে বেড়াবেন ও মতলব নিয়ে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করা হচ্ছে না। পণ্ডিতজি ভালো হিন্দি জানেন না, তিনি জানেন অতি উত্তম উর্দু, এবং সর্দারজির হিন্দি শুনেও কোনও দোবেজি পাঁড়েজি ঈর্ষাতুর হবেন না। তাই হিন্দি দিয়ে যদি ভারতবর্ষ শোষণ করতে হয় তবে এদের বেতন দিয়ে বাড়ি পাঠাতে হবে।

আমাদের আদর্শ হচ্ছে ভারতবর্ষকে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার। তার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে বলশালী হতে হবে। বলশালী হতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রত্যেক প্রদেশকে আপন ভাষায় করতে হবে। ইংরেজি সে পথে অন্তরায় হয়ে আসর জমিয়ে বসেছিল, আজ যদি ইংরেজির শূন্য আসনটি হিন্দি দখল করে বসে তবে আমরা যে আবছায়ায় ছিলুম সেই আবছায়ায়ই থাকব।

এই জিনিসটিই আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

ইংরেজ প্রত্যেক প্রদেশেই কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ লোককে ইংরেজি শিখিয়ে আপন রাজত্ব চালিয়ে নিত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এই কয়েক লক্ষ লোকের কয়েকজন ইংরেজির মাধ্যমে একজোট হয়ে কিছুকাল পরে কংগ্রেস তৈরি করে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। ইংরেজ তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হল না, কারণ সে বিলক্ষণ জানত এসব লেকচার দেশের জনসাধারণ কিছুই বুঝতে পারে না বলে পোলিটিশিয়ানরা ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরামের মতো শুধুই তড়পাচ্ছেন। যখনই দরকার হবে এঁদের ওপর চোটপাট করে এঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু যখন সর্দারজি গুজরাতি ভাষায় বরদলৈএতে আগুন ছড়াতে আরম্ভ করলেন তখন ইংরেজ প্রমাদ গুনল। যে গণ-আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ শেষটায় স্বরাজ পেল তার অধিকাংশ বক্তাই আপন মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

স্বাধীনতালাভ কর্ম সমাধান হয়েছে। সেটা অপেক্ষাকৃত সরল কর্ম। কঠিনতর কর্ম হচ্ছে দেশ থেকে দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করে শিক্ষাবিস্তার করা, স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। এইখানে এসে রাষ্ট্রভাষামত্ত স্বৈরতন্ত্রীরা করেন প্রথম ভুল। তাঁরা ভাবেন রাষ্ট্র নির্মাণে জনসাধারণের আর কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। কাজেই ইংরেজির শূন্য আসনে যদি হিন্দি এসে গেঁট হয়ে চেপে বসে তা হলে কোনও ক্ষতি তো হবেই না, বরং ইংরেজেরই মতো তাঁরা বেধড়ক রাজত্ব চালাতে পারবেন।

অর্থাৎ ইংরেজের আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে। একদল লোক হিন্দি শিখবেন, বড় বড় নোকরি করবেন, বহিরাগত হিন্দিভাষিদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করবেন, আর বাদবাকি চাষাভূষো আমরা পাঁচজন আবছায়া থেকে তিমিরে নিমজ্জিত হব।

তাই দেখতে হবে রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রচেষ্টার সঙ্গে যেন আপামর জনসাধারণ সংযুক্ত থাকে। এবং সে জিনিস মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও মাধ্যমের দ্বারা সফল করা সম্ভবপর হয় না। রাষ্ট্রভাষার উৎকট সমর্থনকারীরা বলবেন, 'মাতৃভাষায় লেখা হলেই কি সব মানুষ এইসব রাষ্ট্র নির্মাণের কুটিলতম প্রচেষ্টার কথা বুঝতে পারবে?'

উত্তরে বলি, সকলে পারবে না, কিন্তু অসংখ্য লোক পারবে।

আমরা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার যে স্বপ্ন দেখছি তাতে দেশের শতকরা নব্বই জন মাইনর, মেট্রিক পর্যন্ত পড়বে। এবং সে মাইনর মেট্রিকের শিক্ষাদান অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ের হবে। ইংরেজি বা হিন্দির জন্য তারা প্রাণপাত করবে না বলে (অবশ্য স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রভাষা হিন্দি অপশনাল হিসেবে পড়বার ব্যবস্থা সবসময়ই রাখতে হবে— আজ যেমন কেউ শেখে সংস্কৃত, কেউ শেখে ফার্সি) তারা অতি উত্তম বাংলা শিখবে এবং ইংলন্ড, ফ্রান্স, চীন, ইরানে যেরকম সাধারণ লোক মাতৃভাষায় লেখা দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক পড়তে পারে, এরাও ঠিক তেমনি দেশের উন্নততম জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। দেশের তাবত লোকেই যে উত্তম উত্তম পুস্তক পড়বে সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়— কারণ সকলেই জানেন জ্ঞানতৃষ্ণা কোনও বিশেষ শ্রেণি বা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, এমনকি উচ্চশিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার ওপরও সে জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। কত বি.এ. এম.এ. পরীক্ষা পাসের পর চেক্ বই ছাড়া অন্য কোনও বইয়ের সন্ধানে সময় 'নষ্ট' করে না, আর কত মাইনরের ছেলে গোগ্রাসে যা পায় তাই গেলে— তাই মাতৃভাষা দেশের সংগঠন কর্মের মাধ্যমে হলে যে কোনও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু অল্প চেষ্টাতেই দেশের সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এর সত্যতা সপ্রমাণ হয় আরেকটি তথ্য থেকে— ইউরোপের বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আবিষ্কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করেও যশস্বী সৃষ্টিকার হতে সমর্থ হয়েছেন।

জিনিসটা এতই সরল যে প্রবাদরূপে বলা যেতে পারে,—

গণভাষার সাহায্য ভিন্ন গণরাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

'জয় হিন্দি', কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিন্দি যেন সে পথে অন্তরায় না হয়।

— ওমর খৈয়াম

www.pathagar.com

জনমত

ইংরেজ এ-দেশ দখল করে শান্তি এনেছিল বলে প্রাচীনদের অনেকেই ইংরেজের প্রশংসা করতেন। খুনখারাবির সময় আর্তজন প্রথম 'কোম্পানির দোহাই' দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করত আর ছোরা তবুও এগিয়ে এলে 'মহারানীর' দোহাই কাড়ত। সাক্ষ্য দেবার সময় আর পাঁচজন বলত 'লোকটা এমনি পাষণ্ড, ধর্মাবতার, যে সে 'মহারানীর দোহাই' পর্যন্ত অমান্যি করে গেল।'

তার পর এই শান্তির সুযোগ নিয়ে ইংরেজ এদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবসা চালিয়ে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য পয়মাল করে দিল। প্রাচীনদের অনেকেই তখন বুঝতে পারলেন, স্বর্গরাজ্যে যাবার জন্য ইংরেজ এসব পরোপকার করেনি। স্পষ্ট দেখা গেল স্বর্গরাজ্যের গাইড-বুক 'মথিলিখিত সুসমাচার' ইংরেজ অফিসার পড়ে না। পাদ্রিদের মারফতে বিলিয়ে দেয় এদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে।

তাই যখন আরম্ভ হল অনটন, বস্ত্রাভাব, দুর্ভিক্ষ তখন দেশের লোক ইংরেজকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করল। অসহিষ্ণুজন বোমা মারল, বিচক্ষণজন তার চেয়েও মারাত্মক বৈষ্ণবপ্রেমের হাতিয়ার আবিষ্কার করলেন।

কিন্তু ততমধ্যে আমাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব জিনিসেই ইংরেজকে দোষ দিয়ে আমরা বিমলানন্দ উপভোগ করতে আরম্ভ করে দিয়েছি। তাজমহলে ফাটল দেখা দিলে ইংরেজের দোষ, বন্যা হলে ইংরেজের দোষ, বৃষ্টি না হলেও ইংরেজের দোষ, আর ভূমিকম্প হলে তো আলবৎ ইংরেজের দোষ,— ওই যে ব্যাটাদের আলীপুরে খাসা যন্ত্রপাতি রয়েছে তাই দিয়ে ভূমিকম্পের দিনক্ষ্যাণ আগের থেকে বাৎলে দিল না কেন? ওদের কম্ম বুঝি আপন জাহাজের তদারকি করা আর ডানপিটেদের গৌরীশঙ্কর চড়ার সময় অষ্টপ্রহর বুলেটিন ঝাড়া!

এ বদ অভ্যাসটার জন্য অবশ্যি বেবাক দোষ দিশি লোকের ঘাড়ে চাপানো যায় না। ইংরেজের কুলগুরু গ্রিকরাই বলে গিয়েছেন, 'দাসের বিবেক থাকতে পাবে না, দাসের স্কন্ধে দায়িত্ববোধ চাপানো যায় না— দাসের পাপ-পুণ্যের জন্য প্রভু দায়ী।' তাই মহাপ্রভুর আপন কর্তব্য-নির্ধারণের সময় আমাদের মতামত কী তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কোন্ রাস্তায় কটা ডাস্টবিন্ থাকবে তাই নিয়ে অবশ্যি মাঝে মাঝে সার্কুলার জারি করে আমাদের পরম আপ্যায়িত করেছেন এবং এই অভ্যাসের বশবর্তী হয়েই ক্রিপ্স সায়েব লড়াইয়ের বাজারে স্বরাজ দেবার অর্থে বুঝেছিলেন আমাদের আপন লেটারহেড্ ছাপাবার অধিকার হয়ে যাবে, কোন্ খ্যাংরায় কটা কাঠি থাকবে সে বিবেচনার হক্ক আমাদের ওপর বর্তাবে। আমাদের অনেকেই তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বগল বাজিয়েছিলেন, পণ্ডিচেরি থেকে পর্যন্ত উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবার ফরমান এসেছিল।

যাক্ এসব কথা— সেসব দিন গেছে।

ইতোমধ্যে স্বরাজটা ধপ্ করে চালকুমড়োর মতো উঠোনে পড়েছে আর তাই নিয়ে যে কামড়াকামড়ি লেগেছে— থাক, বাকিটা আর বলব না— এখন আর জেলে গিয়ে ভাঙাবার মতো কোনও ক্যাশ সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের বদ অভ্যাসটা গেল না,

www.pathagar.com

কিছু একটা বানচাল হলেই আমরা বলি কংগ্রেস দায়ী, ছেলেটা চাকরি না পেলে কংগ্রেসের দোষ, বউটা বাঁজা বেরোলে কংগ্রেসের নাক কাটো।

বেবাক ভুলে গিয়েছি যে আমরা স্বাধীন, এবং যেহেতু চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী রাজ-চক্রবর্তী নন— তাই দেশের জনসাধারণ কংগ্রেসরাজের ভালো-মন্দ সবকিছুরই জন্য অংশত দায়ী।

তার অর্থ, জনগণের যেমন সর্ববিষয়ে দায়িত্ব আছে তেমনি কংগ্রেসকেও জনমত উপেক্ষা করে ফতোয়া জাহির হাতিয়ার বাহির করলে চলবে না। কংগ্রেস হয়তো উত্তরে বলবেন, 'জনমত না কচু! যে-দেশের দু আনা লোক ভালো করে খবরের কাগজ পড়তে পারে না, সে দেশে আবার জনমত! ইংরেজকে তাড়াবার জন্য আজেবাজে সক্কলেরই প্রয়োজন হয়েছিল বলে তারাই সব এখন রাজত্বের কর্ণধার হয়ে যাবে নাকি? বুনো শুয়ার খেদাবার জন্য যে মাচান তৈরি করা হয়েছিল সেইটে এখন রাজসিংহাসন হয়ে যাবে নাকি?'

প্রশ্নটা একেবারে ন-সিকে ভুয়ো নয়, কারণ আমাদের জনগণের কার্যকলাপ সেদিন শেয়ালদায় দেখা গেল, নিত্যি নিত্যি শোফার ঠ্যাঙানোতে, খেলার মাঠের দাব্‌ড়ানোতে দেখতে পাই। জনমত যদি জনকর্মের মতোই হয় তবে তাকেই-বা 'কুইট ইন্ডিয়ার' বখরাদার করা হবে না কেন?

কবুল। কিন্তু প্রশ্ন— এবং এই আমার শেষ প্রশ্ন— কংগ্রেস যখন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তখন সুস্থ জনমত গঠন করার দায়িত্ব কি কংগ্রেসেরই নয়?

ইংরেজ জনমত গঠন করতে চায়নি— বিদেশি রাজা কস্মিনকালেও জনমত গঠন করে না। কাজেই ইংরেজের কথা বাদ দিন।

হিটলারও তো জনমত গঠন করেননি। তবুও তো তিনি জার্মানিকে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খাঁটি কথা। হিটলারের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী ব্র্যুনিঙের আমলে জার্মান রাষ্ট্রে জনমত ছিল প্রচুর এবং রাষ্ট্র ছিল কম-জোর। এবং পার্টির প্রাচুর্য থেকে যদি জনমতের প্রসার স্বীকার করতে হয় তবে ব্র্যুনিঙের জার্মানির সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতে হয়। ১৯৩২ সালে জার্মানিতে সবসুদ্ধ সাতাশখানা পার্টি প্রতি গণনির্বাচনে ঝামেলা লাগাত।

হিটলার যে জনমত গড়েননি তার জন্য তাঁকে খেসারতিও দিতে হয়েছিল। সেই খেসারতির ধাক্কা সামলাবার ভার পড়েছিল গ্যোবেলসের ওপর। জার্মানির নিষ্পেষিত জনমত ছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে। গ্যোবেলস সায়েবের প্রপাগান্ডার চাবুক মরা-ঘোড়াকে খাড়া করেও খাড়া করতে পারল না। অর্থাৎ অস্ত্রবলে, ব্লিৎসক্রিগের ফলে জার্মানি লড়াই জিতেও শেষ পর্যন্ত হার মানলো।

স্ট্যালিনও জনমত চাননি কিন্তু তিনি হিটলারের চেয়ে বহুৎ বেশি হুঁশিয়ার। আর হাজার হোক রুশিয়ার ধনবন্টন পদ্ধতি জার্মানির চেয়ে অনেক বেশি সাম্যবাদী এবং গণতান্ত্রিক— যদিও জার্মান মজুরের বিত্তসম্বল রুশ মজুরের চেয়ে অনেক বেশি। তা সে যা-ই হোক্, লড়াই লেগে যাওয়ার পর স্ট্যালিনকেও রুশ জনমতের দর্গায় গোটাকয়েক মুরগি জবাই করে পীরকে জাগ্রত করতে হয়েছিল। কথাটা নিছক তুলনা নয়, কারণ সবাই জানেন, স্ট্যালিন বহু গির্জার দরজা খুলে দিলেন, 'হোলি রাশিয়া'র নাম নিয়ে বিস্তর দোহাই-কিরা কাটলেন, জাপান হেরে

www.pathagar.com

যাওয়ার পর বললেন, 'এতদিন বাদে আমরা পোর্ট আর্থারের প্রতিশোধ নিতে পারলুম।' 'আমরা' কারা? জারিস্ট রাশিয়া? স্ট্যালিনিস্ট রাশিয়া? একই কথা!

মুসোলিনিও ইতালিকে শক্তিশালী করেছিলেন জনমতের কণ্ঠরুদ্ধ করে। কিন্তু লড়াই লেগে যাওয়ার পর তিনি যুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পারলেন না। কারণ তাঁর গোয়ালে কোন গ্যোবেলস বাঁধা ছিল না। তাই যুদ্ধের মাঝামাঝিই ইতালির সর্বত্র দেখা যেত 'মুসোলিনি-বৈরী' জনমতের নোটিশ লাগানো রয়েছে, 'যুদ্ধে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষ দেখে নাও!' অর্থাৎ 'লড়াইয়ে যোগ দিলে তোমাকে লিবিয়ায় যেতে হবে। সেখানে লড়াইয়ে হেরে ইংরেজের হাতে ধরা পড়বে। ইংরেজ তোমাকে ভারতবর্ষের বন্দিশিবিরে পাঠিয়ে দেবে। ব্যস্! ফোকটে ভারতবর্ষ দেখা হয়ে গেল।' আর ভারতবর্ষ দেখবার নামে ইতালির লোক অজ্ঞান।

মোদ্দা কথা তা হলে এই;— জনমতের টুঁটি চেপে ধরলে দেশটাকে ঝটপট শক্তিশালী করা যায় কিন্তু যখন মার আসে তখন আর সামলানো যায় না। এই তত্ত্বটিই পূর্ববঙ্গের একটি প্রবাদে শুনেছি :

একলা ঘরের বউ-ঝি খেতে বড় সুখ।
মারতে গেলে ধরবে কে? ঐ বড় দুখ।

অর্থাৎ যে বাড়িতে শ্বশুর, ভাশুর, দেবর নেই সে বাড়ির একা বউ মনের আনন্দে যা খুশি রান্না করে খায়, কিন্তু যখন কিল মারার গোঁসাই সোয়ামি বউকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করেন তখন তাঁকে ঠেকাবার জন্য শ্বশুর-ভাশুর কেউ নেই— এই হল বেদনা।

কিন্তু আমরা ভারতবাসী একান্নপরিবারে বিশ্বাস করি। তাই আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেসও জনমত গড়ে তুলতে চাইবেন।

চান আর না-ই চান, আপনি-আমি তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারিনে। কী করা যায়?

প্রথমত শিক্ষার ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ স্কুল-কলেজে শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে।

কিন্তু ততদিন কি জনমত তে-ঠ্যাঙা রেস রান করবে?

না। খবরের কাগজ রয়েছে। এ যুগসন্ধিক্ষণে সত্যযুগাকাঙ্ক্ষী খবরের কাগজ মাত্রেরই দায়িত্ব অসীম।

— ওমর খৈয়াম

রাষ্ট্রভাষা

গল্পটা অতি পুরনো তাই আরেকবার বললে ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

চাটুয্যে এসেছেন শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে স্মোকিং জ্যাকেট পরে। আনকোরা ইভনিং স্যুট। হালে বিলেত থেকে ফিরেছেন তাই।

www.pathagar.com

বাঙ্গালাতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। চাটুয্যে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি বাঙলাটা তেমন ভালো বলতে পারিনে।' সবাই চুপ। শেষটায় মুখুয্যে বললেন, 'তাই তো বড় বিপদে ফেললে হে চাটুয্যে, ইংরিজিটাও জানো না, কী করা যায় বলো।'

অর্থাৎ দু নৌকোয় পা দিলে মধ্যিখানে পড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

কিংবা বলতে পারেন, এ সংসারের অধিকাংশ লোকই একটার বেশি ভাষা শিখতে পারে না (সাহিত্যিকরা বলবেন, একটা ভাষাই-বা কটা লোকে ঠিকঠিক শিখতে পারে বলো, কিন্তু এখানে উচ্চাঙ্গ বঙ্গভাষা নিয়ে রঙ্গরসের কথা হচ্ছে না)। এবং তাই নিয়ে এ পৃথিবীর গুরু সম্প্রদায়ের ভিতর শিরঃপীড়ার অন্ত নাই। আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স যে কোনও দেশ-মহাদেশের শিক্ষা বাবদীয় মাসিক পত্রিকা খুললেই দেখতে পাবেন সেই প্রাচীন সমস্যা নিয়ে পুনরপি আলোচনা : সেকেন্ড ল্যান্‌গুইজ শেখানো কী প্রকারে সফল করা যায়?

আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ ডলার খরচা করে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে ফরাসি, জর্মন শেখানো হয়, ইংলন্ডেও তাই, ছেলেমেয়েরা লেটার পেয়ে পরীক্ষা পাসও দেয় কিন্তু গর্বান্ধ বাপ-মায়েরও অন্ধত্ব ঘুচে যায় যখন দেখেন ছেলে ক্যালে বন্দরে পোর্টারকে ফরাসি ভাষায় সামান্য প্রশ্নটুকু জিগ্যেস করতে পারছে না, পারিসের ট্রেন ছাড়বে কটায়, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে। দেখেন, ছেলের প্রশ্ন শুনে ফরাসি পোর্টার প্রথমটায় মাথা চুলকোয়, তার পর মুখ থেকে পাইপটা নামায়, তার পর হঠাৎ তার মাথায় কী একটা খেয়াল খেলে যাওয়ায় চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার পর আর এক বেরাদর পোর্টারকে চেঁচিয়ে বলে, 'হে জ্যাঁ, ভিয়ানিসি, ভোয়ালা আঁ মসিয়ো কি পার্ল আংলো'— অর্থাৎ 'হেই জন, এদিকে আয়, এক ভদ্রলোক হেথায় ইংরেজি বলছেন।' বাপ-মার চক্ষুস্থির, ছেলের মুখ চুন। কিন্তু কেলেঙ্কারিটার শেষ এইখানেই নয়। জ্যাঁ আসবে, 'ইংরেজি' বলবে এবং সে ইংরেজি বাপ-ব্যাটা কেউই বুঝবে না।

হামেশাই এ ব্যাপার দুনিয়ার সর্বত্র হচ্ছে। প্যারিসে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন; ফিটফাট ভদ্রলোক, লম্বা দাড়ি অধ্যাপক, পাততাড়ি বগলে স্কুলের ছোকরা সবাইকে 'বুজূর' বলে জোর করে দাঁড় করাচ্ছেন, অতিশয় কমনীয় নমনীয় ইংরেজিতে কিংবা আপনার অতি নিজস্ব 'মেড ইন ইন্ডিয়া' (কিংবা ইংলন্ড) মার্কা ফরাসিতে জিগ্যেস করছেন, 'প্লাস দ্য লা মাদলেন কোথায়?' ফলম? সর্বং শূন্যং!

কিংবা হাম্বুর্গে। ইংরেজি ছাড়ুন, ফরাসি ছাড়ুন, জর্মন ছাড়ুন। যা ইচ্ছে তাই, কিংবা যাচ্ছেতাই। 'ইয়া, ইয়া, ইয়েস, ইয়েস, নো, নো, আন্দারস্তেন্দ নৎ। সরি, সরি গুদ মর্নিং!' হয়ে গেল আপনার পায়ে হাঁটার অভিযান। মনে মনে কানমলা খেয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, আর ট্রামবাসে পায়ে হেঁটে ইয়ার্কি মারা নয়, এখন থেকে শুধু ট্যাক্সি, যেখানে যাবার যাব আর আসব, কারও সঙ্গে স্পিকটি নট্।

অথবা আরেকটি গল্প নিন। আমার বক্তব্য আরও খোলসা হয়ে যাবে। এক ফরাসি দোকানের সামনে বড় বড় হরফে লেখা, 'ইংলিশ স্পোকেন'। তাই দেখে আপনার-আমার মতো ভাষা বাবদে একংজিহ্ব (মনোগ্লট) জনৈক ইংরেজ সেই দোকানে ঢুকে গড়গড় করে ইংরেজি বলে কী একটা কিনতে চাইল। দোকানদার উত্তর দেয় যেন ফরাসিতে। ইংরেজ শুধায়, 'ফরাসি কও কেন? ইংরেজি বলতে পারো না? সাইনবোর্ডে লিখে রাখোনি ইংলিশ স্পোকেন?' সাইনবোর্ডের দিকে আঙুল দিয়ে দেখানোতে দোকানদার মামলাটার আন্দেশা

www.pathagar.com

করতে পারল। অনেক ধস্তাধস্তি, বহুৎ হোঁচট খেয়ে ফরাসি-ইংরেজিতে আইরিশ স্টু বানিয়ে যা বললে তার অর্থ, 'ঠিকই তো, ইংলিশ এখানে বলা হয়। আমাদের খদ্দেররা ইংরেজি বলেন, আমরা কিন্তু ফরাসিই বলে থাকি'। দোকানদারকে দোষ দিয়ে কী হবে, সে তো আর লেখেনি, 'উই স্পিক ইংলিশ', সে লিখেছে, 'ইংলিশ স্পোকেন।'

গল্পটি শুনে আমি অবিশ্বাসীর বিজ্ঞ হাসি হেসেছিলুম। পরে ভেবে দেখলুম, এতে অবিশ্বাসের কিছুই নেই। কোথাও যদি পুলিশ সাইনবোর্ড লাগায় 'সাবধান, এখানে মালপত্র চুরি যায়' আর তার পরও যদি আপনার মাল চুরি যায় আপনি কি তবে পুলিশকে গিয়ে ধরবেন যে তারাই মাল চুরি করেছে? (পুলিশের কাছে মাফ চেয়েই বলছি, ভারতবর্ষের কথা আলাদা, আমি অন্যান্য বর্বর দেশের কথা ভাবছি)।

শিরোনামায় বলেছি রাষ্ট্রভাষা। আপনি ঘড়েল পাঠক। নিশ্চয় এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন আমার নলটা কোনদিকে চলেছে। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হয়ে গিয়েছে। সহি বাৎ। আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। একটা কেন, পঞ্চাশটা রাষ্ট্রভাষা চালান, আমি বহ্বাড়ম্বরে সায় দেব। আমি তো আর কেন্দ্রে গিয়ে নোবাবির সন্ধান করব না, কিংবা মন্ত্রণাসভায় লম্বা লম্বা ভাষণ ঝাড়বো না যে হিন্দি রাষ্ট্রভাষার নোকরি পেয়ে গিয়েছেন শুনে বৈধব্য দুঃখে হবিষ্যান্নি আরম্ভ করব?

রাষ্ট্রভাষার যে প্রয়োজন আজ সেটা উপস্থিত না হয় মেনেই নিলুম এবং হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হয়েছে তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার শুধু সবিনয় নিবেদন, যেসব প্রদেশে হিন্দি প্রচারিত নয়, যেমন ধরুন বাঙলা, কিংবা অন্ধ্র, কিংবা তামিলনাড়ু সেসব দেশের লোককে জোর করে হিন্দির কলমা পড়াতে যাবেন না, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, দুটো ভাষা শিখতে পারে অল্প লোকেই।

উত্তরে আপনি বলবেন, 'কেন, মশায়, আমাদের অনেকেই তো ইংরেজি-বাঙলা দু ভাষাতেই খাসা বক্তৃতা ঝাড়তে পারেন!'

আমি বলব, 'ইংরেজিতে আমরা বক্তৃতা দিয়েছি আপসে অর্থাৎ আপনজনের ভিতরে। দহরম মহরম বোঝাতে গিয়ে 'ফ্যামিলি ওয়ে' বলেছি, ট্রেন মিস করার উল্লেখ করতে গিয়ে 'মিস ক্যারেজ' বলেছি তাতে কোনও ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। কারণ, যে দু চারটি ইংরেজ সভাস্থলে উপস্থিত থাকতেন তাঁরা নানা প্রকারের পিজিন ইংলিশ শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন; আমাদের ইংরেজি নিয়ে মস্করামো করতেন না। কিন্তু লালাজি দুবেজি পাঁড়েজিরা, আমাদের টোটি-ফোটি হিন্দি শুনে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করবেন, না মুখ ফিরিয়ে একটুখানি ফিক করে হেসে নেবেন ঠিক এঁচে উঠতে পারছি নে। লক্ষ্ণৌ দেহ্‌লি কি হিন্দি, সাহেব, বড়ি ঠাটকি হিন্দি,— মজাককি বাৎ নহিঁ!'

বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। মোটেই মজাক করছিনে। যে মন্ত্রণাসভায় দেশের দশের ধনপ্রাণ নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে মস্‌করা করতে যাবে কে?

তাই বারান্তরে আলোচনা করার বাসনা রইল, যেসব দেশে বহু ভাষা প্রচলিত সেসব দেশ এ সমস্যা সমাধান করেছে কী প্রকারে। ততদিনের জন্য 'জয় হিন্দ'— এবং

'জয় হিন্দ।'

— ওমর খৈয়াম

www.pathagar.com

ত্রিবেণী

"ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি, ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা রক্ষাকল্পে একটি ভারতীয় পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।"

এ খবর পড়ে বিদগ্ধজন মাত্রই আনন্দিত হবেন এবং আমার বিশ্বাস বাঙালি এ আহ্বানে সাড়া দেবে সবচেয়ে বেশি— কাজ করার সুযোগ পাবে কি না, সেকথা তুলে এই মঙ্গলের দিনে দ্বন্দ্ব-কলহের সূত্রপাত করতে চাইনে। বাঙালি কেন এ আহ্বানে সবচেয়ে বেশি সাড়া দেবে সেকথা আরেক দিন হবে— উপস্থিত ভারতবর্ষই কেন এ প্রকারের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের চক্রবর্তী হবে, সে আলোচনা করা যাক।

প্রাচ্যলোকে তিনটি ভূখণ্ড পৃথিবীতে যশ অর্জন করেছে। আরব-ভূমিতে দুটি ধর্মের অভ্যুদয় হয়। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম এবং এ দুটি ধর্ম যে প্রাচীনতম ইহুদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারও বিকাশ হয়েছে আরব-ভূমির অন্যতম কেন্দ্র জেরুজালেমে।

দ্বিতীয় ভূখণ্ড ভারতবর্ষ। এখানে সনাতন, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ।

তৃতীয় ভূখণ্ড চীন (এবং জাপানকে নিয়ে মঙ্গোলভূমি) কনফুৎসীয়, লায়োৎসে প্রচলিত পন্থাকে ধর্ম বলা যায় কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কিন্তু আমরা এখানে যে ব্যাপক অর্থে ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করছি, তার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মকে সর্বপ্রকারের সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধ্যের প্রস্থানভূমিরূপে অবলোকন করা।

সর্বশেষে আরেকটি ধর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের বল্‌খ্ (সংস্কৃত বল্‌হিক) নগরে জরথুস্ত্র আপন ধর্ম প্রচার করেন ও ইরানি আর্য রাজা গুশতাস্পকে এই নবধর্মে দীক্ষিত করেন।

ভৌগোলিক দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ প্রথম ও তৃতীয় ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী— একদিকে বল্‌খ্ (ইরান) ও আরবভূমি, অন্যদিকে চীন-জাপানের মঙ্গোলভূমি এবং সে যে শুধু মধ্যবর্তী তাই নয়— সর্ব বৈদগ্ধ্যের চক্রবর্তীও বটে।

মুসলমান ধর্ম জন্ম নিল আরবভূমিতে, ইরানে সে ধর্ম সুফি মতবাদের সহায়তায় পুষ্ট হল, কিন্তু ভারতবর্ষে এসে মুসলিম বৈদগ্ধ্য যে বিকাশ ও পরিণতি পেল তার সঙ্গে কটি মুসলিম দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে? মিশরের ইবনেতুলুন মসজিদ অতি রমণীয়, জেরুজালেমের ওমর মসজিদ এবং মসজিদ-উল-আকসা স্থাপত্যের গর্বস্বরূপ, বুখারা-সমরকন্দও চেঙ্গিস তিমুরের কীর্তি বক্ষে ধারণ করেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ পৃথিবীর কে না জানে তাজমহলের বাড়া ইমারত পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

শুধু তা-ই নয়। এ ইমারত গড়ে উঠল আর্য ও সেমিতি সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সহযোগিতার ফলে। তাজের চারু-কারুকার্য অস্মদেশীয়, কিন্তু স্থাপত্য-পরিকল্পনা যাবনিক এরকম কথা পণ্ডিতেরা বলেন, আমরাও (অর্থাৎ অর্বাচীনরা) অস্বীকার করি না, কিন্তু ভারতবর্ষের ক-জন দর্শক তাজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার সময় এ সম্বন্ধে সচেতন?

www.pathagar.com

সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা এবং সেইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব। কোনও ইংরেজ বা মার্কিন যখন তাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তখন কোনও হিন্দু তো একথা বলে না, 'আমাকে শোনাচ্ছ কেন? আমার এতে গর্ব করবার কী আছে? ও জিনিস তো মুসলমানের তৈরি— যাবনিক, ম্লেচ্ছদুষ্ট!' (আজ পর্যন্ত এমন মুসলমানও দেখিনি যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনে কানে আঙুল দিয়ে বলেছেন, 'তওবা, উনি তো হিন্দু!')

পৃথিবীতে বহু সাধক জন্মেছেন, কিন্তু বিশ্বমৈত্রী প্রচার করাতে যাঁরা দেশ-বিদেশে সম্মান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর কবীর, নানক, দাদু, পল্টুদাস এবং অন্যান্য অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত আউল বাউল সম্প্রদায়। কবীরের চেয়ে বড় সাধক জন্মাননি একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাঁর সাধনার ধন যখন বিশ্বজন সমক্ষে স্বপ্রকাশ হল তখন সত্যান্বেষীরা বিস্ময় মেনে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই অশিক্ষিত সাধক সর্বধর্ম সমন্বয়ের সন্ধান পেল কোথায়? হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জরথুস্ত্রি সব ধর্মকে পক্ষপাতহীন সহৃদয়তায় গ্রহণ করতে হলে যে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন এ লোক সে দিব্যদৃষ্টি পেল কী করে?'

এষাস্য পরমাগতি, এষোস্য পরম সম্পদ, ইহাই পরম গতি, ইহাই পরম সম্পদ, এ সম্পদ ভারতবর্ষ পেল কী করে?

সাধনার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির জগতে ভারতবর্ষ একদিন যে দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিল, যার ফলে তার কাছে আত্ম-পর এক হয়ে গিয়েছিল, যার কৃপায় সর্বসংস্কারমুক্ত হয়ে সে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু সত্য অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছিল, আজও সে সম্পদ ভারতবাসীর অবচেতন মনে সুষুপ্ত। সে সত্যযুগ পশ্চাতে ছিল, সে সত্যযুগ সম্মুখেও রয়েছে। আজাদ সাহেবের অদ্যকার প্রচেষ্টাই আমাদের মন সর্বপ্রকার সংশয় থেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

এ ভারতভূমিতে যেরকম ইসলাম এসে তার বিকাশ পেল, জরথুস্ত্র ধর্মও এ ভূমিতে এসে আশ্রয় নিল। ঠিক তেমনি একদা এদেশ থেকে বিশ্বজয়ে বেরিয়েছিল বৌদ্ধধর্ম। চীন-জাপানে সে ধর্ম কী বিকাশ, কী পরিণতি লাভ করেছিল তার সন্ধান মাত্র কিছুদিন হল আমরা আরম্ভ করেছি। আত্মম্ভরিতা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবু বলি যে জিনিস ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে সে সম্বন্ধে সে সচেতন— ইসলামের ভারতীয় ইতিহাস তাই সে অল্লাধিক জানে, কিন্তু যে জিনিস সে বিশ্বজগৎকে দিয়েছে, সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

তাই বলি, ভারতবর্ষ পূর্বদিকে বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে, পশ্চিমদিকে বাহু প্রসারিত করে নিয়েছে। সম্বিতে হোক্, অবচেতন অবস্থায়ই হোক্, দুয়েরই সঙ্গে তার যোগাযোগ। চীন তো আরবকে চেনে না, আরবও চীনকে চেনে না।

সমস্ত প্রাচ্যের দৃঢ়ভূমি তাই ভারতবর্ষ।

— ওমর খৈয়াম

www.pathagar.com

এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা

নদীর এ-পার যখন নিশ্বাস ছেড়ে বলে ও-পারের মতো সুখ এ-পারে নেই আর ও-পারও যখন ঠিক একই কথা বলে তখন বিচক্ষণ জন বিশেষ বিচলিত হন না। কিন্তু পুব পারের প্রজারা যদি বলে পশ্চিম পারে রামরাজত্ব এবং পশ্চিম পারের প্রজারা যদি বলে পুবের জমিদার শিবতুল্য লোক এবং তদুপরি যদি দুই জমিদারের ভিতর মনের মিল না থাকে তা হলে উভয় পারের জমিদার-বাড়িতে সামাল সামাল রব পড়ে যায়। রামের তখন ভয়, পাছে শিব উস্কানি দিয়ে তাঁর জমিদারিতে প্রজা-বিদ্রোহ মাতিয়ে তোলেন, এবং শিব আগের থেকেই আপন প্রজার কিছু কিছু বকেয়া খাজনা মকুব করে দিয়ে শিবতুল্য হওয়ার চেষ্টা করেন। এ-হাল বাবতে বাঙালি মাত্রই ওকিবহাল।

কাজেই জর্মনির পূর্ব-পশ্চিম দু পারের অবস্থা বুঝতে বাঙালিকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। উপরের তুলনাটি পেশ করা মাত্রই বিচক্ষণ জন যেমন 'টে' শুনলেই বুঝতে পারেন 'টেংরার হাইস্কুলের হেডমাস্টারের মাথার টাকের কথা' হচ্ছে ঠিক তেমনি বাঙালি মাত্রই রগড়ের আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

পশ্চিম জর্মনির ইংরেজ-মার্কিন-ফরাসি বড়কর্তারা বিনিদ্র যামিনী যাপন করছেন পাছে রায়তরা রাতারাতি রাতুল রুশের উস্কানিতে লাল হয়ে ওঠে, ওদিকে স্তালিনও যে পূর্ব জর্মনির দিল-দরিয়ায় গোসল করবার হেকমত খুঁজে পাচ্ছে না সেটাও লাল হরপেই মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে।

এ সমস্যার গর্ভদান করেছিলেন লড়াই শেষ হওয়ার পূর্বে রজোভেল্ট, স্তালিন এবং চার্চিল তিন হুজুরে মিলে। জর্মনিকে দু টুকরো করে কমজোর করার মতলব তিন গাঁও বুড়োতেই করেছিলেন। বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন যে, হিটলার একদা জর্মনির মন পেয়েছিলেন অর্ধচ্যুত রাইনল্যান্ডকে সম্পূর্ণ আপন করার জিগির তুলে, জর্মনিকে পাগল করে তুলেছিলেন খণ্ডিত 'সারল্যান্ডকে' ফিরে পাওয়ার লোভ দেখিয়ে এবং শেষটায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন পরহস্তগত 'সুডেটেনল্যান্ড' ও ডানৎসিখ্ কেড়ে নেবার কড়া মদ খাইয়ে। অর্থাৎ জর্মনির সামান্যতম টুকরো তার জাতির অঙ্গ থেকে কেটে ফেললেই জর্মনির সমস্ত শরীর— অর্থাৎ তার পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তাবোধ— ছিন্ন অঙ্গের জন্য প্রথমটায় ব্যাকুল হয়, তার পর নানা কল-কৌশলে গায়ে গত্তি লাগিয়ে নিয়ে শেষটায় চতুর্দিকে ডাণ্ডা বুলোতে থাকে। তখন তার আর শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকে না। ইংলন্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, রুশিয়া, কাউকে তখন সে বাদ দিয়ে কথা কয় না। এ হিড়িকে তিন মাতব্বরই যে কী রকম বেধড়ক মার খেয়েছেন তা তাদের গা চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ শব্দ থেকে আমরা পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

সোজা বাঙলায় বলতে গেলে দাঁড়ায় : বিচ্ছেদের ফল বেদনা এবং তার থেকে জন্ম নেয় নিবিড়তম একাত্মবোধ। এই আমাদের যক্ষের ব্যাপারটাই বিবেচনা করে দেখুন না। একটুখানি ভেড়ুয়াগোছ ছিল বলে লোকটাকে কুবের গাঁয়ের বার করে দিলেন। বেচারি তখন হাউমাউ করে যে কান্নাকাটি করেছিল তারই নাম 'মেঘদূত'। খাসা কাব্যি, কেউ অস্বীকার করবেন না। অথচ দেখুন, কুবের যদি ছোকরার বউ-হ্যাংলামোটা একটুখানি বরদাস্ত করে

www.pathagar.com

নিতেন তা হলে সে আরামে খেয়েদেয়ে— দু পয়সা লোকটার ছিল তো বটে— ঢেঁকুর তুলে তুলে আর আণ্ডা-বাচ্চা পয়দা করে বাকি জীবন কাটিয়ে দিত।

অবশ্য যক্ষটি অস্মদ্দেশীয় অর্থাৎ গান্ধীপন্থি অহিংস। জর্মন হলে কী করত বলা যায় না। হয়তো ভি ওয়ান, ভি টু নিয়ে কুবেরের পেছনে তাড়া লাগাত আর কুবেরও হয়তো এটমবমের সন্ধানে মন্বন্তরব্যাপী তপস্যায় বসে যেতেন।

পাঠক বলবেন, 'চার্চিল তো আর মেঘদূত পড়েননি, এ তত্ত্বটা জানবেন কী করে?' আলবৎ জানা উচিত। কারণ ইংরেজিতেই প্রবাদ রয়েছে 'অ্যাব্‌সেন্স মেক্স্ হার্টস্ ফন্ডার'। আমার বিশ্বাস চার্চিল এ প্রবাদটি জেনেশুনেই বিরহের ব্যবস্থাটা করেছিলেন। কারণ ইংরেজ আর কিছু জানুক আর না-ই জানুক, পয়সার কদরটা খুব ভালো রকমেই জানে। তাই তাদের ভিতর এ প্রবাদেরও বাড়া আরেকটা প্রবাদ আছে এবং সেটা জানে অতি অল্প ঘড়েলই— সেটা হচ্ছে, 'প্রেজেন্টস ফন্ডার স্টিল'।

অর্থাৎ 'প্রেজেন্‌স্' নয় 'প্রেজেন্টস'। 'সাড়িডা, বালাডা কিন্যা বিবির মন যোগাও।'

আমার বিশ্বাস চার্চিল যখন জর্মনিকে বৈষ্ণবার্থে 'খণ্ডিতা' করতে রাজি হয়েছিলেন তখনই 'প্রেজেন্টসের' কৌশলটা মনে মনে এঁচে নিয়েছিলেন। তাঁর মতলব ছিল কৃষ্ণকে কোনও গতিকে রাধার কাছ থেকে মথুরায় সরিয়ে নিয়ে রুক্মিণী-সত্যভামার ভেট দেওয়া। আমার বিশ্বাস তাই ইংরেজ এত সাত-তাড়াতাড়ি জর্মনিতে আবার খানা-দানা পাঠাতে আরম্ভ করেছে। (যুদ্ধ যখন লাগে তখন আমার এক জর্মন বন্ধুর দুই মেয়ের বয়স ছিল এক আর তিন। বন্ধু মাসখানেক হল একখানি চিঠিতে আমাকে লিখেছেন, 'যুদ্ধের সময় তো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কলা আসা বন্ধ ছিল। কাল প্রথম বাজারে কলা উঠেছে। আমার মেয়ে দুটি ছবিতে দেখা জিনিস নিজের চোখে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।' পদ্মার ও-পারে আমরা বলি, 'জর্মনিকে আবার কলাডা মূলাডা দেওয়া হচ্ছে।'

এবং সবচেয়ে বড় সওগাত মার্কিন-ইংরেজ-ফরাসি তিন মহাজন পশ্চিম জর্মনিকে দিয়ে ফেলেছেন সেটা হচ্ছে স্বরাষ্ট্রাধিকার। পশ্চিম জর্মনির কাজ-চালানো-গোছ একটা কনসটিটুশান তৈরি হয়ে গিয়েছে, গণনির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে এবং হের আডেনাওয়ার এ অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

কিন্তু মার্কিন-ইংরেজ-ফরাসি বড়কর্তারা স্তালিনকে ফাঁকি দিয়েছেন। কথা ছিল কোনও কর্তাই আপন হিস্যার জর্মনিকে স্বরাজ দেবে না— স্বরাজ যদি দিতেই হয় তবে সবাই একজোট হয়ে পূর্ণাবয়ব জর্মনিকে পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ দেবেন। মা-ই-ফ ঝপ্ করে আপন হিস্যায় স্বরাজ দিয়ে— অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব আইন চালু করে দিয়ে— ওপারের জমিদার শিববাবুকে বেবাক বোকা বানিয়ে দিয়েছেন।

প্যাঁচটা মন্দ নয়। কারণ নব-রাষ্ট্রপতি হের আডেনাওয়ার প্রথম বক্তৃতাতেই ও-পারের জমিদারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য হিটলার যেরকম ভাষায় সুডেটেন চেয়েছিলেন ঠিক সে ভাষায় নয়— অতি মোলায়েম কণ্ঠে, কিন্তু আমরা এসব গলা চিনি, 'টে' বললেই বুঝতে পারি 'টেংরার হাই স্কুলের ইত্যাদি— '।

অবশ্য চেম্বারলিনের মতো স্তালিনের ছাতা-বগলে ছুটোছুটি, ওড়াউড়ি করতে এখনও ঢের দেরি।

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁকেও 'এপিজমেন্ট' করতে হচ্ছে। পূর্ব-জর্মনিকেও স্বরাজ দিতে হয়েছে।

এখন কে কত দিতে পারে? সুকুমার রায়ের মতো আমরা বলি 'লাগ, লাগ, লাগ'— অর্থাৎ নিলামটা লেগে যাক, দর চড়ুক, বেচারি জর্মনির দু মুঠো অন্ন জুটুক, গায়ে গত্তি লাগুক।'

— ওমর খৈয়াম

ধর্মং শরণং?

নদীতে স্নান করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, দেশভ্রমণ করলে কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষ মুক্তি পায়, বস্ত্রদান ছত্রদান করলে দেশের শিল্প উন্নতিলাভ করে, মন্দির-মসজিদ গড়লে দেশের চারুকলা সমৃদ্ধিলাভ করে, তাই গঙ্গাস্নানে পুণ্য, তীর্থযাত্রায় ধর্মলাভ, দানে মোক্ষ আর উপাসনালয় নির্মাণে যে পুণ্য-ধর্ম-মোক্ষ তিনেরই সম্মেলন সে বিষয়ে এককালে কারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

অর্থাৎ যা কিছু মানুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক এককালে তাকেই ধর্ম নাম দিয়ে সাধুসজ্জন এবং সমাজপতিরা জনগণের মন উদ্বুদ্ধ করতেন। এখনও 'অশিক্ষিত' লোক ধর্মের দোহাই না দিলে কোনও প্রকারের সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করে না, এখনও বহু লোক শরীর অসুস্থ হলে ডাক্তার না ডেকে মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় নেয়। দাওয়াই-দেনে-ওয়ালা সন্ন্যাসী ফকিরের বিধান এখনও মানে বহু লোক, বিধানের বিধানকে উপেক্ষা করে। এ নিয়ে মনস্তাপ করলে 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় বলেন, 'শিক্ষা বিস্তার ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে মানুষের মন ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত করা যাবে না। স্বাস্থ্যরক্ষা, সমাজসংস্কার, শিল্পকলার বিস্তার এখন ডাক্তার, অর্থবিদ্ নন্দনজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে— এঁরা সব স্পেশালিস্ট— ধর্ম এখন শুধু তাঁদেরই জন্য যাঁরা পরলোকের জন্য ইহলোক ত্যাগ করতে প্রস্তুত। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এ তত্ত্বটা বুঝতে পেরে রাজনীতি অর্থনীতি থেকে ধর্মকে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেবে। যেমন ইউরোপ করেছে।'

কিন্তু প্রশ্ন ইউরোপ সত্যিই কি রাজনীতি থেকে ধর্ম বাদ দিয়ে ফেলেছে?

হিটলার যখন সোশ্যালিস্টদের সাবাড় করলেন, কম্যুনিস্টদের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করলেন, ধনপতিদের কলুর বলদের মতো খাটালেন, শ্রমিকদের ইউনিয়ন পয়মাল করে দিলেন, ইহুদিদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করলেন, তখন নাৎসিরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল, 'এখন রাস্তা সাফ, লন্ডন-মস্কো পৌঁছতে এখন আর কোনই বাধা নেই'। ঠিক তখনই বিদ্রোহ দেখা দিল এমন এক দলের মাঝখানে যাঁদের সবাই 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন', 'অফিসের কারবারি' নামে পরিচিত হতেন। এঁরা সব ক্রিশ্চান পুরোহিতের দল, এবং এঁদের নির্ভীক আচরণ দেখে জর্মনির বহু আস্তিক বহু নাস্তিক বিস্ময় মানলেন, এবং আস্তে আস্তে তাঁদেরই চারপাশে ভিড় জমাতে লাগলেন। ১৯২৯ সালে হিটলার যখন সামান্য মন্ত্রীত্ব পেলেই বর্তে যেতেন তখন আমি গির্জাঘরে অনায়াসে বসবার জায়গা পেতুম, ১৯৩৮ সালে যখন চেম্বারলেন তাঁর কথায় কথায় বাঁদরনাচ নাচতে শুরু করেছেন তখন গির্জাঘরের ভিড়ের ঠেলায় আমি বহু রবিবার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি। ১৯২৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

থিয়োলজি বিভাগ ছাত্রাভাবে অক্কা পায় পায়, ১৯৩৮ সালে ওই বিভাগই বক্তৃতা আলোচনায় গমগম করছে। হিটলারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জর্মনির নাস্তিকরা তখন পর্যন্ত পাদ্রি-পুরুতের সঙ্গে দহরম মহরম আরম্ভ করেছে। এঁরা তখন যে সাহস দেখিয়েছিলেন জর্মনির লোক আজও তা ভুলতে পারেনি। এই মাত্র সেদিন পশ্চিম জর্মনির ব্রিটিশ এলাকায় যে গণ-নির্বাচন হয়ে গেল তাতে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে এক ধর্মের নামে গড়া রাজনৈতিক দল। জর্মনির খবর কাগজ পড়ে মনে হয়, সাধারণ জর্মন আর যেন নির্জলা রাজনৈতিকদের হাতে সবকিছু তুলে দিতে রাজি নয়। যে দলে দু চারজন পাদ্রি-পুরুত আছেন সে দলকে স্বীকার করে জর্মনি যেন তাঁদের আগেকার সাহসের পুরস্কার দিতে চায়।

ইটালিতেও তাই। কমরেড তল্লাত্তির মতো সর্বজনমান্য কম্যুনিস্ট নেতা পৃথিবীর অল্প দেশেই আছেন। ইটালির গত গণভোটে তাঁর অবশ্যম্ভাবী জয় ঠেকাবার জন্য স্বয়ং পোপকে ভোট-মারে নাবতে হল। তল্লাত্তিও তখন প্রমাদ গণলেন। কমিউনিস্ট পার্টি জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইস্তাহারে জাহির করলেন, কমিউনিস্টরা জয়লাভ করলে পাদ্রি-পুরুতের টাকা-পয়সায় হাত দেবে না, গির্জা মনাস্টেরির (সংঘ) যুগ যুগ সঞ্চিত চাষা-মজুরের রক্তে রাঙা ধনদৌলত যেমন আছে তেমনি থাকবে। অর্থাৎ 'ধর্ম'কে তার 'অর্থ' থেকে বঞ্চিত করা হবে না। তবু তল্লাত্তিকে হার মানতে হল। আর এখন তো ভ্যাটিকান এবং মার্শাল প্লান একই জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বয়ং স্তালিন লড়াইয়ের সময় পাদ্রি সম্প্রদায়কে ডেকে এনে বহু গির্জাঘর ফেরত দিলেন। শুনেছি কোনও কোনও গির্জাঘরে নাকি 'হোলি রাশার' নামে পুজোপার্বণও হয়েছিল। নাম ভুলে গিয়েছি কিন্তু তখন এক বড় পাদ্রি সায়েবকে নিয়ে রুশিয়া বিস্তর মাতামাতি করেছিল। যুদ্ধের পর আমেরিকার ধনতন্ত্রে ফাটল ধরাবার জন্য কোনও কোনও মার্কিন পুরোতকে রুশ সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ, আদর, আপ্যায়নও করেছিল!

ফ্রান্সের মতো নাস্তিক দেশে ক্যাথলিকদের এখনও কতখানি শক্তি সে-কথা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

প্যালেস্টাইনে নবনির্মিত ইহুদিরাজ্য চোখের সামনে গড়ে উঠল যেহোভার নামে শপথ করে করে। ইহুদিরা শুয়োরের মাংস খায় না— শাস্ত্রে বারণ— 'ইসরায়েল' রাজ্যে এই শূকর মাংস নিষিদ্ধ। অথচ এ রাজ্যের কর্ণধারগণের শতকরা নব্বইজন যখন ইউরোপে ছিলেন তখন ভুলেও সিনাগগে (ইহুদি ভজনালয়) যেতেন না, গবগব করে শুয়োরের মাংস গিলতেন প্রশস্ত দিবালোকে, হোটেল রেস্তোরাঁর বারান্দায় বসে।

এবং এই প্যালেস্টাইনের প্রতিবেশী মিশরে রাজনৈতিক আন্দোলন করে কে? ইংরেজকে খেদাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে কারা? অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা। আমরা এদেশে টোল বা মাদ্রাসা বলতে যা বুঝি অজহর ঠিক সেই জিনিস। সেখানে ধর্মচর্চা হয়, সেখানকার ভূগোল পাঁচশো বছরের পুরনো, সেখানে অর্থনীতি এমনকি রাজনীতিও পড়ানো হয় না। অথচ এই অজহরের ছাত্রেরাই ট্রাম পোড়ায়, বাস জ্বালায়, আর মোকা পেলে ইংরেজকে ঠ্যাঙায়। এদের দমাবার জন্য দিনসাতেক হল নতুন আইন পাস করা হয়েছে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, মিশরের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি ধর্মচর্চা করে না, ট্রামবাস পোড়াতেও চায় না, তারা আছে সরকারকে খুশি করে চাকরি পাবার তালে।

www.pathagar.com

ট্রান্সজর্ডানের আমিরের তাগদ তিনি মহাপুরুষের বংশধর, তিনি রাজা এবং ধর্মগুরু দুই-ই বটেন।

ইবনে সউদের তাগদ তিনি মক্কা-নশীন তাই। মুসলিম জাহানের কেন্দ্র মক্কাশরীফ।

ইরান আফগানিস্তানের মোল্লা সম্প্রদায় এখনও সমাজচক্রবর্তী।

*　　*　　*

ধর্ম রাজনীতিতে প্রবেশ করবে কি না, করা উচিত কি না সে বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু বলতে চাইনে। কারণ আমার মতের কোনও মূল্য নেই। আমি শুধু এইটুকু দেখিয়েই সন্তুষ্ট যে ধর্মকে 'গেট আউট' বললেই সে সুড়সুড় করে বেরিয়ে যায় না। এবং তাই যদি সত্য হয় তবে ধর্মকে কী প্রকারে জনপদ-কল্যাণে নিযুক্ত করা যায় সেইটে সাদা চোখে ভালো করে তলিয়ে দেখতে হবে। এবং তলিয়ে দেখতে হলে ঈষৎ ধর্মচর্চার প্রয়োজন। সেটা কী প্রকারে করা যায় সেই হল সমস্যা। 'ধর্ম' বলতেই যাঁরা অজ্ঞান তাঁদের হাতে তো আর সবকিছু ছেড়ে দেওয়া যায় না।

— ওমর খৈয়াম

কাঠ-বেরালি?

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথা এ সপ্তাহে আমরা বার বার স্মরণ করেছি; দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জনারণ্যের মাঝখানে বক্তৃতামঞ্চের উপর থেকে তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। স্বাধীনতার যে দেউল নির্মিত হল তার অনির্বাণ আরতির চিরন্তন প্রদীপ হয়ে রইল তাঁদের স্মৃতি।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এ-বেদনাটাও বুকে বাজে যে, বহু অখ্যাত অজ্ঞাত দেশবাসীর নাম আমরা এ উপলক্ষে পাঁচজনকে শোনাতে পারলুম না। তাঁরা এমন কিছু কীর্তি রেখে যেতে পারেননি যার জন্য আমরা তাঁদের নাম আড়ম্বর করে স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ করতে পারি। অথচ আপনি আমি পাঁচজন নগণ্য লোকের চেনা-শোনার ভিতরেও এরকম ধরনের দু চারটি দেশসেবী ছিলেন।

তাঁর নাম শান্তিলাল খুশহালচন্দ শাহ। বাড়ি মহাত্মাজির দেশে, অর্থাৎ কাঠিওয়াড়ে— প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে। রোগা-পটকা লোকটি— দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট হয় কি না-হয়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এ-দিক ও-দিক ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পৌঁছলেন শান্তিনিকেতনে— সেখান থেকে গেলেন বন্ শহরে (অধুনা পশ্চিম জর্মনির রাজধানী) সংস্কৃতে ডক্টরেট নেবার জন্য। অধ্যাপক কির্ফেল (পুরাণ সম্বন্ধে 'ইন্ডিশে কসমগণি' নামে একখানা বিরাট গ্রন্থ ইনি লিখেছেন, বিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব অধ্যাপক য়াকোবির ইনি শিষ্য) ছোকরাকে পেয়ে ভারি খুশি।

কী মতলব তা জানার পূর্বে খামকা তর্ক করে অস্ট্রেলিয়ান শয়তানকে হুঁশিয়ার করে দেওয়াটা বিচক্ষণের কর্ম হবে না।

ভেবেছিলুম, শাহ খবরদারিটা শুনে অস্ট্রেলিয়ানকে ঠ্যাঙাবার জন্য তার ভাঙা মোটর-সাইকেল করে তদ্দণ্ডেই বন্ শহর চষতে আরম্ভ করে দেবে। আদপেই না, ঠাণ্ডা হয়ে সব কথা শুনল, মিটমিটিয়ে একটুখানি হাসল।

www.pathagar.com

শুধালুম, 'দেশে ফিরে না যেতে পারলে দেশ-সেবা করবে কী করে? তাই একটু সমঝে-বুঝে বক্তৃতাটা দিলে হয় না?'

শাহ্ মিটমিটিয়ে হাসল।

বক্তৃতার দিন আমরা সদলবলে উপস্থিত— দেখি অস্ট্রেলিয়াও এসেছে।

সাড়ে ছ-ফুটি জর্মনদের মধ্যিখানে পাঁচফুটি শাহকে বামনাবতারের মতো দেখাচ্ছিল।

ভারতবর্ষের নানা প্রকার ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক গবেষণা করার পর শাহ্ নামল ইংরেজ রাজত্বের আমলে। প্রথমে আলোচনা করল সে-আমলের সর্বাঙ্গীণ দুঃখ-দৈন্য, মহামারী-দুর্ভিক্ষের, আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তুলতে লাগল তার জন্য যে দায়ী তার বিকট বীভৎস নগ্ন ছবি এবং সর্বশেষে করল হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিয়ে এমিল জোলার 'আই এক্যুজ (I accuse) কায়দায় ইংরেজের চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ।

কর্ণপটবিদারক করতালির মাঝখানে শাহ্ আসন গ্রহণ করল।

করতালির প্রতি নমস্কার করতে উঠে শাহ্ বলল, 'এই সামান্য নগণ্য বক্তৃতা সম্পর্কে আমার আরেকটি বক্তব্য আছে।'

তার পর অতি শান্তকণ্ঠে অস্ট্রেলিয়ান হুমকির একটা সবিস্তর বয়ান দিয়ে বলল, 'আমি কে, আর আমার কতটুকুই-বা শক্তি? সেই সামান্য সত্তাটুকুকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সইতে পারে না বলে এই সুদূর বন্ শহরের নিভৃত কোণেও সে চোখ রাঙায়, মার লাগাবে বলে ভয় দেখায়। কিন্তু আমার দেহ ক্ষুদ্র, ভয়ও সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র।'

পাঁচফুটি শাহ সেদিন জর্মনদের কাছ থেকে বাদ-'শাহী' কদর পেয়েছিল।

* * *

আমি দেশে ফিরে এলুম। কিছুদিন পরে শুনলুম, কোথাও থেকে একটা বৃত্তি যোগাড় করে শাহ্ বন্ শহরের মেডিকাল কলেজে ঢুকেছে। সংস্কৃতে ডক্টরেট নেওয়ার পর পরিণত বয়সে ডাক্তারি পড়া আরম্ভ করা— তা-ও আবার জর্মন মেডিকাল কলেজে!— চারটিখানি কথা নয়।

তার পর শুনলুম, শাহ ডাক্তারি পাস করে জর্মন ফৌজে ডাক্তার হয়ে ঢুকেছে। তখন বুঝলুম, কেন সে এত মেহনত করে ডাক্তারি শিখল। সুভাষচন্দ্র যেরকম জাপানের সাহায্য নিয়ে ইংরেজকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছিলেন, আমাদের নগণ্য শাহ তেমনি জর্মন ফৌজে ঢুকেছিল সেই মতলব নিয়ে। পাঁচফুটি শাহ তো অন্য কোনও উপায়ে জর্মন ফৌজে ঢুকতে পারত না।

তার পর নাকি শাহ স্তালিনগ্রাদের দিকে জর্মন ফৌজের সঙ্গে যায়— এটা অবশ্য উড়ো খবর। শাহের জীবনের এ পর্বটা জানবার কৌতূহল সকলেরই হওয়ার কথা, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও আমি এ বিষয়ে কোনও তথ্য যোগাড় করতে পারিনি।

শাহের সর্বশেষ খবর পাই লড়াই শেষ হওয়ার বছরখানেক পরে। জর্মনিতে তখন যেসব ভারতীয় আটকা পড়ে আছেন তার একটা ফিরিস্তি ইংরেজ সরকার প্রকাশ করে। সে ফিরিস্তিতে শাহের নাম ছিল।

তার পর শাহের আর কোনও খবর পাইনি।

— প্রিয়দর্শী

www.pathagar.com

মিজো সমস্যা : সরকার

ফিজোর ভাই মিজো না হলেও খুব যে নিকট-আত্মীয় সন্দেহ নেই। বললেন, লোকসভার একজন কংগ্রেসি সদস্য সংসদের কেন্দ্রীয় হলঘরে। উপস্থিত একজন সদস্য অতিশয় উষ্মা প্রকাশপূর্বক বর্ণনা করতে লাগলেন কেন্দ্রীয় সরকার ও আসামের রাজ্য-সরকারের মনোভাব। এবং এক জায়গায় এসে উনি অতি নিপুণভাবে যে বিশেষণটি প্রয়োগ করলেন এই দুই সরকারের বিষয়ে, সেই শব্দটি 'জরগদ্দব'।

একদা নাগা-নেতা ফিজোকে নিয়েও ছিল এই জরদ্গব ভাব; এবার মিজোদের বেলায়ও দেখা গেল ওই একই ভাব। সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যারা দেশের বাইরে চলে যেতে চায় তাদের নিন্দা করেন না এমন রাজনৈতিক নেতা ভারতে খুব বিরল। কিন্তু এবার অনেকে (তাঁদের ভিতর সরকারি দলের নেতারাও আছেন) প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছেন কেন্দ্রীয় ও আসাম রাজ্য-সরকারের সেই ঢিমে-তেতালা জমিদারি চালের, যার জন্য আজ সম্ভব হয়েছে মিজো বিদ্রোহ।

কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আসাম সরকার জানতেন যে, চরমপন্থী মিজোরা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করছে ১৯৬৩ থেকে, এবং যারা অস্ত্র যোগাড় করে তারা একদিন অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবে, তা-ও জানতেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দজি নিজে বললেন লোকসভায় যে, অস্ত্রাদি এসেছে পাকিস্তান থেকে, এবং মিজোদের অনেককে সামরিক শিক্ষাও দিয়েছে পাকিস্তান। এটা সরকার জানেন আজ অনেকদিন। তা সত্ত্বেও না হয়েছে চেষ্টা অস্ত্র-আনার পথ বন্ধ করার, না হয়েছে চেষ্টা চরমপন্থি নেতাদের গ্রেপ্তার করার, না হয়েছে চেষ্টা অস্ত্রের গোপন গুদাম খুঁজে বের করার। এও যদি "জরদ্গব" না হয় তো কে আর হবে?

শুধু তাই কি? এই চরমপন্থী শ্রেষ্ঠ নেতা হল লালডেংগা, ও তার দক্ষিণহস্ত হল লালনুমাউইয়া, মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের যথাক্রমে সভাপতি ও উপ-সভাপতি। এরা, ও আরও অনেকে চট্টগ্রাম দিয়ে যেত পাকিস্তানে। এবং যেত বেড়াবার জন্য নয়। অবশেষে ১৯৬৩-র ১৭ ডিসেম্বর এই দু জনকেই গ্রেপ্তার করা হয় বেআইনিভাবে পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কী জানি কেন, কিছুকাল পর দু জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তার জন্য দায়ী আসাম সরকার।

আজ থেকে প্রায় বছর চার-পাঁচেক আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছিল গোপন সামরিক রিপোর্ট ভারতের ওইসমস্ত পাহাড়ি সীমান্ত নিয়ে, এবং তাতে নাগা-মিজো-পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের উল্লেখও ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার নাকি চমৎকার যুক্তি। তাঁর প্রাক্তন সহযোগী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ সাহেব বললেন লোকসভায় যে, মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত কোনও নিরাপত্তা বাহিনী পাঠালেন না মিজো অঞ্চলে এই ভয়ে যে, তাতে মিজোরা অসন্তুষ্ট হবে, এবং হয়তো তাদের বিদ্রোহের দিন ঘনিয়ে আনবে। এমন যুক্তি কোনও মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেন, অবিশ্বাস্য। কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। আইজলে মাত্র ছিল এক ব্যাটালিয়ন আসাম রাইফেলস্। হালফিলে পাঠানো হয়েছে আর একটি মাত্র ব্যাটালিয়ন। সশস্ত্র মিজোদের সামনাসামনি করতে, অথবা বিদ্রোহ দমন করতে এই দুই ব্যাটালিয়ন কিছুই না। যদি কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেনই তা হলে ওই সময়ে আরও বেশি কেন পাঠানো হল না?

www.pathagar.com

আমাদের সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটিই-বা নেই কেন? ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি এত কম ছিল যে, অতিরিক্ত রাস্তাঘাট তৈরির চেষ্টাও হয়নি।

অসীম অবহেলা যেমন নিরাপত্তার দিকে তেমনি রাজনৈতিক দিকে। লালডেংগা প্রমুখ মিজো নেতারা ১৯৬০ ও আগে থেকে অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলনেতাদের সঙ্গে মিলে কাজ করছিল। ১৯৫৫-৫৬ থেকে তারা দাবি তুলেছে, সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাজ্য গড়ার। স্বাধীন রাষ্ট্রের নয়, ভারতের ভিতরে থেকে আলাদা রাজ্য গড়ার। কে শোনে? আসাম সরকার ও তাঁর কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যের ফলে ক্রমশ নাগারা গেল বিগড়ে। তাঁদের শাসক-মনোভাব শেষে অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলেও আনল অসন্তুষ্টি। গোড়ায় ছিল পাহাড়ি মানুষদের একটা অনুভব যে, তারা আসামের ভিতরে থেকে আসামের কর্তৃত্বাধীনে নিজেদের মতো জীবনযাপন করতে পারবে না। ১৯৬০-এর ভাষা বিল, বাঙালি বিতাড়ন আন্দোলন, ১৯৬১-এর কাছাড়ে পুলিশি তাণ্ডব—সব মিলে ঠেলে দিল পার্বত্য নেতাদের সম্পূর্ণ বিরোধী স্থানে।

তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে এদের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করতে থাকেন ১৯৬০-এর নভেম্বর (২৪-২৬) থেকে। লালডেংগারা সেই বছরই বেরিয়ে চলে গেল সর্বদলীয় নেতা সম্মেলন থেকে। তখন থেকে মিজোরা চলল আলাদা পথে। এমনকি নরমপন্থী দলের নেতা থাংলুরা মশায়ও কংগ্রেস দল থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ২৭ এপ্রিল, ১৯৬১। তাঁকেই আবার কংগ্রেস পাঠালো রাজ্যসভায়। মিজোরা ছিল দু মুখো। এক মুখে ছিল স্বায়ত্তশাসন অর্জনের কথা, অন্য মুখে ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের কথা। আমাদের সরকার প্রথম মুখের কৌশলে ধরা দিলেন।

অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল-নেতারা (খাসি, গারো, মিকির ইত্যাদি) নিজেদের দাবি নামিয়ে আনল। নেফা থেকে গারো পাহাড় অবধি এক রাজ্য আর চায় না। তারা শুধু চাইল, নেহরু ফরমুলা মতে, পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী চালিহাও সম্মত হলেন (১-১-৬৪)। তা সত্ত্বেও আজ দু বছর গড়িয়ে গেল, কিছুই হল না।

সরকারের না আছে সামরিক দূরদৃষ্টি, না আছে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। দৃষ্টিই নেই, তা কি দূরের কি কাছের! ফল : (১) মিজো বিদ্রোহ। (২) অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে তার প্রভাব, যার ফলে অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল শুধু স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট না থেকে হয়তো দাবি আরম্ভ করবে ভারতীয় রাষ্ট্রস্থ রাজ্য-পদ লাভের।

— দারাশিকো।

www.pathagar.com